বাংলা পাণ্ডুলিপি পাঠপরিক্রমা

ড. ত্রিপুরা বসু

পুস্তক বিপণি
২৭, বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারী, ২০০০

প্রকাশক ঃ
অনুপকুমার মাহিন্দার
পুস্তক বিপণি
২৭, বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

বর্ণ সংস্থাপন ঃ
নিউ প্রিন্ট টেক্
অগ্রণী স্ট্রীট (এম. কে. প্লট)
বেনাচিতি, দুর্গাপুর ৭১৩২১৩

চিত্র সংস্থাপন ঃ
'আলোর পাখি' প্রকাশনা
সুকান্ত পল্লী
দুর্গাপুর-৭১৩২০১

মুদ্রণ ঃ
নিউ সারদা প্রেস
৯সি, শিবনারায়ণ দাস লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৬

উৎসর্গ

'যে আছে মম গভীর প্রাণে'

গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ

বাংলা পুঁথি ও পাণ্ডুলিপির পঠন-পাঠন বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত নির্দেশিকা আজও এদেশে তৈরী হয়নি । এ পর্যন্ত যা হয়েছে তার মধ্যে থেকে একটি নির্দিষ্ট পথরেখা খুঁজে বের করা খুবই কষ্টকব। সম্প্রতিকালে পুঁথিচর্চার পথ প্রায় রুদ্ধ হয়ে এসেছে বলা চলে । অথচ বাংলার কয়েকটি শতাব্দীর জীবনভাবনা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ধর্মবোধের পরিচয় এদেশের হাজার হাজার পুঁথি-পাণ্ডুলিপির মধ্যে ছড়িয়ে আছে । দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এবং রসিকজনের ব্যক্তিগত সংগ্রহের বাইরে, আজও অনাবিষ্কৃত হয়ে আছে শত শত পুঁথি, পাণ্ডুলিপি, দলিল, চিঠিপত্র । এর মধ্যে ছড়িয়ে থাকা ইতিহাস বা কবিভাবনাকে উদ্ধার করতে হলে প্রথমেই এ সম্পর্কে পরিচিতি ও প্রাথমিক ধারণা থাকা চাই, একে পাঠ করতে জানা চাই । কবি বা লিপিকরের বক্তব্যটিকে ঠিকভাবে অনুসরণ করতে হলে, লিখিত বিষয়ের শুদ্ধপাঠ উদ্ধার করা চাই । যাঁরা পুঁথিপত্র নিয়ে কাজ করতে যাবেন, তাঁদের কিছুটা সাহায্য করার জন্যেই এই বইখানি । তিনদশক ধরে পুঁথিপত্র নিয়ে কাজ করতে করতে, আমার যখন যা মনে এসেছে, তা নিয়েই বইখানি লিখেছি । প্রয়াত ড. পঞ্চানন মণ্ডল ও ড. বিষ্ণুপদ পণ্ডা, শ্রদ্ধেয় অক্ষয় কুমার কয়াল — পুঁথিচর্চায় নিবেদিত প্রাণ এই সব মানুষের সাহচর্যে এসে পুঁথি সম্পর্কে অনেক শিখতে পেরেছি । কৃতবিদ্য গবেষক, লোকসংস্কৃতিবিদ ও নমস্য প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রদ্ধেয় তারাপদ সাঁতরা তিনদশক ধরে 'বন্ধু, দার্শনিক ও পথপ্রদর্শকের' মতো আমাকে এই কাজে সাহায্য করে আসছেন । নিতান্ত অসুস্থ অবস্থাতেও তিনি এই বইটির জন্য অনেকগুলি আলোকচিত্র এবং 'সংযোজনীর' মূল্যবান রচনাটি লিখে দিয়েছেন । তাঁর ঋণ অপরিশোধ্য ।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন রীডার ড. গোলাম সাকলায়েন, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. মঞ্জুলা বেরা পুঁথি বিষয়ক দরকারী গ্রন্থাদি পাঠিয়ে সহযোগিতা করেছেন অকৃপণ হৃদয়ে । কবি ও সমালোচক বীতশোক ভট্টাচার্য, তরুণ গবেষক ও লেখক কোলাঘাটের শ্যামল বেরা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড মিহির চৌধুরী কামিল্যা, ধাতুবিদ ও মুদ্রাবিশেষজ্ঞ ড. প্রণব চট্টোপাধ্যায়, প্রাক্তন ছাত্র শ্রীমান সন্দীপন মোহান্ত নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন । শ্রীযুক্ত কয়াল এবং ড. চট্টোপাধ্যায় তাঁদের মূল্যবান রচনা দুটি এ গ্রন্থের জন্য প্রদান করেছেন । এঁদের সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ ।

দু'দশকের বেশী সময় ধরে যিনি আমাকে গবেষণামূলক কাজকর্মে নানাভাবে সহযোগিতা করে আসছেন, যাঁর অহরহ তাগিদ আর উৎসাহ না পেলে এ কাজ কোন দিন শেষ করতে

পারতাম না, তিনি আমার স্ত্রী মালতী বসু। পুত্র শ্রীমান সোমনাথ ম্যানেজমেন্ট এর ব্যস্ত শিক্ষার্থী হয়েও সম্ভবমত সহযোগিতা করেছে। 'আলোর পাখি'র সম্পাদক ও কবি বন্ধুবর তপন কুমার রায় এবং তাঁর স্ত্রী মুক্তি রায়, গ্রন্থের আলোকচিত্রগুলি শ্রীমান শৌভিকশুভ্র শীলের সাহায্যে যত্ন সহকারে মুদ্রণোপযোগী করে দিয়েছেন। এঁদের নিঃস্বার্থ সহযোগিতা ভোলা যাবে না কোনদিন। যাঁরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পুঁথিপত্র দেখতে দিয়েছেন, যাঁরা শত শত পুঁথি-পাণ্ডুলিপি এই অখ্যাত পুঁথিপ্রেমীর হাতে তুলে দিয়েছেন, পুঁথির খোঁজে যাঁদের আনুকূল্য পেয়েছি বার বার, যাঁরা নিজেদের পত্রপত্রিকায় আমার পুঁথি বিষয়ক রচনাদি বিভিন্ন সময়ে প্রকাশ করেছেন, তাঁদের সবার প্রতিই আমি কৃতজ্ঞ।

১৯৯৭সালে, সাংবাদিক, লোকসংস্কৃতি ও পুরাতত্ত্বপ্রেমী ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী আমার এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিটির প্রকাশযোগ্যতা বিষয়ে আমাকে উৎসাহিত ও নিশ্চিন্ত করেন। এপার-ওপারে প্রকাশিত বেশ কিছু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ তিনি সংগ্রহ করে দিয়েছেন। বহুল প্রচারিত একটি বাংলা দৈনিকের অতিব্যস্ত বিভাগীয় সম্পাদক হয়েও এটি তিনি সধৈর্য্যে পাঠ করে, নির্দেশাদি দিয়েছেন। তাঁরই একান্ত প্রচেষ্টা, সহযোগিতা ও আগ্রহে 'বাংলা পাণ্ডুলিপি পাঠপরিক্রমা' বই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হ'ল। তাই প্রথাগত ধন্যবাদ দিয়েই বঙ্গসংস্কৃতিপ্রেমী এই অনুজ বন্ধুটির সব ঋণ আমি পরিশোধ করতে পারবো না কোনদিন।

প্রীতিভাজন প্রদীপ ফৌজদার, বর্ণসংস্থাপক তন্ময় সেনগুপ্ত গ্রন্থটির মুদ্রণের বিষয়ে কঠোর পরিশ্রম করেছেন। এঁদের প্রতি এবং পুস্তক প্রকাশক অনুপ কুমার মাহিন্দারের প্রতি আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

আমি লিপিতাত্ত্বিক বা পুঁথিবিশারদ 'পণ্ডিত' নই। বাংলা পুঁথির বিপুল সমুদ্রে আমার উদ্যোগ রামচন্দ্রের সেতুবন্ধনে কাষ্ঠমার্জারের ভূমিকামাত্র। যা দেখেছি, জেনেছি, পেয়েছি, মাধুকরী করে তাই লিখেছি। আমার সিদ্ধান্তের সঙ্গে সকলে একমত নাও হতে পারেন। গ্রন্থে মুদ্রণ প্রমাদও আছে যথেষ্ট। এইসব ভুলত্রুটি দেখিয়ে দিলে বাধিত হব। তাই 'এ বরণ গান নাহি পেলে মান, মরিব লাজে'—এ দাবী করব না। পুঁথিপাঠ, অনুসন্ধান ও আলোচনায় অতিতুচ্ছ গবেষকের এই অকিঞ্চিৎকর উদ্যোগটি আগ্রহী রসিকজনকে কিছুটা সাহায্য করলে এই শ্রম সফল হবে বলে মনে করি।

'গুণিগণের পদে মোর এই নিবেদন। পুস্তকে পাইলে দোষ করিবে ক্ষেমন।।
দোষ বিচারিতে হেতু সকলে জানয। মহাজন দোষ ঢাকি গুণ প্রচারয়।।'

— ('ছাহাৎনামা', মুজাম্মিল, ঢা. বি. ১২২, ১২৬২ ব.)।

ত্রিপুরা বসু

বিষয় সূচী

সংযোজনী

সংকেত সূচী

অ. আ - অক্রুর আগমন । অ. কু. ক. - অক্ষয় কুমার কয়াল সংগ্রহ । অ. লি. - অসমীয়া লিপি । আ. জি. - আত্মজিজ্ঞাসা । আ. ম. - আশুতোষ মিউজিয়াম । উ. ব. - উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথি। এ - এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল । ক. বি. - কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথি । ক. ভ. - কলঙ্কভঞ্জন । ক. রা. - কবিচন্দ্র রামায়ণ । কা. ম. - কাটোয়া মহকুমার পুঁথি । কালিকা. - কালিকামঙ্গল । খ্রীঃ.- খ্রীষ্টাব্দ । গ. চ. - গঙ্গার চরিত্র । গো. ম. - গোবিন্দ মঙ্গল । গৌ. - গৌরাঙ্গ বন্দনা । চৈ. চ - চৈতন্যচরিতামৃত । চৈ. ম. - চৈতন্যমঙ্গল । জ. ম. - জগৎ মঙ্গল । ঢা. বি. - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথি । ঢা. বি. আ. - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সংগ্রহ । তম. - তমলুক মহকুমা পুঁথি । ত্রি. স. - ত্রিপুরা সরকারী মিউজিয়াম । দ. প. - দক্ষিণরায়ের পালা । দা. পা. - দাতাকর্ণের পালা । দি. ব. - দিগ্‌বন্দনা । দ্রৌ. ল. - দ্রৌপদীর লজ্জানিবারণ । পদ - পদকল্পতরু । প. ম. - পঞ্চানন মঙ্গল । প. গা. - পঞ্চানন্দের গান । প্রে. চ. - প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা। ব. পা. - বরানগর শ্রীশ্রীপাঠবাড়ি শ্রীগৌরাঙ্গগ্রন্থমন্দির পুঁথি । ব. বি. - বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথি । ব. রি. - বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম পুঁথি, বাংলাদেশ । ব. সা. প. - বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা । ব. সা. প. প. - বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা । বাং. পু তা. - বাংলা পুঁথির তালিকা সমন্বয় । বা. এ. - বাংলা একাডেমী, ঢাকা । বা. পু. পু. - বাংলা পুঁথিব পুষ্পিকা । বি. ভা. - বিশ্বভারতী পুঁথি । বিষ্ণু. - বিষ্ণুপুর আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন । বি. মা. - বিদগ্ধমাধব। ব্য. সং. - লেখকের ব্যক্তিগত সংগ্রহ । বৈ. ব. - বৈষ্ণব বন্দনা। বৈ. প. - বৈষ্ণব পদ । ভা. ১০. - সনাতনের ভাগবত ১০ম স্কন্ধ । ভা. লি. - ভারতীয় প্রাচীন লিপিমালা (ওঝা, হিন্দি) । ম. ম. - কেতকাদাসের মনসামঙ্গল । মহা. - মহাভারত । ম.- মৎ সংগৃহীত পুঁথি। মু. চ. - মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল । মু. পু. - বাংলা বোর্ড মুসলীম পুঁথি, ঢাকা । য. ভ. - যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের পূর্বোক্ত গ্রন্থ । য. ভ. অ. - ঐ, অসমীয়া পুঁথির তালিকা । রা. পা. - রামমালা পাঠাগার । রা. ক. - রাগময়ীকণা । রা. ব. - রাম বন্দনা । রা. বি. - রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথি। লী. ম. - লীলামঞ্জরী । শ. - শতাব্দী । শ. ব. - শ্যামল বেরা (কোলাঘাট) সংগ্রহ । শি. - শিবায়ন। শী. - শীতলামঙ্গল । শ্রী. - শ্রীকৃষ্ণকীর্তন । স. পুঁ. - বাংলা একাডেমী সংগৃহীত পুঁথি । সা. পুঁ - সাহিত্য পরিষৎ পুঁথি । হ. র. - হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনাবলী । হি. পুঁ. - বাংলা বোর্ড হিন্দুপুঁথি, ঢাকা। E.I. - Epigraphia Indica. I. H. Q. -Indian Historical Quarterly. I. P. - Indian Paleography. O. D. B. L. - The Origin and Dev. of the Bengali Language [S. K Chatterjee] J. A. S. - Journal of the Asiatic Society of Bengal. J. R. A. S. - Journal of the Royal Asiatic Society.

এক

বর্ণমালার উদ্ভব ঃ গোড়ার কথা

বিশ্ব প্রকৃতির নানাবিধ ঘটনা ও বিষয়ের প্রতি আদিম মানুষের কৌতূহল সৃষ্টি থেকেই বিজ্ঞানের যাত্রা শুরু । পণ্ডিতদের মতে, 'শিকারী খাদ্য সংগ্রাহক' আদিম মানুষ খাদ্য সংগ্রহ, নানাধরণের আপদবিপদ থেকে নিজেদের সুরক্ষিত করা, প্রবল শীত বা উত্তাপ থেকে নিজেকে বাঁচানো, ব্যাধি বা দৈহিক কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়া ইত্যাদি ব্যবহারিক জীবনের নানাবিধ সমস্যা সমাধানের তাৎক্ষণিক পথ খুঁজতে খুঁজতে, অনেকগুলো সহস্রাব্দ কাটিয়েছে । আদিম মানুষের সেই দীর্ঘ ও নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ, খ্রীঃ পূঃ ৭ম - ৬ষ্ঠ অব্দে দেখা গেল প্রাচীন গ্রীসের মানুষ প্রাণী ও গাছপালার উপকারিতা, সুখাদ্য-কুখাদ্য-অখাদ্য নির্বাচন, রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থাদি বিষয়ে বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করে । বলা যেতে পারে, এ থেকেই আধুনিক বিজ্ঞানমনস্কতার গতিবেগ সৃষ্টি হয় ।

প্রথমদিকে আদিম জনগোষ্ঠী দল বেঁধে শিকার করা আব বসবাস করার মধ্যে দিয়েই নিজেদের জীবনযাপনকে নিরাপদ করে তুলেছিল । এরপর একসময় যাযাবর জীবন থেকে তাদের নব্যপ্রস্তরযুগে উত্তরণ ঘটে । দলবদ্ধ শিকারের সময়েই তারা নানাধরণের শব্দ ব্যবহার করে নিজেদের বক্তব্য অন্যকে জানাতে চাইতো । তখনই সৃষ্টি হল 'ভাষা' । জীবনযাপনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, বিশেষ করে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে বর্তমানের বক্তব্য তুলে ধরার উদ্দেশ্যে ভাষারীতির উন্নয়নের চেষ্টাও ঘটেছে যুগে যুগে । আর, সেই ভাষাকে স্থায়ীরূপ দেবার জন্যে এক সময় শুরু হল প্রচেষ্টা, অনুসন্ধান । দক্ষিণ আমেরিকার সুপ্রাচীন ইন্‌কা সভ্যতায় প্রচলিত ছিল 'গ্রন্থীরীতি ।' নানা মাপের ও রঙের দড়িতে গিঁট বেঁধে তারা শিকার, কৃষি, পশুপালন ইত্যাদি বৃত্তান্ত অন্যের কাছে বোঝানোর চেষ্টা করতো । মেক্সিকো-ক্যালিফোর্নিয়া থেকে শুরু করে সুদুর জাপান পর্যন্ত প্রচলিত ছিল এই রীতি । রেড্‌ইণ্ডিয়ানরা চামড়ার কোমরবন্ধে পাথরের টুকরো গেঁথে রেখে যুদ্ধ, শিকার বা অন্যান্য বিষয়ের হিসাব রাখতো ।

নরম মাটির ওপর পাখিদের পায়ের ছাপ দেখে মানুষ বর্ণমালা সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ হয় বলেও শোনা যায় । তবে, পশুশিকারের ভয়ংকর অভিজ্ঞতাকে নারী বা শিশুদের কাছে বোঝানোর জন্যে আদিম মানুষ যেভাবে গুহাচিত্র অঙ্কন শুরু করে, সেটিই যে বর্ণমালা উদ্ভবের প্রথম ধাপ, তাতে সন্দেহ নেই । এরপর অবশ্য গোত্রদেবতা (টোটেম)কে সন্তুষ্ট করার জন্যে যে সব প্রতীক অঙ্কন শুরু হয় (অর্থাৎ আলপনা অঙ্কনের মধ্যে দিয়ে আজও আমাদের সেই আদিম মানসিকতা প্রাণবন্ত ।) তা হয়তো এই পথে আরো সফল প্রয়াস । উত্তর স্পেনের সান্তাদর প্রদেশের

আলটামিবার গুহার দেওয়ালে আঁকা প্রায় দশহাজার বৎসরের প্রাচীন চিত্রাবলী আদিম মানুষের লিপিভাবনার প্রাথমিক ও বলিষ্ঠ দৃষ্টান্ত। এই গুহাচিত্রণরীতি থেকে মানুষ ধাপে ধাপে 'চিত্রলিপি' 'ভাবলিপি', 'শব্দলিপি' ও 'ধ্বনিলিপি' সৃষ্টি করে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই সে নানা অসুবিধার মুখোমুখী হলে আরো উন্নত লিখনরীতির খোঁজ করতে থাকে। বহু শতাব্দীর ব্যবধানে এভাবেই সৃষ্টি হয় 'স্বরলিপি' ও 'বর্ণলিপি'।

খ্রীঃ পূঃ ৮০০০ অব্দে, যখন শিকারের প্রাণী খুবই কমে গেল, ভয়াবহ খাদ্য সংকটের মুখোমুখী হল আদিম মানুষ, তখন সে বাধ্য হয়ে শুরু করল জীবনরক্ষার বিকল্প পথ অনুসন্ধান। বছরের পর বছর তারা গাছপালা ও পশুপাখির বাঁচামরা নিবিড়ভাবেই লক্ষ্য করল। এক সময় পরীক্ষামূলকভাবে তারা মাটি খুঁড়ে কিছু বুনো ঘাসের বীজ ছড়িয়ে তা থেকে অনেক বেশী বীজ পেল, অনেক দিন ধরে তারা সেগুলো খেতে পারলো। এই থেকে শুরু হল কৃষি। বনের পশুকে ঘরে এনে রেখে শুরু হল পশুপালন। এভাবেই প্রাকৃতিক সম্পদকে সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করে আদিম মানুষ নিজের জীবনযাপনকে অনেকটাই নিরাপদ করে তুলল। নীলনদের উপত্যকার মতো উর্বর কৃষিক্ষেত্র তৈরী হল, বন কেটে তৈরী হল গ্রাম, জনপদ, কৃষিক্ষেত্র। গড়ে ওঠা নগর গুলিতে সৃষ্টি হল ভিন্ন ধরনের সমাজজীবন। উদ্বৃত্ত খাদ্য ও সম্পদবিনিময়ের মাধ্যমে সেখানে প্রচলিত হল 'পণ্যবিনিময়'এর বাণিজ্য। জোর করে মানুষকে ধরে এনে বাধ্য করা হল তাদের অমানুষিক পরিশ্রম করতে। মিশরের পিরামিড তৈরীর জন্যে হাজার হাজার কৃষক-শ্রমিককে ধরে আনা হল। দীর্ঘদিন ধরে তাদের কাজ করানোর ফলে তাদের কৃষিজমিগুলি নষ্ট হয়ে যেতো। কঠোর পরিশ্রমের ফলে মারা যেতো বহু শ্রমিক। এইভাবেই ক্রীতদাস প্রথার উদ্ভব। যে সব মানুষ কৃষির যন্ত্রপাতি, রান্না বা অন্যান্য কাজের উপযোগী বাসনপত্র তৈরী করত তারা নিজেদের শিল্পদ্রব্যের বিনিময়ে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করে নিত। আর এক শ্রেণীর মানুষ নগরে শাসক, ধাতুশিল্পী, পুরোহিত, বণিক এবং মহাজন বা কুসীদজীবীরূপে আবির্ভূত হয়। অবশ্য মিশরীয়রা এসব ব্যাপারে পথিকৃৎ বলা যেতে পারে। গ্রীক বণিকরা ধাতুর সঙ্গে ধাতু মিশিয়ে সংকর ধাতু প্রস্তুতে (যেমন তামা ও টিন মিশিয়ে ব্রোঞ্জ) মানুষকে উৎসাহিত করে তুলল। এই প্রচেষ্টা অবশ্য কিছুটা আগেই শুরু হয়েছিল।

পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাপ্ত নিদর্শনাদি নিরীক্ষণ করে পুরাতাত্ত্বিকরা জানিয়েছেন, সুমেরীয় 'কিউনিফর্ম', মিশরীয় 'হিয়েরোগ্লিফিক', ভারতের 'সিন্ধুলিপি' ও চীনের 'চিত্রলিপি' বিশ্বের প্রাচীনতম বর্ণমালার আদিমতম রূপভেদ। অবশ্য ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণপূর্ব তীরবর্তী, পারস্য উপসাগরের উত্তর অংশে বর্তমান ইরাকের মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চলে, টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী 'দোয়াব' অঞ্চলে (বা মেসোপোটেমিয়া। গ্রীক ভাষায় 'দুটি নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল) যে সুমেরীয় সভ্যতা গড়ে ওঠে, সেখানকার অধিবাসীরাই প্রথম নরম মাটির ফলকে 'কীলক' বা ছুঁচালো কাঠি দিয়ে একধরণের চিহ্ন আঁকা শুরু করে, ঐতিহাসিকরা যাকে বলেছেন 'বাণমুখ কীলক লিপি'। ব্যবসাবাণিজ্য, ফল ও পশুর হিসেব এবং গণনার সংখ্যা নির্দেশ করতে এগুলি ব্যবহৃত হত। পুরাতাত্ত্বিকরা ইরাকের দক্ষিণাঞ্চল থেকে (দক্ষিণ মেসোপোটেমিয়া) এই ধরণের লিপিযুক্ত অনেকগুলি মাটির ফলক আবিষ্কার করেছেন,

যেগুলি প্রায় খ্রীঃ পূঃ ৮ম সহস্রাব্দের। ৩৫০০ খ্রীঃ পূঃ কালের আরো পরিচ্ছন্ন কীলকলিপির বেশ কিছু মাটির ফলক আবিষ্কৃত হয়েছে, যেগুলি একসাথে এক একটি মাটির খাপে ভরা। এগুলি সবই লেনদেন বা হিসাবপত্রের তথ্যনির্দেশক। খ্রীষ্টজন্মের প্রায় চার হাজার বৎসর পূর্বে মেসোপোটেমিয়ায় প্রথম নগররাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। ইউফ্রেটিস তীরে গড়ে ওঠে ব্যাবিলন নগর। নদীপথ ও স্থলপথে আশপাশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের সঙ্গে এর যোগাযোগ গড়ে ওঠার ফলে এর লিখনপদ্ধতিও চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সে সময়ে মেসোপোটেমিয়ায় এক উন্নত সভ্যতা বিস্তার লাভ করেছিল। তামা ও সোনার মত মূল্যবান ধাতুর বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে তুলাদণ্ড উদ্ভাবিত হল। এই সব ওজনের হিসেবও লেখা হত কীলকলিপিতে। খ্রীঃ পূঃ ৩য় সহস্রাব্দে মেসোপোটেমিয়া দখলকারী আক্কাডীয়রা এই লিপিতে আসিরীয় ও ব্যাবিলনীয় উপভাষাগুলি লিপিবদ্ধ করে। একে বলা হয় 'আক্কাডীয় কিউনিফর্ম।'

ভূমধ্যসাগরের পূর্বতীরে টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীতীরবর্তী উর্বর অঞ্চলে, ব্যাবিলন ছাড়াও মারি, নিনেভে, কিশ, নিপ্পুর, উরুক, লাগাস ইত্যাদি নগর রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। ফিনিসীয়া ছিল এক প্রাচীন নগর রাষ্ট্র। সুপ্রাচীন এই দ্বীপনগরীতে বাস করত জাহাজনির্মাণ ও চালনা, দাসব্যবসা, নৌবাণিজ্য ইত্যাদিতে দক্ষ ফিনিসীয়রা। এই দক্ষ নাবিকরা ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী নানাস্থানে তো বটেই, এমন কী মহাসাগর পাড়ি দিয়েও পণ্যদ্রব্য নিয়ে দেশ বিদেশে বাণিজ্য করতে যেতো। এরা ছিল সেমিটিক ভাষা ব্যবহারকারী। বাণিজ্যের কাজের জন্যে এরা এক ধরণের কিউনিফর্ম উদ্ভাবন করে (সেমিটিক কিউনিফর্ম)। এই লিপি এরা নানাস্থানে ছড়িয়ে দিয়েছিল। ব্রিটিশ ধ্বনিবিজ্ঞানী জিউফ্রে স্যাম্পসিনের মতে এই ফিনিসীয় 'সেমিটিক কিউনিফর্ম' বিশ্বের তাবৎ বর্নমালার জননী [" ......but it was the Phaenicians, who created the alphabet, a system that reproduced the sounds of words and created a common method of communications between traders who spoke different languages. For the first time observations could be recorded for future generation in words and diagrams, a vital step towords the accumulation of knowledge upon which every branch of science is based " - Nature's connection (An Exploration of Natural History), Nicola Megirr, The Natural History Museum, London, 2000.,p.5.]। এই ঘটনা খ্রীঃ পূঃ ৩য়-২য় সহস্রাব্দকালের [পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগণার শিয়ালদহ-লক্ষ্মীকান্তপুর বেলপথের শাসন রেলস্টেশনের নিকট বনবেড়িয়া গ্রামের কাজী পাড়াতে আবিষ্কৃত হয়েছে ফিনিসীয় লিপির সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত তাম্রফলক। এটি ১৪শ-১৫শ শতকের মধ্যপ্রাচ্য ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সঙ্গে গাঙ্গেয় বঙ্গদেশের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের সাক্ষ্য দেয়। দ্রঃ 'বনবেড়িয়ার তাম্রলিপি', নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, অমৃত সাপ্তাহিক ১৪ অগ্রঃ ১৩৮০ বঙ্গাব্দ।]। সেমিটিক কিউনিফর্মের অন্যতম প্রাচীন নিদর্শন আক্কাডীয় রাজা সারগনের একটি লিপি (খ্রীঃ পূঃ ৩য় সহস্রাব্দ)।

খ্রীঃ পূর্ব ৪র্থ সহস্রাব্দে মিশর জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চায় এতদূর এগিয়ে গিয়েছিল যে সেইসব বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করার জন্যে লিপিপদ্ধতি অনিবার্য হয়ে উঠল। তারা বক্তব্য বিষয় বোঝানোর জন্যে ৭৫০টি চিত্র প্রতীক উদ্ভাবন করল। প্রথমে অবশ্য ধর্মীয় বিষয় লিখতে এবং সমাধিগাত্রে

এর ব্যবহার শুরু হয় । এই লিপি পদ্ধতিকে বলা হয় 'হিয়েরোগ্লিফিক' (হিয়েরোশ্ বা পবিত্র, গ্লিফেইন বা খোদাই) বা 'চিত্রলিপি ।' লেখার সরঞ্জাম ছিল নীলনদের দু তীরে জন্মানো ৪-৫ মিটার দীর্ঘ প্রচুর পরিমাণের নলখাগড়া গাছের পাৎলা করে কেটে নেওয়া মসৃণ অংশ 'প্যাপিরাস'। একে আঠা দিয়ে জুড়ে বড় করে, তাকে রঙে ডুবিয়ে শুকনো করে তার ওপর লেখার কাজ হত। এছাড়া চর্ম, কাঠের খণ্ড ও চুনা পাথর খোদাই করেও চিত্রলিপি লেখা হয়েছে । ভাঙা হাড় জোড়ার পদ্ধতি, বাসি-পচা ছাতাধরা রুটি দিয়ে ক্ষতস্থান নিরাময় করা (প্রথম পেনিসিলিনের ব্যবহার), আফিংবীজ খাইয়ে ব্যথা উপশম করা, রসুন খাইয়ে ব্যাধি নিরাময় ইত্যাদি বিষয় মিশরীয় পুরোহিতরা প্যাপিরাসে এবং পাথর খোদাই করে লিখে গেছে ('Earliest written records of medical diagnosis and techniques were made by Egyption priests' -Nature's connections, p. 5.) । এরা 'হিরাটিয়' লিপিতে ধর্মীয় বিষয় লিখতো ।

সুমের বা মেসোপোটেমিয়ার উত্তরে গড়ে ওঠা আসিরীয় সভ্যতাতেও ফিনিসীয় সেমিটিক কিউনিফর্মের প্রভাবে অনুরূপ কিউনিফর্ম প্রচলিত হয় । আসিরীয় রাজা অসুরবনিপালের রাজধানী নিনেভে শত্রুপক্ষের আক্রমণে খ্রীঃ পূর্ব ৭ম শতকে ধ্বংস হয়ে যায়। সেই ধ্বংসস্তূপ থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে একটি ভস্মীভূত গ্রন্থাগার । সেখানে পাওয়া গেছে কিউনিফর্মে লেখা কুড়ি হাজার মৃৎফলক । খ্রীঃ পূঃ ৩য় -২য় সহস্রাব্দে রচিত, সুমেরের ব্যাবিলনের রাজা ' হামুরাবির কোড', 'ব্যাবিলনীয় কিউনিফর্মে' খোদিত ।

প্রাচীন গ্রীসে বহু প্রাচীনকালে যে লিপি পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, খ্রীঃ পূঃ ২য় সহস্রাব্দের শেষদিকে তার ব্যবহার উঠে যায় । তারা ফিনিসীয়দের লিপির সাথে পরিচিত হয়ে, নিজেদের উদ্যোগে ব্যঞ্জনবর্ণ ও স্বরবর্ণ মিলিয়ে মোট চব্বিশটি অক্ষরের বর্ণমালা উদ্ভাবন করে । প্যাপিরাস, মাটির ফলক, মোমের প্রলেপ দেওয়া কাঠের পাটার ওপর ধাতুনির্মিত শলাকা বা 'স্টিল্যুস' দিয়ে তারা লেখার কাজ করত । কোন কোন অভিমতানুযায়ী, সেমিটিক লিপি ছিল উচ্চারণের পক্ষে অসুবিধাজনক, কিন্তু খ্রীঃ পূঃ ১ম সহস্রাব্দে যে বিশুদ্ধ গ্রীকবর্ণমালা সৃষ্টি হয় তা ছিল যথার্থই উচ্চারণযোগ্য । বর্তমানের ইউরোপীয় বর্ণমালাসমূহ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গ্রীকবর্ণমালা থেকেই উদ্ভূত ।

খ্রীঃ পূঃ ১৪০০ অব্দে উচ্চারিত ভাষার ধ্বনিবৈশিষ্ট্যকে অনুসরণ করে সৃষ্টি হয় প্রথম লিখনপদ্ধতি 'লিনিয়ার-বি' । মাইসিনীয় গ্রীক ভাষার শুদ্ধ বানানরীতিকে অনুসরণ করে তৈরী এই লিপির প্রথম পাঠোদ্ধার করেন ইংরেজ স্থপতি মাইকেল ভেন্ট্রিস, ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে । এতে আছে ব্যঞ্জন ও স্বরসম্মিলিত অক্ষর বা শব্দাংশ । এটি সুবিন্যস্ত লিপিমালা ।

হোয়াংহো-ইয়াসিকিয়াং নদীর তীরবর্তী উর্বর সমভূমি অঞ্চলে গড়ে ওঠে প্রাচীন চীনসভ্যতা । পরবর্তীকালে, খ্রীঃ পূঃ ২য় সহস্রাব্দে, হোয়াংহো অববাহিকা অঞ্চলে দাসমালিকভিত্তিক রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে । ধান, গম, নানা ফসল, রেশম শিল্প, পশুপালন ইত্যাদিতে ঐ অঞ্চল ছিল রীতিমত সমৃদ্ধ । সেই সময়ই তারা মনের ভাবনাগুলিকে স্থায়ীরূপ দেবার উদ্দেশ্যে 'লোগোগ্রাফিক' চিত্রলিপির উদ্ভাবন ঘটায় । হাড়, রেশমের কাপড় বা বাঁশের পাতলা চটার ওপর তারা লেখার কাজ করত । শাং রাজত্বের সময়কালীন (খ্রীঃ পূঃ ১৮শ - ১২শ শতক) চীনা

চিত্রলিপির সন্ধান পাওয়া গেছে। তা এত উন্নতধরণের যে, মনে করা হয়, এর অনেক আগেই ওখানে কোন প্রাচীন লিপির উদ্ভাবন ঘটেছিল। খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতকেই 'চিন' যুগে চীনা লিপির বর্তমান রূপটি স্থায়ীরূপ লাভ করে যায়।

বর্তমান তুরস্কের আনাতোলিয়া মালভূমির অন্তর্গত আঙ্কারার পূর্বে, বোগসকয়ের প্রাচীন রাজধানী হত্তুসাসের ধ্বংসাবশেষ থেকে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়েছে আক্কাডীয় কিউনিফর্মের এক উন্নত রূপে খোদিত সহস্রাধিক মাটির ফলক। ইন্দো ইউরোপীয় জনগোষ্ঠীর হিত্তিৎরা খ্রীঃ পূঃ ২য় সহস্রাব্দে এই অঞ্চল শাসন করত। এই লিপিগুলিকে বলা হয় 'হিত্তিৎ কিউনিফর্ম'।

কিউনিফর্ম ও হিয়েরোগ্লিফিক প্রতীকের নানাধাপ অতিক্রম করে বর্ণমালার উদ্ভব ঘটল ধীরে ধীরে। শেষ পর্যন্ত ঐতিহাসিকদের মতে এই বিষয়ে দুটি নরগোষ্ঠীর প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। একটি, সেমিটিক ভাষা ব্যবহারকারী, ভূমধ্যসাগরের পূর্বতীরবর্তী ফিনিসীয় নাবিকদল, অন্যটি গ্রীক। ফিনিসীয়দের বর্ণমালা ছিল ব্যঞ্জনধ্বনি স্থানীয়। গ্রীকদেরটিছিল স্বরধ্বনিস্থানীয়। আবার কোন কোন সিদ্ধান্ত, ফিনিসীয়, মিশরীয়, আসিরীয়, ক্রীটদ্বীপবাসী এবং হিব্রুরা আদি বর্ণমালার স্রষ্টা। যাইহোক না কেন, খ্রীঃ পূঃ ২য় সহস্রাব্দের শেষে মিশর, ব্যাবিলন, আসিরীয়া, হিত্তিৎ ও ক্রীট সভ্যতায় ব্রোঞ্জ যুগ শুরু হলে সভ্যতার এই নতুন ইতিহাসের অধ্যায়ের সূত্রপাত ঘটে। ভূমধ্যসাগরীয় এইসব জাতি আদিতে দক্ষিণ ভারতীয় দ্রাবিড় শ্রেণীর মানুষ ছিল বলে মনে করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্নস্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে প্রাপ্ত পুরাবস্তুর কথা এসে যায়। বিশেষ করে মেদিনীপুরের তমলুক, বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট, অজয়তীরবর্তী পাণ্ডু বাজার ঢিবি, উত্তর ২৪পরগনার চন্দ্রকেতুগড়, হাদিপুর, বেড়াচাঁপা, দক্ষিণ ২৪পরগণার বনবেড়িয়া, হরিনারায়ণপুর ও পশ্চিম দিনাজপুরের বাণগড় থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন পুরাবস্তু, সিলমোহর ও মৃৎপাত্রে খোদিত বর্ণমালার কথা বলতে হয়। বাংলার নদী ও সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলগুলির সঙ্গে সমুদ্রপথে ব্যবসা বাণিজ্য চলতো সুদূর ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া, চীন, শ্রীলঙ্কা, মিশর প্রভৃতি দেশের সঙ্গে। সুতরাং উক্ত অঞ্চলগুলির সঙ্গে প্রাচীনবঙ্গের নিবিড় সাংস্কৃতিক লেনদেনের ফলে বর্ণমালা একস্থান থেকে অন্যস্থানে চলে গেছে। স্মরণীয় উক্তি ঃ 'আদিম বঙ্গবাসীর সঙ্গে দক্ষিণভারতীয়দের সম্পর্কও ছিল নিবিড়।' সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের উর্বর ক্রিসেন্ট অঞ্চলের ইস্রায়েলী, ফিনিসীয় ও আরামীয় জাতি ক্রমান্বয়ে সবদিক থেকে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে তারা উদ্ভাবিত বর্ণমালাকে নানাস্থানে বহন করে নিয়ে যায়। গ্রীকবর্ণমালা থেকে 'ক্যানানিট', 'আরামীয়', দক্ষিণ 'সেমিটিক' বা 'সাবিয়ান' বর্ণমালার উদ্ভব ঘটে। 'ক্যানানিট' বর্ণমালা থেকে 'আদি হিব্রু', 'মোয়াবীয়', 'এডোমাইট', 'অ্যাম্মোনাইট' বর্ণমালার সৃষ্টি। খ্রীঃ পূঃ ১ম সহস্রাব্দে 'আরামীয়' বর্ণমালা নিজস্ব রূপ লাভ করে এবং পরবর্তী কয়েকটি শতাব্দী ধরে তা মধ্যপ্রাচ্য ও অন্যান্য অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে। গ্রীস, আফগানিস্তান ও ভারত থেকে এই লিপির নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। ডানদিক থেকে বামদিকে এই লিপি পড়তে হয় (খরোষ্ঠী লিপিও তদ্রূপ)।

ভারতে বর্ণমালার উদ্ভব ঃ সিন্ধুলিপি

ভারতীয় বর্ণমালার উদ্ভবের ইতিহাস বিভিন্ন পণ্ডিত-তাত্ত্বিকদের পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্তে জর্জরিত

হয়ে আজো তর্কবিতর্কের জালে বন্দী। প্রাসঙ্গিক সিদ্ধান্ত নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এ দেশীয় কোন কোন পণ্ডিত যেমন স্বাদেশিক মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন, তেমনি ইউরোপীয় পণ্ডিত এবং তাদের এদেশীয় অনুগামীরা কিছুটা সাহেবী মানসিকতা থেকে মুক্ত হতে পারে নি। এক পণ্ডিতের সিদ্ধান্ত দশজনের উদ্যোগে বাতিল বলে ঘোষিত হচ্ছে। তবুও ভারতীয় বর্ণমালার উদ্ভবের ইতিহাস খুঁজতে হবে এই সব বিদগ্ধ তাত্ত্বিক-পণ্ডিত-নমস্য প্রত্নতাত্ত্বিকদের বক্তব্যকে অনুসরণ করেই। পাঞ্জাবের (প. পাকিস্তান) মন্টোগোমারি জেলার হরপ্পা এবং সিন্ধুপ্রদেশের লারকানা জেলার মহেঞ্জোদরোর ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাপ্ত মাটি ও ধাতুর প্রায় ৪০০০ সিলমোহরে উৎকীর্ণ চিত্রধর্মী প্রতীকগুলিকে এই প্রসঙ্গে ভারতীয় বর্ণমালার উদ্ভবের ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ বলা যেতে পারে। সিন্ধুসভ্যতার সময়কাল খ্রীঃ পূঃ ২৫০০ - ১৫০০ অব্দ। ১৯২২-এ স্যর জন মার্শালের নেতৃত্বে পরিচালিত এই সিন্ধুসভ্যতার উৎখননের ফলে আবিষ্কৃত পুরাবস্তু ও তথ্যাবলী মানবসভ্যতার প্রাক লৌহযুগের সভ্যতা-সংস্কৃতির পরিচায়ক। প্রায় প্রতিটি সিলমোহরের ওপরে লিপি এবং নিচে কোন প্রাণী বা প্রতীকধর্মী চিত্র খোদিত। কোনটিতে প্রতীক নেই। কেবল দু তিন ছত্র লিপি। প্রায় ২০০০ সিলের পাঠোদ্ধার আজ পর্যন্ত করা গেছে। ড. জি. আর হান্টার ১৯৩৪-এ এ বিষয়ক প্রাথমিক আলোচনায় বলেছেন 'It is Neither Sumerian, nor any other known script though it bears certain resemblances to several.' (The script of Harappa and Mahenjodaro and its relations with other scripts', G. R. Hunter, New Delhi, 1993.)। এগুলিকে তিনি 'Pictographic writing' বলেছেন। এস. আর. গোয়েলের মতে এগুলি পুরোহিত বণিক বা সমাজের বিত্তশালী মানুষদের এক একজনের পরিচয়জ্ঞাপক নিজস্ব প্রতীক (emblame) ('The origine of the brahmi script', Gupta & Ramchandra, New Delhi, 1979.)। স্বদেশী বিদেশী পণ্ডিতরা এগুলিকে আদি দ্রাবিড় সভ্যতার নিদর্শন বলতে চান। এটা জানা গেছে যে, হরপ্পা বা সিন্ধুসভ্যতার সব মানুষ সাক্ষর না থাকলেও অনেকেরই অক্ষরজ্ঞান ছিল। প্রাত্যহিক জীবনের নানা বিষয়ের সঙ্গে এগুলির কোন না কোন সম্পর্ক ছিল। কোন কোন মতে আর্যরা সিন্ধুসভ্যতার ধ্বংসকারী বলে চিহ্নিত হলেও তারা এক সময় সিন্ধুসভ্যতার অনেকটা কাছাকাছি এসেছিল, আর তাই তাদের কাছ থেকে আর্যরা লিখনকৌশলও (Art of writing) শিখে থাকবে। যে সব প্রতীক এইসব সিলমোহরে আঁকা হয়েছে, সেগুলি হল বিভিন্ন ভঙ্গিতে কর্মরত মানুষ, মাছ, পাখি, কীটপতঙ্গ, সাপ, কাঁকড়া, কাঁকড়াবিছা, চতুষ্পদ প্রাণী, বয়ম বা জার, বিভিন্ন ধরনের পাত্র, ছাতা, পশুর শিং, মাঙ্গলিক চিহ্ন, বৃক্ষের পাতা, পদ্মের কুঁড়ি, চেয়ার, বীণাযন্ত্র, হাতের ভঙ্গিমা, যুগ্ম কুঠার, চাকা, তীর ও ধনুক, জলস্রোত, ক্ষুদ্রাকার জাল (মাছ ধরার), পাহাড়-পর্বত, গাছপালা, বিচিত্র ধরনের পশু, জ্যামিতিক চিত্র (ডিম্বাকৃতি, ত্রিভুজ, গুণচিহ্ন, চতুর্ভুজ, রেখা), বন্ধনী, সিঁড়ি বা মই, সংখ্যানির্দেশক চিহ্ন, রশ্মিসহ সূর্যের অংশ ইত্যাদি নানা বিষয়। এর মধ্যে কিছু কিছু তান্ত্রিক চিহ্ন পাওয়া গেছে, যেগুলিকে সিন্ধুসভ্যতার লিপি চর্চার শেষ দিককার নিদর্শন বলা হয়। ৫৩৭ রকমের প্রতীক এখানে দেখা গেছে। একটি প্রতীকের সঙ্গে অন্য একটি চিহ্ন জুড়ে দিয়ে সম্ভবতঃ ব্যঞ্জন বা

সংযুক্তবর্ণ বোঝাতে চাওয়া হয়েছে। তবে এগুলি যে ভাব ও ধ্বনিনির্দেশক চিত্রলিপি, তাতে সন্দেহ নেই। এগুলির সঙ্গে বিভিন্ন বর্ণমালার কিছু কিছু সাদৃশ্যও পরে দেখা গেছে। বিভিন্ন হিয়েরোগ্লিফিকে পশু বা প্রাণীর মুখ ডানদিকে দেখা গেছে বলে সাধারণতঃ লেখা ডানদিক থেকে শুরু করে বামদিকে শেষ করা হয়েছে বলে মনে করা হয়। অধিকাংশ পণ্ডিত মনে করেন 'দক্ষিণ থেকে বাম এবং বাম থেকে দক্ষিণ' এই রীতিতে (Boustrefedon) চিত্রলিপিগুলি সংস্থাপিত। এমনও হতে পারে, যেদিকে পশুর মুখ সেদিক থেকে লেখা শুরু হয়েছে। কিন্তু কারা ছিল এখানকার অধিবাসী, সে বিষয়ে ইতিহাস স্পষ্ট ধারণা দিতে পারে নি। সম্প্রতিকালে ইরভথম মহাদেবন, এ. পেনটি, এস. আর. রাও প্রমুখদের গবেষণার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এরা ছিল প্রাক্ দ্রাবিড়, দ্রাবিড় বা ইন্দো-আর্য জনগোষ্ঠীর মানুষ। প্রধানতঃ বাণিজ্যিক লেনদেনের কাজে এদের এই সিলমোহরগুলি ব্যবহৃত হোত। বহির্বিশ্বের সঙ্গে তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক যখন নিবিড় হয়ে ওঠে তখন এই ধরণের লিপি বা সিলমোহর জরুরী হয়ে পড়েছিল *। এক একজন ব্যক্তি বা এক একটি দলের প্রতীক ছিল এগুলি। ধর্মীয় উদ্দেশ্যেও কোন কোনটি ব্যবহৃত হয়ে থাকবে।

ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের ফিনিসীয় বণিকরা জলপথে বিশ্বের নানাস্থানে ঘুরে বেড়াতো। সেইসব ফিনিসীয়রা হরপ্পাবাসীদের সঙ্গে বাণিজ্যিক কারণে সম্পর্কিত হয়ে যায় (এমনও তো হতে পারে, আদিম ভারতীয়রাই ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করে)। গ্রীস দেশের নানা স্থান থেকে এদের লিপির নিদর্শন পাওয়া গেছে। সাইপ্রাস থেকে পাওয়া গেছে খ্রীঃ পূঃ ৮০০ অব্দের ফিনিসীয় লিপিযুক্ত ব্রোঞ্জের পাত্র। ঐ সময়কার পাথরে লেখা সেমিটিক লিপি পাওয়া গেছে ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী অঞ্চল থেকে। ফিনিসীয় এবং পাশাপাশি আর্মেনীয় বণিক ও পরিব্রাজকরা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের নানাস্থানে তাদের ভাষা ও লিপি বহন করে নিয়ে যেতে পারে। বাণিজ্যিক সূত্রেই হরপ্পাবাসীরা ফিনিসীয়দের সংস্পর্শে এসে নিজেদের লিপির উদ্ভাবনে তাদের বর্ণমালার গঠনভঙ্গিমা কিছুটা নিয়ে থাকতে পারে। ইউরোপীয় পণ্ডিতরা মনে করেন মুদ্রা ও বর্ণমালা প্রথম উদ্ভাবন করে ফিনিসীয়রা। কিন্তু ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রত্নক্ষেত্রের উৎখনন ও আবিষ্কার ইউরোপীয় পণ্ডিতদের বক্তব্যকে সমর্থন করে না। হরপ্পা সভ্যতার সমকালীন, পূর্বকালীন এবং পরবর্তী সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। বিহার, তক্ষশীলা, শৈলা, অহৌরা ও গোলখপুরের চিহ্ন খোদিত ধাতবমুদ্রার আবিষ্কার থেকে জানা গেছে, খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে এদেশে 'কার্ষাপণ' মুদ্রা প্রচলিত ছিল (Lord Mahavira and His times K C. Jain, 1991, p. 339)। এই সব মুদ্রায়

*"On an analogy of modern times, one can well presume that citizens of the Indus cities were literate, and writing apparently was a cherised possession of a group of people who had the need for its pursuit indispensably. In the Harappan Context, we think that the external relations of the Harappans by maritime contacts was a significant factor in the economic aspects of the production potential of the city states, and organisations of the same should have called for the use of a script of one's own, at some stages," 'Pre-Asokan writing in India', K V. S. Rajan, Vide, ' The origin of Brahmi Script', New Delhi, 1979. P. 54.

খোদিত বিভিন্ন প্রতীক (যেমন হস্তী, সূর্য, ছটি বাহুবিশিষ্ট চিহ্ন, ওপরে জোড়া মাছসহ জলাশয় ও নিচে পর্বত, পর্বতের ওপর খরগোশ ও ষাঁড়, স্বস্তিক, ত্রিশূল, বক্ররেখা, নৌকা, শকটচিহ্ন, পর্বত শীর্ষে চন্দ্র) এদেশে লৌকিক সমাজে প্রধানতঃ ধর্মীয় আল্পনায় আজও ব্যবহৃত হয়, সাঁওতালী কুটিরের ফ্রেসকোতেও দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গের বহু প্রত্নস্থল থেকে অনুরূপ চিত্র খোদিত ভগ্ন মৃৎপাত্র, পোড়ামাটির ফলক ও মুদ্রা পাওয়া গেছে। বিশেষতঃ দক্ষিণবঙ্গের নদী ও সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত পুরাবস্তুতে বর্ণমালার পাশাপাশি যূপ, নৌকা, শস্যের শীষ, শঙ্খ, স্বস্তিকচিহ্ন দেখা গেছে। এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত উত্তরপ্রদেশের সৌহগৌড়া তাম্রলিপিতে (খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতক) অঙ্কিত চিহ্নগুলিও তো অনুরূপ প্রাচীন ভারতীয় চিহ্ন। ভূমধ্যসাগরের ক্রীট দ্বীপে প্রাপ্ত প্রত্ননিদর্শনের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের পাণ্ডু রাজার ঢিবি, তমলুক, হরিনারায়ণপুর ইত্যাদি স্থানের প্রত্ননিদর্শনের সাদৃশ্য তো এদেশের প্রত্নতাত্ত্বিকদের এই সিদ্ধান্তে অনুপ্রাণিত করেছে যে, রাজা মাইনোস ও তাঁর সংস্কৃতি (যেমন মহিষাসুর ও সিংহবাহিনী এক মাতৃদেবী) বাংলাদেশ থেকেই গেছে হয়তো। তারা দু'ধরণের চিত্রলিপি ও রেখা ব্যবহার করত মূলতঃ বাণিজ্যিক লেনদেনের হিসেব লিখতে। প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, খ্রীঃ পূঃ ২০০০ অব্দে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সঙ্গে বাঙালীদেরও যোগাযোগ ছিল নিবিড় (দ্র- Pre history and beginings of civilization in Bengal. A. K. Sur, 1970, p. 11)। পূর্বভারতের প্রাচীন বণিক 'কলিত' থেকে ক্রীটের নামকরণ হয়েছে হয় তো। তাহলে, সিন্ধুলিপির উদ্ভবের বিষয়ে দ্রাবিড় বা আদি ভারতীয় প্রচেষ্টা ও ভূমধ্যসাগরীয় প্রভাব কোনটাকে গৌণ করে দেখা চলে না।

যাই হোক না কেন, সিন্ধুলিপি বিষয়ে দেশী বিদেশী পণ্ডিতদের সিদ্ধান্তগুলি এই রকম ঃ

- মিশরীয় চিত্রলিপির মতো। এগুলি ডান থেকে বামে বা ডান-বাম-বাম-ডান রীতিতে অঙ্কিত। দ্রাবিড়দের সৃষ্টি 'হিয়েরোগ্লিফিক'। অঙ্কিত প্রাণী বা প্রতীকগুলির ব্যাখ্যা পৌরাণিক সাহিত্যে কিছু কিছু দেখা যায়। আর্যরা বেদ রচনার সময় এ লিপি গ্রহণ করে থাকবে। 'ব্রহ্ম'>ব্রাহ্মী লিপি। সুতরাং বৈদিকযুগে এই লিপি প্রচলিত ছিল। 'ব্রাহ্মণ' গ্রন্থগুলি হয়তো এই লিপিতে লেখা হয়। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে অনার্যলিপি 'সিন্ধুলিপিই' আর্য-ব্রাহ্মীলিপির জননী (বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, ১৯৯৬, পৃঃ ৯৭)।
- আবার অন্যদিকে এন. এস্. রাজারাম, এম. ডি. কৃষ্ণরাও, এস. আর. রাও, ভগবান সিং, কচ্ছের রাণ অঞ্চলের হরপ্পাকালীন ধোলাবিড়া প্রত্নক্ষেত্রের উৎখনন আধিকারিক আর. এস. বিস্ত্ প্রমুখগণের মতে 'These are the Vedic Aryans who creted both the Vedas and the great material civilization of the people we know call Harappans ('The Harappan Riddle', Swami Mukhanandaji, The Sunday Statesman, 17.12.2000)।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, মাদ্রাজের তামিল জাতির 'সভ্যতা সর্বপ্রাচীন, যাদের সুমের নামক শাখা ইউফ্রেটিস তীরে প্রকাণ্ড সভ্যতা বিস্তার অতি প্রাচীন কালে করেছিল।' তারাই আসিরীয় ও ব্যাবলনীয় সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করে। তাদের 'আর একশাখা মলবার উপকূল হয়ে অদ্ভুত মিশরী সভ্যতার সৃষ্টি করেছিল, যাদের কাছে আর্যেরা অনেক বিষয়ে ঋণী, (স্বামীজির বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ, খণ্ড উদ্বোধন, ১৩৮৮, পৃঃ ৮৫)। এই ঋষিবাক্যের

প্রতি এদেশের পণ্ডিতরা বিশেষ কোন গুরুত্ব দেন নি ।

ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, ' আর্যোপনিবেশের পূর্বে যে প্রাচীন জাতি ভূমধ্যসাগর হইতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিল, তাহারাই বোধ হয় ঋগ্বেদের দস্যু এবং তাহারাই ঐতরেয় আরণ্যকে বিজেতৃগণ কর্তৃক পক্ষী নামে অভিহিত হইয়াছে। এই প্রাচীন দ্রাবিড় জাতিই বঙ্গ মগধের আদিম অধিবাসী, (বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম, পৃঃ ১৭) ।' তাঁর মতে বঙ্গবাসীদের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড়ভাষীদের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ, ঐ পৃঃ ২০) ।

● লিপিগুলিতে পৌরাণিক সাহিত্যের অনেকগুলি নামশব্দ দেখা যায় । যেমন কুশিক, মান, মশক, নাগ, দক্ষক, অন্তক, ধর, জম্বুক, কাম, কাল, কুমার, মনি, নল, নরক, পাক, পার্থ, পদ্ম, শনক, সত্য, শক, শম্বুক, স্কন্দ, সুবাক, তারা, যক্ষ, শিশুপাল কোশল, সুবাসক, ইত্যাদি । জনৈক পণ্ডিতের মতে বৈদিক শব্দ তালিকাকার 'যাস্ক' কাশ্যপ রচিত প্রাচীন রচনা 'নিঘন্টুক পদাখ্যান' ও অন্যান্য পূর্ববর্তী ব্যাকরণ অনুসরনে 'নিরুক্ত' নামে শব্দ তালিকা তৈরী করেন । তাঁর মতে হরপ্পালিপির অনেকগুলিই বৈদিক-সংস্কৃত থেকে আগত (The Deciphered Indus Script, N. Jha) কিন্তু আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পি. শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারকে উদ্ধৃত (ODBL, Vol. I P. 27) করে জানিয়েছেন আর্যজনগণ ছাড়াই ভারতে আর্যভাষার আগমন ঘটে। তাঁর মতে, পাঞ্জাব ও উত্তর ভারতের সুসভ্য অনার্যজাতির ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জাগরণের কালেই এই ভাষার অনুপ্রবেশ ঘটে স্বাভাবিক ধারার মতো ।

● তান্ত্রিক ধর্মসাধনার সঙ্গে সম্পর্কিত প্রতীক । প্রথম ভারতীয় বর্ণমালা । তবে চীনা অক্ষরের সঙ্গেও কোন কোন ক্ষেত্রে সাদৃশ্য দেখা যায় ।

● ঈষ্টার দ্বীপের লিপিমালার সঙ্গে সাদৃশ্য দেখা যায় ।

● আদি হিত্তিৎ চিত্রলিপির বিবর্তিত রূপ । ইন্দো-ইউরোপীয়, পশ্চিম এশিয়ার সুমেরীয় ও এলামীয়, প্রাচীন দ্রাবিড়, সংস্কৃত, মুণ্ডা ইত্যাদি ভাষা-উপভাষার অস্তিত্ব-এর মধ্যে অছে ('Report on the Investigation of the Proto Indian Text' - Nauka Pub, Moscow, !991, 'Proto Indica', 1969.)।

● ৩০০০ খ্রীঃ পূঃ অব্দে এগুলির উদ্ভব । প্রাচীন গ্রীক, সুমের, ফিনিসীয়া, মিশর ও ক্রীটদ্বীপের লিপির সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত । পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রত্নক্ষেত্র থেকে আবিষ্কৃত ফলক বা প্রত্নবস্তুতে অঙ্কিত তান্ত্রিক বা অন্য ধরণের চিহ্নগুলির সঙ্গে ক্রীট ও হরপ্পাসভ্যতার অদ্ভুত সাদৃশ্য থেকে এমনও অনুমান হয় আদিম বঙ্গবাসীরাই বহু সহস্র বৎসর পূর্বে ক্রীটে উপনিবেশ গড়ে তোলে । অথবা যেভাবেই হোক ক্রীট দ্বীপের সঙ্গে হরপ্পা তো বটেই, পূর্বভারতেরও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। কোন কোনটি ব্যবসা-বাণিজ্যে কারেন্সী নোট হিসেবেও ব্যবহৃত হোত ।

● খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ সহস্রাব্দে উদ্ভুত আদি-দ্রাবিড় ভাষার ('Proto -Dravidian) বর্ণমালা ।

● হরপ্পাবাসীদের ধর্ম ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে অনেকগুলি সিলমোহরে ।'সৃষ্টি রহস্য' বিষয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিচয় পাওয়া যায় কোন কোনটিতে ।

● শাসক বা গোষ্ঠীপতি নিজেদের উত্তরাধিকার বলবৎ করার উদ্দেশ্যে ও শক্তিসামর্থ্য দেখানোর

জন্যে পুরোহিত সম্প্রদায়কে কাজে লাগিয়ে কিছু কিছু প্রতীক অঙ্কন করায়।

- এরা বৎসরকে তিনটি বড় ঋতু ও দুটি ছোট ঋতুতে ভাগ করেছিল। ছোট ঋতুর প্রতীক ছাগল, বাঘ, ষাঁড়, একশিংওয়ালা বিচিত্র প্রাণী (ইউনিকর্ণ)। কুমীর বর্ষা বা প্লাবনের প্রতীক। ক্যালেন্ডার বা কালপঞ্জী তৈরীর বিষয়টি এদের মাথাতেই প্রথম আসে।
- পশুবলি বা উৎসব অনুষ্ঠানের বিষয় চিহ্নিত। এছাড়াও আছে উৎসর্গলিপি ('Evidence of the fact that cult practices became more complex is farnished by the appearance on seal of scenes depicting various types of sacrifice. Scenes of cattle being brought for sacrifice, of libation of "Silver water" together with primitive kinds of ritual pointed. 'The Image of India', Levin & Vigasin, Moscow, 1987, p. 194.)।

এইসব নানাবিধ বিষয় বিশ্লেষণ এবং পশ্চিম পাকিস্তান ও ভারতের নানাস্থানের প্রাক্ হরপ্পা, হরপ্পা ও হরপ্পা পরবর্তীকালীন প্রত্নক্ষেত্রগুলি থেকে প্রাপ্ত পুরাবস্তু, সিলমোহর ইত্যাদির সঙ্গে নিবিড়ভাবে অনার্য-দ্রাবিড় সংস্কৃতির সম্পর্ক বিচার করে দুটি সিদ্ধান্তে এসেছেন পণ্ডিতরা। ১. হরপ্পা সভ্যতা দ্রাবিড় সভ্যতা। বৈদেশিক প্রভাব নানা কারণে এর ওপর পড়েছে। ২. আর্যরা দ্রাবিড়গোষ্ঠী থেকে বেরিয়ে যাওয়া একটি দল - যারা উন্নত বা ভিন্নধর্ম, সভ্যতা, সংস্কৃতি সৃষ্টি করেছিল। ভারতের মাটিতেই এর উদ্ভব ও বিকাশ। রুশ পণ্ডিতদের মতে, দক্ষিণ ভারতেই ছিল দ্রাবিড়দের বাসস্থান। উত্তর ভারতের দ্রাবিড়ভাষী মানুষরা দক্ষিণ থেকে এসেছিল। সিন্ধুসভ্যতার সমসাময়িক (খ্রীঃ পূঃ ৩০০০-১৫০০) সভ্যতার অন্যতম বিকাশস্থল গুজরাটের আমেদাবাদ জেলার কাম্বে উপসাগর তীরবর্তী লোথালে অবস্থিত সুপ্রাচীন পোতাশ্রয়ের ধ্বংসাবশেষ এবং প্রাপ্ত সিলমোহরগুলি বিচার করে পণ্ডিতরা জানিয়েছেন, লোথাল, রাজস্থানের কালিবোঙ্গান, গুজরাটের সুরকোটরা, ধোলাভিড়া প্রভৃতি স্থানের সঙ্গে খ্রীঃ পূঃ ৩য় সহস্রাব্দ কালে সুমের-মেসোপোটেমিয়ার নিবিড় বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পাঞ্জাব থেকে মহারাষ্ট্র, ইরান সীমান্ত থেকে উত্তর প্রদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে, কয়েক হাজার বর্গ কি. মি. এলাকা জুড়ে বিস্তৃত ছিল সেই আদি ভারতীয় সভ্যতা। এইসব স্থানের ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাপ্ত সিলমোহরের বিচিত্র লিখনের মধ্যেই লুকিয়ে আছে ভারতীয় বর্ণমালার আদিরূপ। যাই হোক, আদি ভারতীয় বর্ণমালা বিষয়ে এই সিদ্ধান্ত আজ সুপ্রতিষ্ঠিত যে, প্রথম সহজ সরল এবং বিশুদ্ধ বর্ণমালা 'ব্রাহ্মী' তার গঠনবৈশিষ্ট্যের কিছুটা অংশ সিন্ধুলিপি থেকে লাভ করেছে ('......We find that some characteristics of Brahmi and its derivative scripts seem to have been present in the Harappan script. The connection remains mysterious but the possibility remains that through stages ..... the formation of conjuncts and the use of medial signs were legacies of the Harappan system of writing. The possibility is that not only the idea of writing but also some of the forms of the alphabets were copied from the Harappan script.' 'The Origin of Brahmi script,' S. P. Gupta, K. S. Ramachandran, N. Delhi, 1979, P. 70-71.)। তবে বিদেশী বর্ণমালার কিঞ্চিৎ প্রভাবও একেবারে অস্বীকার করার উপায় নেই।

সিন্ধুলিপির চিত্রধর্মী প্রতীকগুলি নিবিড়ভাবে লক্ষ্য করলে, বিহার-পশ্চিমবঙ্গ-ওড়িশার আদিবাসী কুটিরের দেওয়ালে আঁকা বিচিত্র ফ্রেসকো, বীরভূম জেলার কোঁড়া সম্প্রদায়ের

'শশগিডি' বা সত্যনারায়ণ পুজোর আলপনা, দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত 'উঠোনলক্ষ্মী' পুজোর চালপিটুলির আলপনাগুলির কথা এসে যায়। সিন্ধুলিপির মাছ, মানুষ, পাখি, উদ্ভিদ, পাত্র বা আধার, তীরধনুক প্রতীকগুলি এইসব আলপনার মধ্যে আজও বিস্ময়করভাবে বেঁচে আছে। অথচ বিস্ময়ের বিষয়, লিপিবিজ্ঞানীদের দৃষ্টি কিন্তু আজও এদিকে পড়ল না। এইসব আলপনার কুণ্ডলী ও চিত্রপ্রতীকগুলির উত্তরাধিকার কোথায়, সে খবরও বিশেষ কেউ রাখেন বলে মনে হয় না। অথচ আলপনা আর বর্ণমালা উভয়েই তো ভাব প্রকাশের বাস্তব মাধ্যম।

একথা যথার্থই যে সিন্ধুলিপির শত শত ভিন্নধর্মী চিত্রপ্রতীকগুলির যথাযথ পাঠ নির্ণয়ে বিশ্বের লিপিবিজ্ঞানীরা আজও একমত হতে পারেন নি। প্রত্যেকেই নিজস্ব সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। ৫৩৭টি চিত্রকে সামনে রেখেও আহ্মেদ হাসান দানি শেষ পর্যন্ত মন্তব্য করেছেন,- "One thing is certain that the Indus script, in its ultimate analysis is not very complicated. Probably the two fundamental principles of combinations and stroke addition, if they survived, influenced the formation of the conjuncts and the open syllables in the later historiclal Indian scripts." -(Indian Paleography; A. H. Dani, New Delhi, 1997, P. 19)।

কেবল সিন্ধু বা হরপ্পালিপি নয়, এর সমকালীন বা পরবর্তীকালীন যে সব লিপির কথা পণ্ডিতরা বলেছেন ('সিন্ধুসভ্যতার স্বরূপ ও অবদান'- শ্রী অতুল সুর, কলকাতা ১৯৮০, পৃঃ ৩৯-৪০), সেগুলি হোল 'লোথাল-এ' (খ্রীঃ পূঃ ২০০০-১৯০০), 'লোথাল-বি'(খ্রীঃ পূঃ১৯০০-১৬০০), 'রাখি শাহপুর' (খ্রীঃ পূঃ ১৯০০-১৮০০), 'চণ্ডীগড়' (খ্রীঃ পূঃ ১৯০০-১৭০০), 'রংপুর' (১৬০০-১৩০০), 'দৈমাবাদ' (খ্রীঃ পূঃ ১৩০০-১০০০)। বৈদিক সাহিত্য এইধরণের বর্ণমালাতে (বা প্রাক অশোক ব্রাহ্মীতে) লেখা হয়ে থাকবে। এর পরবর্তী পর্য্যায়ে পিপরহা (খ্রীঃ পূঃ ৫ম শঃ) ও মহাস্থানগড় লিপির (খ্রীঃ পূঃ ৩য়) উদ্ভব। হরপ্পা ও গ্রীক-ফিনিসীয় বর্ণমালার কিছু কিছু প্রভাব এই সব লিপিতে দেখা যায়। প্রত্নতাত্ত্বিকরা এই সময়কালটিকে (খ্রীঃ পূঃ ২০০০- খ্রীঃ পূঃ ৩য় শঃ) 'তাম্র যুগ' (Chalcolithic), 'চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্রের যুগ (Painted grey ware)', 'লৌহযুগ' (Iron age) নামে বিভক্ত করেছেন ('Pre-Asokan writing in India', K. V. S. Rajan, Vide 'The origin of Brahmi script', Gupta & R. Chandran, New Delhi, 1979, p.61-64)। এই সময়কালের মধ্যেই আর্য সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটে। প্রত্নতাত্ত্বিক গর্ডন চাইল্ড তাঁর ' দি আরিয়েন্‌স্' (১৯২৬) এ বলেছেন, বর্বর আর্যজাতি পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত সভ্যতাকে ধ্বংস করেছে। ভারতেই তারা নাকি বিশেষ সুবিধা করতে পারে নি। তাঁর কথিত আর্যরা তাহলে ভারতীয় নয়। কিন্তু ইন্‌কা বা মায়া সভ্যতার ধ্বংসকারীও কি তারাই? 'পাথুরে প্রমাণের ইতিহাস' এ অভিমত কতখানি গ্রহণ করবে, কে জানে।

ভাষার কথা

ভারতীয় সভ্যতার গোড়াপত্তনে প্রধানতঃ দ্রাবিড় ও আর্য এই দুটি ভিন্ন ভাষাভাষীর অবদান বর্তমান। দ্রাবিড়রা যে 'অজ্ঞাতস্থানের' অধিবাসী তা রাখালদাস এবং স্বামী বিবেকানন্দের

অভিমতানুযায়ী, পূর্ব ভারত এবং দক্ষিণভারত। আদিম বঙ্গবাসীদের সঙ্গে দক্ষিণভারতীয়দের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ছিল।' স্বামীজির মতে 'আদিম দক্ষিণভারতীয়রাই সুমের, আসিরীয়া, ব্যাবিলন ও মিশর সভ্যতার স্রষ্টা।' ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, তারা আক্কাডীয় বা সেমিটিক জনগোষ্ঠীর অত্যাচারে বালুচিস্তান হয়ে (সেখানকার 'ব্রাহুই' ভাষা তাদের অস্তিত্বের সাক্ষ্য দেয়।) সিন্ধু ও গঙ্গা অববাহিকা অঞ্চলে চলে আসে। সিন্ধু উপত্যকার হরপ্পা-মহেঞ্জোদারো ইত্যাদি ছাড়াও তারা ছড়িয়ে পড়ে ভারতের আম্বালা অঞ্চলের রূপার ও কোটলা নিহাঙ্, রাজস্থানের গঙ্গানগর জেলার বর্তমানে শুষ্ক সরস্বতী নদীর তীরবর্তী কালিবাঙ্গান, উত্তরপ্রদেশের মিরাটের আলমগীরপুর, গুজরাটের ঝালাওয়ার জেলার রংপুর, কচ্ছ জেলার সুরকোটরা, আমেদাবাদ জেলার লোথাল, জম্মু-কাশ্মীরের শ্রীনগরের নিকটস্থ বুর্জোহাম, অন্ধ্রপ্রদেশের মেহবুব নগর, বিহারের সরণ জেলার চিরান্দ, হরিয়ানার হিস্যার জেলার বানোয়ালি, মধ্যপ্রদেশের প্রকাশ জেলার নওদাতোলি ইত্যাদি স্থানে। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট, পাণ্ডুরাজার ঢিবি, বীরভানপুর, ২৪ পরগনা জেলার হরিনারায়ণপুর, চন্দ্রকেতুগড় ইত্যাদি নানাস্থানে ঐ সমকালীন প্রাগার্য আদিম দ্রাবিড়সভ্যতার 'পাথুরে প্রমাণ' মিলেছে। আধুনিক গবেষকদের সিদ্ধান্ত, বালুচিস্তানের কুল্লী, মেহী, রাণাঘুণ্ডাই, কোয়েটা ইত্যাদি স্থানে প্রাক হরপ্পা সভ্যতা বিরাজ করতো ('ভারতের প্রত্নতত্ত্ব' অমলানন্দ ঘোষ, কলকাতা, ১৯৬১)। সুতরাং দ্রাবিড় সংস্কৃতি ভারতের একান্ত নিজস্ব সংস্কৃতি। ভারতের আদিম মৃত্তিকাতেই তার জন্ম। এদেশের ভাষা ও বর্ণমালার আদিমতম স্রষ্টা তারাই। তারাই হয় তো বিশ্বজুড়ে সর্বপ্রথম সভ্যতার আলো জ্বালিয়েছে নানা যুগে।

আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ দু'হাজার অব্দে (মতান্তরে খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ অব্দ) উত্তরপশ্চিম ভারতে যে আর্যসংস্কৃতির উদ্ভব ঘটে (আর্য অনুপ্রবেশ), তার স্রষ্টারা ছিল কৃষিকার্য সম্পর্কে অভিজ্ঞ এক যাযাবর জনগোষ্ঠী। নানা শাখায় বিভক্ত এই জনগোষ্ঠী নানা অভিমতে পাঞ্জাব, কাশ্মীর, মধ্য এশিয়া, দক্ষিণ রাশিয়া, পোল্যাণ্ড, লিথুয়ানিয়া, হাঙ্গেরী, উত্তর জার্মানী, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া, পারস্য ইত্যাদি স্থানের অধিবাসী। এদেরই একটি শাখা পূর্বপাঞ্জাব ও পশ্চিম দোয়াব অঞ্চল থেকে পূর্বভারতের দিকে যাত্রা করে (খ্রীঃপূঃ ১০০০-৬০০ অব্দ)। এবং মধ্যপ্রদেশ গাঙ্গেয় উপত্যকা ও পূর্বভারতের কুরু, পাঞ্চাল, ভাস, উশীনর, মৎস্য, শাল্ব, শূরসেন, কোশল, কাশী, বিদেহ ইত্যাদি সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী রাজ্যগুলি গড়ে তোলে। এই সব স্থানের অধিবাসীদের মধ্যে আর্য-অনার্য উভয়ই ছিল ('Vedic Non-Vedic, Aryans, NonAryans, more or less Aryanised in language and culture' ODBL, vol I, p. 43)। উত্তর ভারতে তখন বৈদিক ভাষার প্রচলন থাকলেও ঐসব অঞ্চলে তখন পরিবর্তিত 'বৈদিক' বা সংস্কৃতের প্রচলন হয়ে গেছে। এর প্রাচীনতম নিদর্শন গুজরাটের কাথিয়াবাড়ের গির্নারে রুদ্রদামনের জুনাগড় শিলালিপি (২য় খ্রীষ্টাব্দ)। এখানেই অক্ষর, শব্দ, অর্থ, ব্যাকরণ, ধ্বনি, মাত্রা নানাবিধ ছন্দের কথা জানা গেল। তবে আর্যরা তাদের ব্যবহৃত ভাষার সৃষ্টিতে অনার্য-দ্রাবিড়দের নিকট যে বহুভাবেই ঋণী ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। দু একটি দৃষ্টান্তঃ দ্রাবিড় আকাশদেবতা 'বিন' আর্যদের 'বিষ্ণু'। পর্বতের দেবতা 'লোহিত দেব' রুদ্র, দ্রাবিড় 'শিব ও শম্ভু'। পরে এই দেবতা শিব বা মহাদেব।

দ্রাবিড়দের বানর দেবতা আর্যদের 'বৃষা কপি' হনুমান। অনেক সংস্কৃত শব্দ দ্রাবিড় ভাষা থেকে নেওয়া হয়েছে ('কম্মার' → কর্মকার)। এগুলি প্রাকৃতের মধ্যে দিয়ে সংস্কৃত হয়েছে।

আর্যদের ব্যবহৃত বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষাকে 'আদি ভারতীয় আর্যভাষা' (OIA) বলা হয়। এর ব্যাপ্তি খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ থেকে ৬০০ অব্দ। সাধারণ মানুষের উচ্চারণে এটি 'মধ্যভারতীয় আর্যভাষা' (MIA) বা 'প্রাকৃত' রূপ ধারণ করে ('পরাকৃত')। এটি 'প্রাকৃত' বা জনগণের ভাষা। কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্যের ৭ম সর্গের ৯০তম শ্লোকে দেখা যায়, শঙ্করের স্তব সংস্কৃত ভাষায় এবং শঙ্করীর স্তব 'অতি কোমল সুখশ্রাব্য প্রাকৃত ভাষায়' রচিত হয়। প্রাকৃতের ব্যাপ্তি খ্রীঃ পূঃ ৬০০ অব্দ থেকে ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ। খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতকের মহাস্থানলিপির প্রাকৃতভাষা এই প্রমাণ দেয় যে, সে সময় ঐ ভাষা বঙ্গদেশে রাজকার্যে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে বহুল প্রচলিত ছিল।

বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থানুযায়ী এটি ভগবান বুদ্ধের নির্দেশে, ধর্মীয় রচনায় 'পালি' রূপে ব্যবহৃত হয় (খ্রীঃ পূঃ ৬০০-২০০)। নানামতে এটি মগধে প্রচলিত উপভাষা বা কৌশাম্বী বা মধ্যপ্রদেশের অবন্তীতে প্রচলিত স্থানীয় ভাষা থেকে সৃষ্ট। অশোকের শিলালিপিগুলি এই ভাষাতেই রচিত। ডঃ সুকুমার সেনের মতে এই লিপিগুলির মধ্যে উত্তর-পশ্চিমা, দক্ষিণ-পশ্চিমা, প্রাচ্যমধ্যা ও প্রাচ্যা, প্রাকৃতের এই চারটি উপভাষার উপস্থিতি লক্ষণীয়। বৌদ্ধ 'পিটক', 'নিকায়', 'ধম্মপদ', 'জাতক', সবই পালিতে লেখা। এর সঙ্গে সংস্কৃত মিশিয়ে সৃষ্ট 'বৌদ্ধ সংস্কৃতে' রচিত 'ললিত বিস্তর', 'মহাবস্তু', 'দিব্যাবদান' গ্রন্থগুলি। পরবর্তী পর্যায়ে 'প্রাকৃত' ২০০ থেকে ৬০০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিকশিত হয়। যেমন শিষ্টজনের ভাষা (Lingua Franca) 'শৌরসেনী', 'মহারাষ্ট্রী', 'মাগধী' বা 'পূর্ব প্রাচ্যা', 'অর্ধ মাগধী' বা 'জৈনমাগধী' বা 'পশ্চিমা প্রাচ্যা' এবং 'পৈশাচী'। মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধ 'অর্ধমাগধীতে' ধর্ম প্রচার করেন। কিন্তু লেখার সময় তাতে 'মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের' প্রভাব পড়ে ('Lord Mahavira and His Times', K. C. Jain, Delhi, 1991. p. 353-68)। ওড়িশার ভুবনেশ্বরে উদয়গিরির খারবেল অনুশাসন (খ্রীঃ পূঃ ১ম শঃ) বিশুদ্ধ পালিতে রচিত। মধ্যপ্রদেশের রামগড় পাহাড়ের যোগীমারা গুহার 'সুতনুকা লিপি' (খ্রীঃ পূঃ ৩য় শঃ) মাগধী প্রাকৃতের নিদর্শন। খ্রীঃ পূঃ ৩য় -৪র্থ শতাব্দীতে মৌর্যযুগে মগধ অঞ্চলে এর উদ্ভব। প্রাক-অশোক পিপরহা লিপি, অশ্বঘোষের নাটকের অংশ অর্ধমাগধীব নিদর্শন। 'কথাসরিৎসাগর' গ্রন্থটির ভাষা পৈশাচী প্রাকৃত।

প্রত্যেক প্রাকৃত ভাষা ৫ম-৬ষ্ঠ শতক থেকে 'অপভ্রংশ' ভাষার রূপ নেয়। শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক', কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশী' ছাড়াও জৈন, বৌদ্ধ, যোগপন্থী ও সংস্কৃত না জানা মানুষদের মধ্যে এর ব্যবহার ছিল। 'প্রাচ্যা-প্রাকৃত' কালক্রমে বাংলা-বিহার-ওড়িশা অঞ্চলে অপভ্রংশের অর্বাচীন রূপ, প্রাচ্য 'অবহট্‌ঠ' (অপভ্রংশ) ধারণ করে। আনুমানিক খ্রীঃ ১০০০ অব্দে এটি তিনটি আঞ্চলিক 'আধুনিক ভারতীয় আর্য' ভাষায় পরিণত হয় - পশ্চিমে 'বিহারী', উত্তরপশ্চিমে 'মৈথিলী', পূর্বে 'বাংলা-ওড়িশা-অসমীয়া'। বাংলা ও অসমীয়া ভাষা ১৫শ-১৬শ শতাব্দী থেকে দুটি পৃথক ভাষাপথ গ্রহণ করে। ১০ম-১২শ শতাব্দী কালে রচিত চর্যাপদগুলি প্রাচীন বাংলা ভাষার নিদর্শন হলেও ('পূর্বী নব্য আর্যভাষা' - নীলরতন সেনের 'চর্যাগীতিকোষ,

২০০১, পৃঃ ভূঃ ১৭) এর মোট ১৬৬০ টি শব্দের মধ্যে আছে সংস্কৃত-তৎসম, সংস্কৃতজ বা তদ্ভব-অর্ধতৎসম, অসংস্কৃতজ বা দেশী-বিদেশী শব্দ। এতে অবহট্‌ঠেরও ছাপ আছে। প্রাচীন হিন্দি, মৈথিলী, ওড়িয়া বা অসমীয়ার দাবী থাকলেও এর ভাষা যে মূলতঃ প্রাচীন বাংলা তা ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় নিশ্চিতভাবে প্রতিপন্ন করেছেন।

তবে মনে রাখা দরকার, বাংলাদেশে সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্যরচনা ও লিপিলেখ রচনার স্রোত কিন্তু সমানভাবেই চলেছিল। তার প্রমাণ গুপ্তযুগ থেকে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' পর্যন্ত সময়কালে (৪র্থ শতাব্দী - ১২শ শতাব্দী) অনেকই পাওয়া যায়। বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া গুহালিপির (খ্রীঃ ৪র্থ শঃ) ভাষা সংস্কৃত। কুমার গুপ্তের ধনাইদহ তাম্রশাসন (৪৩২-৩৩ খ্রীঃ), দুটি দামোদরপুর তাম্রশাসন (৪৪৪ ও ৪৪৭ খ্রীঃ) ছাড়াও বৈগ্রাম (৪৪৮ খ্রীঃ) ও পাহাড়পুর তাম্রশাসন (৪৭৯ খ্রীঃ), বুধগুপ্তের দুটি দামোদরপুর তাম্রশাসন (৪৮২ ও ৪৭৬-৯৫ খ্রীঃ) সবই সংস্কৃত ভাষায় রচিত। কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার নিধনপুর অনুশাসন (খ্রীঃ ৭ম শঃ) সংস্কৃত গদ্যে লেখা। একে 'গৌড়রীতি' বলা হয়েছে। বোঝা গেল সংস্কৃত ভাষা তখন রীতিমত ব্যবহৃত। গুপ্তযুগ থেকে সেনযুগ পর্যন্ত সময়কালে (৪র্থ শতক-১২শ শতক) বাংলায় সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্য চর্চা যে ব্যাপক হয়েছে তার প্রমাণ ঐ সময়কার তাম্রশাসন ও শিলালিপি, বন্দ্যোঘটীয় সর্বানন্দের 'অমরকোষ টীকাসর্বস্ব,' পালকপ্যের 'হস্ত্যায়ুর্বেদ,' শ্রীধরের 'ন্যায়কন্দলী,' ভবদেবের 'ব্যবহারতিলক,' জীমূতবাহনের 'দায়ভাগ,' হলায়ুধের 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব,' ভট্টনারায়ণের 'বেণীসংহার নাটক,' বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষস,' অভিনন্দ ও সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত দুখানি 'রামচরিত,' কবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ,' বল্লালসেনের 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর,' ধোয়ীর 'পবনদূত,' গোবর্ধন আচার্যের 'আর্যাসপ্তশতী,' ইত্যাদি। 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' ও শ্রীধরদাসের 'সদুক্তিকর্ণামৃত' সঙ্কলন কাব্য এযুগেই (১২শ-১৩শ শতক) রচিত। এছাড়া প্রাকৃতে রচিত হালকবির 'গাথাসপ্তশতী,' ছন্দবিষয়ক গ্রন্থ 'প্রাকৃতপৈঙ্গল,' যথাক্রমে পূর্বী ও পশ্চিমী অপভ্রংশে রচিত। সরহ ও কাহ্নের 'দোহাকোষ,' 'ডাকার্ণব' গ্রন্থগুলি আদিযুগের বাংলাভাষাকে প্রভাবিত করেছে নানাভাবে। চর্যাপদের দেড়শো বছর পরের সাহিত্য কর্ম বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' (১৪শ শতক)। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে 'This work, from point view of language, is of unique character in Middle Bengali literature (ODBL, 1985, P. 127).' 'চর্যাপদ' পূর্বী নব্য আর্যভাষার নিদর্শন, যাকে আদি বাংলার প্রথম নিদর্শনও বলা হয়ে থাকে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' আদি মধ্যযুগীয় বাংলার নিদর্শন। চৈতন্যপূর্ব, চৈতন্য ও উত্তরচৈতন্য যুগের বিবিধ সোপান অতিক্রম করে মধ্যযুগের বাংলা ভাষা ক্রমশঃ আধুনিক হয়ে ওঠে।

প্রাক-ব্রাহ্মী প্রসঙ্গ

সিন্ধুলিপির দীর্ঘ কয়েকশত বৎসর পরে 'ব্রাহ্মী' নামক এক বিশুদ্ধ ও সরল বর্ণমালার উদ্ভব ঘটে ভারতে। এর মধ্যবর্তী সময়ে ভারতে আবির্ভূত বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত বর্ণমালার কথা পণ্ডিতরা কেউ কেউ বলে থাকেন, যেগুলি সিন্ধুলিপি থেকে বিবর্তিত হয়ে ব্রাহ্মীলিপির উদ্ভবকে সহায়তা করে থাকতে পারে। এ বিষয়ে অবশ্য বিতর্কের শেষ নেই। যাই হোক না কেন, ব্রাহ্মীই যে ভারত এবং তার সঙ্গে বহু প্রাচীনকালে নানাভাবে সম্পর্কিত প্রতিবেশী দেশগুলির বর্ণমালার

জননী, তা এক প্রতিষ্ঠিত সত্য । কিন্তু ব্রাহ্মীর পূর্বে ভারতীয় জনগণ লিখনরীতির সঙ্গে কতখানি পরিচিত ছিলো বা আদৌ ছিলো কী না সে বিষয়ে কানিংহাম, ডি. আর. ভাণ্ডারকর, ডি. ডিরিঞ্জার, আই. জে. গেলব, জি. আর হান্টার, জে. মার্শাল, জি. এইচ. ওঝা, আর বি. পাণ্ডে, এস. আর. রাও, এ. সি. বার্নেল, রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়, ডি. সি. সরকার, বি. লাল, এ. এইচ্. দানি, সি. এস. উপাসক, টি. পি. বর্মা, আর. ই. এম্. হুইলার, জি. বুলার, এস. আর. গোয়েল, কে. ভি. সুন্দররাজন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট দেশী বিদেশী লিপিবিজ্ঞানী ও পুরাতাত্ত্বিক পণ্ডিত নানা পরস্পরবিরোধী উক্তিতে ভারতীয় বর্ণমালার ইতিহাসের ক্ষেত্রটিকে এত জটিলতায় ভরে দিয়েছেন এবং এইসব প্রাজ্ঞ প্রাচ্যবিদগণের প্রত্যেকের সিদ্ধান্ত এত বলিষ্ঠ যুক্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে যে এর মধ্যে থেকে যথার্থ বিষয়টিকে খুঁজে নেওয়া খুবই দুষ্কর বিষয়।

এঁদের কয়েকজনের মতে, বেদ যেহেতু জীবনযাপনের সর্বক্ষেত্রে সম্পৃক্ত বিষয় নিয়ে রচিত, তাই তা কেবল মুখে মুখে টিকে থাকার কথা নয় । যুক্তিহীন, অর্থহীন, জীবন নিরপেক্ষ বিষয় বৈদিকসাহিত্য আলোচনা করে নি । সুতরাং বৈদিকসাহিত্য লেখার জন্য বিশুদ্ধ বর্ণমালা ব্যবহৃত হোত । তালপাতা, ভূর্জছাল বা চামড়ার মতো স্বল্পস্থায়ী আধারে সেই লেখার কাজ হয়েছিল বলে সেইসব নিদর্শন পরবর্তী যুগের মানুষের হাতে আসে নি । যজুর্বেদে 'অক্ষর', 'বর্ণ', 'মাত্রা' শব্দগুলি আছে । জি. এইচ. ওঝা উপনিষদ ও আরণ্যকে অক্ষর, স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ, ঘোষবর্ণ, মূর্ধন্য, দন্ত্যন্য সম্পর্কিত ধারণার অস্তিত্ব দেখেছেন । তাঁর মতে 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে'র 'ওঁ' এই বর্ণটি অ-কার, উ-কার ও ম-কারের মিলিত রূপ । প্রাক্-অশোক ভারতে লেখার কাজ ছিল অতি সাধারণ নিত্যকর্ম । তিনি বলেন, খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতকে স্ত্রীলোক ও বালকরাও লিখতে জানতো । বাংলার টোল বা পাঠশালার মতো সাধারণ শিক্ষালয়ে লেখা, নামতা বা গণনা, হিসাব করা ইত্যাদি শেখানো হোত । 'মহাভারত' (আদিপর্ব, ১.১১২) লিখেছিলেন গণেশ । 'বশিষ্ঠ ধর্মসূত্রে' (১৬.১০.১৪-১৫) লিখিত প্রমাণ পেশ করার কথা বলা হয়েছে । 'মনুস্মৃতি'তেও (৮.১৬৮) লেখার কথা আছে । কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে'র বিভিন্ন স্থানে (১.৫.২., ১.১২.৮., ১.১৯.৬., ২.৯.২৮.) লেখনপ্রসঙ্গ বিবৃত । বাৎসায়ণের 'কামসূত্রে' 'পুস্তকবাচন', ও 'হিসাবরক্ষণ' প্রসঙ্গ আছে । সর্বত্র লেখা ও লিখিত গ্রন্থের কথা বলা হচ্ছে । খ্রীষ্টপূর্ব যুগে রচিত পাণিনীর 'অষ্টাধ্যায়ী'তে লিপি, লিবি, লিপিকর ইত্যাদি উল্লিখিত । এখানে চতুষ্পদ গৃহপালিত পশুর কানে নানাবিধ চিহ্ন এঁকে দেবার কথা বলা হয়েছে, যা বৈদিকযুগেও প্রচলিত ছিল । পাণিনী তাঁর পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক আপিশলি, স্ফোটায়ন, গার্গ, শাকল্য, শাকটায়ণ, গালব, ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, চাক্রবর্মণ, সেনক প্রমুখ বৈয়াকরণদের অভিমত আলোচনা করে সিদ্ধান্তে এসেছেন । এঁদের গ্রন্থাবলী কেবল মুখে মুখে প্রচলিত ছিল, এটা নিতান্তই অবিশ্বাস্য ।

ডিরিঞ্জার বলেছেন, 'দেশের কোন একটি অঞ্চলে বর্ণমালার উদ্ভব হয় এবং পরে তা রাজকার্য ও ব্যবসাবাণিজ্যের প্রয়োজনে নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়ে ।' ব্রাহ্মণরা বেদ রচনার সময় সেই বর্ণমালা গ্রহণ করে । আরামীয় ভাষার প্রভাব ভারতীয় বর্ণমালার সৃষ্টিতে কিছুটা সহায়ক বলে তিনি মনে করেন ।

বিনয়পিটকে 'লেখক', 'লেখার্পিত', 'অক্ষরিকা'(ক্রীড়া), 'লিখিটক চোর' (Recorded

thief) এর কথা আছে। 'ধর্ম্মপদ', 'জাতক' ও 'নিকায়' গ্রন্থে 'লেখনী', 'লেখসিপ্প' (Writing craft), 'পোত্থক', 'ফলক' (বোর্ড) উল্লিখিত। প্রাকবুদ্ধযুগে ঋষিরা শিষ্যদের উদ্দেশ্যে বাঁশ ও কাঠের ফলকে ধর্মীয় বিষয় 'আত্মহত্যার নির্দেশাবলী' খোদাই করতে বলতেন (অর্থাৎ কীভাবে আত্মহত্যা করলে পরজন্মে ধনী হওয়া যাবে, স্বর্গবাস হবে)। 'কটাহক জাতকে' শ্রেষ্ঠীপুত্র ও দাসীপুত্রকে শ্লেটের মতো কাষ্ঠফলক নিয়ে পাঠশালায় লেখা শিখতে দেখা যাচ্ছে। এখানে শ্রেষ্ঠীর ভৃত্য কটাহক একটি জালপত্র পেশ করে আর এক বণিক কন্যাকে বিবাহ করেছিল। 'মহাসুতসোম জাতকে' তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক তাঁর এক প্রাক্তন ছাত্রকে পত্র লেখেন (পণ্ন)। 'কামজাতকে' এক রাজা ভাই-এর হাতে রাজ্য সমর্পণ করে বনবাসী হয়ে গিয়ে এক গ্রামের অধিবাসীদের আতিথ্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁর ভাইয়ের উদ্দেশ্যে পত্র লেখেন যাতে ঐ গ্রামবাসীরা 'রাজকর' থেকে রেহাই পায়। 'পুণণ নদী জাতকে' এক রাজা তাঁর বিতাড়িত পুরোহিতকে ফিরিয়ে আনার জন্যে শ্লোকসহ পত্র লিখেছিলেন। 'চুল্লকালিঙ্গ জাতকে' রাজা অস্মকের মন্ত্রী নন্দীসেনের লেখা অনুশাসনের কথা আছে। 'অসদিস জাতকে' সাতজন রাজা কাশীরাজ ব্রহ্মদণ্ডের রাজ্য অধিকারের জন্যে রাজাকে পত্র লিখলে রাজার ভাই অসদিস তীরের ওপর অক্ষর খোদাই করে তাঁদের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করেছিলেন। এইভাবেই 'রুরুজাতক', 'কণহজাতক', 'কুরুধম্মজাতক', 'তেসকুন জাতকে' প্রাচীনভারতে লেখনরীতির অনুকূল দৃষ্টান্ত দেখা যায়। 'অক্ষর' শব্দ আছে 'অঙ্গুত্তর-নিকায়', 'সংযুক্তনিকায়' ও 'ধম্মপদে'। বৌদ্ধগ্রন্থ 'মহাবস্তু অবদান' এবং ১ম শতাব্দীতে মিশ্র-সংস্কৃত ভাষায় রচিত ভগবানবুদ্ধের রোমান্টিক জীবনকাহিনী 'ললিতবিস্তর' গ্রন্থের ১০ম অধ্যায়ে নানাধরনের লিপির কথা বলা হয়েছে। যেমন, ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী, পুষ্করশালী, বঙ্গলিপি, অঙ্গলিপি, মগধলিপি, মঙ্গল্যলিপি, মনুষ্যলিপি, কিন্নারিলিপি, দক্ষিণীলিপি, উগ্রলিপি, সংখ্যালিপি, অনুলোম, অর্ধধনু, দরদ, খাস্য, চীন, হূন, মধ্যাক্ষরবিস্তর, পুষ্প, দেব, নাগ, যক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নর, মহোরগ অসুর, গরুঢ়, মৃগচক্র, চক্র, বায়ুরুতম্, ভৌমদেব, অন্তরীক্ষদেব, উত্তরকুরুদ্বীপ, অপরগৌড়, পূর্ববিদেহ, উৎক্ষেপ, নিক্ষেপ, বিক্ষেপ, প্রক্ষেপ, সাগর, বজ্র, লেখপ্রতিলেখ, অনুদ্রুত, শাস্ত্রাবর্ত, গণনাবর্ত, উৎক্ষেপাবর্ত, নিক্ষেপাবর্ত, পাদলিখিত, দ্বিরুত্তরপদসন্ধি, দশোত্তরপদসন্ধি, অধ্যাহারিণী, সর্বরুতসংগ্রণী, বিদ্যানুলোমা, বিমিশ্রিত, ঋষিতপস্তপ্তা, সর্বসারসংগ্রহণী, রোচমানা ধরণীপ্রেক্ষণ, সর্বৌষধিনিষ্যন্দা, সর্বভূতরুতগ্রহণী, অঙ্গুরীয়লিপি, শিকারীলিপি, ব্রহ্মাবলী ও দ্রাবিড়লিপি। 'ভগবৎসূত্র' ব্রাহ্মীলিপিকে প্রথমেই সম্মান জানিয়েছে। ৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দে রচিত চীনা বিশ্বকোষ 'ফা-ওয়ান-সুলিন' প্রথমেই ব্রাহ্মীর কথা বলেছে।

জৈনশাস্ত্র 'পন্নবাণসূত্র' ও 'সমবয়ঙ্গসূত্রে', (১৮শ পরিঃ) ১৮টি বর্ণের কথা আছে, যার প্রথমতম হল 'ব্রাহ্মী'। প্রাচীন পাঞ্জাবের (বা গান্ধার) শলাতুর গ্রামের অধিবাসী পাণিনি খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতকে পাটলীপুত্র নগরে রচনা করেন সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ 'অষ্টাধ্যায়ী'। 'লিপিকর' বা 'লিবিকর' শব্দের দ্বারা লিপি রচয়িতাদের কথা এতে বলা হয়েছে। এছাড়া লিখনসংক্রান্ত নানা তথ্যও এতে আছে। যেমন, 'যবনানি', 'স্বরিত' ('স্বরিতেতাধিকার', ১.৩.১১, 'গ্রন্থ' ইত্যাদি শব্দ।

লিখিত বৈদিক সাহিত্যের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য ব্যাকরণ প্রয়োজন ছিল বলেই যাস্ক তাঁর গ্রন্থ রচনা করেন। পাণিনির পূর্ববর্তী এই নিরুক্ত লেখক তাঁর গ্রন্থে ঔডুম্বরায়ণ, কৌষ্টুকী, শতবলাক্ষ, মৌদ্গল্য, শাকপূণি, শাকটায়ণ, স্থৌলাষ্ঠীবী, আগ্রায়ণ, ঔপমন্যব, ঔর্ণবাভ, কাত্থক্য, কৌৎস, গার্গ, গালব, চর্মশিরস্, তৈটকি, বার্ষায়ণি ও শাকল্য নামক বৈয়াকরণ ও নিরুক্তকারদের অভিমত উল্লেখ করেছেন। এ থেকে বোঝা যায়, পাণিনি ও যাস্কের পূর্বে নানাবিধ ব্যাকরণ ও নিরুক্ত গ্রন্থ লিখিত হয়েছিল। এইসব পণ্ডিত-বৈয়াকরণদের বিশাল সব রচনা মুখস্থ করে পাণিনি বা যাস্ক তাঁদের বইপত্র লিখেছিলেন- এ নিতান্তই অবাস্তব সিদ্ধান্ত। লিখিত বিষয় ছাড়া কখনও সেইসব বিষয়ের সমালোচনা বা সত্যার্থ নির্ণয় অসম্ভব। 'মনুসংহিতার' পূর্ববর্তীকালের রচনা, অন্যতম বৈদিক সাহিত্য 'বশিষ্ঠ ধর্মসূত্র' বৈদিকযুগের ভারতে বহুল প্রচলিত লেখনপদ্ধতির (Art of writing) কথা নির্দেশ করেছে। সিন্ধুলিপি, দ্রাবিড়লিপি, পুষ্করশালী, যবনালিয়া ইত্যাদি ভারতের প্রাচীন লিপিমালা।

বৈদিক সাহিত্যে 'ব্রাহ্মী' প্রসঙ্গ আছে। ('ব্রাহ্মী→বাক্')। সুতরাং লিখন প্রক্রিয়ার প্রসঙ্গও এসে যায়। বেদের স্তোত্রগুলির বিশুদ্ধ উচ্চারণ স্থায়ী করার জন্যে বর্ণমালা জরুরী ছিল। 'নারদস্মৃতির' অভিমত, 'মানুষের শুভগতির উদ্দেশ্যে বিধাতা পুরুষ ব্রহ্মা লিপি সৃষ্টি করেন।' জৈনশাস্ত্র অনুসারে আদিদেব ঋষভদেব 'ব্রহ্মাক্ষর' জপ করতেন। তিনি এই লিপি নিজ কন্যাকে (ব্রাহ্মী) দান করেন। 'জ্যোতিস্তত্ত্বে' বৃহস্পতি বলেছেন 'মানুষ ছয় মাসের মধ্যেই সব ভুলে যায় তাই ধাতা ব্রহ্মা পুরাকালে অক্ষর সৃষ্টি করে তা পত্রে স্থায়ী করার ব্যবস্থা করেন।' ছান্দোগ্য উপনিষদে (২ ১০) 'অক্ষর' শব্দ উল্লিখিত। ঐতরেয় আরণ্যকে (২.২, ৩.১, ৩.২) উষ্মবর্ণ,স্পর্শবর্ণ, স্বর, অন্তঃস্থ ব্যঞ্জন, ণ-কার, ষ-কার, ন-কার, স-কার, সন্ধির, প্রসঙ্গ আছে। শতপথ ব্রাহ্মণে (১৩.৫.১.১৮; ১০.৫.১.২) একবচন, বহুবচন ও তিনপ্রকার লিঙ্গের বিষয় আছে। তৈত্তিরীয় সংহিতায় ইন্দ্র ও বায়ুর প্রসঙ্গ থেকে লেখার কথা জানা যাচ্ছে। ঋগ্বেদে গায়ত্রী, উষ্ণিহ্, অনুষ্টুভ, বৃহতী, বিরাজ, ত্রিষ্টুভ ও জগতী ছন্দের নাম পাওয়া যাচ্ছে (১০.১৪.১৬; ১০.১৩২.৩.৪)। 'বাজসেনী-সংহিতায়' ছন্দ ছাড়াও পংক্তি, বিভিন্ন ছন্দের পার্থক্য ইত্যাদি দেখা যায়। মৈত্রায়ণী সংহিতা, কাঠক সংহিতার সাক্ষ্যও এই বিষয়ে প্রাসঙ্গিক। লেখার কাজ না জানলে বা এই সব বিষয় লিখিত না থাকলে বৈদিক সাহিত্যের জটিল ছন্দপদ্ধতি মানুষের পক্ষে কেবল স্মৃতিতে ধরে রাখা কঠিন বিষয়ই ছিল।

মহাভারতের শান্তিপর্বে (১৮৮/১৫) বলা হয়েছে 'বেদ' হল 'ব্রহ্ম'। 'ব্রাহ্মী' শব্দের অর্থ 'বৈদিকী'। লিপিবিজ্ঞানী জি. বুলার তাঁর 'Indian paleography' তে 'নারদস্মৃতি', 'বৃহস্পতিভর্তৃকা', হিউয়েন সাঙের বিবরণ, ৩০০ খ্রীঃ পূঃ কালে রচিত 'সমবয়ঙ্গ সূত্র', ১৬৮ খ্রীঃ পূঃ কালে রচিত 'পন্নবাণসূত্র' ইত্যাদির সাক্ষ্য অনুসরণে ভারতীয় লিপির উদ্ভাবকরূপে 'ব্রহ্মার' কথা বলেছেন। তাঁর নাম থেকেই 'ব্রাহ্মী' আদি ভারতীয় লিপি। খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ-৫ম শতকেও এর প্রচলন ছিল। এটি বাম থেকে ডানে পাঠযোগ্য। ভারতসংস্কৃতির বিশিষ্ট প্রবক্তা অলবিরুণীর মতে হিন্দুরা লেখনপদ্ধতি এক সময়ে ভুলে গিয়েছিল (অর্থাৎ আগে জানতো)। পরে কোন দৈবপ্রেরণায় পরাসরপুত্র ব্যাসদেব তা পুনরায় উদ্ধার করেন (আদি ভারতীয় সংস্কৃতির

ধারকবাহক, প্রাগার্য দেবতা এবং পরে অর্বাচীন ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে স্থান প্রাপ্ত 'বিনায়ক', 'গণপতি' বা 'গণেশ' আদিতে নানাগুণসম্পন্ন, এক অনার্য গোষ্ঠীপতি বা গণাধিপতি ছিলেন। ইনি ছিলেন মানবকল্যাণকারী। আর্যরা এঁর কাছ থেকে বর্ণমালা গ্রহণ করেন। ব্যাসদেবের 'মহাভারত' ইনি লিপিবদ্ধ করেন। এঁর জননী 'সিংহবাহিনী দেবী' বাংলা ছাড়িয়ে সুদুর ক্রীট দ্বীপেও পূজিতা। 'যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে' এই হস্তীমুখ গণপতি শক্তিধর দৈত্য বা অসুররূপে বর্ণিত। বাংলা থেকে ওড়িশা হয়ে বিশেষ করে সমগ্র দক্ষিণভারতে এই দেবতার অসংখ্য প্রাচীন মূর্তি এবং এঁর বহুল পূজা প্রচার থেকে বোঝা যায়, যথার্থই ইনি 'গণপতি'। বাংলা সনের প্রথমদিনে এঁর পূজা করে বাঙালীর নতুন বছরের যাত্রা শুরু।)। তাঁর মতে খ্রীঃ পূঃ ৩য় সহস্রাব্দে ভারতীয় বর্ণমালার উদ্ভব ঘটেছে। বৈদিক ঋষিরা তাহলে কি সিন্ধুলিপির কথা জানতেন না ? নাকি পরাসর-পুত্রের সিন্ধুলিপিকে আর্যীকরণ করার কাজটিকে 'দৈব অনুপ্রেরণা' বলেছেন তিনি এবং তারপরই 'ব্রহ্মার' সঙ্গে 'ব্রাহ্মী' জুড়ে গেছে ?

আনুঃ ৪৮৭ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে, কুশিনগরে ভগবান বুদ্ধের নির্বাণ লাভের পর তাঁর পার্থিব দেহ বিশুদ্ধ চন্দন কাঠে দাহ করা হয়। এর পর তাঁর 'দেহাস্থি' নিয়ে যাওয়া হয় রাজগৃহ, বৈশালী, কপিলাবস্তু, অল্লকপ্পা, রামগ্রাম, পাওয়া, বেঠদীপ ও কুশিনগরে। ঐ সমস্ত স্থানে বুদ্ধের পবিত্র দেহাস্থি পাত্রে ভরে তার ওপর স্তূপ নির্মিত হয়। অনুরূপ স্তূপ নির্মিত হয় রাজস্থানের আজমীর জেলার বরলি ও তরাই সন্নিহিত উত্তর প্রদেশের পিপরহা নামক স্থানে।

অশোকপূর্ব যুগের বর্ণমালার দৃষ্টান্তরূপে বিশেষজ্ঞরা যেসব নিদর্শন উল্লেখ করে থাকেন, সেগুলির মধ্যে প্রধানতম হল ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর প্রদেশের বস্তী জেলার পিপরহাতে আবিষ্কৃত বৌদ্ধস্তূপ থেকে প্রাপ্ত বুদ্ধের দেহাস্থির আধার। তাতে খোদিত আছে প্রাক অশোক যুগের ব্রাহ্মীলিপির নিদর্শন।। পণ্ডিত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে এটি খ্রীঃ পূঃ ৫ম বা ৪র্থ শতকের।[১] ৩৭ টি বর্ণের পদ্যময় লিপি এখানে দেখা গেছে। এটিকে অশোকপূর্ব যুগে (বুলারের মতে খ্রীঃ পূঃ ৪৮৩ অব্দ), বুদ্ধদেবের নির্বাণকালের বলে বলা হয়েছে (পাণ্ডে)। এছাড়াও এরাণ মুদ্রালিপি, ভারতীয় যাদুঘরে রক্ষিত বগুড়া জেলার মহাস্থানগড় থেকে প্রাপ্ত মহাস্থানলিপি (পাণ্ডের মতে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময়কার), উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুরের দক্ষিণে অবস্থিত শোহগৌড়া থেকে ১৮৯৩ তে প্রাপ্ত (এ. সো. সংগ্রহ) ব্রোঞ্জফলকের লিপি (চারছত্রে ৭২টি বর্ণ ও ৭টি প্রতীকধর্মী চিত্র খোদিত। প্রাক অশোক মৌর্য যুগের লিপি), রাজস্থানের আজমীর জেলার বরলি গ্রামে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রাপ্ত এবং আজমীর মিউজিয়ামে রক্ষিত প্রস্তরলিপি (খ্রীঃ পূঃ ৩৭৪-৭৩, ওঝা ও পাণ্ডে।), অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষ্ণা জেলার ভট্টিপ্রলু স্তূপ থেকে প্রাপ্ত পাত্রলিপি, উত্তরপ্রদেশের মথুরার নিকটবর্তী পরখম্ থেকে ১৮৮২-৮৩ তে কানিংহাম কর্তৃক প্রাপ্ত বেলেপাথরের মূর্তির নিচের ক্ষুদ্র লিপি ('অজাতশত্রু রাজোশিরি' লেখা মূর্তিটিকে পণ্ডিত জয়শোয়'ল 'কুণিক অজাতশত্রু'র বলেছেন। বুদ্ধের সমসাময়িক এই মূর্তিটি ৫১৫ খ্রীঃ পূঃ কালের বলা হয়েছে।) এবং পশ্চিম পাকিস্তানের রাওয়ালপিণ্ডি জেলার তক্ষশীলা নগরীর ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাপ্ত কয়েকটি ধাতবমুদ্রায় খোদিত লিপি (The Origin of the Brahmi Script), 1979.) প্রাক অশোক ভারতীয় বর্ণমালার নিদর্শনরূপে উল্লিখিত। খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতকে কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে'

৬৩ টি বর্ণের কথা বলা হয়েছে ('অকারাদয়ো বর্ণাঃ ত্রিষষ্টি' ।)। রামায়ণ-মহাভারতে লেখার কথা আছে। হস্তীবিদ্যাশিক্ষা ও চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ, চম্পারাজ রোমপাদের সঙ্গে ঋষি পালকাপ্যের দীর্ঘসংলাপ 'হস্ত্যায়ুর্বেদ' (রচনাকাল ৬০০-২০০ খ্রীঃ পূঃ) ও জৈন 'আচারাঙ্গ সুত্ত' (৬০০-৩০০ খ্রীঃ পূঃ) লিপিবিহীন যুগে নিশ্চয়ই রচিত হয়নি । জাতককাহিনীগুলি বুদ্ধের 'মহাপরিনির্বাণের' (খ্রীঃ পূঃ ৪৮৭ অব্দ- ওঝা) একশত বৎসর পরে (৩৭০ খ্রীঃ পূঃ) বৈশালীতে অনুষ্ঠিত 'মহাসঙ্গিতীতে' সংকলিত হয়[২] । ওড়িশার হাথিগুম্ফার কলিঙ্গরাজ খারবেলের অনুশাসনে (খ্রীঃ পূঃ ১ম শতক) লেখা, রূপ ও গণনা-ব্যবহারবিধির কথা জানা যাচ্ছে । বৌদ্ধ 'মহাবগ্‌গ' 'লেখা' ও 'পড়া'র কথা বলেছে । আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময় এদেশে কালি ও লেখনীর ব্যবহার ছিল । 'বিশ্বকোষ'কার বলেছেন (খণ্ড ১৭, পৃঃ ৫৮৬) হিন্দুরা ৩০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে জ্যোতিষবিচারের তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করে রাখতেন । ঋগ্বেদের ১০.৬.২৭ সূক্তে আছে 'সহস্রং মে দদতো অষ্টকর্থ্যঃ'। তাহলে সহস্রের পূর্ববর্তী সংখ্যার লেখন-প্রয়োগও ছিল ।

প্রাচীন 'লিপি' শব্দটি এসেছে পারসিক 'দিপি' শব্দ থেকে । অশোক অনুশাসনে 'লিখিত', 'লেখিত', 'লেখাপিত', 'লিপি', 'লিবি' বা 'লিবী' শব্দ আছে । অশোকের শাহাবাজগঢ়ী ও মানসেরা গিরি অনুশাসনে 'দিপি' শব্দ আছে । এছাড়া আছে 'নিপিসত', 'নিপেসিত', 'নিপেসাসিত' শব্দগুলিও । কর্ণাটকের চিতল দুর্গ জেলার ব্রহ্মগিরি, জটিঙ্গরামেশ্বর ও সিদ্ধপুরের অশোক অনুশাসনে যথাক্রমে 'লিখিতম্ লিপিকরেন', 'পডেন লিখিতম লিপিকরেন' ও 'চপডেন ....লিপিকরেন' লিপি দৃষ্ট হয় । বৈদিক মন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য শুদ্ধ উচ্চারণ । একমাত্র লিপির মাধ্যমেই তা রক্ষা করা সম্ভব । 'নারদস্মৃতি' বলেছে —

'না করিষ্যদ্ যদি ব্রহ্মা লিখিতং চক্ষুরুত্তমম্ । তত্রেয়মস্য লোকস্য না ভবিষ্যৎ শুভাগতিঃ ।।'

মানুষের শুভগতির উদ্দেশ্যেই বিধাতাপুরুষ ব্রহ্মা লিখন সৃষ্টি করেছেন । তাই বৈদিক লিপির নাম 'ব্রাহ্মীলিপি' ।[৩] এমনও হতে পারে, সরল রূপ ও সহজবোধ্যতার গুণে ব্রাহ্মীলিপি মানুষের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করলে অন্যান্য লিপির গুরুত্ব দিনে দিনে হ্রাস পায় । এইসব নানাদিক বিবেচনা করে বুলার তাঁর 'Indian Paleography' তে ঘোষণা করে দিয়েছেন, 'The results of paleographic examination of the most ancient Indian Inscriptions fully agree with the literary evidence which bears witness to the widly spread use of writing during the 5th century B.C. and perhaps even during the sixth. The character of the Ashoka edicts, which have to be considered first, prove very clearly that writing was no recent invention in the 3rd century B.C'. অশোক লিপির মধ্যে নানাবিধ আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে তিনি বলেছেন, '... writing had had a long history in Asoka's time, and that the alphabet was then in a state of transition (Ibid).'

প্রাচীনকালে এদেশে 'লিখিত পুস্তক' দান করে পুণ্য অর্জনের রীতিটি প্রচলিত ছিল । চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ দেশে ফেরার সময় ২০টি ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন শত শত পুস্তক-পুঁথি । ৭ম শতকে বৌদ্ধ ভিক্ষু পুণ্যোপায় প্রায় দেড় হাজার ভারতীয় পুস্তক নিয়ে চীনে যান । বলা বাহুল্য, এইসব পুস্তকই সাধারণ মানুষ, মঠ বা ভূস্বামীদের নিকট থেকে দানরূপে পাওয়া গিয়েছিল । তাহলে এদেশে লিখিত পুস্তকের সংখ্যা কি কম ছিল ?

আবার অন্যদিকে, আর একদল পণ্ডিত গবেষক এইসব সিদ্ধান্তকে অসার ও ভিত্তিহীন প্রতিপন্ন করতে চান। এঁদের অভিমতগুলি আলোচ্য। এঁদের মতে প্রাক্ অশোক যুগে ভারতে কোন বর্ণমালাই প্রচলিত ছিল না। আর্যরা যে লেখনকৌশল জানতো, সে বিষয়ে কোন জোরালো প্রমাণও পাওয়া যায়নি। তাহলে পাথর বা ঐ ধরণের স্থায়ী আধারে তাদের লেখার নিদর্শন কোথাও পাওয়া যেতই। ৩০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে গ্রীক পরিব্রাজক মেগাস্থিনিস চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সাম্রাজ্য ভ্রমণ করে 'ইণ্ডিকা' গ্রন্থ রচনা করেন (খ্রীঃ পূঃ ৬৩ অব্দে স্টার্বো জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর 'Geography' ১৭ বা ২৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত বা পরিমার্জিত হয়। এখানেই মেগাস্থিনিসের ভ্রমণসাহিত্যের আলোচনা ও উদ্ধৃতি আছে। দ্রঃ 'The Clarical Accounts of India', R. C. Mazumdar, P. 270)। এখানে তিনি ভারতীয়দের লেখনকৌশলের কথা কিছুই বলেন নি ('They have no knowledge of written letters and regulate every single thing from memory.' Ibid.)। ব্রাহ্মী বর্ণমালায় কোন আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্য (Regional Variations) নেই ; যেটুকু আপাতভাবে দেখা যায় (অর্থাৎ একই বর্ণের সামান্য আকারগত পার্থক্য) তা কেবল লিপিলেখক বা খোদাইকারকদের জন্যেই ঘটে গেছে বলে পণ্ডিতদের মত (যেমন অ, জ, র, দ, য, ভ এবং হ এর ক্ষেত্রে)। শাহাবাজগঢ়ী লিপির 'লিখিত', 'লেখপিত' শব্দগুলি এসেছে পারসীক শব্দ 'নিপিস' থেকে, যার অর্থ 'লেখা'। পাণিনির আবির্ভাবকাল নিয়েও সন্দেহ আছে। তিনি গান্ধারের যে সলাতুর এলাকায় বাস করতেন, সেটি ছিল ইরানী হখামনিশীয় রাজাদের অধিকারে। তাই তাঁর 'লিবি' বা 'লিবিকর' ও 'যবনানি' শব্দের সঙ্গে ভারতীয় সম্পর্ক নেই। বুদ্ধের নির্বাণের পর (খ্রীঃ পূঃ ৪৮৩) পালিতে যে সব বৌদ্ধ অনুশাসন মুখে মুখে রচিত হয় সেগুলি লিপিবদ্ধ করা হয় সিংহলরাজ ভট্টগামিনীর রাজত্বকালে (খ্রীঃ পূঃ ২৯)। অশোকের পুত্র ও কন্যা যথাক্রমে মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রা (বা, ভাইবোন) সিংহলে গিয়েছিলেন বুদ্ধের বাণী স্মৃতিতে নিয়েই, লিখিতভাবে নয় ('The origin of Brahmi Script', P. 50. Note No. 57.)। ধর্মসূত্রের রচনা হয় অশোক পরবর্তীকাল। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' রচিত হয় খ্রীষ্টজন্মের পর। অর্থশাস্ত্রে ৬৩টি বর্ণের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু অশোক ব্রাহ্মীতে আছে ৪৬টি বর্ণ। বৈদিকযুগ থেকে প্রথম বৌদ্ধযুগ পর্যন্ত সময়কালে ভারতে 'মৌখিক শিক্ষাদান' (Oral teaching and transmission of texts from one generation to another) পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। 'অঙ্গুত্তর নিকায়' (২.১৪৭) অনুযায়ী মঠবাসী ভিক্ষুরা শ্রুতির মাধ্যমে শেখা ধর্মতত্ত্ব স্মৃতিতেই ধরে রাখতো। বেদও সেইভাবে শিষ্য পরম্পরায় মনে রাখা হোত বলে তা 'শ্রুতি'। মুখস্থবিদ্যার মাধ্যমে বৈদিক সাহিত্যে শিক্ষিত আর্য 'বহুশ্রুত' নামে পরিচিত হোত। দেবী সরস্বতী বৈদিক যুগে ছিলেন 'বাগ্দেবী' (Goddes of Speech)। লেখার দেবী নন। ডি. এস. ধানিয়ার মতে, সংস্কৃত ভাষার জননী 'বাণ' দেবী। সিন্ধু লিপিগুলি তাঁর মতে 'বাণী' লিপিতে লেখা (দ্রঃ 'Unlocking the Harappan mystry', S. K. Soni, The Statesman, 4.11.2000. 'The Harappan Riddle', Swami Mukhyanandaji. The Sunday Statesman, 17.12.2000.)। এই সব লেখায় ভারতীয় সভ্যতার গোড়াপত্তনে দ্রাবিড় সংস্কৃতির অবদানকে অনেকাংশে উপেক্ষা করা হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলিতে খোদিতলিপি বিষয়ক পণ্ডিতী অভিমত, যেমন 'এরণ' মুদ্রার 'স' এর প্রাচীনত্ব বিষয়ে বুলারের অভিমত খণ্ডিত হয়েছে। কারণ অনুরূপ 'স' দেখা যাচ্ছে অশোকের গির্নার, কালসী, ব্রহ্মগিরি, সিদ্ধপুর ও জটিঙ্গরামেশ্বর লিপিতে। খ্রীঃ পূঃ ২য় অব্দে ভারতে, গ্রীক প্রভাবে লিপিযুক্ত মুদ্রা প্রচলিত হয়। মৌর্যসম্রাটরাও লিপিযুক্ত মুদ্রা প্রচলন করেন নি। তাঁদের মুদ্রা ছিল বিভিন্ন চিহ্ন খোদিত। তাহলে তক্ষশিলা থেকে প্রাপ্ত মুদ্রা ও তার লিপির প্রাচীনত্ব সম্পর্কেও প্রশ্ন থেকে যায় (অন্ততঃ এইসব পণ্ডিতদের মতে)।

পিপরহা পাত্র-লিপিটিকে বুলার, ফ্লিট, ওঝা, স্মিথ, পাণ্ডে প্রমুখগণ প্রাক-অশোক বলে সিদ্ধান্ত করলেও, এর মধ্যে প্রাচীন লিপি বৈশিষ্ট্য না থাকায় এবং এটি খোদাই না করে দাগ (Scratching) টেনে লেখা হওয়ায় একে 'প্রাক মৌর্য' বলতে চান না টি. পি. বর্মা প্রমুখগণ।

ভারতীয় যাদুঘরে রক্ষিত মহাস্থান প্রস্তরলিপির কয়েকটি বর্ণের সঙ্গে অশোক-ব্রাহ্মী বর্ণমালার সাদৃশ্য দেখে একেও প্রাক-মৌর্য বলা যাচ্ছে না (দ্রঃ 'Select Inscriptions', D. C. Sircar; 'The paleography of Brahmi script in North India', T. P. Verma)। বরং একে অশোক বা তাঁর কোন অজ্ঞাত উত্তরাধিকারী শাসক প্রদত্ত নির্দেশ বলা যায়। সোহগৌড়া ব্রোঞ্জলিপির সম্পর্কেও অনুরূপ অভিমত প্রকাশিত। বরলি শিলালিপির 'বীরায় ভগবতে চতুরাসিতি বষে'('ভগবান মহাবীরের নির্বাণলাভের ৮৪তম বর্ষে') বাক্যটির অর্থ করে এটি (৫২৭—৮৪=৪৪৩ খ্রীঃ পূঃ) ৪৪৩ খ্রীঃ পূর্ব কালের বলে এর আগে নির্দেশিত হলেও, সাল তারিখের এহেন উল্লেখ এদেশীয় কোন সুপ্রাচীন লিপিতে দেখা যায় না বলে এটিকেও প্রাক্‌মৌর্য লিপিনিদর্শন বলতে চান না ডি. সি. সরকার, এ. এইচ. দানি এবং টি. পি. বর্মা। ভট্টিপ্রলু স্তূপের পাত্রলিপির ক, খ, ছ, ন, ত, থ, দ, ধ, প, ফ, ব, য, র, ভ, স ও হ বর্ণগুলির সঙ্গে অশোক-ব্রাহ্মীর দক্ষিণাঞ্চলীয় (Southern Variety) বর্ণমালার সাদৃশ্য দেখা যায়। একে প্রচলিত ব্রাহ্মীর রূপ বলেও অনেকেই নির্দেশ করতে চান না। সুতরাং এটি অশোক পরবর্তী ২য় বা ১ম খ্রীঃ পূঃ কালের বলে মনে করা হয়েছে (ডি. সি. সরকার ও সি. এস. উপাসক)।

সুতরাং অশোকপূর্ব যুগে ভারতে লেখনপদ্ধতির প্রচলন ছিল বলে যে সিদ্ধান্ত বুলার প্রমুখ পণ্ডিতরা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তা অনেকেই অসার বলে প্রতিপন্ন করেছেন।

তবে, প্রাক-অশোক বৈদিক যুগে লিখন প্রক্রিয়া ছিল কী না বা কেমন ছিল, তা নিয়ে কোন সিদ্ধান্ত আজও স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত না হলেও একথা যথার্থ, অশোক যে পরিচ্ছন্ন বর্ণমালা তৈরী করলেন - তা পূর্বে প্রচলিত কোন বর্ণমালার সূত্রেই। এটি কোন আকস্মিক ঘটনা নয়।

ব্রাহ্মী লিপি ঃ খ্রীঃ পূঃ ৫ম/৪র্থ খ্রীষ্টীয় ৫ম/৬ষ্ঠ শতক

কিন্তু, যতই তর্কবিতর্ক 'ব্রাহ্মী' নিয়ে হোক না কেন, প্রাক-অশোকযুগে ভারতে কোন লিপি বা লেখনকৌশল ছিল না, একথা একবাক্যে মেনে নেওয়া যাবে না। বিশাল বৈদিক সাহিত্য স্তোত্রগুলির বিশুদ্ধতা, বিপুল বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মশাস্ত্র সবই, লিপিবিহীন অবস্থায় কেবল স্মৃতি আর উচ্চারণ কীভাবে ধরে রাখা সম্ভব তা ভাববার বিষয়। এটা ঠিকই যে মৌর্য সম্রাট অশোক দীর্ঘদিন (খ্রীঃ পূঃ ২৭২-২৩১) রাজত্ব করেন এবং এই সময়কালে এতগুলি প্রস্তরলিপি স্তম্ভলিপি

বা উৎসর্গলিপি উৎকীর্ণ করার জন্যে তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের এবং বাইরের খ্যাতনামা শিল্পী-খোদাইকারদের নিয়োগ করেন, বর্ণমালাগুলিকে সহজ করে তোলেন। কিন্তু সিন্ধুলিপির পর একেবারে অশোকব্রাহ্মীর আবির্ভাব। মাঝে প্রায় পনরটি শতাব্দীকাল লিপিবিহীন আর্যসভ্যতা টিকে থাকল কীভাবে ? এ প্রশ্ন কি নিতান্তই অবান্তর ?

ব্রাহ্মী বর্ণমালার উদ্ভব সম্পর্কে 'নানা মুনির নানা মত'। একদল পণ্ডিত বলেন এটি বিদেশীয় প্রভাবে সৃষ্টি। জেম্‌স প্রিন্সেপ, ওটফ্রিড মুলার, এমিলি সেনার্টের মতে এটি গ্রীক বর্ণমালার অবদান। আরামীয় বর্ণ থেকে এটি এসেছে বলে হেলভির মত। তিনি বলেন খরোষ্ঠী ও গ্রীকবর্ণমালাও এর সঙ্গে মিশে আছে। ডিকে, আইজাকটেলর ও রিজ ডেভিড্‌স বলেন, আসিরীয় এবং উত্তর ও দক্ষিণ সেমিটিক কিউনিফর্ম ব্রাহ্মীর পূর্বপুরুষ। ওয়েবার, বেনফি, জেনসন প্রমুখ বলেন, প্রাচীন ফিনিসীয় বর্ণমালা কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে ব্রাহ্মীর রূপ ধারণ করেছে। বুলারের মতে উঃ সেমিটিক বর্ণমালা থেকে ব্রাহ্মীর ২২টি বর্ণ এসেছে। উত্তর সেমিটিক বর্ণমালার 'আলেফ', 'জিমেল', 'জেন', 'টেথ', 'পে', 'কোফ', 'রেস' থেকে যথাক্রমে অ, গ, ম, প, ক, র, বর্ণগুলির আবির্ভাব।

ব্রাহ্মীর উদ্ভবে দেশীয় অভিমতের প্রদাতারা বৈদিক ও দ্রাবিড় সম্প্রদায়ের ঋণ স্বীকারের পক্ষপাতী। কানিংহাম বলেন, প্রাত্যহিক জীবনের নানাবিধ বিষয়ের প্রতীককে অনুসরণ করে ব্রাহ্মীর উদ্ভব সেই বৈদিক যুগে (যেমন 'বীণা' থেকে 'ব'; 'তাল', 'তরঙ্গ' ও 'ত্রি' থেকে 'ত' ইত্যাদি)। এডওয়ার্ড টমসনের মতে, দ্রাবিড়রা ব্রাহ্মীলিপির স্রষ্টা। আর্যরা পরে তা গ্রহণ করে। টি. এন. সুব্রাহ্মণ্যমের মতে দক্ষিণভারতীয় তামিল ভাষার জন্যে দ্রাবিড়রা এই লিপি তৈরী করে। পরে প্রাকৃত ভাষা লেখার জন্যে এটি ব্যবহৃত হয়।

যদিও এব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই যে ভারত ও প্রাচীনকালে ভারতের সঙ্গে নানাকারণে সম্পর্কিত দেশগুলির বর্ণমালার জননী ব্রাহ্মী,[৪] তবুও পণ্ডিতী বিতর্কের জটাজালে 'ব্রাহ্মী-ভাগীরথীর' উদ্ভবের ইতিবৃত্ত প্রায় বন্দী হয়েই আছে। সম্প্রতিকালে অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আশুপ্রকাশ্য গবেষণা গ্রন্থ 'এ নিউ থিয়োরী অন্ দি অরিজিন এণ্ড এভোলিউসন অব ব্রাহ্মী আলফাবেট' এ বলতে চেয়েছেন, ভারতীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতরা সংস্কৃত শব্দ ভাণ্ডার থেকেই ব্রাহ্মী বর্ণমালার উদ্ভব ঘটিয়েছিলেন 'এক্রোফনী' তত্ত্বের প্রয়োগ ঘটিয়ে। চিত্রলিপি উচ্চারণের সময়ে, যে প্রথম ধ্বনিটি উচ্চারিত হয় সেটিকেই 'ধ্বনিমূল্য 'প্রদান করা হয় এই রীতিতে। যেমন 'অক্ষি' চিত্রলিপি থেকে অ, 'কর্তন' থেকে 'ক', 'খগোল' থেকে 'খ', 'গগন' থেকে 'গ','জলম্' থেকে 'জ', 'দুন্দুভ' থেকে 'দ', 'ঢক্ক' থেকে 'ঢ' ইত্যাদি। তাঁর মতে ব্রাহ্মীর উদ্ভব ঘটেছিল খ্রীঃ পূঃ ১০০০ অব্দে। এর পূর্ণরূপ গড়ে ওঠে অশোকের সময় অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ৩য় অব্দে। সিন্ধুলিপির কয়েকটি প্রতীকের সঙ্গে ব্রাহ্মীর কোন কোনটির সাদৃশ্য আছে। শেষ পর্বে কয়েকটি ব্রাহ্মী বর্ণমালার সৃষ্টির জন্যে সেমিটিক বর্ণমালার সাহায্য নিতে তাঁরা বাধ্য হন। অর্থাৎ শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, ব্রাহ্মীলিপির উদ্ভব ভারতের মাটিতেই ভারতীয় পণ্ডিতদের দ্বারা সম্ভব হয়েছে, কোন বিদেশী প্রভাবে নয়। আলোচ্য গ্রন্থখানি প্রকাশিত হলে বিশ্বের পণ্ডিতমহলের অনেক ভ্রান্তির অবসান ঘটবে।

একথা যথার্থ যে অশোকের ব্রাহ্মীলিপিগুলির মধ্যে দিয়ে বৌদ্ধ সঙ্ঘারামগুলির পারস্পরিক অনৈক্য দূর করা, মানুষে মানুষে ভ্রাতৃভাব গড়ে তোলা, প্রতিবেশী দেশ ও মানুষের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা এবং মানুষকে নৈতিক শিক্ষা দানের উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করতে চাওয়া হয়েছে। কিন্তু তিনি (অশোক) এই বিশুদ্ধ বর্ণমালা হঠাৎ সৃষ্টি করেছেন, তা মনে হয় না। মেগাস্থিনিসের কথা এহবাহ্য। কারণ তাঁর গ্রন্থের 'মূল' অংশই পাওয়া যায় নি। যা পাওয়া গেছে তা 'পরের মুখে ঝাল খাওয়ার' ঘটনা। তাই তাঁর সাক্ষ্যকে আমরা তত গুরুত্ব দিতে চাচ্ছি না। আবার গ্রীক বা অপর কোন অভারতীয় বর্ণমালা ব্রাহ্মীর উদ্ভবে সীমিত ক্ষেত্রে হলেও কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছে, একথাও ঐতিহাসিক দিক থেকে গ্রাহ্য।

ব্রাহ্মীর ওপর গ্রীক বর্ণমালার কিঞ্চিৎ প্রভাব স্বাভাবিক। কারণ মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য গ্রীক সেনাপতি সেলুকাসের কন্যাকে বিবাহ করেন। এঁদের পুত্র বিন্দুসার রাজা হয়ে গ্রীক শাসকদের নিকট যে রাজকীয় বার্তা প্রেরণ করেন তা হয় গ্রীক অথবা কোন উদ্ভাবিত বর্ণমালাতে ছিল। ইতিহাস সূত্রে জানা গেছে, হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক তিব্বত রাজ স্রংসান-গাম-পো (মৃত্যু ৬৫০ খ্রীঃ) স্বদেশে ধর্মসংস্থাপনের জন্যে লিখন পদ্ধতির খোঁজে ১৬ জন সঙ্গীসহ থন্-মি-সম্ভোতকে কাশ্মীর বা মগধে প্রেরণ করেন। উপহারস্বরূপ তিনি এদের সঙ্গে প্রচুর সোনা দিয়েছিলেন। সম্ভোত ও তাঁর সঙ্গীরা সংস্কৃত ভাষা, বৌদ্ধধর্মীয় অনুশাসন এবং ভারতীয় লিপিমালা বিষয়ে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করে তিব্বতে ফিরে যান এবং তাঁরাই তিব্বতে বর্ণমালা সৃষ্টি করেন। দেশের বুদ্ধিমান মানুষেরা সেই বর্ণমালা শিখে পরে মানুষকে তা শেখান। সিংহাসনে আরোহণ করে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য অনুরূপভাবে দেশ বিদেশের বর্ণমালার নিদর্শন সংগ্রহ করে তা থেকে প্রাক ব্রাহ্মী কোন বর্ণমালা সৃষ্টি করে থাকবেন। পরে তৎপুত্র বিন্দুসার সেই কাজে আরো কিছুটা সহায়তা করে যেতে পারেন। অনুরূপ উদ্যোগ করে যেতে পারেন বিন্দুসার পুত্র সম্রাট অশোকও। অবশ্য এ বিষয়ে শেষ কথা আজও জানা নেই।

ভগবান বুদ্ধের নির্বাণ-বর্ষে ৫০০ জন বৌদ্ধভিক্ষু 'কাশ্যপের' নেতৃত্বে রাজগৃহের সপ্তপর্ণ গুহায় সমবেত হন। সেখানে উপলি নামক এক ভিক্ষু 'বিনয়পিটক' বা বুদ্ধের উপদেশ আবৃত্তি করেন ('Bharatiya Prachina Lipimala' G. H. Ojha, New Delhi, 1993.)। সমবেত বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা বুদ্ধদেবের এই উপদেশাবলী নথিবদ্ধ করতে চান। এজন্যে তাঁদের কাছে কোন একটি বর্ণমালা খুবই জরুরী হয়ে পড়েছিল। আর্য-ব্রাহ্মণদের বর্ণমালা গ্রহণ না করে কোন সহজ সরল বর্ণমালাই তাঁরা উদ্ভাবন করে থাকবেন। সেই বর্ণমালাটি মৌর্য শাসকদের ব্যবহৃত বর্ণমালা হতে পারে। অবশ্য তারও আগে, নন্দবংশীয় শাসকরাও বর্ণমালা নিয়ে কিছু ভাবেন নি, তাই বা বলা যাবে কীভাবে? ভাষা আর লেখালেখি ছাড়া রাজ্যশাসন, সভ্যতা-সংস্কৃতির কোন পরিচয় কি হতে পারে?

সুতরাং প্রাক-অশোকব্রাহ্মী বর্ণমালার ওপর সিন্ধু লিপি, গ্রীক, অন্যান্য দ্রাবিড়ী প্রতীকধর্মী লিপি (?) ইত্যাদির প্রভাব পড়েছে বিভিন্নভাবে। সেই বর্ণমালা অশোকের সময়ে একটি বিজ্ঞানসম্মতরূপ লাভ করে। অশোক, সংস্কৃত ব্যাকরণে পণ্ডিত মানুষদের সহায়তায় পরিচ্ছন্ন ব্রাহ্মী বর্ণমালার উদ্ভাবন ঘটান। তাঁর সাম্রাজ্যে অল্প সংখ্যক মানুষ লেখাপড়া জানতো। তাদের

জন্যে এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্যে তিনি দীর্ঘস্থায়ী ও পুরুষানুক্রমে ('চিলম থিতিক চ হোতু') পাঠ্য শিলালিপিগুলি খোদাই করান ('পুত্র পোত চ প্রপোত্র চ অনুবতরম ')। ধৌলি ও জুনাগড় লিপির সূত্রে বলা যায়, এগুলি ছিল কেবল 'কুমার', 'মহামাত্র' এবং 'রাজপুরুষদের' জন্যে। তাঁরা সাধারণ মানুষকে এগুলি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতেন।

একদিন লেখার কাজ জানা লোকেদের মাধ্যমে আর্যরা নিজেদের ধর্মগ্রন্থগুলি লিখিয়ে নিয়ে থাকবেন। কি ছিল সেই বর্ণমালা, তা অজ্ঞাত। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা তৈরী করেন একধরণের বর্ণমালা, যার মধ্যে (তাঁদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ?) সিন্ধুসভ্যতার দ্রাবিড়লিপি এবং আর্যলিপির কিছু প্রভাব পড়ে গিয়ে থাকবে। পুনরায় উল্লেখ্য, দেশী ও বিদেশী বহুবিধ উপকরণ নিয়েই (সিন্ধুলিপি, গ্রীক-ফিনিসীয়-আসিরীয়-উত্তর ও দক্ষিণ সেমিটিক বর্ণমালা, বৈদিক ও অপর কোন দ্রাবিড়লিপি) সম্রাট অশোকের কালে সরল ব্রাহ্মী বর্ণমালার উদ্ভব ঘটান ভারতীয় পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞরাই। খোদাই কাজের জন্যে অশোক পারস্য-ইরাক-ইরান থেকে শিল্পীদের আনিয়ে থাকবেন। ব্রহ্মগিরি সিদ্ধপুর লিপিতে 'খোদিত চপডেন' তেমনি এক লিপিকর বা শিল্পী। পণ্ডিত এ. এইচ. দানির উক্তি এখানে প্রাসঙ্গিক হবে ঃ-

"Whatever may be the particular source of inspiration, Brahmi is a creation of the Indian Pandits..........The original construction as seen in Asokan Brahmi still preserves the true alphabetic nature of the writing, and thus, despite innovations, Brahmi falls within the general class influenced or inspired by semitic." [('Indian paleography', Ahmed Hasan Dani, New Delhi, 1997, P. 30.) । এ বিষয়ে Encyclopaedia Britannica র ঘোষণা 'The Aramaic Alphabet was probabily the prototype of the Brahmi Script of India, the Ancestor of all Indian scripts. The transmission probably took place in the 7th century B.C.' (15th Edn. 1989, Vol. 29, P. 1065).].

খ্রীঃ পূঃ ৫ম বা ৪র্থ শতাব্দী থেকে খ্রীঃ ৫ম বা ৬ষ্ঠ শতক পর্যন্ত প্রায় সাত-আটশো বছর কাল ধরে (মৌর্য, কুষাণ, সাতবাহন, ইক্ষ্বাকু ও গুপ্ত রাজবংশ) ভারতে ব্রাহ্মী বর্ণমালা ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। বিভিন্ন রাজবংশের সময়ে এর আকারগত কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটে। ৪র্থ থেকে ৫ম/৬ষ্ঠ শতাব্দীকালে ব্রাহ্মী একধরণের অলঙ্কৃত রূপলাভ করে। যাকে বলা হয় 'গুপ্তব্রাহ্মী'। এর একটি শাখা থেকে পরবর্তীকালে তিব্বতী বর্ণমালার উদ্ভব। ৬ষ্ঠ শতকে গুপ্ত রাজ্যাধিকারের শেষপর্বে (মতান্তরে হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর, গুর্জর প্রতিহার সাম্রাজ্যের উত্থানের সময়।) 'গুপ্ত-ব্রাহ্মী'র পূর্বভারতীয় রূপটি একটি অভিনব রূপ লাভ করে। একে বলা হয় 'সিদ্ধমাতৃকা'[৫]। একসময় সারা ভারতের বিশেষ করে উত্তর, পূর্ব ও মধ্য ভারতের শিক্ষিত মানুষদের যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম হয়ে ওঠে এই বর্ণমালা। এরই একটি রূপ 'কুটিল' [বর্ধমান জেলার গলসী থানার মল্লসারুল থেকে প্রাপ্ত ৬ষ্ঠ শতাব্দীর গোপচন্দ্রের তাম্রশাসন পূর্ব ভারতীয় গুপ্তব্রাহ্মী বা কুটিল লিপির পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত আদি নিদর্শন। নদীয়া জেলার রানাঘাট থানার প্রাচীন বৌদ্ধ প্রভাবিত গ্রাম আনুলিয়া থেকে প্রাপ্ত লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসন (১২শ শঃ) উত্তর-পূর্ব ভারতীয় ব্রাহ্মী বর্ণমালায় খোদিত।]। কুটিল থেকে একদিন বাংলা, অসমীয়া, নেওয়ারী, ওড়িয়া ও

মৈথিলী বর্ণমালার উদ্ভব ঘটল । সময়কাল ১০ম-১১শ শতাব্দী ।

অশোক-ব্রাহ্মী ঃ খ্রীঃ পূঃ ৩য় অব্দ

খ্রীঃ পূঃ ২৭২-খ্রীঃ পূঃ ২৩১ অব্দ পর্যন্ত সময়কাল শ্রেষ্ঠতম মৌর্যসম্রাট অশোক মগধের সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন । সুদীর্ঘ চারটি দশকের শাসনকালে তিনি যে এক কল্যাণকারী শাসকরূপে প্রজাদের নানাবিধ সুখ সুবিধের ব্যবস্থা করেন, সে বিষয়ে বহুবিধ প্রমাণ পাওয়া গেছে । কলিঙ্গ বিজয় তাঁকে এক নতুন জগতের সন্ধান দিয়েছিল । যুদ্ধের রক্তাক্ত পরিণতি তাঁকে যুদ্ধজয়ের সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা থেকে সরিয়ে নিয়ে আসে ধর্মবিজয়ের পথে (Rock Edict XIII.) । তারই কালজয়ী ফলশ্রুতির অন্যতম হল নিজেকে 'দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দর্শী' ঘোষণা করে তিনি বিশাল সাম্রাজ্যের নানাস্থানে ৮টি বড় আকারের শিলালিপি (Rock Edict), ৫টি স্তম্ভলিপি (Pillar Edicts), ৬টি ক্ষুদ্রাকার স্তম্ভলিপি (Minor pillar dedication), ১২টি ক্ষুদ্রাকার শিলালিপি (Minor pillar inscription) স্থাপন করেন । মধ্যভারতীয় আর্যভাষা ও ভারতীয় লিপিমালার সর্বপ্রাচীন এবং বিশুদ্ধ নিদর্শনস্বরূপ এই লিপিগুলি ছড়িয়ে আছে মহারাষ্ট্র, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশা, তামিলনাড়ু, দিল্লী, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, কর্ণাটক, নেপাল এবং পশ্চিম পাকিস্তানের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ।

লিপিগুলি শিলাস্তম্ভ ('শিলাস্তম্ভ') এবং শিলাখণ্ডে ('শিলাফলক') খোদিত । স্তম্ভগুলি 'চুণার বেলেপাথরে' তৈরী মসৃণ । এগুলি বেশীরভাগই গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চলে স্থাপিত । নদীপথে বা গোশকটে এগুলি বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে । আর, যেখানে যেমন পাহাড়-পর্বত পাওয়া গেছে সেখানে খোদিত হয়েছে বড় ও ছোট আকারের শিলালিপিগুলি । এগুলি মসৃণ করা হয় নি । 'লিপিকর' বা 'দিপিকররা' (পারসিক বা হখামনিসীয় 'দিপি' থেকে উদ্ভুত । শাহবাজগড়ী লিপিতে 'নিপিসিতম্' বা 'নিপেসিতম্' অর্থে 'লেখা।' বুলারের মতে সরকারী আদেশ লেখক বা 'করণিক' দের বোঝানো হয়েছে ।) লিপিটি রচনা করতো । এরা খড়ি, কাঠকয়লা, লাল লৌহ আকরিক দিয়ে লেখার কাজ করতো ('Indian Paleography' Dani,1997, P. 33.) । খোদাইকাররা তা দেখে খোদাইয়ের কাজ করতো ('ছিন্দতি') । এরা বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে খোদাই করতো ('....Knowledge of writing travelled along the imperial routes, and that the imperial scribes were the carriers of Asokan Brahmi to the distant parts of the Empire', Dani, P. 35) । খোদাইয়ের কাজ যে কত সুন্দর হয়েছিল, এই লিপিগুলিই তার দৃষ্টান্ত । বাদপড়া বর্ণ পরে বসানো হয়েছে । ভুল বর্ণ ঘষে দেওয়া হয়েছে । কোন কোন বর্ণের দু'তিন রকমের অবয়ব দেখা যায়, তা লিপিকর বা খোদাইকারদের অসতর্কতার জন্যেই ঘটেছে বলে মনে করা হয় (অশোকলিপিতে আঞ্চলিক 'বর্ণবৈশিষ্ট্য' নিয়ে নানা বিতর্ক আছে । বুলারের সমর্থকরা এটি মানেন । অন্যরা অস্বীকার করেন ।) ।

অশোকের শিলালিপিগুলি ড. সুকুমার সেনের মতে 'প্রাকৃত ভাষায়' (চারটি প্রধান উপভাষা), ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে 'পূর্ব প্রাচ্য' ভাষায়, এবং ব্রাহ্মী বর্ণমালায় খোদিত । কেবল দুটি শিলালিপি 'শাহাবাজগঢ়ী' ও 'মানসেহ্‌রা' [পশ্চিম পাকিস্তানের পেশোয়ার

জেলায় 'শাহ্‌বাজগঢ়ী' ও হজারা জেলায় 'মানসেহ্‌রা' অবস্থিত । প্রথমোক্ত স্থানে ২৪ ফুট দীর্ঘ, ১০ফুট উঁচু এক আগ্নেয় শিলাখণ্ডের একদিকে এগারটি ও অন্যদিকে দুটি লিপি খোদিত ।.অদূরে আর একটিক্ষুদ্র শিলায় অপর একটি লিপি খোদিত । শেষোক্ত স্থানে তিনটি অনুরূপ শিলাখণ্ডে তেরটি শিলালিপি খোদিত । উভয় স্থানেই শিলাখণ্ডগুলি পাহাড়ের নিকটে স্থিত ।] । ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে প্রচলিত খরোষ্ঠী লিপিতে (এগুলি প্রাকৃতের উত্তরপশ্চিমা উপভাষায় রচিত ।) খোদিত । অশোক-ব্রাহ্মীতে দেখা গেছে অ, ই, উ, আ, এ, ও, এই ছ'টি স্বরবর্ণ ; ক, খ, গ, ঘ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম, য,র, ল, ব, শ, ষ, স, হ, ড় এই ৩৩টি ব্যঞ্জনবর্ণ এবং কয়েকটি যুক্তাক্ষর (যেমন, ম-ফলা, ব-ফলা, র-ফলা, স-যোগ, ত-যোগ, স্প, স্ম, ক্ষ, হ-যোগ) ও বিন্দুর মতো 'অনুস্বার' ব্যবহৃত হয়েচে বর্ণের দক্ষিণ-শীর্ষে, মাঝে, দু একটি জায়গায় দক্ষিণ-নিম্নভাগে । জৌগড় লিপিতে আছে তিনটি স্বস্তিক চিহ্ন ও তিনটি মাঙ্গলিক বর্ণ-প্রতীক ('ম' বা 'মং' । বোধ হয় 'মঙ্গলম' বোঝাতে) । কালসী শিলালিপি (১১-১৪) তে ছেদচিহ্নরূপে দণ্ড বা দাঁড়ি ব্যবহৃত হয়েছে । অন্যান্য ক্ষেত্রেও বাক্যের শেষে দণ্ড ব্যবহৃত ।

লিপিবিজ্ঞানী বুলার, অশোক ও তাঁর পরবর্তী কয়েকটি শতাব্দীর (খ্রীঃ পূঃ ৩০০-১৫০) ব্রাহ্মী (মৌর্য) লিপিকে ১) প্রাচীন ব্রাহ্মী (উত্তরাঞ্চলীয় ও দক্ষিণাঞ্চলীয়) ও ২)পরবর্তী ব্রাহ্মী-এ দু'ভাগে ভাগ করেছেন । 'উত্তরাঞ্চলী'য় ব্রাহ্মীকে তিনি 'উত্তর পূর্বাঞ্চলীয়' (এলাহাবাদ, রাধিয়া, মাথিয়া, রামপূর্বা, নিগলিবা, পড়োরিয়া ও সারনাথ), 'উত্তর মধ্যাঞ্চলীয়' (বৈরট, সাসারাম, সাঁচী, দিল্লী, বরাবর গুহালিপি), 'উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয়' (কালসী) -এই তিন ভাগে ভাগ করেছেন। 'দক্ষিণাঞ্চলীয়' ব্রাহ্মী থেকে দক্ষিণ ভারতীয় বর্ণমালার উদ্ভব । 'পরবর্তী ব্রাহ্মী'র (Younger Mourya Alphabet) কয়েকটি দৃষ্টান্ত হল অশোকপৌত্র রাজা দশরথের[৬] বিহারের গয়া জেলার নাগার্জুনী গুহালিপি (খ্রীঃ পূঃ ২০০), ভারহুত তোরণ, প্রাচীরস্তম্ভ ও প্রবেশপথের লিপি, ভুবনেশ্বরের 'হাথিগুম্ফা' লিপি (খ্রীঃ পূঃ ২য় শঃ), বুদ্ধগয়ার মন্দিরের প্রাচীরস্তম্ভলিপি (খ্রীঃ পূঃ ১৫০) ইত্যাদি [এ. এইচ. দানির মতে নাগার্জুনী লিপি ১ম শতকের মাঝামাঝি, রামগড় ও মহাস্থান লিপি খ্রীঃ পূঃ ২য় শতকের প্রথমার্ধ, ভারহুত খ্রীঃ পূঃ ১ম শতকের দ্বিতীয়ার্ধ, হাথিগুম্ফা ১ম শতকের প্রথমার্ধ, পিপরহা খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতক, এবং শোহ্‌গৌড়া তাম্রশাসন খ্রীঃ পূঃ ২য় অব্দের প্রথমার্ধ সময়কার (দ্রঃ 'Indian paleography, P. 50-59')] ।

অশোক অনুশাসনের সমসাময়িক একটি প্রাচীন ব্রাহ্মী লিপি, মধ্যপ্রদেশের সরগুজা রাজ্যের (তাৎকালিক) রামগড় পাহাড়ের যোগীমারা গুহার 'সুতনুকা লিপি' । এটি খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতকের এবং আর্যভারতে প্রচলিত উপভাষার বিশিষ্ট নিদর্শন ।[৭] লিপিটি হলঃ 'শুতনুক নম দেবদিশিক্য/তং কময়িথ বলন শেয়ে/ দেবদিনে নম লুপদখে ।' অর্থাৎ 'সুতনুকা' নামে দেবদাসী। তাকে কামনা করেছিল বারাণসীবাসী (?) দেবদিন্ন নামে রূপদক্ষ।' প্রাচ্যা ভাষার এই লিপিটিতে 'র' স্থানে 'ল' এবং 'স' ও 'ষ' স্থানে 'শ' এর অবস্থান দেখা যায়, যা অশোক অনুশাসনের প্রাচ্যায় নেই ।

'মৌর্য-ব্রাহ্মী' বা 'অশোক ব্রাহ্মীতে' স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণে কোন মাত্রা (Serif) নেই ।

মাত্রা যোগ হয়েছে পরে কুষাণযুগে। বর্ণগুলি একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নানাধরণের দাগের সাহায্যে (vertical, horizontal strocks)। এগুলির মধ্যে তেমন কোন বক্রতাও দেখা যায় না। ব্যঞ্জনবর্ণে স্বরবর্ণের চিহ্ন (Medial vowel form) সংযোগের কেবল আনুভূমিক বা উল্লম্ব স্পষ্ট রেখা জুড়ে দেওয়া হয়েছে এইভাবে ঃ আকারের ক্ষেত্রে বর্ণের ওপরে ডানদিকে, ইকারের ক্ষেত্রে আকারের ডানদিকে চুড়োর মতো করে, উকারের ক্ষেত্রে বর্ণের নীচে ডানদিকে, একারে ওপরের বামদিকে।

খরোষ্ঠী ঃ খ্রীঃ পূঃ ৫ম → খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতক

ব্রাহ্মীলিপির সমসাময়িক প্রাচীন ভারতের এক বর্ণমালা 'খরোষ্ঠী' বা 'খরোষ্ঠী'। চীনা বিশ্বকোষ 'ফা-ওয়ান-সু-লিন', বৌদ্ধগ্রন্থ 'ললিতবিস্তর'এর ১০ম অধ্যায় ও 'মহাবস্তু অবদানের' ৭ম ভূমিতে এই বর্ণমালার উল্লেখ আছে। এটি ডানদিক থেকে বামদিকে পাঠ্য। কানিংহামের মতে, ব্যাকট্রীয় গ্রীক শাসকদের মুদ্রায় এটি প্রথম দেখা যায়। ভারতের সঙ্গে ঐ শাসকদের সম্পর্ক ছিল। এটি 'ইন্দো ব্যাকট্রীয়' বর্ণমালা ('Coins of Ancient India')। গান্ধার অঞ্চলে প্রচলিত ছিল বলে এটি 'গান্ধারী', কাবুলের নাম থেকে এটি 'কাবুলিয়' নামে পরিচিত। এর নামকরণ নিয়ে নানা মত। যেমন উত্তরপশ্চিম ভারতে 'খরোষ্ট'[৮] নামক রাজ্যের নাম থেকেই এরূপ নাম '(সিলভ্যা লেভিঁ)'; 'সেমীয় লিপি থেকে উদ্ভূত (সুকুমার সেন)'[৯] 'খ্রীঃ পূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে আরামীয় ও প্রাকৃত ভাষার বাহন স্বরূপ এই লিপির সৃষ্টি হয় ব্রাহ্মীর প্রভাবে; এর উদ্ভবক্ষেত্র হখামনীশীয় সাম্রাজ্যের (Achaemenid) ভারতীয় প্রদেশ সমূহ (ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়)';[১০] 'খরোষ্ঠ' নামক এক ঋষি এটি আবিষ্কার করেন (অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ)। আলফ্রেড উল্‌নার বলেছেন, "This cursive script written from right to left is certainly Semitic in origin. being derived from the Aramaic script which was used by the clerks of Darius the Great for ordinary work as distinct from the monumental cuneiform in which the great King recorded the achievements of his reign, highup on the rock of Behistun ('Ashoka . Text And Glossary', 1993, P. XVIII)." 'খর' শব্দের অর্থ গর্দভ। এই লিপি গর্দভের ওষ্ঠের সঙ্গে তুল্য। ইরানীয় শব্দ 'খরপোস্ত' অর্থে গর্দভের চামড়া। মধ্য এশিয়া থেকে যে সব প্রাচীন খরোষ্ঠী লিপির সন্ধান পণ্ডিতেরা দিয়েছেন, সেগুলি সবই উট বা গর্দভের চামড়ায় লেখা। আবার 'খর' = সাম্রাজ্যের, ওস্ত = লিপি বা বর্ণমালা। এই বর্ণমালা তাই হয়তো সরকারী বা বাণিজ্যিক কাজকর্মেই ব্যবহৃত হোত। অন্যদিকে, ইরানীয় 'খরোষ্ঠী'র অর্থ 'লিখন'।

এর উদ্ভব সম্পর্কে আইজাক টেলর বলেন, হখামনিশীয় উদ্যোগেই এটির সৃষ্টি। ডিরিঞ্জারের মতে এটি সেমিটিক বর্ণমালার একটি প্রধান শাখা। কানিংহামের মতে, এই অভিনব বর্ণমালা অনেক বেশী সুসংবদ্ধ ভারতীয় বর্ণমালার সঙ্গে সঙ্গে বিকশিত হবার সুযোগ পায়। বুলারের মতে, এটি ছিল জনপ্রিয় বর্ণমালা। স্থানীয় ভাষা লেখার জন্যে সরকারী খোদাই শিল্পীরা এটি সৃষ্টি করে, স্থানীয় ভূস্বামীদের সহযোগিতায়। স্টেন কোনাওয়ের সিদ্ধান্ত অনুসারে ('Corpus Inscription Indicarum') এ. এইচ. দানি বলেন, উত্তরপশ্চিম প্রান্তবর্তী পূর্ব পাঞ্জাব,

আফগানিস্তানের খাবাত্, কান্দাহার, সেইষ্টান, মহেঞ্জোদারো, লাদাখ, বালুচিস্তান ইত্যাদি অঞ্চল জুড়ে এ লিপির প্রচলন ছিল ('Indian Paleography', P. 252.)। এর উদ্ভবক্ষেত্র গান্ধার বা তক্ষশিলা। ১৮৯২ সালে চীনা তুর্কিস্তান থেকে ফরাসী পরিব্রাজক ডেট্রিল-ডি-রাইনস্ যে প্রাকৃত 'ধম্মপদ' উদ্ধার করেন, তা প্রমাণ করে, ঐ অঞ্চলেও খরোষ্ঠী প্রচলিত ছিল। স্থানীয় ভাষার চেয়ে বিশুদ্ধ সংস্কৃত, প্রাকৃত বা বিদেশী ভাষা প্রকাশে এটি অনেকটা সফল হয়েছিল।

লিপিবিজ্ঞানীরা সবদিক বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, প্রাচীন সিরিয় বা আরামীয় লিপিই এর জননী। প্রাচীন গান্ধার-তক্ষশীলা অঞ্চলে এর উদ্ভব ঘটে। খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ বা ৫ম শতাব্দীতে দক্ষিণপশ্চিম ইরানের এখামনিশীয় (Achaemenians) বংশের কুরুষ (খ্রীঃ পূঃ ৫৫৮-৫৩০), দারিউস (খ্রী পূঃ ৫৫২-৪৮৬), ও জারজেক্স্ (খ্রীঃ পূঃ ৪৮৬-৪৬৫) এই তিনজন রাজা বিভিন্ন সময়ে ভারতবর্ষ আক্রমণ করে ভারতের ঐ উত্তরপশ্চিম অঞ্চলে নিজেদের সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। পূর্ব আফগানিস্তান, পশ্চিম পাকিস্তান, কাশ্মীর, পাঞ্জাব ও হরিয়ানা অঞ্চল নিয়ে গড়ে উঠেছিল তাদের সাম্রাজ্য। পরবর্তীকালে এটি গ্রীক, মৌর্য, ইন্দো গ্রীক, শক, পহ্লব ও কুষাণদের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। তাই ঐ অঞ্চলই খরোষ্ঠীর উদ্ভব ও বিকাশ ক্ষেত্র রূপে নির্দেশিত। প্রস্তরলিপি, মাটির ফলক ও পাত্র, মুদ্রা, ভূর্জ ছাল (আফগানিস্তান থেকে প্রাপ্ত খণ্ডিত লিপি এবং খোটান থেকে প্রাপ্ত লিপি), কাঠ ও চামড়ায় লেখা খরোষ্ঠী লিপি পাওয়া গেছে। এতে প্রথমে কোনও দীর্ঘস্বর নেই। পরে সংস্কৃত শব্দ লেখার সময় দীর্ঘস্বর ব্যবহৃত হয়েছে। আরামীয় (সেমিটিক ভাষার পূর্বী উপশাখার অন্তর্গত ভাষা আসীরীয়, আক্কাদীয় বা ব্যাবিলনীয়। পশ্চিমী উপশাখার অন্তর্গত ভাষা কানানিট্, ফিনিসীয় ও আরামীয়।) কফ্, জিমেল, সদি, যয়িন, তোয়া, ডিলেথ, পে, বেথ্ ইত্যাদি বর্ণ থেকে খরোষ্ঠীর যথাক্রমে ক, গ, চ, জ, ত, দ, প, ব, বর্ণগুলি এসেছে। ব্রাহ্মীর সঙ্গে এর নানাধরণের পার্থক্য আছে, বিশেষ করে 'গুণ বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ' প্রয়োগের ক্ষেত্রে।*

সম্রাট অশোকের শাহ্‌বাজগঢ়ী ও মানসেহ্‌রা প্রস্তর অনুশাসনগুলি প্রাকৃতের উত্তর পশ্চিমা উপভাষায় খরোষ্ঠী বর্ণমালায় খোদিত। মনে হয়, তাঁর সাম্রাজ্যের ঐ অঞ্চলটিতে (অবিভক্ত ভারতের উত্তরপশ্চিমাঞ্চল) এই লিপি সাধারণ মানুষের কাছে সহজবোধ্যই ছিল। অর্থাৎ বলা যেতে পারে, অশোকের পূর্বেই এটি ঐসব অঞ্চলে বহুল প্রচলিত বর্ণমালা। সরকারী ও বাণিজ্যিক কাজকর্ম ছাড়াও ব্যক্তিগত লেখালেখি এবং ধর্মীয় লিপি লেখায় এটি ব্যবহৃত হয়েছে।[১১] এটি হয়ে উঠেছিল জনসাধারণের বর্ণমালা।[১২] পরবর্তীকালে দেশী-বিদেশী বণিক বা বৌদ্ধধর্ম প্রচারকরা এই লিপি নানাস্থানে নিয়ে গিয়ে থাকবেন। মথুরা ও পাটনাতেও এর নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে।[১৩]

সম্প্রতি মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার পার্বতীপুর এবং উত্তর ২৪পরগণার চন্দ্রকেতুগড়ের নিকটবর্তী হাদীপুর থেকে পাওয়া গেছে প্রাচীন খরোষ্ঠী লিপির নিদর্শন। ভারতীয়

---

*স্বরধ্বনির রূপান্তর। একার → ওকার, বা হ্রস্ব-দীর্ঘ ক্ষীণতা/লোপ। প্রত্যয় বিভক্তির মূল স্বরধ্বনি প্রথমে অবিকৃত থাকে, এরপর দীর্ঘ হয়, এর পর লুপ্ত বা ক্ষীণ হয়। যেমন, 'যজ্' ধাতু >'যজ্ঞ' (গুণ), > 'যাগ' (বৃদ্ধি), > 'ইষ্টি' (ক্ষীণ, সম্প্রসারিত)।

যাদুঘরেও খরোষ্ঠী লিপি খোদিত মৃৎপাত্র আছে।[১৪] অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মতে (Indian Museum Bulletin, Vol. XXV, 1990) হখামনিশীয় যুগে খরোষ্ঠীর উদ্ভব হলেও অশোকের অনেক আগে থেকেই এই বর্ণমালা ভারতের উত্তর ও উত্তরপশ্চিম অঞ্চলে (এবং পূর্বভারতেও) ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর মতে পাকিস্তান, কাশ্মীর, পাঞ্জাব, হিমাচলপ্রদেশ, পূর্ব আফগানিস্তান, দক্ষিণপূর্ব হিন্দুকুশ এলাকায় ৪র্থ শতাব্দী পর্যন্ত এটি ব্যবহৃত হয়। ভারতের বাইরে এই বর্ণমালা ভারতীয় শাসক, বণিক ও বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারকরা ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে 'Khoroshti indeed became a vehicle for spreading Indian culture in central Asia ... It was indeed a majore script in ancient India (Ibid)'. বৌদ্ধগ্রন্থ 'মহাবস্তু অবদান' (৭ম ভূমি) ও 'ললিতবিস্তরের' (১০ম অধ্যায়) মতো প্রাচীন গ্রন্থে খরোষ্ঠীর উল্লেখ এর বহুল ব্যবহারের পক্ষেই সাক্ষ্য দেয়। ব্যবসা বাণিজ্যের কারণে সমৃদ্ধ তাম্রলিপ্ত, চন্দ্রকেতুগড় ইত্যাদি স্থানে দেশী বিদেশী বণিকরা এই লিপি উত্তর পশ্চিম ভারত থেকে নিয়ে আসে। তবে অনেকে একে ভারতীয় লিপি বলতে চান না। ভারতীয় লিপির সঙ্গে এর তেমন কোন সম্পর্কও নেই। দেখা যাচ্ছে কুষাণযুগেই এর ব্যবহার শেষ হয়ে যায়। ড. দীনেশ চন্দ্র সরকারের মতে মানুষ একদিন এটি ভুলে যায়। একসময় এর স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে।

খরোষ্ঠী-ব্রাহ্মী লিপি

সম্প্রতি দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের নানাস্থান থেকে খরোষ্ঠী লিপির যেসব নিদর্শন পাওয়া গেছে, তার মধ্যে এক ধরণের মিশ্রিত লিপিরও সন্ধান পাওয়া গেছে, যাকে নাম দেওয়া হয়েছে 'খরোষ্ঠী ব্রাহ্মী' বা 'মিশ্র লিপি'। বণিক বা পরিব্রাজকরা নানা সময়ে, নানা উদ্দেশ্যে এটি তৈরী করে থাকবেন নিজেদের অজান্তেই।[১৫] 'ললিতবিস্তরে'র বর্ণমালার তালিকায় কথিত 'মিশ্রিত লিপি' বোধ হয় এটিই। উত্তরবঙ্গের বাণগড় উৎখননে প্রাপ্ত একটি টেরাকোটার ওপর এধরণের লিপির প্রথম সন্ধান পাওয়া যায়। এরপর দক্ষিণ২৪পরগণার চন্দ্রকেতুগড় থেকে পাওয়া যায়। অনুরূপ নিদর্শন। বর্ধমান জেলার পাণ্ডু রাজার ঢিবি থেকেও পাওয়া গেছে এধরণের মিশ্রিত লিপির নিদর্শন (খ্রীঃ ১ম - ৩য় শঃ)। এর মধ্যে 'লিনিয়ার-এ' লিপির ধরণ দেখা গেছে। দক্ষিণ ২৫পরগণার চন্দ্রকেতুগড় ছাড়াও উত্তর ২৪পরগণার হাদিপুর, গাজীতলা, বেড়াচাঁপা; পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক ইত্যাদি স্থান থেকে প্রাপ্ত এইসব মিশ্রিত লিপির বিষয়ে জানা যাচ্ছে। প্রধানতঃ বাণিজ্যিক কারণেই এই বর্ণমালার উদ্ভব ঘটেছে। প্রাক-খ্রীষ্টীয় যুগ থেকেই দক্ষিণ বঙ্গের সমুদ্র ও নদীতীরবর্তী অঞ্চলগুলির সঙ্গে সমুদ্রপথে ব্যবসা বাণিজ্য চলতো দক্ষিণপূর্ব এশিয়া, চীন, শ্রীলঙ্কা, মিশর ছাড়াও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে কথিত 'বঙ্গ' এবং বৈদেশিকদের কাছে 'গঙ্গা' নামে পরিচিত ঐ অঞ্চলটি ছিল নানাদিক থেকে সমৃদ্ধ। তার ফলেই দেশী-বিদেশী বণিকদের আবির্ভাব ঘটে ঐ সব অঞ্চলে। বিদেশীদের অনেকে এদেশে স্থায়ী বাসস্থানও গড়ে তোলে। পূর্ব ভারতের এই দক্ষিণবঙ্গীয় অঞ্চলটির সঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাংস্কৃতিক নিবিড়তার ফলেই পারস্পরিক বর্ণমালা ব্যবহারেও ঘটে যায় সাবলীল 'দেওয়া নেওয়া' ['Their immigrants in Vanga were eco-

nomically and numerically strong enough to continue the use of their script and language and even to introduce a form of mixed script........... In the field of script and language the emigrants from the northwest introduced the Khoroshti Script and North-Western Prakrit in Vanga (including parts of lower West Bengal) and also evolved a 'mixed' script,' B. N. Mukherjee, Indian Museum Bulletin, Vol. XXV, 1990, P. 20] । প্রধানতঃ পোড়ামাটির পাত্র বা পাত্রের ভগ্নাংশের ওপর খোদিত এই লিপিগুলি থেকে দক্ষিণবঙ্গীয় কয়েকটি শতকের সামাজিক ইতিহাসের তথ্যাদি অবগত হওয়া যায়। মিশ্র বর্ণমালার পাশে পাশে দেখা গেছে যূপ, নৌকা, জাহাজ, শস্যের শীষ, শঙ্খ, স্বস্তিক ইত্যাদি প্রতীকধর্মী চিত্রাবলী । বোঝা যাচ্ছে, ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী ঐ অঞ্চলে বহুল ব্যবহৃত বর্ণমালাই ছিল হয়তো ।

কুষাণ-লিপি ঃ খ্রীষ্টীয় ১ম → ৩য় শতক

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর ব্যাকট্রীয় গ্রীক, শক, কুষাণ প্রভৃতি বৈদেশিক জাতিগুলি একে একে ভারতবর্ষ আক্রমণ করে এখানে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে । এদের মধ্যে চীনাতুর্কিস্তানের অধিবাসী, ইউ-চি জাতির এক শাখা এই কুষাণদের রাজত্বকাল এদেশে গুরুত্বপূর্ণ। এই জাতির শক্তিশালী নেতা কুজুল বা কদফিসেস্ ৫০ খ্রীষ্টাব্দে কাবুল ও কান্দাহার দখল করেন। এরপর এঁর পুত্র বিম বা ২য় কদফিসেস্ আসেন কাশ্মীর পর্যন্ত । তার কিছুদিন পরে এলেন কণিষ্ক । ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজধানী পুরুষপুর বা পেশোয়ারের সিংহাসনে বসেন, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী অথচ পর ধর্মের প্রতি সহিষ্ণু এই কণিষ্ক । স্থাপত্য, শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী কণিষ্কের রাজত্বকালেই বৌদ্ধধর্ম হীনযান ও মহাযান-এই দুই শাখায় বিভক্ত হয় । ধর্মীয় বিরোধের অবসানের জন্যে ইনি জলন্ধরে 'চতুর্থ বৌদ্ধসঙ্গীতি'র আয়োজন করেন । অশ্বঘোষ, নাগার্জুন, বসুমিত্র, চরক প্রমুখ কবি-নাট্যকার-দার্শনিক-তাত্ত্বিক ও চিকিৎসাবিদ ব্যক্তিরা তাঁর সভা অলঙ্কৃত করেন এবং মূল্যবান গ্রন্থাদি রচনা করেন । এঁর সময়ে মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে ভারতের নিবিড় বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপিত হয় । 'শকাব্দা' এঁরই প্রবর্তনা বলে মনে করা হয় । এঁর রাজত্বকালে বিভিন্ন শিলালিপিতে বর্ণমালা যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আকার ধারণ করে, তাকে বলা হয় 'কুষাণ ব্রাহ্মী'। ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে কুষাণ লিপিগুলির সময়কাল খ্রীষ্টীয় ১ম-২য় শতাব্দী থেকে।[১৬] বুদ্ধগয়ার সিংহাসন (বজ্রাসন) লিপির স, প ও ম বর্ণগুলির বৈশিষ্ট্য দেখে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এটিকে 'উত্তরভারতীয় কুষাণ লিপির' পূর্বাঞ্চলীয় বৈশিষ্ট্যের প্রাচীনতম নিদর্শন বলেছেন । কুষাণ লিপির সঙ্গে বাংলার ক, চ, ড, ম, দ ও ঢ এবং কয়েকটি যুক্তাক্ষরের সাদৃশ্য দেখা যায় । অশোক ব্রাহ্মী বর্ণে মাত্রা (Serif) ছিল না । কুষাণ ব্রাহ্মীতেই তা প্রথম দেখা গেল। * বর্ণ লেখার সময়, 'বাম থেকে ডানদিকে গিয়ে কিছুটা বেঁকে ওপরে ওঠা'র নিয়ম এখন থেকেই শুরু হল (Curvilinear, Vertically) । 'দক্ষিণ থেকে বামে' লেখা 'খরোষ্ঠী লিপি'ও নানাস্থানে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করে, যেমন খ, গ, য, স, অ, র ।

---

*বর্ণের শীর্ষদেশের মাত্রা । কুষাণ ব্রাহ্মীতে এটি ছিল বিন্দুর আকারে । পরে সেটি ক্ষুদ্র আনুভূমিক রেখার রূপ নেয়। ৪র্থ শতকে তার আকার হয় ক্ষুদ্র ত্রিভুজাকৃতি । এরপর তা ইংরেজী V ও U এর আকার ধারণ করে ।

কুষাণ রাজ কণিষ্কের সময়কার এই লিপিগুলি উল্লেখযোগ্য ঃ-[১৭]
সারনাথ ছত্রলিপি, বুদ্ধমূর্তির লিপি, সাহেত-মাহেত (শ্রাবস্তী) থেকে প্রাপ্ত দুটি বুদ্ধমূর্তির পাদপীঠের লিপি (ভারতীয় যাদুঘর সংগ্রহ), বিহারের রাজগীর থেকে প্রাপ্ত খণ্ডিত ভাস্কর্যের লিপি ও একটি মূর্তির পাদপীঠের লিপি ।

গুপ্ত-ব্রাহ্মী (৪র্থ-৬ষ্ঠ শতাব্দী)

কুষাণপরবর্তী গুপ্তযুগে ব্রাহ্মী লিপিগুলির মধ্যে বুলার তিনধরণের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছেন-
১. ল,শ, স, হ্ বর্ণগুলির বিশেষ রূপলাভ ।
২. টানা হাতের হলেও স্পষ্ট লিপি ।
৩. তির্যক ও কিছুটা দীর্ঘাকার ।
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় গুপ্ত-ব্রাহ্মীর 'উত্তর ভারতীয়' বর্ণমালার মধ্যে 'পূর্বাঞ্চলীয়', 'পশ্চিমাঞ্চলীয়', 'দক্ষিণাঞ্চলীয়' ও 'মধ্যএশীয়' এই চার প্রকার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছেন । বাংলাদেশের প্রাচীনতম শিলালিপি, খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতকের মহাস্থান প্রস্তরলিপি যেন অশোক ব্রাহ্মীর সার্থক পূর্বপুরুষ ।[১৮] পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার ছাতনা থানার শুশুনিয়া পাহাড়ের একটি গুহার দেওয়ালে খোদিত কয়েক ছত্র ব্রাহ্মী লিপির কথা এখানে উল্লেখযোগ্য । গুপ্ত-ব্রাহ্মীর পূর্বাঞ্চলীয় বৈশিষ্ট্যের (Eastern Variety) এই লিপিটি ৪র্থ শতাব্দীর এবং পূর্বভারতে গুপ্তরাজাদের এক প্রাচীনতম লিপি ।[১৯] পুষ্করণারাজ চন্দ্রবর্মণের এই লিপি বিষয়ে দানি বলেছেন, The Susunia inscription shows a monumental style. The engraving is of a high quality. The angular features are conspicuous in the formation of the letters. (Indian Paleography, P. 101-02)' । এই লিপির * গ, চ, ম, স, ব, র-ফলা, ঋ-যোগ, য-ফলা আধুনিক বাংলার দিকে পথ নিয়েছে । বর্ণগুলির শীর্ষে ত্রিভুজাকৃতি মাত্রা আছে । 'ন' বক্রাকৃতি, 'ণ' এর মুখ খোলা, বাঁদিকে বাঁকা রেখা । হুকযুক্ত 'হ' । সরল উল্লম্বাকার 'র' । ত, গ ও স এর ডানদিকের রেখা বামরেখার থেকে দীর্ঘ । আকার বর্ণশীর্ষে যুক্ত । র-ফলা ও ঋ-কার আধুনিক রীতির মত । ই-কার ও এ-কারের পার্থক্য নির্ণয় (শীর্ষেযুক্ত) দুরূহ । উভয়ই বর্ণশীর্ষে বাঁদিকে বক্ররেখাকৃতি ।

অবশ্য এই সঙ্গে. গুপ্তব্রাহ্মী বর্ণমালায় খোদিত ১ম কুমার গুপ্তের ধনাইদহ তাম্রশাসন (৪৩২-৩৩ খ্রীঃ), দামোদরপুর তাম্রশাসন (৪৪৪ খ্রীঃ), বৈগ্রাম তাম্রশাসন (৪৪৯ খ্রীঃ), পাহাড়পুর তাম্রশাসন (৪৭৯ খ্রীঃ), বৈন্যগুপ্তের গুণাইঘর তাম্রশাসন (৫০৭ খ্রীঃ) ইত্যাদির মধ্যে আধুনিক বাংলা বর্ণমালার কোন কোনটিকে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর নয় ।

বিহারের বুদ্ধগয়া থেকে প্রাপ্ত এবং ভারতীয় যাদুঘরে সংরক্ষিত, সংস্কৃত ভাষায় সিদ্ধমাতৃকা (বা কুটিল) বর্ণমালায় খোদিত (যাদুঘর সং ২৫৯৩ । আকার ৪৭ সেমি × ৫০ সেমি) মহানমনের বুদ্ধগয়া শিলালিপিটি (৫৮৮-৮৯ খ্রীঃ), উক্ত সিংহলী বৌদ্ধধর্মপ্রবক্তার

*প্রাক ও উত্তর স্বাধীনতাকালের পণ্ডিতরা নিষ্ঠাসহকারে এর পাঠনির্ণয় করেছেন বলে মনে হয় না । অন্ততঃ অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার, বিনয় ঘোষ ও রবীন্দ্রনাথ সামন্তের বাঁকুড়া বিষয়ক গ্রন্থগুলিতে লিপিটির পাঠভেদ লক্ষ্যনীয় ।

সংঘস্থাপনের ইতিহাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত। বিস্তীর্ণ গাঙ্গেয় উপত্যকায়, পূর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বর্ণমালা লিখনের নতুন রীতি অনুসরণের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে এর বর্ণগুলি। চোদ্দ সারি লিপির মধ্যে ব্যবহৃত বর্ণমালায় এখানে উ, ক, কৃ, গু, চি, টি, ঢ, ন, ফ, মি, ল, ব, ষ, স, স্ক, স্ত বর্ণগুলি আধুনিক বাংলা বর্ণমালার সঙ্গে এতটাই সাদৃশ্যযুক্ত যে মনে হয় এ যেন যথার্থই কোন বাঙালী খোদাইকারক বা রচয়িতার শিল্পকর্ম। কলাগাছ ভক্ষণরতা, শাবকসহ পয়স্বিনী একটি গাভীর চিত্র এখানে খোদিত। লিপির সঙ্গে এর সত্যিই কোন তাত্ত্বিক সম্পর্ক আছে কীনা কে জানে। যাই হোক, বাংলা বর্ণমালার উদভবের ইতিহাসে এই লিপি যে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ তাতে সন্দেহ নেই। এমন কী. ৭ম শতকেরপ্রথম পর্বের, হর্ষবর্ধনের তাম্রশাসনের উ, ক, গ, চ, ধ, ন, ফ, ম, ল, বী, ষ, স সম্পর্কেও প্রায় একই বক্তব্য প্রযোজ্য।

সুতরাং, এইসব অনুশাসনের খোদিত বর্ণমালার মধ্যেই লুকিয়ে ছিল পূর্বভারতীয় বর্ণমালার আদিরূপ। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, "The Bengali alphabet is derived from an Eastern alphabet current in what is now Eastern United provinces, Bihar, Orissa, Bengal and Assam, from the 6th century onwards This Eastern alphabet is a variety of the Gupta Script (400-550 A. D.) which is a sort of cursive development, through the intermediate Kusana writing of the primitive and monumental Brahmi, the mother of all the National Indian Alphabets."[২০]. তিনি অন্যত্র বলেছেন, "উত্তরভারতে ব্রাহ্মী লিপি কুষাণ ও গুপ্তরাজাদের আমলে পরিবর্তিত হইয়া কালক্রমে সম্রাট হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পরে ৭ম শতকে তিনটি বিশিষ্ট রূপ ধারণ করে। এই তিনটি রূপের মধ্যে উত্তরপশ্চিমে(কাশ্মীর ও পাঞ্জাব) প্রচলিত রূপেব নাম 'শারদা', দক্ষিণপশ্চিমে (রাজস্থান, মালব ও গুজরাট) এবং মধ্যপ্রদেশে প্রচলিত রূপের নাম 'নাগর' এবং পূর্বভারতের রূপের নাম 'কুটিল'। মূল ব্রাহ্মীলিপির এই 'কুটিল' রূপভেদ হইতে বাঙ্গালা অক্ষরের উৎপত্তি। 'নাগর' হইতে দেবনাগরীর এবং 'শারদা' হইতে পাঞ্জাবে 'গুরুমুখীর' উৎপত্তি।[২১] গুপ্তব্রাহ্মী বর্ণ পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে দুটি ভিন্ন ধরণের 'সিদ্ধমাতৃকা' রূপ পরিগ্রহ করে।" ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার, বলেছেন, পশ্চিমভারতের সিদ্ধমাতৃকা বর্ণমালা নাগরীতে এবং পূর্বভারতের সিদ্ধমাতৃকা বাংলা বর্ণমালায় পরিণত হয়।[২২]।

সিদ্ধমাতৃকা

ষষ্ঠ শতকে, গুপ্তরাজ্যাধিকারের শেষপর্বে (মতান্তরে সম্রাট হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর, গুর্জর প্রতিহার উত্থানের সময়), পূর্বাঞ্চলীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুপ্তব্রাহ্মী বর্ণমালা একটি বিশেষ রূপ লাভ করে। একে বলা হয় সিদ্ধমাতৃকা বর্ণমালা। ৫৮৮-৮৯ খ্রীষ্টাব্দে মহানমনের বুদ্ধগয়া লিপিতে প্রথম একে দেখা যায়। ৩৪টি ব্যঞ্জনবর্ণ ১৪টি স্বরবর্ণ ও যৌগিকস্বর (Dipthong) নিয়ে গঠিত এই বর্ণমালা এক সময় সারা ভারতের মানুষদের যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। অলবিরুনী তাঁর ভারত বিষয়কগ্রন্থে প্রাচীন ভারতের এগারটি বর্ণমালার কথা বলেছেন। এগুলি হল অর্ধনাগরী, মালবারী, সৈন্ধব, ভৈক্ষুকী, সিদ্ধমাতৃকা, নাগর, গৌরী, লারী বা লাটি, কর্ণাট. অন্ধ্রী ও দিরবারী বা দ্রাবিড়ী। পশ্চিমভারতে একদা প্রচলিত (ভটিয়া ও সিন্ধু অঞ্চল), প্রথম

তিনটি বর্ণমালার কোন নিদর্শন ঐ স্থান থেকে পাওয়া যায় নি । বৌদ্ধদের ব্যবহৃত 'ভৈক্ষুকী' বর্ণমালার ব্যবহার ছিল সেকালের বিখ্যাত বৌদ্ধবিহার 'পূর্বদেশের' অন্তর্গত উদুনপুর বা 'ঔদন্তপুর' অঞ্চলে (বর্তমান বিহার শরীফ) । 'সিদ্ধমাতৃকা' সহ অন্য সাতটি বর্ণমালার ব্যবহারের অঞ্চলগুলি পণ্ডিতরা চিহ্নিত করতে পেরেছেন । 'নাগর' লিপির নামটি এসেছে বর্ণনাগ কৃপাণিকা বা 'বর্ণনাগ' থেকে । মালব অঞ্চলে এই লেখনরীতি প্রথম প্রচলিত হয় । এ থেকেই দেবনাগরী বর্ণমালা এসেছে । কাশ্মীর, কনৌজ বা মধ্যপ্রদেশ ও বেনারস অঞ্চলে 'সিদ্ধমাতৃকা'র বহুল ব্যবহার ছিল । পূর্বভাবতে এর একটি পরিবর্তিত রূপ ফুটে ওঠে, ফ্লিট যাকে 'কুটিললিপি' এবং বুলার যাকে 'তীক্ষ্ণ-কোণী' (Acute-angled) বলেছেন । বুলারের মতে এর আবির্ভাব খ্রীঃ ৫ম শতকে । কিন্তু ১০ম শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে কাশ্মীর অঞ্চলে 'সারদা' লিপি (কাশ্মীরের অধিষ্ঠাত্রীদেবী সারদার নাম থেকে) এবং গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চলে 'নাগরীর' আবির্ভাব ঘটলে, ঐসব অঞ্চলে এর ব্যবহার বন্ধ হয় । বাংলা, নেওয়ারী, ওড়িয়া, অসমীয়া বর্ণমালা সৃষ্টিতে এর অবদান সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । পূর্বভারতে এর ব্যবহার ঘটেছে দীর্ঘসময় ধরে ।

'সিদ্ধমাতৃকা'র' কুটিলরূপ পরিগ্রহের পটভূমিতে বাঙালী শিল্পীদের অবদান কতখানি, তা গবেষণার বিষয় হলেও মহানমনের বুদ্ধগয়া শিলালিপির (৬ষ্ঠ শতক) বর্ণমালা দেখে (উ, ক, কৃ, গু, চি, ঢ, দী, ধী, ন ফ, মি, য, ল, ব, ষি, ম, স্ক, স্ত) দানি যথার্থই বলেছেন, এর শিল্পী বোধ হয় বাংলাদেশ থেকেই এসেছিলেন । কথিত বর্ণগুলির সঙ্গে আধুনিক বাংলা বর্ণমালার সাদৃশ্য যথার্থ বিস্ময়কর । পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীনতম তাম্রশাসন, বর্ধমানজেলার গলসী থানার মল্লসারুল গ্রাম থেকে প্রাপ্ত, মহারাজাধিরাজ গোপালচন্দ্রের 'উপরিক' (?) মহারাজ বিজয়সেনের লিপিটি (খ্রীঃ ৬ষ্ঠ শতক) । কুটিললিপিতে খোদিত এই অনুশাসনের বর্ণমালা দেখে মনে হয়, ৬ষ্ঠ শতক থেকেই অনেক বাংলা ও অসমীয়া বর্ণ যেন তাদের নিজস্বরূপ লাভ করে । সম্প্রতি মালদহ জেলার জগজীবনপুর গ্রাম থেকে রাজ্য পুরাতত্ত্ব দপ্তর মহেন্দ্রপালদেবের তাম্রশাসন উদ্ধার করেছেন। এতে উভয়দিকে ৭২টি লাইনে সিদ্ধমাতৃকা বর্ণমালায় খোদিত আছে 'নন্দ দির্ঘিকা উদরঙ্গমহাবিহারের সমূহ ব্যয় নির্বাহের জন্য ভূসম্পদ দানের ঘোষণা ।'

বাংলা বর্ণমালার উদ্ভব

'বঙ্গ' নাম কতদিনের প্রাচীন, এ প্রশ্নের সদুত্তর আজো মেলে নি । ঋগ্বেদে এ শব্দ নেই । ঐতরেয় আরণ্যকে প্রথম এটি দেখা যায় (২/১/১/৫/) । মহাভারত ও বোধায়ন ধর্মসূত্রে বঙ্গদেশ প্রসঙ্গ আছে । উত্তরপ্রদেশের পাভোস গুহালিপিতে (১ম শঃ) 'বঙ্গপাল' নাম দেখা যায় । পাণিনির সূত্রে (৬/২/১০০) উল্লিখিত 'গৌড়' বাংলা দেশেরই কোন অঞ্চল সম্ভবতঃ । কালিদাসের 'রঘুবংশে' রঘুর দিগ্বিজয়ের বর্ণনাকে অনেকে সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয় বলে থাকেন (২য় শঃ) । তা থেকে জানা যায়, বাংলার নৌবাহিনী বিখ্যাত ছিল । এ দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব অংশ ছিল জলাভূমি- যার সাধারণ নাম 'বঙ্গ' । এখানকার অধিবাসীরা ছিল 'বঙ্গাল'। প্রাচীন বঙ্গের চারটি ভাগ ছিল বরেন্দ্রী, সুহ্ম বা রাঢ়া, বঙ্গ ও কামরূপ । প্রাচীন বঙ্গদেশকে চারটি ভুক্তিতে ভাগ করে শাসন করা হোত ঃ পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তি (উত্তর ও পূর্ববাংলা), বর্ধমানভুক্তি (পশ্চিমবাংলা), দণ্ডভুক্তি

(দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা, ওড়িশা ও ছোটনাগপুরের অংশবিশেষ) ও প্রাগজ্যোতিষভুক্তি (উত্তরপূর্ব বাংলা ও আসাম)। বাংলায় ইসলামী শাসনের পর 'বাঙ্গালা' নামটি প্রচলিত হয়। ১৬ শতকে এটি ফরাসী 'বঙ্গালহ্' থেকে উদ্ভূত। কিন্তু চৈতন্যদেবের সময়ও বাংলার মানুষ 'গৌড়ীয়' রূপে পরিচিত। এরই মধ্যে কোন এক সময় তারা 'বাঙ্গালী' হয়ে পড়ে। ১৫৭৬ এ সম্রাট আকবরের বাংলাদেশ অধিকারের পর থেকে 'বঙ্গাল' শব্দটি সরকারীভাবে গৃহীত হয়।

ঠিক কোন সময় থেকে বাংলা বর্ণমালার উদ্ভব ঘটেছে, এক কথায় বলা কঠিন। আদিবাসী গৃহচিত্রণকলা, পালপার্বণে দেওয়া নানা আকারের আলপনা, সিন্ধুসভ্যতার কিছু কিছু চিত্রলিপি, অশোক ব্রাহ্মী বর্ণের (ক, চ, ঢ, দ), মধ্যে বাংলা বর্ণের প্রাচীন রূপটি দেখা যায়। তবে একথা যথার্থ যে, গুপ্তলিপির পূর্বাঞ্চলীয় রূপ 'কুটিল' থেকেই বাংলা বর্ণমালার যথাযথ যাত্রা শুরু। অসমীয়া বর্ণমালার উদ্ভবের ইতিহাস অনুসন্ধান করতে গিয়ে সেখানকার পণ্ডিতমন্ডলী ৫ম শতাব্দীর অহোমরাজ সুরেন্দ্র বর্মার 'উমাচল শিলালিপি' এবং 'নগজরী খনিকরগাঁও প্রস্তরলিপি' দুটিকে আদি অসমীয়া লিপির নিদর্শন রূপে নির্দেশ করেছেন ('অসমীয়া লিপি, ড. উপেন্দ্রনাথ গোস্বামী, পৃঃ ২৩')। এই দুটি লিপির বিভিন্ন বর্ণমালা গুপ্তলিপির সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। ৩য় বলবর্মণের (৮৮৫ খ্রীঃ - ৯১০ খ্রীঃ) নওগাঁও তাম্রলিপির সাক্ষ্য থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা গেছে সে অসমীয়া বর্ণমালা পূর্ণাঙ্গরূপ লাভ করেছে ৯ম-১০ম শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে। অন্যদিকে ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মহানমনের বুদ্ধগয়ালিপির (৫৮৮-৮৯ খ্রীঃ) বর্ণমালার বিভিন্ন স্বরচিহ্ন ও দু একটি যুক্তাক্ষর দেখে প্রাথমিকভাবে বলতে দ্বিধা নেই, বাংলা বর্ণমালার যাত্রা শুরু কিন্তু সেখান থেকেই। এই লিপির কুটিল বর্ণগুলি যে বাংলা, অসমীয়া, মৈথিলী, ওড়িয়া ও নেওয়ারী বর্ণমালার জননী, তাতে সন্দেহ নেই। গঙ্গা অববাহিকা অঞ্চলে বর্ণলেখন পদ্ধতির পরিবর্তন কীভাবে সূচিত হয়, তার সাক্ষ্য ধরা আছে এর খোদিত বর্ণগুলিতে। বর্ণমালার দক্ষিণ বা নিম্নাংশে 'তীক্ষ্ণরূপধারণরীতির (Acute angles)' এখান থেকেই যাত্রা শুরু বলা যেতে পারে। গুপ্ত, মৌখরী, শশাঙ্ক, পাল ও সেনযুগের বিভিন্ন শিলালিপি, তাম্রশাসন ও পুঁথির বর্ণমালার মধ্যে বাংলা বর্ণমালার আদিরূপ দেখতে পাওয়া গেছে। পণ্ডিত রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় তাঁর 'The origin of the Bengali scripts' পুস্তকে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। তাঁরই পথ ধরে বলি, ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসন (৮ম শতাব্দী), দেবপালের মুঙ্গের তাম্রশাসন (৮৪৩ খ্রীঃ) ও খোস্রাবন শিলালিপি বা 'বীরদেব প্রশস্তি' (৯ম শতাব্দী), নারায়ণ পালের গরুড় স্তম্ভলিপি (৮৫৪-৯০৮ খ্রীঃ) ও ভাগলপুর তাম্রশাসন (ঐ), ১ম মহীপালের বাণগড় তাম্রশাসন (৯৮৮-১০৩৮ খ্রীঃ), যশোবর্মণের নালন্দা প্রস্তরলিপি (৮ম), সারনাথ প্রস্তরলিপি (ঐ), নারায়ণপুর মূর্তিলিপি (ঐ), ৩য় বিগ্রহপালের আমগাছি তাম্রশাসন (১১শ শতাব্দী), ৩য় গোপালের রাজীবপুর মূর্তিলিপি (১১২৮-১১৪৩ খ্রীঃ), মদনপালের মনহলি তাম্রশাসন[২৩] ও জয়নগর মূর্তিলিপি[২৪] (ঐ), গোবিন্দচন্দ্রের পাইকপাড়া বেতকা মূর্তিলিপির (১১৫৫-১১৬২ খ্রীঃ)[২৫] মধ্যে প্রাচীন বঙ্গাক্ষরের কোন কোনটিকে দেখা গেছে। এদের মধ্যে রাজীবপুর মূর্তিলিপিতে র, ম, ত্য, দ + গ = দ্গ, ল, স প্রাচীন বঙ্গাক্ষরের স্পষ্টরূপ লাভ করেছে। ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ মহকুমার টাঙ্গিবাড়ি থানার বিক্রমপুর পাইকপাড়া থেকে প্রাপ্ত গোবিন্দচন্দ্রের পাইকপাড়া-বাসুদেবমূর্তির পাদপীঠে খোদিত

চারছত্র লিপির ক, চ, ত, ভ, ব, র, স বর্ণগুলি অনেকাংশে আধুনিক ।[২৬] পশ্চিম দিনাজপুরের তপনের একটি পুকুর থেকে আবিষ্কৃত এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মিউজিয়ামে রক্ষিত 'উমা-আলিঙ্গন' মূর্তির পাদপীঠের পিছনে দ্বাদশ শতাব্দীকালীন আদি বঙ্গাক্ষরে খোদিত লিপিটির পাঠঃ 'দানপতি আচলি জেচক' । এর দ, ন, ত, আ, ল, ক, বর্ণগুলি আধুনিক রূপ লাভ করেছে । (দ্রঃ 'Iconography of sculptures', P. K. Bhattacharya, N. B. University, 1983, P. 24) । অনুরূপভাবে, জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ থেকে প্রাপ্ত ঐ মিউজিয়ামের কালো পাথরের সূর্যমূর্তির পাদপীঠে খোদিত 'ওঁ স্বস্তি শ্রী শিরদেবাদিত্যয়' লিপিটির ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায় (প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২) ।

এই প্রসঙ্গে আরো কয়েকটি প্রাচীন লিপির কথা বলা যাবে । যেমন, জীবিতগুপ্তের দেওবর্ণক লিপি (৭ম শতাব্দীর শেষ । উ, ক, গ, দ, ন, ম, য, ল, ব, স । এখানেই 'জ'এর ডানদিকের রেখাটি ক্ষুদ্রাকারে প্রথম দেখা গেল ।), ভাস্করবর্মণের নিধনপুর লিপি (৭ম শতাব্দীর প্রথমার্ধ। কৃ, গ, ঘ, চ, দ, ধ, ন, ফ, ম, য, ব, ষ, স), খালিমপুর ও ময়নামতি ফলক (৮ম শতাব্দী । অ, আ, উ, ঔ, কু, কৃ, খি, খে, গৌ, ঘ, চৌ, পূর্ণাঙ্গ জ, দা, থ, নু, ফ, ম, য, লী, ব, ষ, স, ঞি, ন ।) । উল্লিখিত বর্ণগুলির মধ্যে আধুনিক বাংলা হয়ে ওঠার ভঙ্গিমাটি লক্ষ্যণীয় ।

গুপ্তযুগীয় পাণ্ডুলিপি লেখনপ্রক্রিয়ার কথা আলোচনা করতে গিয়ে বুলার, এবং দানি (Indian paleography, P. 147-154) 'কল্পনামণ্ডিটিকা' (তালপত্র । ৫ম শতাব্দীর প্রথমার্ধ), বোয়ার পাণ্ডুলিপি (৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমাংশ), ভারত থেকে চীনে ও পরে জাপানে নিয়ে যাওয়া 'হোরিওজী তালপত্র-পাণ্ডুলিপির' (৮ম শতাব্দী) কথা বলেছেন । প্রথম পাণ্ডুলিপির মধ্যে ক, খ ও গ কিছুটা লক্ষ্যণীয় তবে দ্বিতীয়টির মধ্যে উ এর রূপটি ছাড়াও ও, ক, কু, গ, শু, ঘৃ, চ, দ, ফ, ম, ব, ষ, স অদ্ভুতভাবে উপস্থিত । 'হোরিওজী'তে উ, কি, খ, গ, ঘ, চ, ছ, দ, ন, ফ, ব, ন, য, ল, ষ যেন অনেকটাই আধুনিকতার পথ ধরেছে ।

১১শ শতকের শেষ দিক থেকে গৌড়-বঙ্গে শুরু হয় নানা রাষ্ট্রনৈতিক উৎপাত । পাল সাম্রাজ্যের ভিত্তি ধীরে ধীরে দুর্বল হতে থাকে । রাষ্ট্রমঞ্চে এসে উপস্থিত হন সেন রাজারা। বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে সেন রাজাদের অবদান অনস্বীকার্য । ঐ সময় বেশ কিছু কালজয়ী সংস্কৃত গ্রন্থ রচিত হয় । সেনরাজাদের সময়ে যে সব শিলালিপি, তাম্রশাসন ও মূর্তিলিপি খোদিত হয়েছে সেগুলি থেকেও ১১শ, ১২শ ও ১৩শ শতকের বাংলার ভাষা-সাহিত্য চর্চার সমৃদ্ধচিত্রটির সঙ্গে পরিচয় ঘটে । বাংলা বর্ণমালার আধুনিকরূপ এইসব লিপিমালা থেকেই যাত্রা শুরু করেছে। তবে এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রাজা বিজয় সেনের শিলালিপি ।[২৭] এটি উত্তরপূর্ব ভারতীয় ব্রাহ্মী বর্ণমালার বিবর্তিতরূপ, আদি বঙ্গাক্ষরে (Proto Bengali)[২৮] খোদিত । দেওপাড়ার অদূরেই ছিল রাজা বিজয় সেনের রাজধানী বিজয়পুর বা বিজয়নগর। ১১শ - ১২শ শতকের বাংলা বর্ণমালা ব্যবহারের আদি নিদর্শনস্বরূপ এই শিলালিপি সম্পর্কে রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় বলেছেন, "We come to the Deopara inscription of Vejoy Sena, where we find the modern Bengali Alphabet with certain exceptions in which the development of the form is still incomplete."[২৯] এখানে অ, ই, ও, ঘ, দ, ঝ, ত, থ, ক, হ, ব, ম, য,

ল (বাংলা পুঁথি ও পাণ্ডুলিপিতে ন এর নীচে বিন্দু দিয়ে লেখা।), স বর্ণগুলি অনেকাংশে আধুনিক হয়ে উঠেছে।[৩০**]

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন, "বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রশস্তিতে যে বর্ণমালা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ২২টি পুরাপুরি অথবা প্রায় বাংলা অক্ষরের মতো। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমে তাম্রশাসনের অক্ষর প্রায় সম্পূর্ণ আধুনিক বাংলা অক্ষরে পরিণত হইয়াছে (বাংলা দেশের ইতিহাস ১ম খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ১৫২)"।

এছাড়াও, ১২শ-১৩শ শতকের আরো কয়েকটি শিলালিপি বা তাম্রশাসনের কথা বিশেষজ্ঞরা উল্লেখ করে থাকেন, যেগুলিতে আদি ও প্রাচীন বাংলা বর্ণমালার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। এগুলি হল অশোকচল্লের বুদ্ধগয়া শিলালিপি (১১৭০ খ্রীঃ), গদাধর মন্দিরলিপি (১১৭৫ খ্রীঃ), লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর তাম্রশাসন (১২শ শতাব্দীর শেষদিক), বৈদদেবের কমৌলি তাম্রশাসন (১২২৪ খ্রীঃ), লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগর তাম্রশাসন (১২শ শতাব্দীর শেষাংশ), লক্ষ্মণসেনের সুন্দরবন তাম্রশাসন (ঐ), তর্পণদিঘি তাম্রশাসন (ঐ), বিশ্বরূপ সেনের মদনপাড়া তাম্রশাসন (১৩শ শতাব্দী), বিশ্বরূপ সেনের সাহিত্যপরিষৎ তাম্রশাসন (ঐ) ও কেশবসেনের ইদিলপুর তাম্রশাসন (ঐ)।

ঢাকার বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর সংগ্রহে রক্ষিত সুলতান গিয়াসুদ্দিন মাহমুদ শাহের সময়কার শিলালিপিটি ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ করা। এটির ভাষা সংস্কৃত কিন্তু ম, হ, দ ইত্যাদি অনেকগুলি বর্ণই আধুনিক বাংলার মতো। ঐ সংগ্রহের অপর একটি খোদিত, সংস্কৃত ভাষার শিলালিপিকে ১০ম শতাব্দীর বলা হয়েছে। এর এ, স, ম, ব, ল, ক, গ ইত্যাদি বর্ণগুলি অনেকটাই আধুনিক হয়ে উঠেছে ('বাংলাভাষা বর্ণমালার ব্যবহারঃ অতীত এবং বর্তমান', বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর, ঢাকা।)। শিলালিপি তাম্রশাসনেব বর্ণমালার সঙ্গে পুঁথির বর্ণমালার যে পার্থক্য তা কেবল লিখনকৌশলগত। পুঁথির বর্ণমালায় টানালেখার জটিলরূপ অনেকটাই এসে যায়। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রাচীন পুঁথির কথাও বলতে হবে, যেগুলি ১২শ শতাব্দীতে লেখা হয়। এগুলি হল এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত 'কালচক্রাবতার' (১১২৫ খ্রীঃ) ও 'পঞ্চরক্ষা'(১১৫০ খ্রীঃ) এবং কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত 'গুহ্যাবলী বিবৃতি' (১২০০ খ্রীঃ)। এছাড়াও 'শিষ্যালেখ' (১০৮৪ খ্রীঃ), 'কালচক্রতন্ত্র' (১৪৪৬ খ্রীঃ) ইত্যাদি কয়েকটি পুঁথির কথাও আলোচ্য, যেগুলির মধ্যে বঙ্গাক্ষরের আদিরূপ বর্তমান।

তবে ১১শ-১২শ শতাব্দীর শিলালিপিব বর্ণমালার তুলনায় পুঁথির বর্ণমালার দ্রুত রূপান্তর ঘটেছে। এ সিদ্ধান্ত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর। হিন্দুদের প্রাচীন পুঁথিপত্র তেমন পাওয়া যায় নি। যা পাওয়া গেছে তা সবই বৌদ্ধপুঁথি। ব্রাহ্মণরা শিলালিপি লেখাতেন বা লিখতেন। বৌদ্ধরা পুঁথি লিখতেন। এ সময় তাঁরা রাজকীয় ক্ষমতাও পান নি। মানুষের মধ্যে ছিল বৌদ্ধ মানসিকতা। হরপ্রসাদ বলেছেন, 'ব্রাহ্মণেরা পশ্চিমদেশ হইতে আসিয়াছিলেন ; তাহারা পশ্চিমের অক্ষরের পক্ষপাতী ছিলেন। আর দেশের লোক অর্থাৎ বৌদ্ধরা দেশের অক্ষরের পক্ষপাতী ছিলেন। এই দুয়ের লড়াইতে দেশের লোকে অর্থাৎ বৌদ্ধরা জয়লাভ করিল। তেকোণা অক্ষর চলিয়া গেল। ব্রাহ্মণরাও শেষে সেই অক্ষরেই পুঁথি লিখিতে আরম্ভ করিলেন। মুসলমান বিজয়ের

পর শিলাপত্র এই দেশের অক্ষরেই লেখা হইত (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ১৩২৭)।'

এইসব শিলালিপি, তাম্রশাসন ও পুঁথির বর্ণমালা বিশ্লেষণ করে পণ্ডিতরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, ৬ষ্ঠ শতক থেকে প্রাথমিক প্রচেষ্টা শুরু হলেও ১১শ-১২শ শতাব্দী থেকেই বাংলা বর্ণমালা তার নিজস্ব রূপলাভ ক'রে, বিভিন্ন সাহিত্যিক-অসাহিত্যিক ক্ষেত্রে স্থান করে নিয়েছিল। ১২শ শতাব্দীর ইসলামী আক্রমণ বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতির সাবলীল প্রবাহকে সাময়িকভাবে রুদ্ধ করে দিলেও অচিরেই সেই সমস্যার আপাত সমাধান ঘটলে, সমাজজীবনে কিছুটা স্থিতাবস্থা ফিরে এলে, লিপিচর্চা আবার বিপুল উদ্যমে শুরু হয়ে যায়। ইসলামী শাসকরাও যে বাঙালী কবি সাহিত্যিকদের নানাভাবে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করেন, এই ঐতিহাসিক সত্য আজ সুপ্রতিষ্ঠিত।

পরবর্তীকালে স্বাধীন সুলতান বা গ্রাম্য ভূস্বামীদের অনুপ্রেরণায় যে সব পুঁথি সাহিত্য রচিত হয়, তার মধ্যে দিয়ে বাংলা বর্ণমালা আরো আধুনিক হয়ে ওঠার পথ খুঁজে পায়। চৈতন্যপ্রভাবে রচিত বাংলার বিপুল ও বিশাল বৈষ্ণব সাহিত্যচর্চার মধ্যে বাংলা বর্ণমালার অনুসরণ ঘটেছে সাবলীলভাবে- সে তালপাতা বা তুলটকাগজ, যে কোন আধারেই হো'ক না কেন। কেবলমাত্র সাহিত্যিক পাণ্ডুলিপি নয়, চিঠিপত্র দলিল দস্তাবেজ, সরকারের কাগজপত্রেও সেই বর্ণমালা ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলা অক্ষরে লেখা প্রাচীনতম দলিলের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে ড. সুরেন্দ্রনাথ সেনের 'প্রাচীন বাংলা পত্র সংকলন' (১৯৪২) গ্রন্থে। দলিলটির লিপিকাল ১১২৫ বঙ্গাব্দ বা ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দ।[৩১] ১১২৯ বঙ্গাব্দ বা ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে লেখা একটি জমির পাট্টাতেও আঠারো শতকের 'অসাহিত্যিক' গদ্যে ব্যবহৃত বর্ণমালা (মৎসংগৃহীত) উল্লেখযোগ্য। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত ১১০৩ বঙ্গাব্দের (১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দ) একখানি বাংলা চুক্তিপত্রের বিষয়ে আলোচনা করেছেন।[৩২] কিছুদিন আগে অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় "বাংলা লিপি ও ভাষার ইতিহাসের এক নতুন তথ্যসূত্র" আবিষ্কার করেছেন। বাংলা লিপি উৎকীর্ণ করা প্রায় ষাটটি পোড়ামাটির ফলক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে (এগুলি উত্তর ও দক্ষিণ ২৪পরগণা এবং মেদিনীপুর জেলার তমলুক অঞ্চল থেকে সংগৃহীত এবং ভারতীয় যাদুঘর, কলকাতা রাজ্য সংগ্রহশালা, গঙ্গাবিদই অনুসন্ধানকেন্দ্র ও তমলুক সংগ্রহশালায় রক্ষিত।) তিনি জানিয়েছেন রোদে শুকানো বা আগুনে পুড়ানো এই ক্ষুদ্রাকার লেখগুলিতে টানা হাতের বাংলা লেখা উৎকীর্ণ। এগুলি ৭ম থেকে ১৮শ শতাব্দীর বিভিন্ন সময়ের। লেখগুলির কয়েকটি ভাষা সংস্কৃত হলেও বেশির ভাগই বাংলা। সংস্কৃত লেখগুলি প্রাক্ মধ্যযুগের প্রথম দিককার (১৩শ-১৪শ শতাব্দী)। প্রতিটি লেখে আছে তিনটি বা চারটি পঙ্ক্তি। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের মতে এগুলি 'দেবস্থানের উদ্দেশ্যে' উৎসর্গ করা ফলক (এই ধরনের 'উৎসর্গ-ফলক' সিন্ধুসভ্যতাতেও পাওয়া গেছে। অন্যত্রও দুর্লভ হয়। এলাহাবাদ মিউজিয়াম সংগ্রহে ভিটা, কৌশাম্বী, ঝুসি, অহিচ্ছত্র ও পূর্বপাঞ্জাবের সুনেত থেকে সংগৃহীত এধরণের মাটি ও বেশ কয়েকটি তামার সিলমোহর আছে। প্রায় প্রতিটিতেই প্রাচীন ব্রাহ্মী বর্ণমালার লিপি আছে। সেই সঙ্গে নানা মূর্তি)। প্রায় প্রতিটি ফলকের উল্টোদিকে খোদিত আছে দেবস্থান কর্তৃপক্ষের সীলমোহর। লেখগুলিকে তিনি তিনটি পর্যায়ে ভাগ করে দেখিয়েছেনঃ-[৩৩]

- ❑ প্রথম পর্যায় ঃ আ. ৯০০ - ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ ঃ প্রাচীন বাংলা (Old Bengali) ।
- ❑ দ্বিতীয় পর্যায় ঃ আ. ১২০০ - ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দ ঃ প্রাচীন থেকে মধ্যযুগে পরিবর্তনকালীন (Transitional Middle Bengali) বাংলা এবং ১৩০০ - ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ ঃ মধ্যযুগীয় বাংলার আদিকাল (Early Middle Bengali) ।
- ❑ তৃতীয় পর্যায় ঃ ১৫শ - ১৭শ/১৮শ শতক, মধ্যযুগীয় বাংলার শেষভাগ (Late Middle Bengali) ।

এর মধ্যে প্রথম পর্যায়ভুক্ত স, আ, ভ, ট, ল, দ, র বর্ণ দেবপালের ঘোস্রাবন শিলালিপি বা 'বীরদেব প্রশস্তি' (৯ম শতাব্দীর সিদ্ধমাতৃকালিপি) এবং বিজয়সেনের দেওপাড়া শিলালিপির (১১শ শতাব্দী) বর্ণমালার সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত । লেখটির অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়কৃত পাঠ নিম্নরূপঃ- 'সং ৭৯ আশ্বিন/ভট লটংদের হর/পাদাড়ত (?)' । অর্থাৎ, ৭৯ সম্বৎসরের আশ্বিন মাসে 'লটংদ' নামক এক ভট বা সৈনিক হর বা শিবের পদানত বা বিশেষ ভক্ত ছিলেন ।

মেদিনীপুর জেলার তমলুকের তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালা ও গবেষণাকেন্দ্রে রক্ষিত (সং ২৪৭) প্রাক্ মধ্যযুগীয় একটি লেখের পাঠ ঃ- 'স ত ভা দিন (৩২)/সহকেথী/তা পত্র (।)' । এই লেখের স, ত, হ এর আকার ১২শ শতকের শিলালিপির বর্ণমালার সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত । ঐ সংগ্রহশালার অপর একটি লেখের (১৩শ শতক) পাঠ ঃ- 'সং ১৩ (?) /নালসর/দেহঅপ/বাহিক (।)' অর্থাৎ, ১৩ সম্বতে দেহবাহক (মৃত) নালসর (কর্তৃক দত্ত) । এই লেখের ত, স, প, হ বর্ণগুলির সঙ্গে ১৩শ শতকের চর্যাগীতিকোষ ও রামচরিত ইত্যাদি পুঁথির বাংলা বর্ণমালার সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়। ভারতীয় যাদুঘরে রক্ষিত (সং ৯০/২৬৯) একটি লেখের পাঠ নিম্নরূপ ঃ-

'শ্রী গাম্পণ/এবে দিলা/বৃসোগর্স/দান ভাদ্র ৩ (।)' এটি মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে প্রচলিত 'বৃষোৎসর্গ' বিষয়ক লিপিবিশেষ । এর বর্ণগুলিব সঙ্গে ১৩শ শতাব্দীর 'চর্যাগীতিকোষ' ১৫শ শতাব্দীর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', ১৫শ শতাব্দীর 'বোধিচর্যাবতার' পুঁথির বর্ণমালার সাদৃশ্য দেখে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় এটিকে ১৪শ থেকে ১৬শ শতাব্দীর বাংলা বর্ণ বলেছেন ।[৫৪]

প্রাকমধ্য ও মধ্যযুগীয় বাংলার জনজীবনের ধর্মীয় মানসিকতার দৃষ্টান্ত, এইসব লিপিযুক্ত মাটির ক্ষুদ্রাকার ফলক । আধুনিক যুগেও বিভিন্ন দেবস্থানে যেভাবে মাটির ঢেলা সুতোতে বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়ে কিংবা পোড়ামাটির হাতি ঘোড়া 'ছলন' হিসেবে উৎসর্গ করে মনস্কামনা পূর্ণ হবার প্রার্থনা জানানো হয়, এগুলিও সে ভাবেই হয়তো ব্যবহৃত হোত ।[৫৫] কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হল, রাজা-জমিদার বা সামন্ত প্রভুদের নাগরিক জীবনের বাইরে, নিতান্ত পল্লীবাংলার সাধারণ মানুষ আঃ ৯০০ থেকে ১৭শ-১৮শ শতাব্দী কালের মধ্যে কী ধরণের বর্ণমালা ব্যবহার করতো, তার দৃষ্টান্তস্বরূপ এই লেখযুক্ত সীলমোহরগুলির 'হস্তলিপিবিজ্ঞানগত' গুরুত্ব অনস্বীকার্য ।

পুঁথির লিপি

এ কথা আগেই বলা হয়েছে যে, শিলালিপি তাম্রশাসনে খোদাইকাজের সময় বর্ণমালার যে

সরল আকার থাকে, পুঁথি বা পাণ্ডুলিপিতে লেখনী দিয়ে লেখার সময় তা যেমন অনেক বেশী আঞ্চলিকরূপ লাভ করেছে তেমনি তার মধ্যে লিপিকরভেদে জটিলতাও সৃষ্টি হয়ে গেছে। নিতান্ত আধুনিক যুগেও মানুষের হস্তাক্ষরের মধ্যে সাদৃশ্য নেই। তবুও বিভিন্ন স্থানে লেখা বাংলা পুঁথি ও বর্ণমালার মধ্যে যে কিছু কিছু আপাতবোধ্য সাদৃশ্য দেখা গেছে, তার দ্বারাই পরবর্তীকালে বাংলা পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়েছে (যদিও সবক্ষেত্রে বিশুদ্ধ পাঠোদ্ধার সম্ভব হয় নি।)।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কয়েকটি বাংলা অক্ষরের পুঁথির বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন 'বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকার' ১৩২৭ এর ১ম সংখ্যায়। বাংলা পুঁথির বর্ণমালা বিষয়ক আলোচনায় বলা যেতে পারে এটিই পথপ্রদর্শক।[৫৬]

১০ম-১১শ শতকের (মতান্তরে ১১শ-১২শ) পূর্ববঙ্গরাজ হরিবর্মদেবের সময়ে লেখা 'বিমলপ্রভা' পুঁথিটির ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, জ, অ, আ, ঋ, এ, ঐ বর্ণগুলি আধুনিক বাংলার মত। এটি যশোহরে লেখা। এতে ও, ঔ, নেই। তাঁর মতে এটিই বাংলা লিপির প্রথম পুঁথি।'ক্ষণভঙ্গ সিদ্ধি' পুঁথির 'নমঃ শ্রীলোকনাথায়' বাক্যটি পুরোপুরি আধুনিক। অভয়াকর গুপ্তের[৫৭] 'বজ্রাবলী', 'কালচক্রাবতার' পুঁথির কয়েকটি বর্ণ আধুনিক বাংলা বর্ণের মতই। ১১৯৮ খ্রীষ্টাব্দে লেখা 'হেবজ্রতন্ত্রটীকা'র এ, ঐ, ও, ঔ, আ, ঋ আধুনিক বাংলাব মত। সৌরাষ্ট্রের রাজপরিবারের মানুষ, নালন্দা মহাবিহারের আচার্য জয়দেবের শিষ্য শান্তিদেব (এঁর বাল্যনাম শান্তিবর্মা ; পিতা কল্যাণবর্মা) ৭ম-৮ম শতাব্দীতে আবির্ভূত হন।[৫৮] এই মহাযানী ভিক্ষু রচিত দুখানি গ্রন্থ 'শিক্ষাসমুচ্চয়' ও 'বোধিচর্যাবতার'। শেষোক্ত 'বোধিচর্যাবতার' পুঁথিটি ১৪৩৬ খ্রীষ্টাব্দে কোন এক 'সম্বৌদ্ধ করণ-কায়স্থ ঠক্কুর অমিতাভ', বর্ধমান জেলার বেণুগ্রামে, নিজপুত্রের কল্যাণ কামনায়, সমকালীন বাংলা বর্ণমালায় অনুলিপি করান এক বৌদ্ধ ভিক্ষুকে দিয়ে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ এই পুঁথিটি নেপাল থেকে উদ্ধার করেছেন।[৫৯] এই পুঁথিতে বিভিন্ন বর্ণমালার মধ্যে বিশেষ করে উ (কোচ্ছ - উচ্ছ). চ, ছ, জ, ত, থ, (স্থ), ন, ল, (ন এর নীচে বিন্দু দিয়ে), ভ (সোভাবিরম) স বর্ণগুলি আধুনিক রূপ লাভ করেছে। কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'যোগরত্নমালা' ও 'গুহ্যাবলীবিবৃতি পুঁথিতে বেশ কয়েকটি বাংলা বর্ণ আধুনিক হয়ে উঠেছে। এগুলি এদেশের প্রাচীন পুঁথি সাহিত্যে (খ্রীঃ ১১শ-১২শ শতাব্দী) বাংলা বর্ণমালা ব্যবহারের দৃষ্টান্ত। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল রাজদরবারে 'চর্যাগীতিকোষ' বা চর্যাপদের তালপাতার পুঁথি আবিষ্কার করেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে তাঁরই সম্পাদনায় এই 'চর্যাপদ' (তাঁর নামকরণ 'চর্য্যাচর্যবিনিশ্চয়ঃ'), সরোজবজ্র ও কাহ্নপাদ বা কৃষ্ণাচার্যের দুখানি 'দোহাকোষ' এবং 'ডাকার্ণব' এই চারখানি পুঁথি একত্রে 'হাজার বছরের পুরানো বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। বাংলার বিদ্বৎসমাজ এই রচনাগুলিকে বাংলাদেশের প্রাচীনযুগীয় রচনারূপে সম্মানিত করেন। ফলে 'চর্যাপদ' বাংলার আদি সাহিত্য নিদর্শনের সম্মান লাভ করে। উভয়দিকে লিপিযুক্ত তালপাতার ৬৪টি পাতার এই পুঁথিতে আছে ৪৬টি সম্পূর্ণ ও একটি খণ্ডিত পদ। সেই সঙ্গে প্রতি পাতাতেই আছে বিভিন্ন পদের সংস্কৃত টীকা। নেপালরাজ বীরচন্দ্রের নামাঙ্কিত গ্রন্থশালার এই মূল পুঁথিটি (আকার ৫১/৪ ইঞ্চি

x ১৫/৮ ইঞ্চি। প্রতি পৃষ্ঠায় পাঁচটি পংক্তি। শুধু ৬৫-ক পৃষ্ঠায় ছ'টি পংক্তি) কালো কালিতে মোটা ধাতব নিবযুক্ত কলমে লেখা। সেকালের পুঁথি লেখার প্রচলিতরীতি এখানে অনুসৃত। তাই 'বর্ণ গুলির আকার ও প্রকারে, এক বর্ণ থেকে অপর বর্ণের বা এক পংক্তি থেকে অন্য পংক্তির দূরত্ব রক্ষায় যথাসম্ভব ঐক্য লক্ষিত হয়' (নীলরতন সেন 'চর্যাগীতিকোষ' ভূঃ পৃঃ ১৮-১৯)। এখানে ড/ড়, ট/ ঢ/ ঢ়, ব/চ, কৃ/ কু,/কচ/ ক, ছ/চ্ছ, ভ/ ত, ন/ল, নু/স্ব/ণ/স বর্ণগুলিতে লিপিগত ভ্রান্তি ও দুর্বোধ্যতা দেখা যায়। দুটি শব্দের মধ্যে ফাঁক না থাকায় পাঠোদ্ধারে জটিলতা ঘটেছে। যেমন 'অঠকমারী', 'অধ কমারী', 'অঠ কুমারী' শব্দটিতে। অনুরূপভাবে 'করুণা শূনমে হেরী' (শাস্ত্রী), 'করুণা শূন মেহরী' (প্রবোধচন্দ্র ও শহীদুল্লাহ), 'করুণা শূন মেহেরী', (তারাপদ মুখোপাধ্যায়) ও এবং 'করুণা শূন মেহেলী' (সুকুমার সেন) পাঠভেদ দৃষ্ট হয়। হরপ্রসাদ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখ পণ্ডিতগণ এর লিপিটিকে ১৩শ শতকে লেখা প্রাচীন বাংলালিপি বলেছেন। পদগুলির রচনাকাল ১০ম-১২শ শতক। মুনিদত্ত ১৩শ শতকে সংস্কৃত টীকাগুলি রচনা করেন। হরপ্রসাদ নেপালের অভিজ্ঞ পুঁথি লেখকদের দিয়ে মূল পুঁথিটির একটি অনুলিপি করিয়ে আনেন (বর্তমানে এশিয়াটিক সোসাইটি সংগ্রহ। নং ৮০৬৩)। লিপিটি নাগরীর মতো অর্বাচীন নেওয়ারী ('চর্যাগীতিকোষ', পৃঃ ২০)।

অধ্যাপক নীলরতন সেন নেপালী পুঁথি লেখকদের অভিমত অনুসারে বলেছেন মূল পুঁথিটি 'পুরানো নেওয়ারী লিপিতে লিখিত'। সেই সময় প্রাচীন বাংলা, অসমীয়া, মৈথিলী ও ওড়িয়া লিপির সঙ্গে নেওয়ারীর সাদৃশ্য ছিল। তিনি তাঁর 'চর্যাগীতিকোষ' গ্রন্থে চর্যার বর্ণমালা বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। তাঁর অনুসরণে জানাই, বিভিন্ন স্বরবর্ণ (অ, আ, উ, ঊ, এ) এবং ব্যঞ্জনবর্ণ (ক, খ, গ, ঘ, চ, ঝ, ঞ, ড, ণ, দ, ধ, ন, ফ, ম, য, ল, শ, ষ, স,) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বর্ণমালার সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত এবং অনেকাংশে আধুনিক বর্ণমালার মত। আ, ই, উ, ঋ, ও বা ঔ কারের ক্ষেত্রেও সেই কথা বলা চলে। ঋ, ঌ, ঐ, ঔ, চর্যায় বর্ণরূপে ব্যবহৃত হয় নি। অ-আ, ক, খ, ঠ, দ, ধ, প, ব, ল, স বর্ণগুলির দুটি করে রূপ দেখা যায়।

বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' (১৫ শ শঃ) পুরোপরি বাংলা বর্ণমালায় লেখা মধ্যযুগের প্রথম নিদর্শন। এতে প্রাচীন ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক উভয় ধরনের হস্তাক্ষর দেখা যায়।[৪০] উ ও ঊ শীর্ষচিহ্নহীন। ক দুধরনের দেখা যায়। চ, ট, ঢ, থ, শ পুরানো রীতি ধরে রেখেছে কিছুটা। ছ কোথাও প্রাচীন, কোথাও আধুনিক। ব এর পেট কেটে র করা হয়েছে। জ এর ডানদিকেব রেখাটি নেই। ঘ চর্যারীতিকে পুরো ত্যাগ করতে পারে নি। দেওপাড়া শিলালিপির অনেকগুলি বর্ণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বর্ণের সাদৃশ্য বর্তমান। এখান থেকেই বাংলা বর্ণমালা তার নিজস্বরূপ লাভ করে আধুনিকতার দিকে এগিয়ে গেছে।

একথা যথার্থ যে, বাংলার স্বাধীন সুলতান বা স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান ভূস্বামীদের অনুপ্রেরণায় নানাবিধ কাব্য রচনা এবং দলিল দস্তাবেজ ও নানা অসাহিত্যিক লেখালেখির মধ্য দিয়ে বাংলা বর্ণমালার চর্চা অব্যাহত থাকে। মালাধরের 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়', কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ',[৪১] বিভিন্ন কবির মঙ্গলকাব্য, পাঁচালী, ভাগবত ও মহাভারত, বৈষ্ণব পুঁথি, বিভিন্ন আঞ্চলিক লৌকিক দেবদেবীর মাহাত্ম্যকথা, জমিদারী কাগজপত্র (জলদান, ভূমিদান, পাট্টা, ফসলছাড়, তমশুকপত্র,

বন্ধকীপত্র, ভাষপত্র, ব্যক্তিগত চিঠিপত্র) ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে পাণ্ডুলিপির বর্ণমালার নানাবিধ পরিবর্তন ও বৈচিত্র্য সাধিত হয় । '

বর্তমান বাংলাদেশের বিভিন্ন সংগ্রহশালায় রক্ষিত বঙ্গাক্ষরে লেখা কয়েকটি সংস্কৃত পুঁথির কথা জানিয়েছেন কল্পনা ভৌমিক তাঁর 'পাণ্ডুলিপি পঠন সহায়িকা' গ্রন্থে । এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল শ্রীলক্ষ্মণদীক্ষিতের লেখা 'সারদাতিলক' (১৪৩৯ খ্রীঃ, ঢা. বিশ্ব. সং ৪৬০৮), 'মহাভারতবনপর্ব', (১৪৭১ খ্রীঃ, ঢা. বিশ্ব. ৪৯৫), 'অনেকার্থকোষ' (১৪৯৯ খ্রীঃ, ঢা. বি. ২৩৯৭), কবি কর্ণপুর রচিত 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' (১৫৭২ খ্রীঃ, ঢা. বি. ৪৫১৮), 'নারসিংহপুরাণ' (১৬৬৬ খ্রীঃ, ঢা. বি. ৩২৩), রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের 'মঠাদিপ্রতিষ্ঠা প্রয়োগ' (রামমালা গ্রন্থাগার ১২১৬, ১৬শ শতাব্দী) ইত্যাদি ।

প্রাক মুদ্রণযুগের বাংলার সমাজ ও সভ্যতার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল পুঁথি ও পাণ্ডুলিপির লিপিবৈচিত্র্য । বাংলা পুঁথির জনপ্রিয়তার প্রমাণ বাংলার বাইরে বা ভেতরে ভিন্নভাষী মানুষদের নিজস্ব বর্ণমালায় তার অনুলেখন । বেশীরভাগ পুঁথি বাংলা বর্ণে লেখা হলেও আরো যেসব লিপিতে বাংলা পুঁথির সন্ধান পাওয়া গেছে[৪২], সেগুলি হল আরবী, ওড়িয়া, কায়থী, নাগরী, নেওয়ারী, রোমান ও সিলেটী নাগরী লিপি ।

১৮শ শতাব্দীতে বা তার পূর্বে চট্টগ্রাম অঞ্চলের মুসলমান সম্প্রদায় বাংলা পুঁথি লেখার জন্যে ফারসী-আরবী লিপির ব্যবহার করেন ।[৪৩] চট্টগ্রামের মুন্সী আবদুল করিম এবং কুমিল্লার মৌলবী আলী আহমদ এই ধরনের পুঁথি সংগ্রহ করেন ।[৪৪] পূর্ববঙ্গীয় আঞ্চলিক উচ্চারণরীতি এইসব পুঁথির অঙ্গে ধরা আছে । এই শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য পুঁথি 'যোগকালন্দর', 'নছিয়তনামা', মোহাম্মদ খান রচিত 'দর্জ্জাল নামা', সৈয়দ সুলতান রচিত 'ওফাত-ই-রসুল' শেখ চান্দ রচিত 'শাহদৌলা পীর বা তালিবনামা' ইত্যাদি । কোন কোন বাংলা পুঁথিতে (যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৫৯ সংখ্যক 'সাকিনা বিলাপ') আরবী হরফের লেখা দেখা যায় ।[৪৫]

বাংলাদেশের বিভিন্ন সংগ্রহে রক্ষিত আরবী লিপিতে এই ধরনের কয়েকটি বাংলা পুঁথি নাছির মহম্মদ রচিত 'শ্লোকপুঁথি', (স. পুঁ. ১৪৫), মোহাম্মদ খান রচিত 'মোক্তাল হোসেন', (স. পুঁ. ১৪৮), 'ইউনান দেশের পুঁথি' (অজ্ঞাত রচয়িতা, স. পুঁ. ১৪৯), ছমির উদ্দিন রচিত 'মাসায়েল' এবং বেনামাজীর পুঁথি (স. পুঁ. ১৫০), আলী খোন্দকার রচিত 'আল্লার নামের মাহাত্ম্য' (স. পুঁ. ১৬৩), সৈয়দ আকবর রচিত 'জেবের মুল্লুক সামারুখ' (স.পুঁ. ১৭৫), মোহাম্মদ খান রচিত 'কারবালা কাহিনী' (স. পুঁ, ১৯১), মোঃ জানু ও মুজাম্মিল রচিত 'জুমার নামাজের মাহাত্ম্য' এবং 'নীতিশাস্ত্রবার্ত্তা' (স. পুঁ. ১৯০), ছৈয়দ নুরুদ্দিন রচিত 'নছিয়তনামা' (স. পুঁ. ১৯৯) ইত্যাদি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় আরবী হরফে লেখা[৪৬] বাংলা পুঁথির সংখ্যা নেহাৎ অল্প নয় । এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শেখ মুতালিবের দুখানি 'কিফায়তুল মুসল্লিন' (৬৫৫, আ. ১৫০ বৎসরের প্রাচীন ও ১৯৫, আ. ১৭৫ বৎসরের প্রাচীন), 'কোরান পাঠের ফল' (৫৯২, আ ১৭৫ বৎসরের প্রাচীন), বালক ফকিরের 'চৌতিসার পুঁথি' (৬১৩, শতাধিক বৎসরের প্রাচীন), 'ছখিনা বিলাপ' (৩, শতাধিক বৎসরের প্রাচীন), কানু ফকিরের তিনখানি 'জ্ঞানসাগর' (৫০০, শতাধিক বৎসরের প্রাচীন, আ. ১৫০ বৎসরের প্রাচীন ও নং ১৩৯, শতাধিক বৎসরের

প্রাচীন)।

ফকির গরীব উল্লাহের 'আমির হামজা ' পুঁথি (ঢা. বি. ৩৩৮, ৬০৭ ইত্যাদি) উর্দু পুঁথির বাংলা তর্জমা। ইনিই প্রথম উর্দু-বাংলা মিশ্ররীতির পুঁথি রচনা করেন। একটি পুঁথিতে তিনি লিখেছেন (ঢা. বি. ৬০৭)[৪৭] ঃ-

"আমির হামজা কিশ্চা ফারসী কিতাব। ন বুঝিআ লোকের মনেত পাই তাব (তাপ)।। বঙ্গেত ফারসি ন জান এ সব লোকে। .... এই হেতু সেই কথা মুঞি রছিবার। নিজবুদ্ধি চিন্তিমনে কৈলুম অঙ্গিকার।। মুছলমানি কথা দেখি মনেহ ডরাই। রছিলে বাঙ্গালা ভাসে কোপে কি গোঁসাই।। লোক উপকার হেতু তেজি সেই ভএ। দরভারে রছিবারে ইশ্ছিলুম হৃদ এ।।"

এই ধরণের 'দোভাষী পুঁথির' নমুনা 'তন্বিয়তন্নেছা' (ঢা. বি. ৬৩৫), গোলাম মওলার 'সুলতান জমজমার গোলাম মওলা' (ঢা. বি. ৫৩৯), 'নসিয়ৎনামা' (ঢা. বি. ৬৫০-৫১) ইত্যাদি। মনে রাখতে হবে, মুসলমানি পুঁথি ডানদিক থেকে বামদিকে পাঠ্য।

বাংলা পুঁথি আরবী-ফারসীতে কেন লেখা হয়, তারও কারণ জানিয়েছেন পণ্ডিত আহমদ শরীফ। তাঁর মতে "আরবী হরফে লেখা পুঁথি কোনটারই বয়স ১০০/১২৫ বৎসরের উপরে নহে। ইংরেজ আমলে অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীতে ফারসী দরবারী ভাষার গৌরব-চ্যুত হইলে মুসলমানেরা ইংরাজী শিক্ষা না করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, ফলে মাদ্রাসাগুলিই তাহাদের আশ্রয় হয়। মাদ্রাসায় এই সেইদিন পর্যন্ত বাংলা ভাষার কদর ছিল না। উর্দু-ফারসীর মাধ্যমে শিক্ষিত মৌলবী মওলানারাই হয়ত নিজেদের সুবিধার জন্য আরবী হরফে বাংলা লেখার প্রচলন করেন। এই পদ্ধতিএকান্তভাবে চট্টগ্রামেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং তাহা বহুল প্রচলিত হয় নাই (পুথি পরিচিতি, আহমদ শরীফ, ১৯৫৮, পৃঃ ১৬৯)।"

বাংলা হরফে লেখা পুঁথি দেখেই যে আরবী হরফে তার প্রতিলিপি করা হোত, তার অন্যতম সাক্ষ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বারমাসী সংগ্রহ' (ঢা. বি. ৬৯৯-৭০৫) পুঁথির লিপিকরের বক্তব্য। তিনি লিখেছেন "বারমাস লেকা হইল আব লিখিব কি ! পূর্ব্বে ছিল বাঙ্গালা করিলাম আরবী।।" আবার, একথাও বলা হয়েছে 'আরবী হরফে সুষ্ঠুরূপে বাঙ্গালা লেখা চলে না'।

'ফারসী কেতাবের' বাংলা অনুবাদেরও বহুবিচিত্র তথ্য উপহার দিয়েছেন পুথিপ্রেমী পণ্ডিত আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ (পুথি পরিচিতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮, পৃঃ ৫১৫-১৬)। 'আহাকুলমসা' ফারসী কেতাবের বঙ্গানুবাদ 'শ্রীনামা' বা 'সির্নামা' রচনা করে কবি কাজী শেখ মনসুর লিখেছেন ঃ-

'বচন আরবি ভাসে সব সাস্ত্র মূল। বোজিতে ফারসী ভাসে কিতাব বহুল।। জত গুণিগণ সবে মনে প্রীতি ভাসি। আরবি ফারসী ভাসে দিলেক প্রকাসি।। বাঙ্গালা ন বোজে সব ফারসী কিতাব। ন বোজি কিতাব কথা মনে হএ তাব (তাপ)।। সবে বোলে বাঙ্গালের ভাসে এ কিতাব। শুনিতে পার এ জদি জাএ মনস্তাব।। তেকাজে বাঙ্গালা ভাসে ফারসী বচন। পদবন্দি করি কৈলুং পুস্তক গ্রহন।। 'আছাফল' মন (নাম) এক কিতাবের বানী। সব প্রচারিয়া দিলুং রাখি খানি ২।। ন পাইলে খানি ২ গুরুতে পুছিব। তত্ত্ব মনে গুরুভক্তি তাহা শুদ্ধি লৈব।।'

অন্যস্থানে কবি লিখেছেন, "আছিল আরবি ভাসে কিতাব প্রধান। আলিম চতুরে কৈল

ফারসি বাখান ।। আনিয়া ফারসী ভাস বাঙ্গালা করিলং । তার মৈধ্যে দোস গোনা এক ন চাহিলুং।।"

কবি আবদুল হাকিম তাঁর 'নুরনামা' কাব্যে 'দীর্ঘকৈফিয়ৎ' দিয়ে লিখেছেন, ফারসি-আরবীতে না লিখে কেন তিনি এ কাব্য বাংলায় লিখেছেন (ঢা. বি. ২৯৯) ঃ-

'কিতাব পড়িতে জার নাইক ঐভ্যাস । সে সবে কহিল মোতে মন হাবিলাস ।। তেকাজে নিবেদি বাঙ্গালা করিয়া রচন । নিজ পরিশ্রম তোস আমি সর্ব্বজন ।। য়ারবি ফারছি শাস্ত্রে নাই কোন রাগ । দেসি ভাসা বুজিতে ললাটে পুরে ভাগ ।। য়ারবি ফারছি হিন্দে নাই দুই মত । জদিভা লিখ এ আল্লা নবির ছিফাত ।। জেই দেশে জেই বাক্ক কহে নরগন । সেই বাক্ক বুঝে প্রভু য়াপ নিরঞ্জন।। সর্ব্ববাক্ষ বুঝে প্রভু কিবা হিন্দুয়ানি । বঙ্গ দেসি বাক্ষ কিবা জাত ইতি বানি ।।'

আরবী রচনাকে বাংলাতে অনুবাদ বা বর্ণান্তরিত করার কাজটি ইসলাম ধর্মের বিধানে যথার্থ ছিল কীনা সে বিষয়ে যাচ্ছি না । তবে কিছু কিছু ইসলামী পুঁথিতে বিচিত্র মন্তব্য লক্ষ্য করা যায় । যেমন, 'কিফায়তুল মুসল্লিন' পুঁথির (ঢ. বি. ৫৭৮) রচয়িতা শেখ মুতালিব লিখেছেন - আরবিত সকলে না বুজে ভালমন্দ । তেকারনে বাঙ্গালা রচিলুম পদবন্দ ।। মুছলমানী শাস্ত্রকথা বাঙ্গালা করিলুম । বহু পাপ হৈল মোর নিশ্চত্র জানিলুম ।। কিন্তু মাত্র ভরসা আছএ মনান্তরে। বুজি আ মুমিনে দোআ করিব আমারে ।। (পুঁথি পরিচিতি, আহমদ শরীফ, ১৯৫৮, পৃঃ ৭১) । আবদুন নবী তাঁর আরবী হরফে লেখা 'কোরানের কায়দা' পুঁথিতে (ঢা. বি. ৫৫) লিখেছেন - 'কোরানের লফ্জগুলি এথা না কহিলুম । কায়দা রছিতে ভয়ভীত হইলুম ।। কোরানের লাফজ হএ জবানি আল্লার । বঙ্গভাষে কৈতে তাকে মহা পাপকার ।।'

আবার, আবদুল হাকিম তাঁর 'নছিয়তনামা' পুঁথিতে (ঢা. বি. ৪০৬) বলেছেন - 'আরবী পড়িয়া বুঝ শাস্ত্রের বচন । জতেক এলেম মৈদ্দে আরবি প্রধান ।। আরবি পড়িতে যদি না পার কদাচিত । নিজ দেসী ভাসে সাস্ত্র পড়িতে উচিত ।।'

সীমান্তবাংলার জেলাগুলিতে বাংলা ভাষা লেখার জন্যে বিভিন্ন বর্ণমালা ব্যবহৃত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে, যেমন, মেদিনীপুরে ওড়িয়া, পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমে যথাক্রমে সিলেট নাগরী ও কায়থী এবং উত্তরবঙ্গের পশ্চিমাংশে মৈথিলী ।

দক্ষিণপশ্চিমবাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল উৎকল রাজ্যের এলাকাভুক্ত ছিল । ১৮শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে রচিত 'অন্নদামঙ্গলকাব্যে'র ৩য় খণ্ডে ভবানন্দের 'দেশবিদেশবর্ণন' অংশে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র লিখেছেন- 'মল্লভূমি কর্ণগড় দক্ষিণে রাখিয়া । বঙ্গের সীমা নেড়াদেউল দেখিয়া ।। এড়ায় মেদিনীপুর নারায়ণগড়ে । দাঁতন এড়ায়ে জলেশ্বরে ডেরা পড়ে ।।' (সাহিত্য পরিষৎ সং,১৩৫৭ ব.) । বর্তমান মেদিনীপুর জেলার কেশপুর থানার তলকুঁয়াই গ্রামের কামেশ্বর শিবের ঝামাপাথরের জগমোহনযুক্ত শিখর দেউলের শীর্ষদেশের আমলক অংশ ভেঙে যায় বহুদিন পূর্বে । ১৭শ শতাব্দীর এই মন্দিরটি নেড়া দেউল নামে পরিচিত । 'নেড়া' দেউল থেকে শুরু করে দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গেব মেদিনীপুর জেলাঞ্চল উৎকল সাহিত্য সংস্কৃতির প্রভাবে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয় । সীমান্তবাংলার এই অঞ্চলে উৎকলীয় অজস্র বাংলা পুঁথি যেমন অনুলিখিত হয়েছে তেমনি ওড়িশার অনেক কবি বাংলা বর্ণেই লিখেছেন উৎকলীয় কাব্যসাহিত্য (বর্তমান

লেখকের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাপত্রিকা 'সাহিত্যিকী', ১৯শ ও ২০শ বর্ষ, ১৩৮৯-৯০, শরৎ ও বসন্ত সংখ্যায় প্রকাশিত 'দক্ষিণরাঢ় উড়িশা সীমান্তের প্রাচীন কবি ও কাব্য' এবং মেদিনীপুর জেলাব এগরা থেকে প্রকাশিত 'শারদীয়া অভিজ্ঞান' ১৪০২তে 'প্রতিবেশী রাজ্যে পুঁথি শিল্প' রচনা দুটিতে এসব কথা বলা আছে।) । প্রয়াত অধ্যাপক বিষ্ণুপদ পাণ্ডার 'দ্বারিকাদাসের মনসামঙ্গল' কাব্যও তালপাতায় উৎকলীয় হরফে লেখা দুখানি পুঁথির ওপর ভিত্তি করেই সম্পাদিত । ওড়িশার ভুবনেশ্বর রাষ্ট্রীয় সংগ্রহশালায় এ ধরণের বেশ কিছু বাংলা পুঁথি আছে ।[৪৮] কাশীরাম দাসের মহাভারত বিরাটপর্ব, সনাতন বিদ্যাবাগীশের ভাগবতের কয়েকটি স্কন্ধ, কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ছাড়াও এখানে আছে আরো কিছু কিছু পুঁথি । অধ্যাপক পান্ডা বর্তমান লেখককে লেখা একাধিক চিঠিতে জানিয়েছিলেন, সতেরো শতক থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত সময়কালে দ্বিজ লোকনাথ, কবিকর্ণ (সত্যনারায়ণ ষোলপালা, মাধব রথ (চৈতন্যবিলাস), পুরুষোত্তম দাস, রঘুনাথ দাস, কবিপ্রসাদ, ভৃঙ্গবর রায়, ধনঞ্জয় ভঞ্জ, গোকুল রায়, নটবর দাস, নারায়ণ মর্দরাজ প্রমুখ কবিরা উৎকলীয় হরফে বাংলা কাব্য রচনা করেন । কবিচন্দ্র রামায়ণের বাংলা পুঁথিগুলি নানা সময় উৎকলীয় বর্ণমালায় লেখা হয় । কলকাতার বউবাজার অঞ্চল থেকে একসময় বর্তমান লেখক কবিকর্ণের (ষোলপালা)র মুদ্রিত বইগুলি সংগ্রহ করেছিলেন । উৎকলীয় বর্ণে এগুলি বিশুদ্ধ বাংলা । যেমন 'জন্মপালার' কিয়দংশঃ- 'পদ্মফুল রূপ হয়্যা সত্যনারায়ণ । দরিয়ার কিনারেতে ভাসিতেছিলেন ।। গোসল করিতেছিল যেথা দরিয়াতে । দেখিয়া সে পদ্মফুল উঠাইল হাতে ।। উঠাইয়া ফুল কন্যা এবার শুকিল । সত্যনারায়ণ তার গর্ভেতে রহিল ।। কপালে বিধির লেখা কে করিবে আন । শাহজাদী গভেতে রহিল ভগবান ।' সতেরো শতকে উৎকল কবি রঘুনাথ দাস তাঁর 'ভুবনমঙ্গলে' লিখেছেন, 'ওড্রদেশী হৈয়া কৈল বঙ্গলা বর্ণন । না লইবে রচন দোষ সব সাধুজন ।।'

মেদিনীপুর জেলার কাঁথি শহরের নীহার প্রেস সীমান্ত অঞ্চলের এমন অনেক পুঁথি সংগ্রহ করে ছেপেছিলেন যেগুলির ভাষা উৎকলীয়, কিন্তু হরফ বাংলা । সেইসব মুদ্রিত বইয়ের ওপরেই লেখা থাকত 'উৎকলীয় বঙ্গাক্ষরে ।' একথা বোধ হয় অনেকের জানা নেই যে, মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম ও কাঁথি মহকুমা সন্নিহিত ওড়িশার গ্রামে আজো বাংলা বর্ণে উৎকলীয় বিষয় বা উৎকলীয় বর্ণে বাংলা বিষয় রীতিমত লেখালেখি হয়ে থাকে ।'

প্রাচীন কাব্য, তন্ত্র, মহাকাব্য ও বৈষ্ণবপুঁথির বিপুল সংগ্রহ বরানগর শ্রীপাঠবাড়ি শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দিরের অধিকারে । এখানে আছে কয়েক হাজার সংস্কৃত-বাংলা পুঁথি । এখানে উৎকলীয় ভাষায় বাংলা বর্ণে লেখা কয়েকটি পুঁথি আছে, 'কৃষ্ণচরিত্র' (ব. পা. ৩২৮৬), পুরুষোত্তম দাসের 'গঙ্গার মাহাত্ম্য' (ঐ, ৩২৮৭), 'জাহ্নবী চরিত্র' (ঐ, ৩২৮৮), পদ্মলোচন নাড়ার 'দারুব্রহ্ম' (ঐ,৩২৮৯), 'ভাগবত নবম স্কন্দ' (ঐ, ৩২৯০), 'দশম স্কন্দ' (ঐ,৩২৯১) এবং তালপাতায় ধাতবশলাকায় খোদিত লিপির পুঁথি 'চৈতন্যচরিতামৃত' আদিলীলা (ঐ, ৩২৯২)।

১৯শ শতাব্দীর প্রথমদিকে বাংলার দুই প্রান্তে অর্থাৎ পশ্চিমে মানভূম পুরুলিয়া অঞ্চল এবং পূর্বে শ্রীহট্ট অঞ্চলে দেবনাগরী লিপি দুটি ভিন্ন রীতিতে লেখা হোত । ১২২৪ বঙ্গাব্দে

(১৮১৮ খ্রীঃ), বাংলার পশ্চিমপ্রান্তীয় নাগরী লিপিতে লেখা দুটি পুঁথি ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল (মোট নয়টি পালা) তাৎকালিক মানভূম জেলার লাড়া-পাপড়া গ্রাম থেকে ১৩১৫ বঙ্গাব্দে সংগ্রহ করেন বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ (বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদে রক্ষিত)। পুঁথিটি (সা. প. ৫২৯, ১৪১৮) মানভূম-পুরুলিয়া ও তৎসন্নিহিত এলাকায় প্রচলিত দেবনাগরী অক্ষরে বাংলা ভাষায় লেখা। বর্তমান পুরুলিয়া শহরের কয়েক কি. মি. উত্তরে, পঞ্চকোট চাকলার নাখদা পরগণার ডিমডিহা গ্রামের শ্রীপণ্ডিত পট্টনায়ক রুদড়া গ্রামের ছিরু মাঝির জন্য ১২২৪ বঙ্গাব্দের ১৪ শ্রাবণ পুঁথিখানি অনুলিপি করেন।[৪৯] ছোটনাগপুর অঞ্চল থেকেও বেশ কিছু এই জাতীয় পুঁথি সংগৃহীত হয়েছে, যেগুলি বর্তমানে বিশ্বভারতী সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত।[৫০] এই লিপিটি 'কায়থী' বা 'কয়থী' নামে পরিচিত।

শ্রীহট্ট অঞ্চলে প্রচলিত দেবনাগরী লিপিটি 'সিলেট নাগরী' নামে পরিচিত। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, "In Sylhet, a kind of modified Dev-nagari, called 'Silet Nagari' has a restricted use among the Local Musalmans, and this use of Nagari in distant East Bengal, and among Mohammedans, too, is explained as being the result of the influence of early Colonies of proselytising Moslems from upper India who wrote their Vernaculars, (Eastern and western Hindi dialects)in Deva-nagari - Persianised Hindi (or Urdu) being not yet in the field and taught it to the local converts : a tradition in employing this alphabet was thus established and has continued down to our times."[৫১] শ্রীহট্টবাসী এক শিক্ষিত মুসলমান আবদুল করিম (স্কুল ইন্সপেকটর) আরব ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে দেশে ফিরে শ্রীহট্টে প্রচলিত নাগরী অক্ষরের রূপ কিছুটা সংস্কার করে, ১৯শ শতাব্দীর ৬ষ্ঠ দশকে 'সিলেট নাগরী' বর্ণমালায় গ্রন্থমুদ্রণের বিষয়ে উদ্যোগী হন। পরবর্তীকালে এই বর্ণমালা চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও কাছাড় এলাকার মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। কলকাতার চিৎপুর রোডের জেনারেল প্রিন্টিং প্রেসে এই লিপির টাইপ তৈরী করে বই ছাপা হয়। শিয়ালদহের হামদী প্রেস, শ্রীহট্টের ইসলামিয়া প্রেস এই বর্ণমালায় বই ছাপানো শুরু করে। ৫টি স্বরবর্ণ ও ২৭টি ব্যঞ্জনবর্ণ নিয়ে এই বর্ণমালা। দেবনাগরীর অ, ঈ, উ, ঋ, ঐ, ঔ, ঙ, ণ এই বর্ণমালায় নেই।[৫২] এ বিষয়ে পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ প্রথম আলোচনা করেন।[৫৩] এই লিপির পুঁথি 'মুজমারাগ হরিবংশ'।

নাগরী অক্ষরে উল্লেখযোগ্য বাংলা পুঁথি সিউড়ির রতন লাইব্রেরী সংগ্রহের ১১৫৬ বঙ্গাব্দে লেখা 'কলাবতী সত্যনারায়ণ' এবং এশিয়াটিক সোসাইটির কৃষ্ণদাসের 'বর্ণপরিক্রমা' (এ. সো. ১৫৭৫)। বরানগর পাঠবাড়ি সংগ্রহের লোচনদাসের পদাবলী (ব. পা. ২৫৯৬), বাসুঘোষ পদাবলী (ব. পা. ২৬০৪), 'ছয় গোস্বামীর সূচক' (২৬১০), 'গীতচিন্তামণি' (২৬১৫, নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনা (২৫৭১,২৫৭৭), নারায়ণ দাসের 'উজ্জ্বল কিরণ' (ঐ, ৩২৮৪) পুঁথিগুলিও নাগরী অক্ষরে লেখা। বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের উখড়া নিম্বার্কমঠে প্রচুর নাগরী পুঁথি দেখেছিলাম।

মধ্যযুগীয় অসমীয়া পুঁথির বর্ণমালার মধ্যে তিনটি শ্রেণীর কথা বলা হয়েছে। আহোম

রাজার রাজধানী গড়গাঁওকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছিল 'গড়গাঁও লিপি'। সংস্কৃত টোল-চতুষ্পাঠীতে সৃষ্টি হয়েছিল 'বামুণীয়া লিপি'। রক্ষণশীল কায়স্থশ্রেণী যে লিপি অনুসরণ করতো, তাকে বলা হোত 'কায়থেলী লিপি'। প্রথমোক্ত লিপির ব্যবহার ঘটেছে রাজকীয় লিপিমালায়, বুরুঞ্জীপুঁথি লেখার কাজে। পঞ্জিকা ও সংস্কৃতপুঁথি লেখা হয়েছে 'বামণীয়া লিপিতে'। সাধারণ সমাজে প্রচলিত ছিল 'কায়থেলী লিপি'। অবশ্য কয়েকটি যুক্তাক্ষর ও বর্ণ ছাড়া তিনটি লিপির মধ্যে তেমন পার্থক্য দেখা যায় নি।

ভাস্কোডাগামার নেতৃত্বে কেরালার কালিকট বন্দরে প্রথম পর্তুগীজদের আগমন ঘটে। এরপর আসেন পর্তুগীজ ধর্মযাজকরা। বিদেশ থেকে 'রোমান টাইপে' ১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দে গোয়ায় প্রথম খ্রীষ্টধর্ম বিষয়ক বই ছাপা হয়। বাংলা দেশে তারা রোমান বর্ণমালা ব্যবহার করে ১৮শ শতাব্দীর প্রথমদিকে। ভূষণার জমিদারপুত্র দোম আন্তোনিও দা রোজারিও 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' বইটি লেখেন। বাংলা গদ্য ভাষার এই বইটি ছাপানোর জন্যে পর্তুগালে পাঠানো হয়। পর্তুগীজ মিশনারী মানোএল দা আস্সুম্পসাম্ ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ববঙ্গে 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' বইটি লেখেন। ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে এটি ইটালীর লিসবন শহরে রোমান হরফে ছাপা হয়। সাধারণ মানুষের হাতে এ বই না পৌঁছালেও ছাপার হরফে এটিই প্রথম বই।[৫৪] এর নিদর্শন নিম্নরূপ ঃ-

Sevilha xuhore eq grihoxto assilo, tahar nam Cirilo, xei Cirilo Quebol aq putro Jarmilo; tahare eto doea corilo Ze cono din tahare xiqhao na dilo, ebang xaxtio na dilo; xe zaha corite chahito taha corito.

'সেভিল্যা শুহরে এক গৃহস্থ আছিল, তাহার নাম সিরিলো; সেই সিরিলো কেবল এক পুত্রো জর্মাইলো ; তাহারে এতো দয়া করিল যে কোনো দিন তাহারে শিক্ষাও না দিল এবং শাস্তিও না দিল; সে যাহা করিতে চাহিত তাহা করিত।'

মানোএলের অপর বই 'Vocabulario em Idioma Bengalla e Partuguez' রোমান হরফে মুদ্রিত হয়। অনেক পরে বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাধারাণী' ও 'দুর্গেশনন্দিনী' যথাক্রমে ১৯১৯ ও ১৮৮১ সালে রোমান হরফেই ছাপা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের 'একোত্তরশতী' নাগরী হরফে মুদ্রিত হয়।[৫৫]

বিহারের মিথিলা ও দ্বারভাঙ্গা অঞ্চলের 'কায়স্থ বা নেওয়ার'রা নেপালে পুঁথিপত্র লেখার কাজ কবতেন। পূর্বভারতীয় 'কুটিললিপি' তাঁদের হাতে পড়ে রূপান্তরিত হয়ে 'নেওয়ারী লিপি' (মৈথিলী-বাংলা) নামে পরিচিত হয়। এই লিপির সঙ্গে বাংলা লিপির সাদৃশ্য আছে। চর্যাপদের পুঁথিতে নেওয়ারী বর্ণে সংশোধনের কথা বলেছেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রকাশিত 'নেপালে বাংলা নাটক', কাশীনাথের 'বিদ্যাবিলাপ', কৃষ্ণদেবের 'মহাভারত', গণেশের 'রামচরিত্র' ও ধনপতির 'মাধবানল কামকন্দলা' এই চারখানি নেওয়ারী নাটকের সংকলন। প্রবোধচন্দ্র বাগচী ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের পরিষৎ পত্রিকায় (সংখ্যা ৩) এই ধরণের নেওয়ারী লিপির ২৩টি পুঁথির কথা বলেছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'গোপীচন্দ্র নাটক', 'উষাহরণ', 'কৃষ্ণচরিত্র', 'মদনচরিতকথা', 'কোলাসুর বধোপাখ্যান', 'অভিনব

প্রবোধচন্দ্রোদয়', 'ললিত কুবলয়াশ্ব', 'হরিশ্চন্দ্রকৃত্যম' ও 'শিবমহিমা' নাটক।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামে নেওয়ারী লিপির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পুঁথি আছে যেমন 'কারণ্ডব্যূহ' (ব. রি. ৮৫২;১০৯০ খ্রীঃ), 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' (ঐ, ৮৫১;১২৭৩ খ্রীঃ), 'করুণাপুণ্ডরীক তন্ত্রাবতার' (ঐ, ৭১৭; ১৫৯৪ খ্রীঃ) ও 'একল্লবীরচণ্ড মহারোষণ তন্ত্র' (ঐ, ৬২০; ১৮৪৪ খ্রীঃ)।

ছাপার হরফ

ছাপার উপযোগী বাংলা হরফ তৈরীতে উইলিয়ম বোল্টসের নাম স্মরণীয়। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে তিনি টাইপ নির্মাতা জোসেফ জ্যাকসনকে দিয়ে প্রথম বাংলা টাইপ তৈরী করান। কিন্তু সেই টাইপ নির্মাণের কাজ বেশ জটিল ছিল। তাই হলহেড সাহেব সেই টাইপ গ্রহণ করেন নি নিজের বই ছাপার সময়। এমন কী হলহেডের প্রথম বই 'A code of gentoo Laws' (১৭৭৫) তে বাংলা বর্ণমালার যে ব্লকটি মুদ্রিত হয় সেটিও খুব একটা পছন্দসই ছিল না। হলহেড এবং চার্লস উইলকিন্স দুই বন্ধু মিলে বাংলা ছাপার উপযোগী হরফ তৈরীতে উদ্যোগী হন। হুগলীর এণ্ড্রুস্ সাহেবের ছাপাখানায় সেই কাজ চলে। সেখানে এসে যোগ দিলেন হুগলী জেলার জিরাট-বলাগড়ের কর্মকারশিল্পী পঞ্চানন কর্মকার। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে খোদাই ও ঢালাই করা বাংলা টাইপে হুগলীতে ছাপা হল প্রথম বাংলা বই, ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসি হলহেডের 'এ গ্রামার অব দি বেঙ্গল ল্যাংগুয়েজ'। বাংলা টাইপ নির্মাণে পঞ্চানন, তাঁর জামাতা মনোহর এবং উইলকিন্স এদেশে পথিকৃত। বোল্টস্ বা পঞ্চাননরা যে বাংলা টাইপ তৈরী করেন, তা পুঁথির হরফের আদর্শে। হুগলী অঞ্চলের 'খুশমৎ' নামক এক মুনশির হাতের লেখা থেকেই বাংলা অক্ষর তৈরী হয়। আবার শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের বাংলা টাইপের আদর্শ ছিল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা হস্তলিপিশিক্ষক কালীকুমার রায়ের হস্তাক্ষর।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ জানুয়ারী শ্রীরামপুর মিসনের প্রেস তৈরী হয়। স্যার উইলিয়ম কেবী, মার্শম্যান, উইলিয়ম ওয়ার্ড প্রমুখ মিশনারীরা বাংলায় বাইবেল মুদ্রণ ছাড়াও গ্রামবাংলা থেকে বেশ কিছু পুরানো পুঁথি সংগ্রহ করে তা ছাপতে থাকেন। সরকারী কাগজপত্র ও বাংলা বই ছাপার কাজে যেন সাড়া পড়ে গেল।

আসাম প্রদেশের সাঁচিপাতায় লেখা পুঁথি সংগ্রহ করে মিশনারীরা ছেপেছিলেন। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে আত্মারাম শর্মাব 'অসমীয়া বাইবেল' বা 'ধর্মপুস্তক' শ্রীরামপুরে ছাপা হয়। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ঐ প্রেসেই ছাপা হয় রবিনসন সাহেবের 'অসমীয়া ব্যাকরণ' এই বইগুলির ধাতব হরফ সাঁচিপাতার পুঁথির বর্ণমালা অনুসারে তৈরী হয়। এখানে অসমীয়ার অন্তস্থ ব লেখা হয় যথাক্রমে ব এর পেট কেটে আর ব এর নিচে দাগ দিয়ে ....এইভাবে। এই রীতির অনুসরণ অনেক বাংলা পুঁথি এবং লিপিতেও দেখা গেছে।

টাইপ বা প্রেস তৈরী হলেও, তুলট বা তালপাতায় পুঁথি লেখার কাজ কিন্তু বন্ধ হয়ে যায় নি। কারণ মেশিনে পা দিয়ে ছাপা বইয়ের ব্যাপারে ব্রাহ্মণদের বেশ আপত্তি ছিল। তাছাড়াও 'অসাহিত্যিক' চিঠি পত্র, দলিল দস্তাবেজ, নথিপত্র ইত্যাদিতে বাংলা বর্ণমালার চর্চা তো চললই।

নানাক্ষেত্রে বাংলা বর্ণমালা

কেবলমাত্র তালপাতা, তেরেটপাতা, ভূর্জছাল বা তুলট কাগজের ওপর লেখা বললেই বাংলা বর্ণমালা চর্চার প্রসঙ্গ শেষ হয়ে যায় না । এদেশের বিভিন্ন প্রত্নবস্তুর অঙ্গে যে সব পরিচয় জ্ঞাপক লিপি আছে সেগুলির কথাও আলোচিত হওয়া দরকার । এই ধরনের লিপির সংখ্যা সবচেয়ে বেশী আছে বাংলার ইট-পাথরের মন্দির দেবালয়ের দেওয়ালে । পুরানো প্রাসাদেও কোন কোন স্থানে এ ধরণের লিপি আছে । এছাড়াও লোহা বা পিতলের কামান, খড়্গ, অস্ত্রশস্ত্র, পিতলের রথ, ধাতুনির্মিত দেবদেবীর মূর্তি, সিংহাসন, মৃতব্যক্তির স্মৃতিমন্দির, তুলসীমঞ্চ বা রাসমঞ্চ, পাথরের স্তম্ভ, মুদ্রা ইত্যাদিতে সংস্থাপিত বা খোদিত লিপিতে বাংলা বর্ণমালার বিচিত্র বিন্যাস লক্ষ্যণীয় । কবি-পণ্ডিতরা প্রথমে কাগজ বা তালপাতায় এই লিপিগুলি লিখে দিতেন । পরে কারিগররা সেগুলি নির্মিত শিল্পবস্তুতে খোদাই করতেন । মূল লিপির হুবহু প্রতিরূপটি লিপি ফলকে খোদিত হোত । ভুলভ্রান্তি ঘটে থাকলে তা খোদাই শিল্পির অজ্ঞতার ফলেই । তারা সকলেই বানানে পারদর্শী ছিল না । সুতরাং পুঁথি-পাণ্ডুলিপির বর্ণমালার বিবর্তনের ধারা মন্দির-পুরাবস্তুর লিপির বর্ণমালার সঙ্গেই সমান তালে পা ফেলে চলেছে ।

বীরভূম জেলার মুরারই থানার পাইকোড় গ্রামে পাইকোড় উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নিকট অবস্থিত 'নারায়ণ চত্বর' নামক পুষ্করিণীতীরে একটি পাথবের বেদীতে উত্তর পূর্বভারতে প্রচলিত প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে ছয় লাইন সংস্কৃত লিপি দেখা যায় । এই লিপিটি চেদীরাজ কর্ণের অর্থাৎ ১১শ শতাব্দী সময়কালের ।[৫৬] লিপিটি নিম্নরূপ ঃ-

১। শ্রী শ্রী গণপতি * * *

* * * * * *

২। দেবদ্বিজ গুরু ভজন্তো বৈষ্ণবাদয়ঃ স্বং ভিনত্তিদু * *

৩। নিবেদয়ন শ্রদ্ধয়াস্মিন কর্ম্মণি রাজশ্রীকর্ণদেবস্য * *

৪। স্বস্তি সমৃদ্ধরাট শ্রীচেদিরাজ্ঞ শ্রীকর্ণদেবস্য ধ্বনস্তি বা কীর্ত্তিপ্রশস্তি বিশালা

৬। স্বহস্তিয়ঃ বিশ্বকর্ম্মচরণ প্রসাদাৎ দেবীমূর্তি নৃর্ম্মিত্যং শ্রিয় শ্রীকার্ত্তি *

প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধারে 'সংকটে' পতিত এই অস্পষ্ট লিপিটির ভিন্নপাঠ দৃষ্ট হয় দেবকুমার চক্রবর্ত্তীর 'বীরভূম জেলার পুরাকীর্তি' গ্রন্থে (পৃঃ ৫২, ১৯৭২)।

পাইকোড় গ্রামের দ্বিতীয় শিলালিপিটি একটি মূর্তির পাদপীঠে খোদিত ঃ 'রাজ্যে শ্রীবিজয় সেন'।

এই প্রাচীন মন্দিরলিপিটি আজ অনেকাংশে অস্পষ্ট হয়ে গেলেও যা আছে তার সঙ্গে সমকালীন পুঁথির বর্ণমালার যেমন মিল, তেমনি অমিলও কোন কোন ক্ষেত্রে ।

বিভিন্ন ধাতুনির্মিত শিল্পবস্তুর গায়ে যে সব খোদিত লিপি দেখা যায়, সেগুলি নানা দিক থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ । দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি লোহার খাঁড়ার লিপি তুলে দেওয়া হল ।[৫৭]

মেদিনীপুর জেলার কেশিয়াড়ীর সর্বমঙ্গলা মন্দিরে রক্ষিত লোহার খাঁড়ার ওপর খোদাই

লিপি; 'শ্রী শ্রী' সর্বমঙ্গলা শ্রীচরণে স্বরণং। কারিগর শ্রী ভরত রাণা সাং সাঁতড়াপুর পঃ বাগভূম ১২০১/২২ আশ্বিন।' অর্থাৎ লিপিটি ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের। হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানার ডিহি মণ্ডলঘাট গ্রামের দক্ষিণাকালীর মন্দিরে রক্ষিত লোহার খাঁড়ার লিপিঃ '১০৮১ সাল' অর্থাৎ ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে। নদীয়া জেলার হরিণঘাটা থানার লাউফালা গ্রামের খাঁড়ার গায়ের লিপি 'শ্রীবেচারাম কর্মকার সাং লাউফালা'।

পশ্চিমবাংলার নানাস্থানে রক্ষিত লোহা বা পিতলের কামানের গায়েও কিছু কিছু খোদিত লিপি দেখা যায়। যেখানে পুরানো বাংলা বর্ণমালার সঙ্গে একালের মানুষের পরিচয় ঘটে।[৫৮] বাংলাদেশের ঢাকা মিউজিয়ামে রচিত একটি পিতলের কামানের লিপি 'সরকার শ্রীযুত ইছা খাঁর মসনদী কি সন হীজার ১০০২।'* অর্থাৎ লিপিটি ১৫৯৩-৯৪ খ্রীষ্টাব্দের। কোচবিহারের মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের সময়কার পিতলের জলকামানের গায়ে পুরানো বাংলা বর্ণমালায় খোদিত লিপি 'শ্রীকৃষ্ণপদনখচন্দ্রপ্রকাস (শ) মনোবিলাস - শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ভূপতি নির্ম্মিতং। স (শক) ১৫৩৩।' লিপিটির প্রতিটি অক্ষর এক ইঞ্চি পরিমাণ। ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে খোদিত এই লিপি সম্পর্কে গবেষক তারাপদ সাঁতরা, খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহমদের উক্তি উদ্ধৃত করে লিখেছেন, "পুরাতন বাঙ্গালা লিপির অতি সুন্দর এবং সুস্পষ্ট অক্ষর।" কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে রক্ষিত নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময় নির্মিত পিতলের কামানের গায়ে খোদিত ন' লাইন লিপি উল্লেখযোগ্য। মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা থানার মঙ্গলাপোতা থেকে প্রাপ্ত এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্ন অধিকারের মিউজিয়ামে রক্ষিত একটি পিতলের কামানের গায়ের লিপি[৫৯] "অখণ্ড প্র/তাপ শ্রীযুত/ জসমন্ত সিংহ/রাজা সন ১১৪৬/শ্রীব্রজকিশোর দাস কামার।" অপর লিপিটি 'শ্রীজগ/ন্নাথ দাস'।

বাংলার কর্মকার শিল্পের অনন্য নিদর্শন এদেশের পিতলের রথগুলি। এইসব রথের খোদাইকর্মের পাশে কোথাও কোথাও নির্মাতা বা শিল্পীদের নাম-ধাম, নির্মাণকাল ইত্যাদি তথ্যমূলক লিপিও দেখতে পাওয়া যায়।[৬০] বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস থানার শাসপুর গ্রামের পঞ্চরত্ন পিতলের রথের গায়ে খোদিত লিপিটি হলঃ 'শ্রীশ্রীরঘুনাথ জিউ/সন ১৩০২ সাল/পরিচায়ক গোপিনাথ কর্ম্মকার/মাধব দাস কৃত সাং/ পাতলাপুর।' বিষ্ণুপুর শহরের কৃষ্ণগঞ্জের পিতলের রথের (নির্মাণকালঃ ১৮৯৯ খ্রীঃ) বিভিন্ন খোদিত মূর্তির নীচে লিপি 'শ্রীসূর্যনাথ দে/সন ১৩০৬/ ২৫ আষাঢ়/শ্রীদ্বারিকানাথ দে;' 'শ্রীনিবাসচন্দ্র দে গড়গড়া/সন ১৩০৬ সাল তারিখ ২৫ আষাঢ়/ শ্রীরিশিকেশ দে/শ্রী রতন চন্দ্র দে/ শ্রীগোবিন্দলাল দে/সন ১৩০৬ সাল;' 'শ্রীফকিরচন্দ্র দে / শ্রীজিতিন্দ্র দেএর কৃত/ শ্রীঈশ্বরচন্দ্র দে/কৃষ্ণগঞ্জ।' 'শ্রীশ্রীলালজিউ/শ্রীগীরিশ্চন্দ্র দে/ পিতারং শ্রীগনেশ্চন্দ্র দে।' 'শ্রীশ্রীলালজিউ/কৃষ্ণগঞ্জ নিবাসি/শ্রীহৃদয়পাল'। বীরভূম জেলার জয়দেব কেঁদুলি-নিম্বার্কমঠের ন'চুড়ো পিতলেব রথটি নির্মাণ করেছিলেন স্থানীয় টিকরবেতা গ্রামের কর্মকার শিল্পীরা। এতে খোদিত লিপিটি এইরকম ঃ 'শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ শরণং/সূতৈ জসং রথং দত্বা

* 'বাংলা ভাষা ও বর্ণমালার ব্যবহার ঃ অতীত এবং বর্তমান,' বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর, ফেব্রুঃ, ১৯৯৪, পুস্তিকার আলোকচিত্রের সঙ্গে 'শ্রীযুত ইছা খাঁ বমসনদ। হি। সন হাজার ১০০২' পাঠটি অসম্পূর্ণ বলে মনে হয়।

শ্রীকৃষ্ণ প্রিতয়ে ময়া/শাকে রামেন্দুগজভু ফুল্লচন্দ্রেন যত্নতঃ/রাধাকৃষ্ণ প্রসাদেন বনমালীতি কর্ম্মিক/ নির্ম্মিত বহুযত্নেন ফুল্লচন্দ্রেনানুজ্ঞয়া/সন ১২৯৮ সাল তাং ২৫ আষাঢ় ।'

পঃ মেদিনীপুর জেলার কেশপুর থানার আনন্দপুর গ্রামের বাগ পরিবারের পঞ্চরত্ন রথ, বর্ধমান জেলার কাঁকসা থানার রায় পরিবারের রথ, ঐ জেলার মানকরের লক্ষ্মীজনার্দনের রথ এবং রাণীগঞ্জ শিয়ারশোল রাজবাড়ির রথের লিপি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ । শেষোক্ত রথের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লিপির পিতলের পাতটি সম্প্রতি অপহৃত হয়ে গিয়ে একটি মূল্যবান শিল্পবস্তুর নির্মাণ বিষয়ক 'পাথুরে প্রমাণ' চিরতরে হারিয়ে গেছে । লিপিটিতে লেখা ছিল, কলকাতার চিৎপুরের প্রসাদচন্দ্র দাস ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে রথটি নির্মাণ করেন ।

ধাতব মুদ্রায় বাংলা বর্ণমালা ব্যবহারের বেশ কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে । বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয়ের স্মারক মুদ্রায় 'গৌড় বিজয়ে' বাংলা লিপি দেখা যায় । হিজরী ৬০১ বা ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমদিককার এই বাংলা লিপিটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ । ১৫শ শতাব্দীর প্রথমদিকে (১৪১৭-১৪১৮) ভাতুড়িয়া পরগণার শক্তিশালী হিন্দুরাজা গণেশ বা দনুজমর্দনদেব গৌড়বঙ্গের সিংহাসন অধিকার করেন । তিনিই প্রথম হিন্দুরাজা, যিনি উত্তর ও পূর্বভারতে মুসলমান অধিকৃত কোন জনপদে নিজের নামে মুদ্রা তৈরী করেন এবং তাতে ভারতীয় ভাষায় ও বর্ণমালায় লিপি খোদাই করেন । এরপর মুদ্রায় বাংলা বর্ণমালার বেশ ব্যবহার ঘটেছে । তৎপুত্র মহেন্দ্রদেব, ত্রিপুরা-কামতাপুর-আসাম-আরাকান-কাছাড়-জয়ন্তীয়া রাজ্যের রাজারা বঙ্গ লিপিযুক্ত মুদ্রা তৈরী করান ।

বারাসত মহকুমার সাইবনা গ্রাম থেকে প্রাপ্ত এবং ১৯৮৬ সালের জুলাই মাসে কলকাতার ভারতীয় যাদুঘরে রক্ষিত নবাব সিরাজ উদ্দৌলার কলকাতা অভিযানের 'পাথুরে প্রমাণ', ব্যাসল্ট পাথরে বঙ্গাক্ষরে খোদিত লিপিটির কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় ।[১] শিলালিপিটির পাঠঃ 'শ্রীগণেশঃ/রঘুনাথ দত্তসুত, দত্ত অভিরাম/তার পুত্র চূড়ামণি পাকুড়িয়া ধাম/নবাব জাফর খান দুরন্ত হইলা /তার ভয় চূড়ামণি দত্ত পলাইলা/১১৩২ সনে জ্ঞাতি কুটুম্ব ছাডে শূন্য হইলা গ্রাম/ চূড়ামণি কলিকাতা করিলেন ধাম/নবাব সিরাজদ্দৌলা কলিকাতা লুটিলা/সেইকালে চূড়ামণি গ্রাম উদ্ধারিলা/১১৬২ সনে জঙ্গল কাটিয়া বাটি করিলা নির্মাণ/লিখিয়া আপন হাতে রাখিলা ধীমান ।। শকাব্দ ১৬৭৭ বড় ঝড় ১১৪৩ সনে বরগি ১১৪৮ সনে চৈত্রে' । ১১৩২ সন হল ১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দ ।

তবে এ বিষয়ে বোধ হয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্দির দেবালয়ের লিপিগুলি । ব-র, এ-ঐ, ও-ঔ-তু, খ-ঘ, এই সব বর্ণ ছাড়াও নানা যুক্তাক্ষর ব্যবহারে সেখানে বৈচিত্র্য ঘটেছে । কারণ পুঁথি ও পাণ্ডুলিপির বর্ণবৈচিত্র্যের মতই মন্দিরলিপির বর্ণবৈচিত্র্যও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ । যদিও লেখকের লিখে দেওয়া লিপি অনুসরণেই মন্দিরশিল্পীরা তা খোদাই করতেন, তাহলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে বৈচিত্র্য আদৌ ঘটে নি তা বলা যায় না : স্থানান্তরে পুঁথির লিপিতে যেমন লিপিকলাগত পার্থক্য দেখা যায়, এক্ষেত্রেও তা ঘটেছে, যদিও তা খুব গভীর বা ব্যাপক নয় । অধ্যাপক তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের কথা প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করি, " আমরা সকলেই বাঙ্গালা অক্ষরে লিখি: কিন্তু আমাদের সকলের লেখা এক নয়, আবার পৃথক নয় । আমাদের প্রত্যেকের অক্ষরের যে

সাধারণ বৈশিষ্ট্য সেটা এযুগের বাঙ্গালা অক্ষরের বৈশিষ্ট্য । কিন্তু আরো একটি বৈশিষ্ট্য আছে, যে বৈশিষ্ট্যে আমার লেখা দশজন বাঙ্গালীর লেখা থেকে পৃথক ('শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কলকাতা, আশ্বিন ১৩৭৮) ।'' এখানে তিনি লিপি এবং লিপিকরের বৈশিষ্ট্যের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ও সূত্রনির্দেশ ।।

১. Origin of the Bengali Script, R D Banerjee, Cal 1973, P 8

২ 'জাতক', ঈশানচন্দ্র ঘোষ, ১৩৯৭ ।

৩ Sanskrit English Dictionary, M M Williams, New Delhi 1986, P 742

৪ 'A Descriptive Catalogue of Prakrit and Sanskrit Inscriptions in the Epigraphy gallery of Indian Museum', Shyamal Kanti Chakravarty, Cal 1977 P 3

৫ 'Much more important was the Siddhamatrika script, developed during the 6th century A D from the western branch of the eastern gupta character The Siddhamatrika became the ancestor of the Nagari or Devnagari Script (sanskrit 'deva'[divine]) Nagari' [script of the city], which is the script used for sanskrit It is therefore the most important Indian script, consisting of 48 signs (14 Vowels and dipthongs and 34 basic consonants), in the common means of communication among learned men throughout India (Encyclo Britannica. 15th Edn 1989 Vol 29. P 1066)'

৯ম শতকের 'সিদ্ধমাতৃকা' লিপিতে খোদিত রাজা মহেন্দ্রপালদেবের ৫২ সেমি x ৩৭ ৫ সেমি আকারের তাম্রশাসন সম্প্রতি মালদহ জেলার হবিবপুর থানার জগজীবনপুর গ্রাম থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে (১.৩.৮৭)। উভয়দিকে মোট ৭২টি লাইনে সংস্কৃত ভাষায় লেখা, প্রায় ১২কিলো ওজনের এই ফলকটির রচয়িতা 'ব্রজেন্দ্র' । 'বাণীমাহত্তর' ভ্রাতা 'সামন্তশ্রী মাহত্তের' নামে খোদিত এই ফলকটি থেকে জানা যায় ঃ ভূমিদান উৎসবে সমাগত বিশিষ্টজনের সামনে রাজা এই ঘোষণা করছেন যে, তাঁর নির্মিত 'নন্দদির্ঘিকা উদবঙ্গ মহাবিহার' সংলগ্ন ভূমি তিনি তাঁর পিতামাতা ও বিশ্বমানবের পুণ্যলাভের জন্য বৌদ্ধবিহারের ভিক্ষুদের দ্বারা প্রজ্ঞাপারমিতা ও অন্যান্য বৌদ্ধদেবদেবী, মহাযানী শাখার অবৈবর্তিকা উপশাখার বোধিসত্ত্বগণ, অষ্টমহাপুরুষের পূজা এবং নানাবিধ ধর্মানুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলেন । ফলকটির ওপরের দিকে লাগানো আছে একটি পদ্মের মাঝে ধর্মচক্র, দুদিকে দুটি হরিণ । নীচে লিপি 'শ্রীমহেন্দ্রপালদেব' । এটি রাজার ৭ম রাজ্যাঙ্কে (৮৫৪ খ্রীঃ) ঘোষিত হয় ।

৬. 'বাঙ্গালার ইতিহাস' ১ম খণ্ড, রাখালদাস বন্দ্যোঃ কলকাতা ১৯৭১, পৃঃ ৭৬ ।

৭ ODBL Vol 'I' Cal 1985, P 60

৮ 'বিশ্বকোষ' সাক্ষরতা সং ১৯৮০ পৃঃ ১৯২-৯৩ ।

৯ 'ভাষার ইতিবৃত্ত' সুকুমার সেন, ১৯৬৮, পৃঃ ১৭ ।

১০ 'পশ্চিমবঙ্গে খরোষ্ঠী লিপি আবিষ্কার' রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, তটরেখা, মার্চ-এপ্রিল, আগরপাড়া, ১৯৮৯, পৃঃ ৭৮-৮৪ ।

১১ 'A cursive script written from right to left, Kharosti was used for commercial and Calligrahic purpose It was influenced somewhat by Brahmi, the other Indian script of the period, which eventually superseded it'- The New Encyclopaedia Britannica, Vol. 6, 15th Edn. 1989, P 833

"During the 5th century B C second of the prototypal of Indian alphabates - the Kharosti script came into being North West India (which was then under Persian Rule) the Kharosti alphabet is a direct descendant from the Aramaic alphabet" - Ibid, P 1065

১২. 'Indian paleography', Ahmed Hasan Dani, New Delhi, 1997, P. 251-272
১৩ Ibid
১৪ ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রাগুক্ত রচনা ছাড়াও আগ্রহী পাঠক তাঁর 'বাংলা লিপি ও ভাষার ইতিহাসের এক নতুন সূত্র' (দেশ, ২৯ ৮ ৯২) রচনাটি পড়ে দেখতে পারেন ।
১৫ ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত । 'Kharosti' And 'Kharoshti -Brahmi Incscriptions in West Bengal' B N Mukherjee, Indian Museum Bulletin, Cal, 1990
১৬ 'Origin of the Bengali Script', 1973, P 18
১৭. প্রাগুক্ত ।
১৮. প্রাকৃত ভাষায় প্রাক্‌মৌর্য ব্রাহ্মী অক্ষরে খোদিত এই লিপিটি কলকাতার ভারতীয় যাদুঘরে সংরক্ষিত (A 19720)।
১৯ বাঁকুড়া শহর থেকে উত্তরপশ্চিমে ২২ কি মি দূরে ছাতনা থানার শুশুনিয়া গ্রামের শুশুনিয়া পাহাড়ের (জে. এল. নং ৮৫) গুহায় খোদিত লিপিটি নিম্নরূপ ঃ
'চক্রস্বামিনঃ দাসাগ্রনাতিসৃষ্ট / পুষ্করণাধিপতের্ম্মহারাজ শ্রীসিংহবর্মণঃ পুত্রস্য / মহারাজ শ্রীচন্দ্রবর্ম্মণঃ কৃতিঃ ।' লিপিটির পাঠে নানা পাঠভেদ দেখা যায় ।
২০. ODBL , Vol. I, 1985, P. 224
২১. 'বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা', সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ক. বি. ১৯৯৬, পৃঃ ৯৮ ।
২২. 'বাংলা দেশের ইতিহাস' ১ম খণ্ড, রমেশচন্দ্র মজুমদার, কলকাতা ১৯৮১, পৃঃ ২০১ ।
২৩. Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol LXXIX Part I ,'Corpus of Bengal Inscription', Mukherjee & Maity, 1967, P 209
২৪ Cunningham's Archaeological Survey Report, Vol. III, P 126
২৫ 'শিলালেখ তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ', ড দীনেশচন্দ্র সরকার, ১৯৮২, পৃঃ. ১৪৯ ।
২৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৯-১৫৩ ।
২৭. 'A descriptive catalougue of the prakrit and sanskrit Inscriptions in the Eprigraphy gallery, Indian Museum', Shyamal Kanti Chakravarty, 1977, P 9
২৮. Epigraphia Indica, Vol. I P 305-315, Inscriptions of Bengal, Ed Nanigopal Mazumdar, Vol. III, P 42-56, 'Corpus of Bengal Inscriptions', Mukherjee & Maity, 1967, P 244-258.
২৯. Origin of the Bengali Script, P. 81
৩০. ঐ, p 81-84.
** ৮ম শতকের ধর্মপালের মহাবোধি লিপি, দেবপালের ঘোষ্রাবন লিপি (বীরদেব প্রশস্তি), ৯ম শতকের নারায়ণপালের গৌড় স্তম্ভলিপি ও ভাগলপুর তাম্রশাসন ও ৩য় বিগ্রহপালের আমগাছি তাম্রশাসনে যে প্রাচীন বাংলা অক্ষরকে দেখা গিয়েছিল তা এখানে অনেকটাই আধুনিক রূপ লাভ করেছে । কিন্তু উ, ক, গ, ন, চ, জ, ট, ড, ণ, দ, ধ, ন, প, বর্ণগুলি আধুনিক বাংলা বর্ণমালা হয়ে ওঠেনি ।
৩১. 'দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন', চিত্তরঞ্জন বন্দোপাধ্যায় সং, ১৯৮১, পৃঃ ২১ ।
৩২. 'বাঙ্গালা ভাষা প্রসঙ্গে', সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৯৭৫ (আলোকচিত্র) ।
৩৩. 'দেশ' ২৯ আগষ্ট, ১৯৯২, পৃঃ ৬১-৬৯ ।
৩৪. 'বাংলা লিপি ও ভাষার ইতিহাসের এক নতুন তথ্যসূত্র', ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় । ঐ ।
৩৫ পুরীর 'সিদ্ধবকুলপীঠে' মন্দির কর্তৃপক্ষ নানা চিহ্নসম্বলিত পোড়ামাটির ফলক ভক্তদের বিক্রয় করেন পবিত্র বকুলগাছে ঝোলানোর জন্যে ।
৩৬. 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ', ২য় খণ্ড, ১৯৮১, পৃঃ ৬৯৩-৭২৭ ।
৩৭. রাজা রামপাল কর্তৃক নিযুক্ত বজ্রাসন বিহারের উপাধ্যায় । পরে বিক্রমশীলা মহাবিহারের অধ্যক্ষ হন । তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ২৪ । সময়কাল ১১শ-১২শ শতাব্দী ।

৩৮. 'বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব,' নীহাররঞ্জন রায়, সংক্ষে. পৃঃ ৩৭০ ।

৩৯. মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে ইনিই বৌদ্ধচর্যাপদ রচয়িতা 'ভুসুকু' বা 'রাউতু', যিনি নিজেকে 'বাঙালী' বলেছেন । কিন্তু বর্তমানে ঐতিহাসিকরা এ সিদ্ধান্ত মানেন না ।

৪০ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথির লিপিকাল', রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, (দ্রঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, ১৩৮৫) ।

৪১ এদেশে পুঁথি সংগ্রহে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা জানেন , কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুঁথিই সবচেয়ে বেশী এবং সহজে পাওয়া যায় ।

৪২ 'পুঁথির পরে বই' যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য (দ্রঃ 'দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন'), সং চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৮১, পৃঃ ২১-২৮ ।

৪৩. ODBL Vol. I., S K Chatrterjee, 1985, P 228

৪৪.'আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংকলিত পুঁথি পরিচিতি', সং আহমদ সরীফ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮ ।

৪৫ ঐ, পৃঃ ৫১৪-৫১৫ । 'দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন', ১৯৮১, পৃঃ ২৩ ।

৪৬. 'আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংকলিত পুঁথি পরিচিতি', ১৯৫৮ ।

৪৭ ঐ, পৃঃ ৩ ।

৪৮ 'Illustrated Palmleaf Manucripts of Orissa' Orissa State Museum, 1984

৪৯ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', মদনমোহন কুমার সং, বঙ্গীয় সা. পরি. ১৩৮০, ভূমিকা ।

৫০. 'পুঁথি পরিচয়' ৪র্থ খণ্ড, শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল, বিশ্বভারতী, ১৯৮০, ভূমিকা পৃঃ ১৫ ।

৫১. ODBL , Vol. I, Suniti Kr Chatterjee, 1985, P. 234-35

৫২ 'লিপির উৎপত্তি ও বর্ণমালার বিকাশ', মদনমোহন কুমার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, বর্ষ ৮১, সংখ্যা ১, পৃঃ ৪৪-৪৫ ।

৫৩. 'সিলেট নাগরী', পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, বর্ষ ১৫, সংখ্যা ৪, পৃঃ ২৩৫-২৪৪ ।

৫৪ আঠারো শতকের শেষ দিকে ব্রিটিশ মিশনারীরা 'পুরাণো ছাঁচে সযত্নে হাতে লিখে পুঁথি চালিয়ে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারে উদ্যোগী হয় (দ্রঃ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস - ২, সুকুমার সেন, ১৩৮৬, পৃঃ ৫) ।

৫৫. 'দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন', ১৯৮১, পৃঃ ২৪ ।

৫৬. 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনাসংগ্রহ', ২য় খণ্ড, ১৯৮১, পৃঃ ৬৮৩-৮৪ ।

৫৭. 'বাংলার ধাতুশিল্প' তারাপদ সাঁতরা, কৌশিকী ১৯৯৮, পৃঃ ১১৩-১২০ ।

৫৮. প্রাগুক্ত ।

৫৯ 'জসবন্ত (যশোবন্ত) সিংহ' ছিলেন মেদিনীপুরের কর্ণগড় রাজ্যের অধিপতি । ঢাকার নায়েব-নাজিম সরফরাজ খাঁয়ের দেওয়ান ছিলেন ইনি । এঁর পিতা রাজারাম সিংহ ছিলেন নবাব নিযুক্ত কর্ণগড়ের ফৌজদার । পিতার মৃত্যুর পর যশোবন্ত কর্ণগড়ের সিংহাসনে বসেন । এঁরই আনুকূল্যে কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য 'শিবায়ন' (১৭২২ খ্রীঃ) কাব্য রচনা করেন ।

৬০. 'পিতলের রথ : ধাতুশিল্পের অনন্য নিদর্শন', তারাপদ সাঁতরা, কৌশিকী ১৯৯৬, পৃঃ ৪৩৩-৪৫৫ ।

৬১. 'বাতায়ন', শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী, দেশ, সহস্রাব্দ, ১১ ডিসে. ১৯৯৯, পৃ ১৬৯ ।

দুই

পাণ্ডুলিপি পরিচিতি

'পাণ্ডুলিপি' শব্দের অভিধানগত অর্থ হল খসড়া লেখা, মুসাবিদা, ছাপানোর জন্যে হাতে লেখা বই। এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, (পান্ডু = পন্ড + উ, কর্মবা/ শ্বেত পীতবর্ণ বা ফ্যাকাশে রঙ্ ; লিপি = লিপ্ + ই, কর্মবা। লেখন, অক্ষরবিন্যাস, বর্ণমালার লেখ্যরূপ) শ্বেতপীতবর্ণ বিশিষ্ট লেখনবিশেষ। ব্যাসদেবের 'অত্রিসংহিতা' অনুসরণে পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

'পাণ্ডুলেখেন ফলকে ভূমৌ বা প্রথমং লিখেৎ।
ন্যূনাধিকং তু সংশোধ্য পশ্চাৎপত্রে নিবেশয়েৎ।।'

'অর্থী (পূর্বপক্ষ, বাদী) সহজভাবে (অর্থাৎ ভয়াদি বিনা) যাহা বলিবে, প্রাড়্‌বিবাক (যিনি বিবাদবিষয় অর্থী ও প্রত্যর্থীকে জিজ্ঞাসা করিয়া সভ্যগণের সহিত মিলিতভাবে বিচার করেন'— যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ২/৩।) প্রথমে তাহা পাণ্ডুলেখ (খড়ি) দ্বারা ভূমিতে বা ফলকে লেখাইবেন, পরে তাহা শোধন করিয়া (অর্থাৎ অধিকাংশ ছাঁটিয়া ন্যূনাংশ পূরণ করিয়া) পত্রে লেখাইবেন। এই 'পাণ্ডুলেখ' লিখিত বিষয় এবং গৌণার্থে, প্রথমে কালিতে লিখিত ন্যূনাধিক্যযুক্ত পুস্তক - প্রবন্ধাদির বিষয়ও 'পাণ্ডুলেখ' বা 'পাণ্ডুলিপি'।[১]

সুতরাং কোন বিষয়ের স্থায়ীরূপ দেবার পূর্বে পাণ্ডুলিপি হল প্রাথমিক মুসাবিদা বা খসড়া, যাব কিছু অংশ বাদ দেওয়া যায় আবার সংশোধনেরও অবকাশ থাকে (এর ইংরেজী প্রতিশব্দ Manuscript)। অশোকের 'ব্রাহ্মীলিপি' তে 'লিপি' এবং 'খরোষ্ঠী' তে 'দিপি' শব্দ সৃষ্ট হয়। খ্রীষ্টপূর্ব যুগের রচনা পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'তে লিপি অর্থে লেখনী, মসী, বর্ণ, অক্ষর ইত্যাদিকে নির্দেশ করা হয়েছে।

প্রাকৃতিক নিয়মে যে কোন বস্তুই বিবর্ণ বা ধূসর (পাণ্ডুবর্ণ) হয়ে যায়। প্রাচীন কালে লেখার কাজ করা হত যে সব উপাদানে (যেমন, বৃক্ষের ছাল বা পাতা, পশুচর্ম, হাড়, ধাতু বা প্রস্তরফলক, পরবর্তীকালে হাতে তৈরি কাগজ), তা দীর্ঘদিনের ব্যবহারে পান্ডুবর্ণ হয়ে যেতো। এদেশে যে হাতে তৈরী তুলট কাগজে পুঁথি লেখা হোত, তাও ছিল ধূসর, পাণ্ডুবর্ণ। গ্রন্থাদি এই ধরণের পাণ্ডুবর্ণের কাগজে লেখা হোত বলেও তাকে 'পাণ্ডুলিপি' বলা হয়েছে।

ঠিক কোন সময় থেকে 'পাণ্ডুলিপি' কথাটির ব্যবহার শুরু হয়েছে, তা জানা যায় না। তবে এর ইংরেজী প্রতিশব্দ Manuscript এর সঙ্গে পাণ্ডুবর্ণের কাগজে লেখা ভারতীয় বিষয়ের মিল নেই। আবার পরবর্তীকালে নিতান্ত 'শুভ্র পত্র' অর্থাৎ কলে তৈরী কাগজে লেখা বিষয়ও সহজেই পাণ্ডুলিপি নামে পরিচিত।

আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, প্রাচীন কালে শিলালিপি বা তাম্রশাসনাদি খোদাই করার পূর্বে অন্য কোন আধারে তার খসড়া করে নেওয়া হোত। পরবর্তীকালে যে কোন হাতে লেখা লেখন 'পাণ্ডুলিপি' নামে পরিচিত হয়ে যায়। আজও, মুদ্রণালয়ে প্রেরণের পূর্বে প্রকাশ্য বা মুদ্রণযোগ্য বিষয় (১) হাতে লেখা হয়, (২) টাইপ করা হয়, (৩) কম্পিউটারে খসড়া করা হয়। সবই 'পাণ্ডুলিপি' রূপে গণ্য হবে।

শ্রেণীবিভাগ

আলোচনার সুবিধার্থে পাণ্ডুলিপিকে দুভাগ করা যায় ঃ (১) সাহিত্যিক পাণ্ডুলিপি, (২) অসাহিত্যিক পাণ্ডুলিপি।

সাহিত্যিক পাণ্ডুলিপি

বাংলার সাহিত্যিক পাণ্ডুলিপিগুলিকে সাধারণতঃ 'পুঁথি' বলা হয়ে থাকে। এটি দু'ধরণের। যেমন, 'কবির স্বহস্তলিখিত' (Autographic Text) এবং 'অনুলিখিত' (Transmitted Text)। প্রথম শ্রেণীর পুঁথি নিতান্তই দুর্লভ। দ্বিতীয় শ্রেণীর পুঁথি নিয়েই যত কাজ কারবার।

অবশ্য 'পুঁথি' শব্দে বই বা গ্রন্থ হলেও একালে হাতে লেখা পুরোনো সব বই 'পুঁথি' নামে পরিচিত। সংস্কৃত 'পুস্তিকা' শব্দ থেকে প্রাকৃতে 'পুত্থিয়া' ও পরে বাংলায় 'পুথি' বা 'স্বতোনাসিক্যী-ভবনে' 'পুঁথি।' পারসিক 'পুস্ত' শব্দের অর্থ চামড়া। উদ্ভবযুগে চামড়ার ওপর বই লেখার কাজ হতো বলেই বোধ হয় 'পুস্তক' শব্দটির সৃষ্টি। হিন্দি, পাঞ্জাবী, মারাঠা, গুজরাটী, মৈথিলী, সিন্ধি ও ওড়িয়া ভাষায় 'পোথী' শব্দটি প্রচলিত। অসমীয়াতে 'পুথি' ও 'পুথী' উভয়ই চলে। আধুনিক বাংলায় 'হুতোম প্যাঁচা' 'পুঁথী' লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথ 'পুঁথি' বানানটিই লিখতেন এবং পছন্দ করতেন। তাঁর মন্তব্য, "পুঁথি শব্দের চন্দ্রবিন্দুর লোপে পূর্ববঙ্গের প্রভাব দেখিতেছি, উহাতে আমার সম্মতি নাই (বাংলা শব্দতত্ত্ব, ১৩৯১, পৃঃ ২৯৯।" দুজন বিশিষ্ট পুঁথি সংগ্রাহক ও পরিচায়ক, প্রয়াত পঞ্চানন মণ্ডল 'পুঁথি' এবং অক্ষয় কুমার কয়াল 'পুথি' বানানের পক্ষপাতী।* আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'পুঁথি' লিখেছেন। 'শব্দকোষ' রচয়িতা পণ্ডিত হরিচরণ বন্দোপাধ্যায় 'পুঁথি', 'পুঁথী' 'পুথি' ও 'পুথী' এই চারটি বানানকেই স্বীকৃতি দিয়ে শব্দটির অর্থ করেছেন এই ভাবে ঃ ১. (প্রায়ই প্রাচীন) হস্তলিখিত পুস্তক ; ২. গ্রন্থ বা পুস্তক ; ৩. সন্দর্ভ। প্রথমোক্ত অর্থটিই সমধিক প্রচলিত।

আজকের দিনে সভ্যমানুষের জীবনে বইয়ের যেমন অসাধারণ ভূমিকা, সেকালেও জীবনযাপনের নানা অনুষঙ্গে পুঁথি ছিল এক অবিচ্ছেদ্য জীবনোপকরণ। বৈষ্ণবের আখড়া, আউল-বাউলের আখড়া, সাধারণ গৃহস্থ থেকে রাজা জমিদারের বাড়ি, কবিরাজের গৃহ, পাঠশালা, টোল-চৌপাড়ি, সর্বত্রই স্থানভেদে চৈতন্যজীবনী, পদাবলী, মীনগোর্খের হেঁয়ালী, মঙ্গল-কাব্য, পঞ্জিকা, রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত, কোকশাস্ত্র, কবিরাজী চিকিৎসা, ইত্যাদির হাতে লেখা পুঁথির কদর ছিল। বাঙালী জাতি সেই কোন সুদূর অতীতকাল থেকেই জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে হাতে লেখা পুঁথিকে সংযুক্ত করে নিয়েছিল। চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকে শুরু করে পাঁচালি, পদাবলী সমস্ত পুঁথির মধ্যেই বাঙালীর ঐতিহ্যলালিত জীবন ও সভ্যতার যথার্থ পরিচয়

নিহিত আছে। তাই বাঙালীর সভ্যতা-সংস্কৃতির মূল্যায়ণে এখানকার পুঁথিসাহিত্যের আলোচনা প্রয়োজন।

বিচিত্র জীবনযাপনের নানামুখী প্রয়োজনের দিক থেকে বিচার করলে বাংলা-সাহিত্যিক পুঁথিকে সাধারণভাবে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করলেও মনে রাখতে হবে, এই শ্রেণীকরণ সর্বদা যথার্থ হয় না। কেননা, ধর্মীয় পুঁথিগুলির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্য যেমন আছে, তেমনি সাহিত্যবিষয়ক পুঁথির ধর্মীয় মূল্যও কম নয়। বিশেষ করে মধ্যযুগীয় জীবনটাই তো ছিল ধর্মনির্ভর। আলোচনার সুবিধার্থে শ্রেণীবিভাগ নিম্নভাগে করা যেতে পারে —

ক. ধর্মীয় পুঁথি, খ. আনুষ্ঠানিক পুঁথি, গ. সাংস্কৃতিক পুঁথি ; ঘ. শিক্ষা-বিষয়ক পুঁথি ; ঙ. চিকিৎসা-বিষয়ক পুঁথি ; চ. স্থানমাহাত্ম্য বিষয়ক পুঁথি ; ছ. জীবনী ; জ. পীরসাহিত্য ; ঝ. ইসলামী পুঁথি।[৫] এই সব নানাধর্মী পুঁথির সাহায্যেই বাঙালীর শত শত বৎসরের ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজভাবনার অবিচ্ছিন্ন ধারাটি পুরুষানুক্রমে প্রবাহিত হয়ে এসেছে। এককথায় কয়েক শতাব্দীর বাঙালী জীবন যেন পুঁথিকে নির্ভর করেই পরিপুষ্টি লাভ করেছে। তাই বঙ্গীয় জীবন-সভ্যতা-কৃষ্টির যথাযথ মূল্যায়ণ করতে হলে এদেশের পুঁথি-সাহিত্যের পঠন-পাঠন, আলোচনা, সংগ্রহ নিতান্তই জরুরী।

অনুলিখিত পুঁথিগুলিকে প্রধানতঃ চারটি শ্রেনীতে ভাগ করা যায়।[৬] - ১. মূল পাণ্ডুলিপি (Original Manuscripts), ২. সুরক্ষিত লিপি (Protected Manuscripts), ৩. অরক্ষিত লিপি (Unprotected Manuscripts) ও ৪. সংশোধিত লিপি (Revised and corrected Manuscripts)। কবি বা রচয়িতার স্বহস্তলিখিত পুঁথিটি 'মূল পাণ্ডুলিপি'। বিভিন্ন রাজা বা শাসনকর্তার তত্ত্বাবধানে অনুলিখিত হয়েছে বহু পুঁথি। আদর্শ বা মূল পাণ্ডুলিপিকে সামনে রেখে দক্ষ লিপিকরদের দিয়ে যেসব পুঁথি সযত্নে ও অতিসাবধানে লেখানো হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট রাজা বা শাসনকর্তার পুঁথিশালায় যেগুলিকে সংরক্ষণ করা হয়েছে, সেগুলি 'সুরক্ষিত লিপি।' নেপাল রাজের গ্রন্থাগারের 'সুরক্ষিত লিপির' অনেক পুঁথি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী উদ্ধার করেন। অনেক লিপিকর লেখার সরঞ্জামসহ গ্রামে গ্রামে ঘুরে পুঁথি নকল করে বেড়াতেন বা নিজেরাও অনেক রেডিমেড্ পুঁথি নকল করে রাখতেন। দুর্বোধ্য হস্তাক্ষর, বানান ভুলে পূর্ণ এইসব পুঁথিলিপিকর স্বাধীন ভাবেই অনুলিপি করে যান। ফলে মূল বা আদর্শ পাণ্ডুলিপির সঙ্গে এইসব পুঁথির বহুলাংশে ব্যবধান ও অমিল লক্ষ্য কবা যায়। এগুলিই 'অরক্ষিত লিপি।' শিক্ষাদীক্ষাহীন, বানানে অজ্ঞ এইসব লিপিকরদের লেখা পুঁথিতে যেমন মূল পুঁথির কোন কোন অংশ পরিত্যক্ত, তেমনি অনেক 'প্রক্ষিপ্ত পাঠও' (Interpolation) লক্ষ্য কবা যায়। অরক্ষিত পুঁথির সংখ্যা এদেশে নেহাৎ কম নয়। অনুলিখিত পুঁথি বিশেষজ্ঞজন নিবিড়ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করে, পাঠ করে তার সংশোধন করতেন। মূল পুঁথির বাদ পড়া অংশ তিনি বিভিন্ন স্থানে (ঐ পাতায়) বসিয়ে দিতেন অথবা অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিতেন। অবশ্য ভুল বানান সংশোধন করার তেমন প্রচেষ্টা দেখা যায় না। কোন কোন পুঁথির বিভিন্ন অংশের টীকা-টীপ্পনীও করা হয়েছে। এটি অবশ্য সংস্কৃত পুঁথিতেই দেখা যায়। চর্যাপদের পুঁথিতে বাংলা ও দেবনাগরী অক্ষরে সংশোধনের চিহ্ন দেখা যায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত ১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে অনুলিখিত চণ্ডীমঙ্গলের

একটি পুঁথির সংশোধন পদ্ধতি বিশেষভাবে প্রশংসনীয় ।

যাই হোক, এইসব 'সাহিত্যিক পাণ্ডুলিপি'র অঙ্গে ধরা আছে মধ্যযুগের বাঙালীর সাহিত্য ও সংস্কৃতি ভাবনার নানাদিক, বাংলা বর্ণমালার বিচিত্ররূপ । উত্তর বা দক্ষিণ-বঙ্গ, পূর্ব বা পশ্চিমবঙ্গ যেখানেই বাংলা পুঁথি লেখা হোক না কেন, সর্বত্রই পুঁথি লেখার ক্ষেত্রে কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেছে । এইসব নানা কারণে পুঁথির সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও আলোচনা জরুরী ।

অসাহিত্যিক পাণ্ডুলিপি

সাহিত্য = সহিত + য (ষ্যঞ) । 'কাব্য বা পদ্যগদ্যময় সন্দর্ভ' ছাড়াও বেদ ইত্যাদি চতুর্দশ বিদ্যা, আয়ুর্বেদ-ধনুর্বেদ ইত্যাদি অষ্টাদশবিদ্যা, ছন্দ ও অলঙ্কার শাস্ত্র সবই সাহিত্য পদবাচ্য । আধুনিক বিচারে সাহিত্য সমাজদর্পণ । সুতরাং মানুষের জীবনযাপন, সংগ্রাম, ওঠা-পড়া, সবকিছুই সাহিত্যের বিষয়বস্তু । সেই দিক থেকে বিচার করলে 'অসাহিত্যিক পাণ্ডুলিপি' রূপে যাদের নির্দেশ করা হচ্ছে, তারাও বোধ হয় সাহিত্যপদবাচ্য । কেবল আলোচনার সুবিধার জন্যেই, অনিবার্য শ্রেণীকরণে, অসাহিত্যিক পাণ্ডুলিপি বলতে দলিল দস্তাবেজ, জমিদারী সেরেস্তার কাগজপত্র, দানপত্র, বিবাহের লগ্নপত্র, হিসাবের কাগজ, তমশুকপত্র, ভাষপত্র, ব্যবসাবাণিজ্য সংক্রান্ত নথিপত্র, কর্জপত্র, দাদনপত্র, শিক্ষাবিষয়ক পত্র, ব্যক্তিগত চিঠিপত্র, চুক্তিনামা, দাসখৎ (মানুষ বিক্রির দলিল), নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়ব্যয় সংক্রান্ত হিসাবের কাগজ সবকিছুকেই বোঝানো হচ্ছে । সাহিত্যসেবার উদ্দেশ্যে যদিও এগুলি রচিত হয়নি, তবু ছিন্ন-বিবর্ণ পাণ্ডুলিপির সাহিত্যিক মূল্য কম নয় ।

এইসব জীর্ণ কাগজপত্রের গুরুত্ব বহু পূর্বেই উপলব্ধি করা গেছে । সামাজিক ইতিহাস নির্মাণে এগুলি মূল্যবান উপকরণ ।

গ্রামবাংলার গৃহস্থ বাড়ির পরিত্যক্ত তোরঙ্গ বা সিন্দুক, মাটির বাড়ির তেতলার অন্ধকার কুঠরি, ঠাকুরবাড়ির কলুঙ্গি, জমিদারবাড়ির পরিত্যক্ত কাগজের স্তূপ, টোল বা চতুষ্পাঠী থেকে এধরণের বহু পুরোনো কাগজপত্র উদ্ধার করা হয়েছে । বাংলার উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুর প্রভাবে এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে এখানকাব বহু পুরোনো কাগজপত্র বিনষ্ট হয়ে গেছে । ভারত সরকারের পুরাতত্ত্ব বিষয়ক আইনে বলা আছে, ১০০ বছরের বেশী পুরোনো যে কোন দ্রব্য বা লিপি ইতিহাসের উপাদান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সম্পদ । অবজ্ঞা বা অনাদরে এগুলিকে বিনষ্ট না করে মহাফেজখানা বা নথি সংরক্ষণের প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণ করা উচিত । দুঃখের বিষয়, মানুষের অজ্ঞতা এবং জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি অনাগ্রহবশতঃ এধরণের বহু মূল্যবান উপকরণ এদেশে বিনষ্ট হয়ে গেছে ।

১৯২২ সালে, বীরভূম জেলার ইতিহাসকার শিবরতন মিত্র এই ধরণের চিঠিপত্র ও দলিল দস্তাবেজ সংগ্রহ করে একখানি বই লেখেন 'টাইপস্ অব আর্লি বেঙ্গলি প্রোজ ।' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় । প্রথম দিককার কাজ হিসেবে বইখানির গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না । ডঃ সুরেন্দ্র নাথ সেন ভারত সরকারের মহাফেজখানায় রক্ষিত বাংলায় লেখা কয়েকটি চিঠিপত্র ও দলিল গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন । এই গ্রন্থটিতে প্রকাশিত রেকর্ড ও

নথিপত্রের মাধ্যমে আঠারো শতক থেকে উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়কালে উত্তর ভারতের বিভিন্ন সরকারী ঘটনা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয় । অবশ্য এতে ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং তাদের কৃপাধন্য দেশীয় রাজা রাজড়াদের কথাই বেশী আলোচিত হয় । পরবর্তীকালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা বিভাগ থেকে প্রকাশিত হয় (১৯৫৩ খ্রীঃ, ডঃ পঞ্চানন মণ্ডলের চিঠিপত্রে সমাজচিত্র দু'খণ্ড) । এই বইদুটিকে বলা যেতে পারে জীর্ণ কাগজ ও চিঠিপত্র বিষয়ক এক আদর্শ গ্রন্থ । আজও এর থেকে কোন উৎকৃষ্ট গ্রন্থ (এই জাতীয়) লেখা হয়নি । তাই , অসাহিত্যিক নথিপত্র নিয়ে গবেষণার কাজ করতে গেলে এই বই দুখানিকে সামনে রাখতেই হবে । সমগ্র রাঢ় অঞ্চলের পল্লীবাসী মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভালমন্দ, সুখ-দুঃখ, সমাজচিন্তা, অর্থনীতি ও ধর্মনীতি বিষয়ক এক পূর্ণাঙ্গ চিত্র (১৮শ ১৯শ শতকের মূলতঃ) এ থেকে পাওয়া যায় । গ্রন্থের ভূমিকায় আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন,'ইহা পুরাতন ঘরোয়া পত্রের একটি সংকলন । সংকলয়িতার উদ্দেশ্য- এই পত্রগুলি হইতেই তখনকার সমাজের নানাদিক এবং পত্রলেখকগণের মনের কথা আধুনিক বাংলার পাঠক জানিতে পারিবে । .... যাঁহারা লিখিয়াছেন, তাঁহারা অতি সহজভাবে উপস্থিত তাগিদ মিটাইবার জন্য লিখিয়াছেন । তাঁহাদের আশা আকাঙ্ক্ষা বা হর্ষবিষাদ, ছোটোখাটো সাময়িক প্রয়োজন বা দীর্ঘস্থায়ী কায়েমী বন্দোবস্ত, এ সমস্তই কোনো রকমে সঙ্কোচ বা গোপন না করিয়া তাঁহারা জানাইয়াছেন ।" কবিগুরুর কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে আচার্য সুনীতিকুমার আরও লিখেছেন, "আজি যার জীবনের কথা তুচ্ছতম/ সেদিন শুনাবে তাহা কবিত্বের সম । সামান্য একটি উৎসবের ফর্দ কিংবা কোনো বিবাহের জন্য পত্র কিংবা সামাজিক অভয় বা প্রতিকাবপ্রার্থী কোন ভীত নিপীড়িত ব্যক্তির কাতরতা সংসারে নানা অভাব অভিযোগে মানুষের মনের বিতৃষ্ণা .... আমরা যেন চোখের সামনে ......দেখিতেছি ।"

উক্ত গ্রন্থরচয়িতা, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রীডার অধ্যাপক ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল, বর্তমান প্রতিবেদকের 'নথিপত্রে সেকালের সমাজ' গ্রন্থের ভূমিকাতে লিখেছেন, 'ইতিহাস রচনার দৃষ্টিকোণ বদল হয়েছে । পুরাতন দলিল দস্তাবেজ, চিঠিপত্রাদি থেকে তথ্য আহরণ করে বিশ্বভারতী ১৯৫০ সাল থেকে সামাজিক ইতিহাস রচনার প্রকল্প হাতে নিয়েছেন । এই প্রায়-অর্ধশতাব্দীর ব্যাপক উদ্যোগে আমাদের রাঢ় গবেষণা পর্যদের বহু ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেছেন । তন্মধ্যে ডঃ ত্রিপুরা বসু পুরোগামী । ..... দেশবাসীর নিকট আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, তাঁরা কেউ যেন তাঁদের বাড়িতে রক্ষিত পুরাতন দলিল দস্তাবেজ, চিঠিপত্রাদি বা যে কোন পুরানো কাগজপত্র আবর্জনা ভেবে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ না করেন । আমাদের শ্রীযুক্ত ত্রিপুরা বসু তার অন্যতম গ্রাহক ।"

ওপার বাংলাতেও এধরনের নথিপত্র বিষয়ক গবেষণার কাজ যে পুরোদমে চলেছে, তার অন্যতম দৃষ্টান্ত হল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বাংলা সমিতি' থেকে আনিসুজ্জামান সংকলিত ও সম্পাদিত প্রাচীন নথিপত্রের বই "দুশো বছরের বাংলা চিঠি ।"

দুঃখের বিষয় বাংলায় লেখা জীর্ণ চিঠিপত্র ও দলিল দস্তাবেজ নিয়ে গবেষণার কাজ পশ্চিমবাংলায় একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে । প্রাচীন পুঁথি গবেষণার প্রতিও আগ্রহ প্রায় নেই বলা

যায়। সম্প্রতি প্রকাশিত, মোহিত রায়ের 'নদীয়ার সমাজচিত্র' (১৯৯০) ও শ্যামল বেরার 'নথিপত্রে লোকজীবন' (২০০০) বই দুখানি তবুও বলার মতো বিষয়।

সেকালে মানুষ সাহিত্যকর্মে পয়ার বা ত্রিপদী ছন্দে পদ্য রচনা করত। কিন্তু ঘরোয়া বা ব্যবহারিক জীবনের কাগজপত্রে গদ্যই ব্যবহৃত হোত। ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে লেখা কুচবিহার রাজ নরনারায়ণের চিঠিখানি এজাতীয় প্রাচীনতম বাংলা গদ্যভাষার নির্দর্শন। ১৭ শ শতকের শেষদিক থেকে চিঠিপত্র ও দলিল দস্তাবেজে ফারসী শব্দের যথেচ্ছ অনুপ্রবেশ ঘটল। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত ১১০৩ বঙ্গাব্দের (১৬৯৭ খ্রীঃ) একটি বাংলা চুক্তিপত্রের আলোচনা দৃষ্ট হয় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গলা ভাষা প্রসঙ্গে'[৪] গ্রন্থের 'ব্রিটিশ মিউজিয়ামের কতকগুলি বাংলা কাগজপত্র' প্রবন্ধে। পত্রটিব পাঠ নিম্নরপ ঃ

শ্রীকৃষ্ণ
সাখি শ্রী ধর্ম্ম

শ্রীযুর্ত মিত্রিগই সাহেব মিত্রি গারবেল
মহাশহেষু লিখিতং শ্রীকৃষ্ণদাস উ
নরসিংহদাস আগে আমারা দুইলুকে
করার করিলাম জে কিছু বারে সুনা
রগায় উগর খরি করি সকরাত ২ দ্ব
ই রূপাইয়া কবিআ আরত দলালি লইব
আর কুন দায়া নাই খুরাক সমেত এই নি
অমে করা পত্র দিলাম স ১১০৩ তেং ১৫ আ
গ্রান

শ্রীকৃষ্ণদাস উ নরসিংহদাস

কিঞ্চিৎ পরবর্তী কালীন একটি 'পাট্টাপত্র' আমাদেরও হস্তগত হয়েছে (১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দ)।

১১৮৭ বঙ্গাব্দের ২৯ পৌষ (১৭৮১ খ্রী ঃ) মহারাজ নন্দকুমার পুত্র গুরুদাসকে লেখেন—
"প্রাণপ্রতিমেষু পরম শুভাশীর্বাদ শিরঞ্চ বিশেষ ঃ-
তোমার মঙ্গল সর্বদা বাসনা করণক অত্র কুশল পরন্তু '২৫ তারিখের ২৭ রোজ রাত্রে পাইয়া সমাচার জানিলাম শ্রীযুক্ত কেতরত আলি খাঁ এর এখানে আইশনের সম্বাদ জে লিখিয়াছিলেন এতক্ষণে তক পহুঁছেন নাই, পহুছিলেই জানা যাইবেক শ্রীযুক্ত জগৎচন্দ্র বিষ রোজের পর বাটি হইতে আসিযাছেন যেমত ২ কুচেটা পাইতেছেন আপনারি মন্দ করিতেছেন সে সকল লোকেও অবশ্য বুঝিবেক।"

বাংলা গদ্য ভাষার প্রথম সার্থক রূপকার পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মস্থান মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার বীরসিংহ গ্রাম। ঘাটাল ও আরামবাগ (মাঝে শিলাবতী নদী। এপারে মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমা, ওপারে হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমা বা তাৎকালিক জাহানাবাদ পরগণা। দুটি আধুনিক মহকুমা-অঞ্চলের সাংস্কৃতিক লেনদেনের বহু নিদর্শন আজো ছড়িয়ে আছে ঐ অঞ্চলের নানাস্থানে।) মহকুমার বিভিন্ন গ্রাম থেকে, বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবকালের পূর্ববর্তী বেশকিছু দলিল বা চিঠিপত্র উদ্ধার করা গেছে, যেগুলি থেকে প্রাক্-

বিদ্যাসাগর যুগের ঘাটাল-আরামবাগ (হুগলী জেলা) অঞ্চলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ সেপ্টেম্বর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মদিন। কথিত অঞ্চল থেকে সংগৃহীত হয়েছে ১৭২৩ খ্রীঃ, ১৭৬৬ খ্রীঃ, ১৭৬৯ খ্রীঃ, ১৭৭৪ খ্রীঃ, ১৮০৬ খ্রীঃ, ১৮০৭ খ্রীঃ লেখা দলিল ও বিভিন্ন পুরোনো লেখন, যেগুলি থেকে গ্রামবাংলার অখ্যাত অজ্ঞাত অঞ্চলের বাংলা বর্ণমালাচর্চার প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করা যায়। এইসব দানপত্র বা ছাড়পত্র থেকে জমিদারী উদারতার কিছু কিছু দৃষ্টান্ত দেখা যায়। ভাষপত্রগুলি সেকাল বাংলার ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং সমাজ শাসনের লিখিত প্রমাণ। গোয়ালে গরুর মৃত্যু বা আঙ্গুলে ইঁদুর কামড়ানোর ফলে পাপবশতঃ রক্ত বিষিয়ে যাওয়ার জন্যে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আজ হাস্যকর হলেও সেকালে জরুরী ছিল। তীর্থে গিয়ে অর্থাভাব ঘটলে তীর্থগুরু 'পাণ্ডা' তমশুকপত্র লিখিয়ে নিয়ে টাকা ধার দিতেন, সাক্ষী থাকতেন দেবতা। আর সেই টাকা নিয়মিত ভাবে কিস্তিতে পরিশোধ করা হত।

প্রথমেই আসা যাক বিবাহ সংক্রান্ত চিঠিপত্রে। বীরভূম জেলার দ্বারবাসিনীর লালমোহনদেব তাঁর কন্যার বিবাহে পণ ১৪ টাকা, দানসামগ্রী ১১ টাকা, আর বরযাত্রী বাবদে তিনটাকা ব্যয় করে ঋণগ্রস্ত হয়ে যান আঠারো শতকের প্রথম দিকে। ১৭৫২ সালে পাত্র নন্দলাল চট্টোপাধ্যায় একান্ন টাকা ঋণ করে বিবাহ করেন। দেড়টাকার বাতাসা, দুটাকার জিলাপী আর হরজাই সামান্য খরচ করেও সে সময় বিবাহ সম্পন্ন হয়। ন'আনার পোলাও, পাঁচ আনায় চার সের মাছ আর দেড় টাকার বাজার খরচে ১৮২২ সালে এক ধনী সদ্‌গোপ কন্যার বিবাহ মহা আড়ম্বরেই অনুষ্ঠিত হয়েছে। একালের মত সেকালেও পাত্র নিজের বিবাহের নিমন্ত্রণপত্র লিখতো। ১৮৭৩ সালে শ্বশুর গুরুচরণ বন্দোপাধ্যায় নিজের চেয়ে বয়সে অনেক বড় জামাতাকে চিঠিতে সম্বোধন করেছিলেন, "পরম পূজনীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত দীননাথ চট্টোপাধ্যায় বাবাজীবন দীর্ঘজীবেষু।" সেকালের কুলীণ ব্রাহ্মণদের বিবাহ করার প্রচণ্ড নেশার চিত্রটি বিদ্যাসাগর তাঁর "বহুবিবাহ প্রথম পুস্তকে" তুলে ধরেছেন। বসো গ্রামের ভোলানাথ বন্দোপাধ্যায় ৫৫ বৎসর পর্যন্ত ৮০টি, দেশমুখো গ্রামের ভগবান চট্টোপাধ্যায় ৬৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত ৭২টি এবং চিত্রশালী গ্রামের পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৫৫ বছর বয়স পর্যন্ত ৬২টি বিবাহ করেন। এছাড়া পুরোনো নথিপত্র থেকেই জানা যাচ্ছে মায়াপাড়া গ্রামের রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৬২টি, জয়রামপুরের নিমাই মুখোপাধ্যায় ৬০টি, আড়ুয়ার রমাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ৬০টি, সালগ্রামের দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় ৫৩টি, নগর গ্রামের ক্ষুদিরাম মুখোপাধ্যায় ৫৪টি বিবাহ করেন।

শুভ বিবাহের অব্যবহিত পরেই বেনারসী-সিঁথি পরেই অনেক মেয়ে নতুন বরকে ছেড়ে পালিয়ে যেতো পর পুরুষের সঙ্গে, প্রাক্‌বিবাহ প্রেমের পরিণতি স্বরূপ। খুঁজে নিয়ে আসার পর আবার, বার বার সেই মেয়ে পালিয়ে যেতো। যেমন ১৮১৯ সালে বর্ধমান জেলার দরিখিরপাই গ্রামের সিদাম পাগলের স্ত্রী এহেন কান্ড বার বার করতে থাকলে তাকে শেষ পর্যন্ত চিরতরে পরিত্যাগ করার জন্যে সিদাম ব্রাহ্মণ সমাজপতিদের নিকটে লিখিতভাবে অনুমতি প্রার্থনা করে। ১৮৪৮ সালে জনৈক হুগলীবাসী, মাগারাম চাষা ভগবতী চাষীনকে শাসিয়েছিল। কারণ, তার কন্যা চন্দ্রার সঙ্গে মাগারামের অবৈধ প্রণয়ের ফলে চন্দ্রা সন্তানসম্ভবা হয়। চন্দ্রার গর্ভপাতের

জন্যে ভগবতী যদি ওষুধ না খাওয়ায়, তাহলে মাগারাম ভগবতীকেই সাঙ্গিনী করে নিয়ে পালাবে- এই ছিল শাসানি। ওষুধ প্রয়োগের ফলে চন্দ্রা অবশ্য মারা যায়। উল্লেখ্য, মাগারাম ছিল চন্দ্রার নন্দাই। সুতরাং জামাতা ও শাশুড়ীর মধ্যেকার এই কুৎসিত সম্পর্কের বিষয়টিও সেকালের গ্রামজীবনে কখনও কখনও ঘটতো। নিজের বিবাহিতা কন্যা মুসলমানের আশ্রয় নিয়ে যে পাপ করেছিল তার প্রায়শ্চিত্তের আবেদন করেছিল ১৮০৫ সালে জনৈক পরীক্ষিত সৌ। ১৮৪৮ সালে বিধবা স্ত্রীলোক লক্ষ্মীবেরা রামলোচন রায়েব সঙ্গে ভালবাসা করে ঘর ছাড়ে। আবার রামলোচনকে ছেড়ে বেলডাঙ্গার কার্তিক চক্রবর্তীর সঙ্গে পালিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত বৈরাগ্য নেবার বাসনায় শ্রীমতী লক্ষ্মী রামলোচনের অনুমতি প্রার্থনা করেছিল।

সেকালের গ্রামশাসনের কেন্দ্রে থাকতেন গ্রামের সমাজপতি ব্রাহ্মণবাই। নানা প্রকার অপকর্ম বা দৈবদুর্বিপাকবশতঃ কোন দুর্ঘটনা ঘটলে মানুষের যে 'পাপ' হত, তা থেকে কীভাবে মুক্তি পাওয়া যাবে, সেই বিষয়ে আবেদন করতে হত সমাজপতিদের নিকট। সমাজপতিরা সেই আবেদনপত্রের ওপরেই ব্যবস্থা লিখে দিতেন। এধরণের কাগজগুলিকে বলা হত 'ভাষপত্র'। ব্যাধির আক্রমণেরও প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা হত। ১৮১৭ সালের পৌষমাসে মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার বসন্তপুর গ্রামের শ্যামচরণ ঘোষের পায়ে ইঁদুর কামড়ালে তা বিষিয়ে যায়, শ্যামচরণের মর মর অবস্থা। তাই প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেওয়া হয়। রোগ সেরেছিল কিনা জানা নেই। বীরভূম জেলার নানুর গ্রামের অর্জুন মেড়ের পুত্র রাজীব 'নীচ' জাতের মেয়ে নিয়ে পালিয়ে গেলে পরে প্রায়শ্চিত্ত করে 'শুদ্ধ' হয়ে আবার যথারীতি জাতে ওঠে।

চুক্তিপত্র লিখে সেকালে পাঠশালায় ছাত্র ভর্তি করা হত। নির্দিষ্ট সময়ের পরেও ছাত্র যদি পাঠশালায় কিছু শিখতে না পারে, তাহলে শিক্ষক লিখিত চুক্তি অনুযায়ী বাধ্য হতেন অভিভাবকের হাতে পারিশ্রমিকের নেওয়া অর্থ ফেরৎ দিতে। নওয়াপাড়া গ্রামের শেখ কালাচাঁদ, শিক্ষক সনাতন সরকারের পাঠশালায় ১২৬৬ বঙ্গাব্দে (১৮৫৯ খ্রীঃ) এই মর্মে চুক্তিপত্র লিখেই নিজের দুই পুত্র ফোজলু হোসেন ও তসুন্দক হোসেনকে পড়াতে পাঠায়। অপর একটি দলিলে শিক্ষক লিখে দিয়েছেন, "আমার একরার তক মাহিনা লইবো। কিংবা এই কর্মে আমার গাফিলি হয় তবে আমি এই চুক্তির টাকা বাদ দিব।" এছাড়াও সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় বা বন্ধক রাখা, ভূমিদান, দেলদান, খরা বা অন্য কোন কারণে প্রজাদের খাজনা মকুব করা বা ফসলছাড়, ব্যক্তিগত চিঠিপত্র, সুদের হিসাব, পারিবারিক খরচের ফর্দ, বাজারদর ইত্যাদি বিষয়ক নানাবিধ কাগজপত্রগুলি থেকেও সেকাল বাংলার সমাজজীবনের নানাতথ্য পাওয়া যায়। ১২৯০ বঙ্গাব্দে (১৮৮৪ খ্রীঃ) চারবিঘা তিনকাঠা জমির মূল্য নিরানব্বই টাকা বেশ চড়া দামই বলা চলে। বরং সেই তুলনায় ১৮০৯ সালে সাড়ে তিনবিঘা ধানীজমি সাড়ে তিনটাকা নগদে বিক্রি হয়েছে- একালে যা বিশ্বাস করা চলে না। আবার, কুঞ্জপুর পরগণার দুয়ারখোলা গ্রামের নবদ্বীপ মান্না নিতান্তই 'জলের দামে' মাত্র আশি টাকায় কোন এক দীননাথকে ২৭ বিঘা ৬ কাঠা জমি দলিল করে দিয়ে বিক্রি করে। ১২০০ বঙ্গাব্দে রামকিশোর রায় দত্ত ডিহিদারের পদের চাকরীতে মাসে বেতন পেতেন পাঁচটাকা। ১২০৫ বঙ্গাব্দে মহাজনী ব্যবসায় পাঁচটাকার বার্ষিক চারটাকা সুদ আমাদের বিস্মিত করে। দরিদ্র চাষী অভাবের সময় জমিদারের কাছ থেকে ধান-খড় ধার নিয়ে তা শোধ করতো

দ্বিগুন হিসেবে।

সবচেয়ে বেদনা দায়ক নথিগুলি হল মানুষ বিক্রির দলিল, দাসখৎ বা আত্মবিক্রয়পত্র গুলি। অভাবের তাড়নায় মানুষ যেমন নিজের স্ত্রী বা পুত্র-কন্যাকে অন্যের কাছে দলিল করে বিক্রি করতো, তেমনি নিজেকেও পুরুষানুক্রমে বিক্রি করে দিত বিত্তশালী মানুষের কাছে। এহেন ক্রীতদাস প্রথা যে আঠার-উনিশ শতকের বাংলাদেশে দিব্যি প্রচলিত তার প্রমাণ হল ঐ বিষয়ক নথিপত্র গুলি। কলকাতার যাদুঘরে রক্ষিত এবং কিছুদিন পূর্বে প্রকাশিত একটি আত্মবিক্রয় পত্র নিম্নরূপ ঃ—

৭ শ্রীশ্রী হরি ঃ ইয়াদিকীর্দ্দ শ্রীকৃষ্ণরাম মৌলিক সুচরিতেষু - লিখিতং শ্রীবদন চান্দ ওলদে শ্রীগঙ্গারাম চন্দ ও শ্রীমতি সরেস্বতি জত্তজে শ্রীবদনচান্দ চন্দ রাজিনামাপত্রমিদং কার্যাঞ্চ আগে আমরা স্ত্রী পুরুষ হই ও আমারদিগের পুত্র শ্রীডেঙ্গু চন্দ ওমর তিন বৎস্যর এহি তিনজন রিণ অর্থ উপহতিক্রমে আপনার স্থানে আপ্তবিক্রী হইযা নফরি ও দাস্যতার বশী হইয়া রাজিনামা দিলাম আপনার পুত্র পউত্রাদিক্রমে নকরি ও দাস্যতা আমার পুত্র পউত্রাদি-ক্রমে করিতে থাকিব এতদর্থে বশীনামাপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন বার সত্ত দস সন বাঙ্গালাতে ১৪ আশীন।[৫]

বিশ্বভারতী সংগ্রহশালায় রক্ষিত একটি দলিল থেকে জানা যায়, [৬] জনৈক রাধু দাস মাত্র ৫টাকার বিনিময়ে কন্যা তারণীকে জমিদার বৈদ্যনাথ রায়ের নিকট বিক্রয় করে দেয় চিরতরে। বর্ধমানের আত্মারাম বাগদী ৮ বছরেব পুত্র শ্যামকে ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে গ্যাসপাব সাহেবের কাছে দলিল করে বিক্রি করে- "সাত তংকা পাইয়া আমি স্বেচ্ছাপূর্বক তোমার স্থানে বিক্রয় করিলাম। তুমি ইহারে ব্যাতিত্বর ক্রিস্তাঙ্ করিয়া খোরাক পোষাক দিয়া আপন খেদমতে রাখহ। এই ছোকরার দানবিক্রয় সত্বাধিকার তোমার।"

১২৬৩ বঙ্গাব্দের ১২ চৈত্র (১৮৫৬ খ্রীঃ), গয়াতীর্থে গিয়েছিলেন মেদিনীপুর জেলাব দাসপুর থানার তাৎকালিক চেতুয়া পরগণার বলিহারপুর গ্রামের যজ্ঞেশ্বরী দেবী। সেখানে তিনি পাণ্ডার কাছে ৬টাকা ধার করেন এবং সেই টাকা আদায় নেবার জন্যে স্বহস্তে একটি তমশুকপত্র লিখে তাতে স্বাক্ষর করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সে সময় সারা দেশে শিক্ষাবিস্তারে ব্যাপক উদ্যোগ নিয়েছেন। অথচ তাঁর জানা ছিলনা, তাঁরই জন্মস্থান বীরসিংহ গ্রামের (মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমা) কয়েক কি. মি. দূরের একটি প্রত্যন্ত গ্রামে স্ত্রীশিক্ষার আলো কীভাবে প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছে। উল্লেখের বিষয়, এই লিখনটিতে সাক্ষী রাখা হয়েছে 'গদাধর বিষ্ণুকে।'

বর্ধমানরাজ কীর্তিচন্দ্রের নিকট বসন্তকুমার মাহাতোর লেখা কবুলতিপত্রটির ঐতিহাসিক বা সামাজিক গুরুত্ব আছে। তারিখবিহীন এই পত্রটি ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লেখা।[৭] কীর্তিচাঁদের জীবিতকালেই তাঁর পুত্র চিত্রসেন রায় ইন্দ্রায়ণী পরগণা ও সরকার মান্দারণের মণ্ডলঘাট (বর্তমান হাওড়া জেলার পশ্চিমাংশ) পরগণার জমিদারী লাভ করেন এবং তাই কবুলতি পত্র তাঁর কাছেই পেশ করার কথা। কিন্তু ১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দে চিত্রসেন জমিদারী পান। তাহলে উক্ত পত্রটি ১৭২৯ এর পূর্বে লেখা। পত্রটি নিম্নরূপ ঃ-

৭ শ্রীশ্রীহরিঃ ঃ—

স্বরনং।—

মহামহিম শ্রীজুক্ত রাজাধিরাজ মহারাজ কীৰ্ত্তিচন্দ রাঅ মহাসঅ ববাবরেসু ঃ-
লিখিতং শ্রীবসন্তকুমার মাহাতো কস্য কবুলতি পত্র মিদং সন ১২৪৫ সালের লেখনং কাজ্যনঞ্চাগে মহাসএর জমিদারির মধ্যে মণ্ডলঘাট পরগণার লাট কৃষ্ণানন্দপুরের সামিল মৌজে তাজপুর গ্রাম সেওয়ায় লাখেরাজ খেরাজি জমি হাসিল ও পতিত ও জঙ্গল ও বিল ও ঝিল ও পুস্কনি গয়রহ দরবস্তি বিমজ্জিম গ্রাম মজুকুরের কাগজাত তামাম আমি ২০০০০ হাজার টাকা পোনবাহাতে পত্তনি তালুক লইলাম ইহার মালগুজারি সালিআনা ২০০০০ হাজার টাকা সন সন মাফিক কীস্তীবন্দী মহাসএর নিকট সরবরাহ করিব কীস্তী খেলাপ হইআ জদ্যপি মালগুজারির টাকা দাখিল করি তবে ফি সতে ১ টাকার হিসাবে কীস্তী খেলাপের সুদ দিব আর বাট্টা ফি সতে ছয়আনা হারে দিব সন সন নাগাদি ৩০ চৈত্রের মধ্যে মালগুজারির টাকা মাঅ বাট্টা বেবাক সরবরাহ করিব তাহা না পারি তবে মাফিক আইন মহাসঅ য়ন্য তালুকদারকে মহল মযুকুর বন্দবস্ত করিবেন তাহাতে আমার কোনু আপত্তি নাই এই করারে পত্তনি তালুক লইআ কবুলতি লিখিআ দিলাম ইতি —[৮]

ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের মধ্যে দিয়ে সমাজজীবনের নানাদিকের চিত্র ফুটে ওঠে। 'অসাহিত্যিক' শ্রেণীভুক্ত এই শ্রেণীর 'লিখিত' পাণ্ডুলিপির সামাজিক-ইতিহাসগত মূল্য অনস্বীকার্য। বিশেষ ব্যক্তি বা মনীষীদের চিঠিপত্র তো আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখা ১২৭৬ বঙ্গাব্দের (১৮৭০ খ্রীঃ) এই পত্রখানি নানাদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ।ঃ—

শ্রী শ্রী হরিঃ শরণম্।

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ পিতৃদেব শ্রীচরণারবিন্দেষু —
প্রণতিপূৰ্ব্বকং নিবেদনম্ —

নানা কারণে আমার মনে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, আর আমার ক্ষণকালের জন্যেও সাংসারিক বিষয়ে লিপ্ত থাকিতে বা কাহারও সহিত কোন সংস্রব রাখিতে ইচ্ছা নাই। বিশেষতঃ ইদানিং আমার মনের ও শরীরের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে সাংসারিক বিষয়ে সংসৃষ্ট থাকিলে অধিকদিন বাঁচিব এরূপ বোধ হয় না। এ জন্য স্থির করিয়াছি, যতদূর পারি নিশ্চিন্ত হইয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ নিভৃত ভাবে অতিবাহিত করিব। এই সংকল্প করিয়া শ্রীমতী মাতৃদেবী প্রভৃতিকে যে পত্র লিখিয়াছি, তাহার প্রতিলিপি শ্রীচরণ সমীপে প্রেরিত হইতেছে, যদি ইচ্ছা হয় দৃষ্টি করিবেন।

সাংসারিক বিষয়ে আমার মত হতভাগ্য আর দেখিতে পাওয়া যায় না। সকলকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত প্রাণপণ যত্ন করিয়াছি, কিন্তু অবশেষে বুঝিতে পারিয়াছি, সে বিষয়ে কোন অংশে কৃতকার্য হইতে পারি নাই। যে সকলকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করে, সে কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারে না। এই প্রাচীন কথা কোনক্রমেই অযথা নহে, সংসারী লোকে যে সকল ব্যক্তির কাছে দয়া ও স্নেহের আকাঙ্ক্ষা করে, তাঁহাদের একজনেরও অন্তঃকরণে যে, আমার উপর দয়া ও স্নেহের লেশমাত্র নাই, সে বিষয়ে আমার অণুমাত্র সংশয় নাই। এরূপ অবস্থায় সাংসারিক বিষয়ে লিপ্ত থাকিয়া ক্লেশ ভোগ করা নিরবচ্ছিন্ন মূর্খতার কর্ম। যে সমস্ত কারণে আমার মনে

এরূপ সংস্কার জন্মিয়াছে, আর তাহার উল্লেখ করা অনাবশ্যক ।

এক্ষণে আপনকার শ্রীচরণে আমার বক্তব্য এই, পিতার নিকট পুত্রের পদে পদে অপরাধ ঘটিবার সম্ভাবনা, সুতরাং আপনার শ্রীচরণে কতবার কত বিষয়ে অপরাধী হইয়াছি তাহা বলা যায় না । তজ্জন্য কৃতাঞ্জলিপুটে কাতর বচনে শ্রীচরণে প্রার্থনা করিতেছি, কৃপা করিয়া এ অধম সন্তানের সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন ।

কার্যগতিকে ঋণে বিলক্ষণ আবদ্ধ হইযাছি । ঋণ পরিশোধ না হইলে, লোকালয় পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না । এক্ষণে যাহাতে সত্বর ঋণমুক্ত হই, তদ্বিষয়ে যথোচিত যত্ন ও পরিশ্রম করিতেছি । ঋণে নিষ্কৃতি পাইলেই কোন নির্জ্জন স্থানে গিয়া অবস্থিতি করিব । ... আপনকার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যয়নির্ব্বাহার্থে যাহা প্রেরিত হইয়া থাকে যতদিন আপনি শরীর ধারণ করিবেন, কোন কারণে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিবেক না । ইতি ২৫ অগ্রহায়ণ ।

১২৭৬ সাল, (স্বাক্ষর) ভৃত্য শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ—

সুতরাং, সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্কিত না হলেও এইসব অসাহিত্যিক পাণ্ডুলিপির গুরুত্ব যে কতখানি, তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না । যে কোন স্থানে এই ধরণের নথিপত্রের সন্ধান পেলে সেগুলির যথাযথ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার । কাগজ বা তালপাতা, যে কোন আধারেই লেখা হোক না কেন, পুরোনো লিপিমাত্রেই মূল্যবান - সে দলিল দস্তাবেজ, চিঠিপত্র হোক, বা হিসেবের কাগজ, যন্ত্র, ঠিকুজী, কোষ্ঠি, ব্যক্তিগত চিঠিপত্র, যাই হোক না কেন। বাংলা অক্ষরের বিবর্তনের অনুসন্ধানে যে কোন ধরণের পুরোনো পাণ্ডুলিপির গুরুত্ব অবিলম্বে দেশের মানুষের মধ্যে উপলব্ধ হওয়া দরকার । যদিও এগুলি প্রত্যক্ষ 'সাহিত্য চর্চার' বিষযভুক্ত নয়, কিন্তু এইসব লিপিলেখগুলির বর্ণমালাও যে অঞ্চলবিশেষে এক একটি লিখনকৌশলকে (Art) অনুসরণ করে এসেছে, তা যথাযথভাবে বিশ্লেষণের জন্যে এইসব লেখনগুলিকে পাদপ্রদীপের আলোকে আনয়ন করা একান্ত জরুরী ।

গ্রন্থপঞ্জী ও সূত্রনির্দেশ

১ 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' ২য় খণ্ড, হরিচরণ বন্দোপাধ্যায়, ১৯৭৮, পৃঃ ১৩০৭ ।

*'পুঁথি আর পুথি নিয়ে আমি বেশি বিচার বিবেচনা করিনি । আমার মনে হয়েছিল পুস্তক > পোত্থা > পুথি । হয়তো আমার ভুলও হতে পারে ।' লেখককে লেখা অক্ষয় কুমার কয়ালের পত্র (২১ ২ ২০০০) ।

২. 'আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংকলিত পুথি পরিচিতি', সম্পাদক আহমদ শরীফ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮

৩ 'মধ্যযুগের কাব্যপাঠ', ড নির্মল দাস, ১৩৮৬ পৃঃ ১৬ ।

৪. 'বাঙ্গলা ভাষা প্রসঙ্গে', সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৯৭৫ ।

৫. 'কলকাতার যাদুঘরে', শ্যাম কাশ্যপের ধারাবাহিক রচনা, আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয় সংখ্যা । পত্রটি ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকার নিকটবর্তী ধামরাই গ্রামে লেখা হয় ।

৬ . বিশ্বভারতী নথি সংগ্রহ সং ১৪৯৩, দ্রঃ 'চিঠিপত্রে সমাজচিত্র', ১ম ও ২য় খণ্ড, পঞ্চানন মণ্ডল, বিশ্বভারতী, ১৯৬৮, ১৯৫৩ ।

৭ কীর্তিচাঁদের রাজত্বকাল ।

৮. বিশ্বভারতী সংগ্রহ, নথি সংখ্যা বি ৫৫২০ খ, দ্রঃ চিঠিপত্রে সমাজচিত্র, ২য় খণ্ড, পঞ্চানন মণ্ডল, ১৯৫৩, পৃঃ ৩৩১ ।

তিন

পাণ্ডুলিপির আকার ও লিখন উপকরণ

আকার

পাণ্ডু লিপির আকার আয়তন প্রধানতঃ উপাদানের আকার বা আয়তনের ওপর নির্ভর করলেও বিষয়ভেদে পাণ্ডুলিপির আকারে পার্থক্য ঘটে থাকে। সুতরাং কোন সময়ই পাণ্ডুলিপির আকাব নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বিন্যস্ত হতে পারে না। মৌয-ব্রাহ্মী বর্ণমালায রচিত (খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতক), বাংলাদেশের বগুড়া জেলার মহাস্থান থেকে প্রাপ্ত 'মহাস্থান শিলালিপি'টির আকার ৫.৮ সেমি. x ৮.৫ সেমি. x ২.২ সেমি.।[১] ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কৃত এই সরকারী আদেশনামা বিষযক লিপিটির মূল প্রস্তরটির (ঈযৎ হলুদবর্ণ বিশিষ্ট শক্ত চুনাপাথর) আকার জানা যায়নি। মধ্যপ্রদেশের ভারহুত থেকে প্রাপ্ত খ্রীঃ পূঃ ২য় শতকে শূঙ্গ-ব্রাহ্মী বর্ণমালায় খোদিত দুটি 'ভারহুত স্তম্ভলিপি'র আকার যথাক্রমে ৮৩ সেমি. x ৫০ সেমি. ও ৬১ সেমি x ৫০ সেমি.। উত্তরপ্রদেশের মথুরা থেকে প্রাপ্ত ১ম শতাব্দীর শিলালেখটির আকার ৪২ সেমি. x ৮০ সেমি। বিহারের বুদ্ধগয়া থেকে প্রাপ্ত 'সিদ্ধমাতৃকা'[১] লিপিমালায় লেখা (৫৮৮-৮৯ খ্রীষ্টাব্দ) 'মহানমনেব বুদ্ধগযা শিলালিপি'র আকার ৪৭ সেমি x ৫০ সেমি। রাজশাহী জেলার দেওপাড়া থেকে প্রাপ্ত ১১ শ শতাব্দীর দেওপাড়া শিলালেখাটির আকার ৫৪ সেমি x ২৬ সেমি। বিহারেব গোবিন্দপুর থেকে প্রাপ্ত ১২ শ শতকের 'গঙ্গাধরেব গোবিন্দপুর শিলালেখের' আকার ৬০.৫ সেমি. x ৪৩ সেমি.।

বৈগ্রাম তাম্রশাসনেব (৫ম শতাব্দী) আকার ১২.৫ সেমি. x ২২.৫ সেমি.। ওড়িশার গঞ্জাম থেকে প্রাপ্ত বাজা অনন্তবর্মার বল্লবেলুব অনুশাসনের' (১১ শ শতাব্দী) আকার ১৭.৫ সেমি. x ৭ সেমি.। বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার নৈহাটি থেকে প্রাপ্ত বল্লালসেনের (১২ শ শতাব্দী) তাম্রশাসনের আকার ৩৪.৫ সেমি. x ৩৮ সেমি.। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে, শিলালিপি তাম্রশাসনের ক্ষেত্রে আকারগত সাদৃশ্য প্রায় নেই। একই শাসক বা সম্রাটের রাজত্বকালে খোদিত একাধিক অনুশাসনের মধ্যেও সাদৃশ্য নেই। তালপাতার আকারে তাম্রশাসন খোদাই করে সেগুলি আংটার সাহায্যে পর পর জুড়ে দেবার কথা বলেছেন বুলার। তা দেখাও গেছে।

পুঁথি ও পাণ্ডুলিপির আকার-আয়তনের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য তালপাতা, তেরেট পাতা ও ভুর্জছালে লেখা পাণ্ডুলিপির আকার ক্ষুদ্র হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক কারণে তালপাতা ও তেরেটপাতা অপ্রশস্ত ও কিছুটা দীর্ঘ। তুলনামূলক ভাবে তালপাতা অপেক্ষা তেরেটপাতা কিছুটা প্রশস্ত হয়। কিন্তু তুলট কাগজে লেখা পুঁথির আকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে অনেকটাই বেশি হয় তাল বা

তেরেটপাতার তুলনায় । ৫০.০০ সেমি x ১৫ সেমি. থেকে ২৫.০০ সেমি. x ৮.০০ সেমি. আকারের তুলটের পুঁথির সংখ্যাই বেশি । আবার বৈষ্ণব পদাবলী লেখা হয়েছে ৪০ সেমি. x ২৫ সেমি. আকারের তুলট কাগজে । কবিকঙ্কণ চণ্ডীর ২৮ সেমি. x ১৮ সেমি. আকারের পুঁথি পাওয়া গেছে । পুঁথি লেখকের ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা কাগজের আকার অনুযায়ী পুঁথির আকারে হেরফের ঘটেছে । ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত, মঙ্গলকাব্য, জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গল পুঁথির আকার অনেকটাই বড় আকারের দেখা যাচ্ছে । তন্ত্র-মন্ত্র, যন্ত্র ইত্যাদি লেখা হয়েছে ৩২ সেমি. x ২২ সেমি. আকারের তুলট কাগজে । কোষ্ঠীর কাগজ জুড়ে জুড়ে দীর্ঘ করা হয়েছে । বইয়ের আকারে সেলাই করা পুঁথিও প্রচুর পাওয়া গেছে ।

অন্যদিকে দলিলদস্তাবেজ ও নথিপত্রের আকার গোড়ার দিকে ক্ষুদ্রাকার ছিল, পরবর্তীকালে, মুঘল শাসনব্যবস্থার শেষদিক থেকে (১৭শ শতাব্দীর শেষভাগ) দলিল দস্তাবেজের আকার বড় হতে থাকে । ব্রিটিশ সরকারের সময় থেকে কলের কাগজে দলিল লেখা শুরু হয় । অবশ্য তুলটের ব্যবহারও হয়েছে সমভাবে ।

লিখন উপকরণ

প্রাক্-অশোক ভারতবর্ষের মানুষেব কাছে লেখন-কৌশল কোন অজানা বিষয় ছিল না । পশ্চিমী-বিশ্বাসী এদেশীয় একদল পণ্ডিত প্রাণান্ত প্রচেষ্টা করেছেন এই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করতে যে প্রাক-অশোক ভারতবর্ষে লেখালেখির কাজ কেউ জানতো না । কিন্তু বরলি ও পিপরহা লিপি ছাড়াও আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের বিবরণ, বৌদ্ধ ও জৈনশাস্ত্র গ্রন্থ, কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র', খারবেল অনুশাসন, বৈদিক সাহিত্য, সংস্কৃত মহাকাব্য, অলবিরুনীর বিবরণ, এইসব নানাবিধ তথ্যের প্রমাণে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত যে অশোকের বহু আগে থেকেই এদেশের মানুষ লিখতে পড়তে জানতো । কোন বিদেশী উদ্যোগ নয়, লেখনরীতি ভারতবর্ষের প্রাক-আর্য জনগোষ্ঠীরই উদ্ভাবিত । হরপ্পা মহেঞ্জোদারোর সিলমোহরের লিপি বা তারও পূর্ববর্তী অজ্ঞাত যুগে এদেশের বিভিন্ন গুহাচিত্র, প্রতীকধর্মী চিত্রাবলীব (আলপনা ইত্যাদি) রহস্যময় আকৃতির মধ্যে আদিম ভারতীয় জন-গোষ্ঠীর লেখনকৌশল বিধৃত হয়ে আছে ।

ক. পত্র

জি. বুলার তাঁর 'Indian Paleography' রচনায় লেখন উপকরণগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করেছেন । যেমন ঃ-

(১) ভূর্জছাল (Birch bark), (২) কার্পাস নির্মিত বস্ত্র (Cotton cloth), (৩) কাষ্ঠফলক (Wooden boards), (৪) বৃক্ষপত্র (Leaves), যেমন তালপত্র, তেরেটপত্র, কদলিপত্র, শাল পত্র, (৫) প্রাণীজ উপাদান (Animal Substance), যেমন পশুচর্ম, হাতির দাঁত, (৬) ধাতুফলক (Metals), যেমন, স্বর্ণপট্ট, রৌপ্যপট্ট, সোনালি পদার্থে রঞ্জিত আধার (gilt), রৌপ্যরঞ্জিত তালপত্র, লৌহ-আধার (দিল্লির মেহরৌলি লৌহস্তম্ভ), টিন (ব্রিটিশ মিউজিয়াম সংগ্রহ), (৭) প্রস্তর বা পোড়ামাটির ফলক, (৮) কাগজ ।

'যোগিনীতন্ত্র' বলেছে, (উত্তরখণ্ড, ৭ম পটল, ১৪-১৭)ভূর্জপত্র, তেজপাতা, তাল বা

তেরেটপত্র, সোনা বা তাম্রফলক, কোন বৃক্ষত্বক, রৌপ্যপত্রেও লেখা চলে কিন্তু বসুদল (বক্‌পাতা), কেতকী পাতা, মৃৎফলক, রৌপ্যফলক ও বটপাতা শুভদায়ক নয়। কিন্তু অগুরুগাছের ছাল বা সাঁচিপাতা ও কেতকীপাতায় লেখা পুঁথি আসাম রাজ্যে বেশ কিছু পাওয়া গেছে। মৃৎফলকে খোদিত লিপির অভাব নেই এদেশে।

পণ্ডিত জি. এইচ. ওঝা তাঁর 'ভারতীয় প্রাচীন লিপিমালা' গ্রন্থে, তালপত্র, ভূর্জপত্র, রেশম বা কার্পাসবস্ত্র (পট), কাঠের পাটা, চর্ম, প্রস্তর, মৃৎফলক, স্বর্ণ-রৌপ্য-তাম্র-পিতল-কাংস্য-লৌহফলককে এদেশের লিখন উপকরণ রূপে নির্দেশ করেছেন (1993, P. 142-154)। প্রাচীন মিশরে লিপির উদ্ভব ঘটার পর লেখার জন্যে প্যাপিরাস নামক নলখাগড়া গাছের শুকনো কাণ্ডের অংশকে ব্যবহার করা হোত। নীলনদের দু'তীরে এই গাছ প্রচুর জন্মাতো। ঐ গাছের কান্ড পাৎলা করে চিরে গাছের পাতার ওপর সেগুলো আঠা দিয়ে জুড়ে তাকে রঙে ডুবিয়ে শুকিয়ে নেওয়া হোত। তার ওপর লেখার কাজ করা হোত। খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ সহস্রাব্দের এ ধরণেব নিদর্শন পাওয়া গেছে। এই প্যাপিরাস থেকেই 'পেপার' কথাটিব উদ্ভব।[৫]

'ব্যাস সংহিতা' অনুযায়ী —

'পূর্ব্বপক্ষং স্বভাবোক্তং প্রাড়্‌বিবাকোহভিলেখয়েৎ।
পাণ্ডুলেখেন ফলকে ততঃ পত্রে বিশোধিতম্‌।।'

বিবাদবিষয় অর্থী ও প্রত্যর্থীকে জিজ্ঞাসা করে সভাদের সঙ্গে মিলিতভাবে বিচার করে, প্রশ্নকারী 'প্রাড়্‌বিবাক' প্রথমে ভূমিতে খড়ি দিয়ে বা ফলকে লেখাবেন, পরে তা সংশোধন করে পত্রে লেখাবেন।

সুতরাং এই প্রাচীন রচনা থেকে পাণ্ডুলিপির যে উপকরণগুলির কথা জানা গেল সেগুলি হল খড়ি (পাণ্ডুলেখ), ভূমি ও ফলক। এছাড়া আরো নানাবিধ উপকরণে যে লেখালেখির কাজ হয়েছে, তার দৃষ্টান্তের অভাব নেই। প্রাচীন ভারতে, বিশেষতঃ খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ বা ৫ম শতাব্দীতে পাঠশালা, টোল বা এইধরণের দেশীয় শিক্ষালয়ের যে বহুল অস্তিত্ব ছিল সে বিষয়ে বিভিন্ন হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম শাস্ত্র নানা তথ্য দিয়েছে। বুলারের অভিমত ; আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার মত প্রাচীনকালেও এদেশে 'লেখ' বা লেখা, 'রূপ' বা সাহিত্যপাঠ এবং 'গণনা' বা যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগের নানা প্রকরণ শিক্ষার্থীরা শিখতো। কটাহক জাতক, মহাসুত সোমজাতক, কাম জাতক, পুণ্যনদী জাতক, চুল্লকালিংগ জাতক, অসদিস জাতক, রুরু জাতক, তেসকুন জাতক ইত্যাদি বৌদ্ধজাতক কাহিনীতে প্রাচীন ভারতের লেখনকর্মের যে সব সাক্ষ্য পাওয়া যায় তাতে নানা আধারে লেখার কথা বলা হয়েছে।

ভগবান বুদ্ধের 'মহাপরিনির্বাণের' এক শত বৎসর পরে, খ্রীঃ পূর্ব ৩৭০ অব্দে বৈশালীতে আহূত 'বৌদ্ধসঙ্গীতিতে' বৌদ্ধ জাতককাহিনীগুলি সঙ্কলিত হয়। খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীর প্রাচীন এই কাহিনীগুলি প্রাচীন ভারতীয় জীবনচর্যা সম্পর্কে নানা বৃত্তান্ত সরবরাহ করেছে।[৬] ১২৫ সংখ্যক কাহিনী 'কটাহক জাতক' থেকে জানা যায়, গর্ভদাস কটাহক প্রভুপুত্রের ফলক' বহন করে পাটশালায় যেত। 'অনীলচিত্ত জাতক' (১৫৬) থেকে জানা যায়, কাঠের খণ্ডগুলিতে বিভিন্ন অঙ্ক খোদাই করতো সূত্রধরেরা।

হিমালয়সন্নিহিত অঞ্চলে 'ভূর্জ' গাছ জন্মায় (BAETULA BHOJPATTR)। এব কাণ্ডের ওপর থেকে সংগৃহীত ছাল 'ভূর্জপত্র' নামে কথিত। বহু প্রাচীনকাল থেকে এদেশে এটি লেখার কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আলেকজাণ্ডারের ভারত বিজয়ের সময় এব ব্যবহার হোত (৩২৭ খ্রীঃ পূর্বাব্দ)। অলবিরুণী মধ্য ও উত্তরভারতে এর বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করেছেন। ৩ ফুট x ৬ ইঞ্চি আকারের ভূর্জপত্রকে প্রয়োজন মত কেটে লেখার কাজ করা হোত। একে দীর্ঘস্থায়ী ও মসৃণ করার জন্যে তৈলাক্ত পদার্থেব লেপন দেওযা হোত। লেখার পত্রগুলি আয়তাকার করে কেটে নিয়ে কালি দিয়ে লেখা হোত। মাঝে ছিদ্র কবে সুতো দিয়ে, ওপরে নিচে কাঠের পাটা দিয়ে পত্রগুলিকে বাঁধা হোত। সাধারণ পত্রের আকার দেখা গেছে দৈর্ঘে এক 'এল'(Ell) ও প্রস্থে এক 'স্পান' (Spun)- যা অলবিরুণী বলেছেন। ভূর্জপত্রে লেখা সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন আফগানিস্তানের খোটান থেকে প্রাপ্ত 'খরোষ্ঠী ধম্মপদ'। এটি লেখা হয়েছে খ্রীঃ ২য় বা ৩য় শতাব্দীতে (ওঝা, পৃঃ ১৪৪)। 'সংযুক্তাগম' নামক বৌদ্ধসূত্রের ভূর্জপত্রের লিপিটি খ্রীঃ ৪র্থ শতাব্দীর বলে অনুমিত (ঐ)। S M Katre সংগৃহীত তথ্যানুযায়ী, ১৮৮১ তে প্রাপ্ত, ভূর্জপত্রে সারদা লিপিতে লেখা 'বাকশালী পুঁথি' (৭ম শঃ) ও ১৮৯০ তে আবিষ্কৃত 'গিলগিট' পুঁথি (৭ম-৮ম শঃ), ভাবতে আবিষ্কৃত প্রাচীন পুঁথির নিদর্শন ('Introduction to Indian Textual Criticism', Poone, 1941, P. 132)। কালিদাসের বিদ্যাধর সুন্দরীরা ভূর্জপত্রে লিখেছেন হৃদয়ের নানা কথা। 'বিক্রমোর্বশীতে' উর্বশী পুরুরবার উদ্দেশ্যে পত্র লিখেছে ভূর্জ পত্রে। কাশ্মীবরাজ অনন্তের সভাকবি পণ্ডিত ও (১১শ শতকের) দার্শনিক ক্ষেমেন্দ্র লেখার কাজে ভূর্জপত্রের উল্লেখ করেছেন।

ভাবতের নানাস্থানেই তালগাছ (corypha umbra culifera) জন্মায়। এটি সহজলভ্য বস্তু বলে বহু প্রাচীনকাল থেকেই এদেশে তালপাতায় লেখার কাজ চলে আসছে। ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর অনুষ্ঠিত প্রথম বৌদ্ধমহাসংগীতিতে ধর্মীয় অনুশাসনগুলি শুকনো ও আকার মত কেটে নেওয়া তালপাতায় লেখা হয়।[৬] ভুর্জপত্রকেও তালপাতার আকারে কেটে নেওয়া হোত। খ্রীঃ ১ম শতাব্দীর 'তক্ষশীলা তাম্রলিপি'র ফলকগুলিকে শিল্পী তালপাতার আকারেই কেটে নিয়েছিল।[৭] খ্রীঃ ৭ম শতাব্দীতে লেখা হিউয়েন সাঙের বিবরণীতে এদেশে লেখার কাজে তালপাতা ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। দক্ষিণভারতের সমুদ্রতটে তালগাছ বেশী জন্মায়। সেগুলি একটু বিশেষ ধরণের। রাজস্থান-পাঞ্জাব অঞ্চলে তালগাছ কম জন্মায়। আবার ওড়িশা, বাংলা, বিহার, আসাম অঞ্চলে তালগাছ জন্মায় ব্যাপক। বৌদ্ধ জাতক কাহিনীতে 'পণন' (পত্র, পত্তা, পণনা) শব্দের উল্লেখ আছে। কটাহক জাতকে 'কটাহক' জাল 'চিঠি' দেখিয়ে নিজেকে বণিকপুত্র পরিচয় দিয়ে আর এক বণিক কন্যাকে বিবাহ করে। মহাসুতসোমজাতকে তক্ষশীলা বিহারের এক অধ্যাপক তাঁর প্রাক্তন ছাত্রকে 'পত্র' লিখেছিলেন। কামজাতকে এক রাজ্যত্যাগী রাজা ভাইকে নিজের রাজ্য দিয়ে বনবাসী হয়ে কোন এক গ্রামের মানুষের কাছে আতিথ্য লাভে ধন্য হয়ে, তাঁর ভাইকে এই মর্মে 'পত্র' লিখেছিলেন যে ঐ গ্রামবাসীদের যেন কোন কর না দিতে হয়। অনুরূপ 'পত্রের' সন্ধান পাওয়া যায় পুণ্যনদী জাতক, অসদিস জাতক, ইত্যাদির কাহিনীতে। এইসব পত্র সম্ভবতঃ তালপাতাতেই লেখা হয (দ্রঃ ওঝা, পৃঃ ১৪২)। 'ত্রিপিটক' প্রথম

তালপাতাতে লেখা হয় । কোন কোন পণ্ডিত এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যেও এমন কিছু কিছু শব্দ বা বিবরণ দেখা যায়, যা থেকে মনে হয়, দীর্ঘস্থায়ী তালপাতাই প্রাচীন ভারতে লেখার 'পত্র' রূপে ব্যবহৃত হয়েছে । কোন বিষয়ের পুস্তককে 'গ্রন্থ' বা 'সূত্র' বলা হয়েছে, যা তালপাতারই গুচ্ছ এবং তা সুতো দিয়েই গ্রন্থিত । 'স্কন্ধ', 'কাণ্ড', 'শাখা', 'বল্লী' শব্দগুলি বৃক্ষের পাতার সঙ্গেই সম্বন্ধযুক্ত । ওড়িশা ও দক্ষিণভারতে তালপাতায় লেখার রীতি বহুকাল ধরেই প্রচলিত । উত্তর ও উত্তর পূর্ব ভারতে বাঁশ বা শরের কলম ব্যবহৃত হলেও ওড়িশা ও দক্ষিণ ভারতে লৌহশলাকা বা ধাতব শলাকা ব্যবহৃত হয়েছে । তাম্রশাসনের সূত্রে জানা যায়,[৮] প্রথমে তাল পাতার ওপর বিষয়টি লেখা হোত, তারপর তা তাম্রশাসনে খোদাই করা হোত । খ্রীঃ ৭ম শতাব্দীতে নির্মিত ওড়িশার ভুবনেশ্বরে পরশুরামেশ্বর মন্দিরের অলঙ্করণে তালপাতার পাণ্ডুলিপি দৃষ্ট হয় । অনুরূপ দৃষ্টান্ত আছে ভুবনেশ্বরে ১০ম শতাব্দীর মুক্তেশ্বর মন্দির ও ১৩শ শতাব্দীর কোনারক সূর্যমন্দিরের ভাস্কর্যে। খুর্দা রোড্ রেলস্টেশনের নিকটবর্তী হরিপুরে ১১শ শতকের মন্দিরের অলঙ্করণে দেখা যায়, ব্যাসাসনে রাখা সুতোয় বাঁধা তাল পাতার পুঁথি পাঠরত এক পন্ডিত ব্যক্তিকে ।[৯] বস্তুতপক্ষে, দক্ষিণ ভারত থেকে শুরু করে ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গে লেখার কাজে তালপাতায় ব্যবহার কিছুদিন আগে পর্যন্ত ব্যাপক হয়েছে । আজও ওড়িশায় নবজাত শিশুর জন্মপত্রিকা, কোষ্ঠী-ঠিকুজী বা ধর্মীয় লিপি তাল পাতায় লেখা হয়। দেবতাদের উদ্দেশ্যে লেখা পবিত্র নিমন্ত্রণ পত্র 'দিয়ন নিমন্ত্রণ' তালপাতাতে লেখা হয় । বিবাহের আমন্ত্রণ পত্রও লেখা হয় তালপাতায় । পঞ্চাশ বৎসর আগেও পশ্চিমবাংলার মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলায়, তালপাতায় পুঁথিপত্র ও জন্মপত্রিকা লেখা হয়েছে । পাঠশালায় ছাত্ররা তালপাতায় বাঁশের কঞ্চির কলমে কালি দিয়ে হাতের লেখা অভ্যাস করত । পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে তালপাতায় লেখা বহু পুঁথিপত্র । ওড়িশার ভুবনেশ্বরে ওড়িশা রাজ্য সংগ্রহশালায় সংগৃহীত হয়েছে হাজার হাজার তালপাতার পুঁথি । এর মধ্যে সবচেয়ে পুরোনো পুঁথিটি ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রী শ্রীধর শর্মা কর্তৃক অনুলিখিত কবিচন্দ্র রায় দিবাকর মিশ্র রচিত 'অভিনব গীতগোবিন্দ' কাব্যের । এটি ওড়িশার গজপতিরাজ শ্রী পুরুষোত্তম দেবের উদ্দেশ্যে নিবেদিত । পশ্চিমবাংলার গ্রামে গ্রামে তালপাতায় লেখা পুরোনো পুঁথি আজো সহজেই সংগ্রহ করা যায় । কাঁচা তালপাতা কেটে নিয়ে তাকে প্রথমে ২/১ দিন স্বল্প সূর্যালোকে শুকিয়ে তা জলাশয়ে ডুবিয়ে[১০] রাখা হয় ৩/৪ দিন । এরপর তাকে রোদে শুকিয়ে সমতল অংশগুলি কেটে নিয়ে ভারী বস্তু দিয়ে চেপে রাখা হয় সমান করার জন্যে । লেখা শুরু করার আগে পাতাগুলিকে আয়তাকারে সমানভাবে কেটে নেওয়া হয় ।[১১] পাথর বা শাঁখ দিয়ে ঘষে ঘষে পাতাগুলিকে মসৃণ করে নেওয়া হয় । দুভাবে তালপাতায় লেখার কাজ হয়েছে - কালি ও কলমে লিখে বা ধাতুর শলাকা দিয়ে খোদাই করে । গভীর নিষ্ঠা আর অসাধারণ ধৈর্যের সঙ্গে লোহার সূক্ষ্ম শলাকা (stylus) দিয়ে পাতার ওপর চেপে চেপে লেখা বা চিত্রাদি অঙ্কনের কাজ হোত । এরপর শিম পাতা বা 'কালকাসুন্দ' পাতা, নারকেল মালা পোড়ানো কাঠকয়লা, তেঁতুলবীজের আঁঠা ও তিল তেলের মিশ্রণে তৈরী আঠালো মণ্ড খোদিত তালপাতাগুলির ওপর ঘষে দেওয়া হোত । খোদিত অংশের মধ্যে সেই মণ্ড লেগে গেলে নরম কাপড়ের টুকরো

দিয়ে পাতাগুলি মুছে নেওয়া হোত। তালপাতায় শলাকার সাহায্যে চিত্রাঙ্কন করলে মাটি, গাছের পাতা বা খনিজ পদার্থ থেকে তৈবি রঙের প্রলেপ দেওয়া হত তালপাতার ওপর। আসামে অগর গাছের ছাল থেকে তৈবী সাঁচিপাতা পুঁথিলেখা বা আঁকার কাজে বহুল ব্যবহৃত উপাদান। 'আসাম বুরুঞ্জী'র বর্ণনানুযায়ী ১৫-১৬ বছরের গাছের ছাল তুলে কাঠের তক্তায় তাকে টান করে এঁটে রাখতে হয়। এরপর আকার মতো কেটে তাকে জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে। তারপর তাকে শুকিয়ে মসৃণ করে তার ওপর মাটি, হরিতাল বা মিহিগুঁড়ো কলার বীজ সেদ্ধ মণ্ড বা বেল আঠা মিশ্রিত হলুদের প্রলেপ দিয়ে শাঁখ দিয়ে ঘষে ঘষে মসৃণ করা হয়। তবেই তাতে আঁকা বা লেখার কাজ করা যাবে। লেখার সময় প্রতিটি পাতার মাঝে একটি নির্দিষ্ট স্থানে ক্ষুদ্র বর্গাকার স্থান ছেড়ে রাখা হোত সুতো বাঁধার জন্যে। পুরোনো তালপাতার পুঁথিতে এমন দুটি স্থান দেখা যায় যেখানে দুটি সুতো প্রবেশ করিয়ে পুঁথি বাঁধা হোত। চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথির মাঝে বর্গাকার শূন্য স্থান দৃষ্ট হয়। চর্যাপদ তালপাতায় লেখা। ধাতুর শলাকা দিয়ে খোদাই করে লেখা তালপাতার পুঁথি পশ্চিমবঙ্গে কম হলেও ওড়িশা বা দক্ষিণ ভারতে ব্যাপক হয়েছে (বর্তমান লেখকের সংগ্রহেও এধরণের একটি নাগরী লিপির বেশ পুরোনো পুথি আছে।) অ্যাডাম সাহেবের রিপোর্টে গ্রাম্যপাঠশালা, টোল-চতুষ্পাঠীতে তালপাতা, শালপাতা বা কলাপাতায় লেখার কথা উল্লিখিত। তালপাতায় পুঁথিপত্র লেখার কাজ ৪০-৪৫ বছর আগে পর্যন্ত গ্রাম বাংলায় হয়েছে। চিত্রবহুল প্রাচীন পুঁথিগুলি তো প্রায় সবই তালপাতায় লেখা। পালযুগে লেখা ও বহুবর্ণময় চিত্রে অলঙ্কৃত, কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত বৌদ্ধ পুঁথি 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' তালপাতাতেই লেখা।[১১] তালপাতাকে দীর্ঘস্থায়ী করার কোন রাসায়নিক কৌশল সেকালে প্রচলিত ছিল কীনা, তা অজ্ঞাত। কারণ পরবর্তীকালের অনেক তালপাতার পুথি নষ্ট হলেও পাল ও সেনযুগের তালপাতাব পুঁথিগুলি এখনও আছে। সংস্কৃত 'তাল' শব্দ আঞ্চলিক উচ্চারণে 'তাড়'। দু'ধরণের তালপাতার কথা বলা হয়ে থাকে- 'খড়তাড়' ও 'শ্রীতাড়'। এগুলি যথাক্রমে 'তাল' ও 'তেরেট' নামে পরিচিত। প্রথমটি স্থূল, স্বল্পাকৃতি, স্বল্পায়ু বিশিষ্ট। দ্বিতীয়টি সূক্ষ্ম, প্রসারণশীল, অনেকাংশে নমনীয়। এটি অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী (অধ্যাপক সরসীকুমার সরস্বতী তাঁর 'পালযুগের চিত্রকলা' গ্রন্থের 'আঙ্গিক কথা' অংশে এবিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন)। সেই নবম-দশম শতাব্দী থেকে এদেশে ব্যাপকভাবে তালপাতাতেই পুঁথিপত্র, ধর্মীয় লিপি ইত্যাদি লেখা হয়ে আসছে।

সাঁচিপাতের ওপর লেখার প্রচলন ছিল উত্তরপশ্চিম ভারতেও। হাতীর দাঁতের পাৎলা খণ্ডে লেখা দুটি লিপি আছে বৃটিশ মিউজিয়ামে, যা ভারত থেকেই প্রাপ্ত।[১২]

বৈদিকযুগে ব্রাহ্মণরা মৃগচর্ম ছাড়া অন্য যে কোন চামড়াকে অপবিত্র মনে করতেন। তবুও চামড়াতেও লেখার কাজ হয়েছে অতি সীমিত ক্ষেত্রে। সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা'য় এর সাক্ষ্য মেলে। জয়শল্মীরে প্রাপ্ত 'বৃহৎজ্ঞানকোষ' জৈনগ্রন্থ সংগ্রহশালায় একটি লিপিবিহীন চর্মখণ্ড পাওয়া গেছে।

কলহ ও রুরু জাতক সূত্রে জানা যায়, প্রাচীন ভারতে ব্যবসায়ীদের হিসাব, পারিবারিক নথিপত্র, কবিতা, ধর্মীয় অনুশাসন সোনার পাতে খোদিত হোত। কুরুধম্ম জাতকে দেখা যায়,

কুরুজাতির পাঁচ প্রধান ধর্ম অহিংসা, অস্তেয়, পরস্ত্রীগমণ নিষেধ, সত্যবাদিতা ও মদ্যপান নিষেধ রাজাজ্ঞায় সোনার পাতে খোদিত হয়'। তক্ষশীলার ধ্বংসাবশেষের নিকটবর্তী 'গঙ্গু' স্তূপ থেকে প্রাপ্ত 'খরোষ্ঠী' লিপিতে লেখা নিদর্শনের কথা বলেছেন বুলার। সোনালী পদার্থে রঞ্জিত (Gilt) তালপাতার লিপি আছে বৃটিশ মিউজিয়ামে।

রৌপ্য ফলকে খোদিত লিপির কথা জানা যাচ্ছে। এই ধরণের লিপি ভট্টিপ্রলুর স্তূপ (বুলার) এবং তক্ষশীলা থেকে পাওয়া গেছে (Journal of the Royal Asiatic Society 1914, P 975-76 ; 1915, P 192)। জৈনমন্দিরে মূর্তির সঙ্গে পূজাবেদীতে রাখা হয় রূপোর গোলাকার পট্ট। তাতে লেখা থাকে প্রণাম মন্ত্র 'নমো অরিহন্তাণং'। এছাড়াও থাকে বীজমন্ত্র খোদিত (হ্রীংবীজ) রৌপ্যফলক। জৈন সংস্কৃতিতে রৌপ্যফলকে লেখা খোদাই এক প্রাচীন রীতি বলে অনুমান হয়।

লিপিফলক নির্মাণে তামার ব্যবহার বহুকাল ধরে এদেশে প্রচলিত। এই ধাতুটির সহজলভ্যতা, নমনীয়তা এবং দীর্ঘস্থায়িত্বের কারণে ধর্মীয় অনুশাসন বা রাজকীয় লিখনে এটির ব্যবহার হয়েছে। রাজা বা সামন্তশ্রেণী দানপত্র বা সনদ খোদাই করেছেন তামার ফলক বা পাতে। এইসব দানপত্র, তাম্রপত্র, তাম্রশাসন বা শাসনপত্র রচনা করত মন্ত্রী বা অমাত্য, সন্ধিবিগ্রহিক, বলাধিকৃত বা অক্ষপটলিক (হিসাব রক্ষক) পদাধিকারীরা। কল্হনের 'রাজতরঙ্গিনী' (তরঙ্গ ৫, শ্লোক ৩৯৭-৯৮) সূত্রে জানা যায়, কাশ্মীরের জনৈক রাজা তাম্রপত্র নির্মাণের জন্য 'পট্টোপাধ্যায়' নিয়োগ করতেন। এই পদাধিকারীরা ছিল অক্ষপটলিকের অধীনস্থ কর্মী। তাম্রফলকে কখনো ছুঁচালো শলাকা দিয়ে 'বিন্দু বিন্দু' আকারেও করা হোত (আজকাল যেমন করে সাইকেল বা ঘড়িতে নাম লেখা হয়)। প্রথমে তালপাতার ওপর মূল বিষয় লিখে পরে, তা তামার ফলকে সেঁটে দিয়ে তার ওপর সূক্ষ্ম ছেণী দিয়ে লেখা খোদাই করা হোত দক্ষিণ ভারতে। তাম্রপট্টের আকার ছিল বিভিন্ন ধরণের। আজমীর সংগ্রহশালায় রক্ষিত ক্ষুদ্রাকার তাম্রলিপিটি ৪১/২ ইঞ্চি দীর্ঘ ও ৩ ইঞ্চি চওড়া ; সবচেয়ে বড়টি যোধপুর থেকে প্রাপ্ত প্রতিহার রাজ ভোজদেবের দানপত্র। আকার ২ ফুট ৫১/২ ইঞ্চি দীর্ঘ, ১ ফুট ৪ ইঞ্চি চওড়া। পূর্বভারতেও তাম্রলিপি পাওয়া গেছে বেশ কয়েকটি। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব দপ্তরের উদ্যোগে মালদহ জেলার (মালদহ শহর থেকে ৪১ কি. মি. দূরে) সীমান্ত অঞ্চলের গ্রাম জগজীবনপুর থেকে সংগৃহীত হয়েছে প্রায় ১২ কিলো ওজনের ৫২ সেমি. × ৩৭.৫ সেমি. আকারের তাম্রফলক। ৯ম-১০ম শতকের পালরাজা মহেন্দ্রপালদেবের এই ফলকটির উভয় দিকে ৪০ টি ও ৩২ টি লাইনে আছে ৯ম শতকের সিদ্ধমাতৃকা বর্ণমালায় খোদিত সংস্কৃত ভাষার লিপি। ফা-হিয়েনের বিবরণ অনুযায়ী (৪০০ খ্রীঃ) তাম্রফলকে ক্ষত্রপরাজের বৌদ্ধ স্তূপ ও মঠ নির্মাণের কথা আছে। জগজীবনপুর তাম্রফলকটিও একটি বৌদ্ধবিহারে রক্ষিত ছিল। এটি একটি দানপত্র। উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার শোহগৌড়া থেকে প্রাপ্ত প্রাচীনতম তাম্রফলক সূত্রে জানা যায়, (খ্রীষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দী) মৌর্যযুগে তাম্রফলকে সরকারী আদেশ-নির্দেশাদি খোদিত হোত।*

---

*.. has been cast in a mould of sand, into which the letters and the emblems above had been previously sciached with a stilus or a pointed piece of wood', Buhler's 'Indian Paleography'

কুষাণরাজ কণিষ্কের লেখা 'পবিত্র বিষয়বস্তু' খোদিত তাম্রফলকের সন্ধান দিয়েছেন বুলার। সাহিত্যকর্মেও ব্যবহৃত হয়েছে তাম্রফলক। তিরুপতি, মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা থেকে এধরণের নিদর্শন সংগৃহীত হয়ে বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। তবে শোহগৌড়া তাম্রলিপিটি গলিত তামার ওপর বালি দিয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে লেখা হয়েছে। এতে লিপি ও প্রতীক চিহ্নগুলি 'উন্নত' (RELIEVO) অবস্থায় দেখা যায়। অবশ্য হাতুড়ী ছেনির সাহায্যে অধিকাংশ তাম্রফলক খোদিত হয়েছে। পাৎলা, ভারি, হালকা, মজবুত, নানাধরণের তাম্রফলক পাওয়া গেছে। বিষয়বস্তুর আকার-আয়তন অনুযায়ী তাম্রফলক নির্মাণ করা হোত। মূল পাণ্ডুলিপি লেখা হোত তালপাতা বা ভূর্জছালে। সেই সব লিপি পৌঁছে দেওয়া হোত সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ঢালাই শিল্পীদের কাছে। মূল লিপিটিকে সামনে রেখে শিল্পী খোদাইকাররা অনুশাসনগুলি তৈরী করতো। তালপাতার আকারের তাম্রলিপিরও সন্ধান মিলেছে। দীর্ঘলিপির ক্ষেত্রে কয়েকটি ফলক খোদিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে প্রথম ফলকটির নীচে দুটি এবং দ্বিতীয় ফলকটির ওপরে দুটি ছিদ্রে আংটা লাগিয়ে এইভাবে পরপর ফলকগুলিকে জোড়া হোত। লেখার স্পষ্টতা রক্ষার জন্যে প্রতিটি ফলকের চারদিকে কিনারা উঁচু করে রাখা হোত। প্রথম ফলকটির একদিক এবং শেষ ফলকটির একদিক খোদাই করা হোত না (ওড়িশায় কয়েকটি তালপাতায় খোদিত লিপি বা ছবিকে এই ভাবে সংযুক্ত করার রীতি বহুল প্রচলিত ছিল, আজও আছে।)।

জৈনমন্দিরে পিতলের তৈবী বৃহদাকার এমন কিছু কিছু মূর্তি পাওয়া গেছে, যেগুলির পাদপীঠে খোদিত লিপি দেখা যায়। ক্ষুদ্রাকার মূর্তিগুলিতেও আছে খোদিত লিপি। এগুলি ৭ম-৮ম শতাব্দী থেকে শুরু করে ১৯শ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কালের ('The Paleography of India', Ojha, 1993, New Delhi, P 154)। ঐসব মন্দিরে রক্ষিত পিতলের ফলকে 'নমস্কার মন্ত্র' এবং 'যন্ত্র' খোদিত দেখা যায়। বিভিন্ন মন্দিরেব কাঁসার ঘন্টাতেও শিল্পীর নামও দাতার পরিচয়, নির্মাণকাল খোদাই করার রীতি চলে আসছে প্রাচীন কাল থেকে। বৃটিশ মিউজিয়ামে টিনের পাতের ওপর খোদিত বৌদ্ধ অনুশাসন সংগৃহীত হয়েছে।[১৪]

দিল্লীব কুতুবমিনারের পাশে রাজা চন্দ্রের যে খোদিত লৌহস্তম্ভটি আছে (মেহবৌলি। ৫ম শতাব্দী), তা এদেশে খোদিত লৌহ-আধারের বলিষ্ঠ দৃষ্টান্ত। আবু পাহাড়ের অচলেশ্বর মন্দিরের বিশাল ত্রিশূলে নির্মাণকাল খোদিত (Ibid)। দেশের নানাস্থানে লিপিখোদিত লোহার কামানের অভাব নেই (এ বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।)।

প্রাচীনকাল থেকে এদেশে রেশমবস্ত্রের ওপর লেখার কাজের দৃষ্টান্ত বর্তমান। তবে মহার্ঘতার কারণে এর তেমন বেশী প্রচলন ঘটেনি। অলবিরুণী তাঁর গ্রন্থে নগরকোট দুর্গে রক্ষিত কাবুলের শাহিয়াবংশের হিন্দুরাজাদের বংশলতিকার কথা বলেছেন, যা রেশম বস্ত্রের ওপর কালি দিয়ে লেখা (Ibid P. 147.)। বুলার জয়শল্মীরের 'বৃহৎ জ্ঞানকোষ' গ্রন্থসংগ্রহে রেশমবস্ত্রখণ্ডে লেখা জৈনসূত্রের নির্ঘন্টের কথা বলেছেন।

এদেশের শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাথরের শ্লেট ব্যবহারের পূর্বে ব্যবহৃত হোত মসৃণ কাঠের ফলক। দণ্ডীর 'দশকুমার চরিতের' একটি কাহিনীতে দেখা যায়, বন্দী রাজকুমার অপহারবর্মা গোপনে, কন্যান্তপুরের রাজকন্যার কক্ষে প্রবেশ করেছিল গভীর রাত্রে। কিন্তু হাতির দাঁতের

শ্বেতশুভ্র পালঙ্কে আলুলায়িত ভঙ্গীতে শায়িতা রাজকন্যার পা, গোড়ালি, জানু, উরুদেশ, নিতম্ব, কুঞ্চিত উদর, কম্পিত বক্ষযুগল দেখে সে মুগ্ধ হয়ে গেল। হস্তীদন্তের নির্যাসবঞ্জিত উজ্জ্বল কাষ্ঠফলকে সে তুলিকা বা লেখনী দিয়ে লিখলো —

"ত্বাময়াবদ্ধাঞ্জলি দাসজনস্তমিমর্থমর্থয়তে।
স্বপিহিময়াসহ সুরতব্যতিকরঘিন্নৈব মা মৈবম্।।"

সে ভুলে গেল নিশিকুটুম্বিতা করতে।

'বিনযপিটক' কাঠের পাটা বা বাঁশের খণ্ডের ওপর লেখার কথা বলেছে। এগুলি বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের কাছে 'পরিচয়পত্র' রূপে থাকতো।

কিন্তু কাষ্ঠফলকে লেখার কথা তো জানা যাচ্ছে খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীর শেষদিকে 'বৈশালী-মহাসঙ্গিতীতে' সংকলিত জাতক কাহিনীর বেশ কয়েকটিতে। 'কটাহক জাতকে' শ্রেষ্ঠীপুত্র ও দাসীপুত্র একত্রে কাষ্ঠফলক নিয়ে পাঠশালায় চলেছে লেখাপড়ার উদ্দেশ্যে। কাষ্ঠফলকগুলি ছিল চতুষ্কোণ। এর ওপর মূলতানী মাটি বা খড়ির প্রলেপ দিয়ে তা শুকিয়ে নিয়ে তার ওপর কাঠ বা বাঁশের তৈরী কলম দিয়ে লেখা হোত। রাজস্থানে একে বলা হোত 'বরতনা' বা 'বরথা।' জ্যোতিষী, বণিক, রাজকর্মচারী সকলেই এই কাষ্ঠফলকে লেখার কাজ করতো। শ্লেটের ওপর খড়ি দিয়ে লেখার কাজ চালু হবার অনেক আগেই কাষ্ঠফলকের ব্যবহার রহিত হয়ে যায়। তার জায়গায় আসে বাড়িতে তৈরী কালি আর বাঁশের কলমে তালপাতার ওপর লেখা - বাংলায় তো শিক্ষার্থীরা (বিশেষতঃ গ্রাম্য পাঠশালায়) ৪০-৫০ বৎসর আগে পর্যন্ত তালপাতায় হাতের লেখা অভ্যাস করেছে।

কার্পাস বস্ত্রখণ্ডের ওপর লেখার কথাও জানা গেছে। অনহিলবারের জৈন গ্রন্থাগারে রক্ষিত শ্রীপ্রভাস সুরীর 'ধর্মবিধি' ৯৩টি কাপড় টুকরো জুড়ে তার ওপর লেখা। পিটারসন্ আবিষ্কৃত এই লিখনটির পত্রগুলি ১৩" × ৫" আকারের। যাজ্ঞবল্ক তাঁর স্মৃতিগ্রন্থে (১/৩১৯) কাপড়ের ওপর লেখা রাজনির্দেশের কথা বলেছেন। 'পট', 'পটিকা' বা 'কার্পাসিকা পট' কথাগুলি এই ধরণের লেখার উপাদানের দিকেই অঙ্গুলিনির্দেশ করে। তবে কাপড়ের পত্রের ওপর লেখা এখন পর্যন্ত সন্ধানপ্রাপ্ত একমাত্র পুঁথি পূর্বোক্ত 'ধর্মবিধি।' মসৃণ বস্ত্রখণ্ডের ওপর আঠালো পদার্থ, হলুদ ও কাঠকয়লার গুঁড়ো দিয়ে তৈরী পাৎলা মণ্ড মাখিয়ে তা শুকনো করে, শাঁখ বা পাথর দিয়ে ঘষে তা মসৃণ করে তার ওপর কালি বা খড়ির সাহায্যে লেখার কাজ হোত। দক্ষিণভারতের মহীশূর অঞ্চলে বণিকরা কাপড়ের ওপর তেঁতুলবীজ সেদ্ধ করে তার মণ্ড মাখিয়ে, তাকে কালো রং করে তার ওপর হিসাবপত্র লেখার কাজ করতো গত শতাব্দী পর্যন্ত। 'কড়িতম্' নামক হিসাবের খাতা এভাবেই তৈরী করা হোত। জৈন মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় এই ধরণের কাপড়ের 'পত্রে'র ওপর ধর্মীয় বাণী, দেবদেবী, অবতারদের মূর্তিও অঙ্কন করে তা পূজা করা হয়।

তালপাতা, ভূর্জপত্র, কাপড়ের পট ইত্যাদির ওপর লেখা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনা এই উপাদানগুলির অল্পস্থায়িত্বের কারণে। তাই লিপিকে চিরস্থায়ী করার জন্যে আগ্নেয়শিলা, বেলে পাথর বা চুণাপাথরের ওপর খোদাই করার কাজ বহুকাল ধরেই চলে আসছে। পাহাড়ের মসৃণ

অংশ, স্তম্ভ, শিলাখণ্ড, প্রস্তর মূর্তির পাদপীঠ, পাথরের তৈজসপত্রাদিতে খোদিত বহু প্রাচীন লিপি আজও টিকে আছে। আফগানিস্তান, পাকিস্তান এবং ভারতের নানা স্থানে আবিষ্কৃত মৌর্য সম্রাট অশোকের (খ্রীঃ পূঃ ৩য় শঃ) সর্বমোট ৪২টি পর্বতলিপি, স্তম্ভলিপি ও গুহালিপির প্রসঙ্গ প্রথমেই স্মরণীয়। এছাড়া বিভিন্ন সংগ্রহশালায় এধরণের শিলালেখ, প্রশস্তি, স্তম্ভলেখের সংখ্যা কম নয়। সারনাথ ও এলাহাবাদ সংগ্রহশালায় আছে এধরণের বেশ কিছু প্রাচীন লিপি। ভারতীয় যাদুঘরের অসংখ্য শিলালেখের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল বাংলাদেশের বগুড়া জেলার মহাস্থান থেকে জনৈক বরু ফকির কর্তৃক ১৯৩১এ আবিষ্কৃত শক্ত চুণাপাথর খণ্ডের ওপর প্রাকৃত ভাষায় মৌর্য-ব্রাহ্মী বর্ণমালায় খোদিত ছ'লাইন লিপিবিশিষ্ট 'মহাস্থান শিলালিপি' (খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতাব্দী)। দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রজাসাধারণকে রক্ষা করার জন্য কোন এক দয়াপরবশ রাজা পুণ্ড্রনগরীর আঞ্চলিক প্রশাসকের প্রতি এই আদেশমূলক লিপিটি পাঠিয়েছিলেন। ঐ যাদুঘরেই আছে মধ্যপ্রদেশের ভারহুত বৌদ্ধ স্তূপের ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাপ্ত স্তম্ভলিপি। প্রাকৃত ভাষায়, শৃঙ্গ-ব্রাহ্মী বর্ণমালায় (খ্রীঃ পূঃ ২য় শতাব্দী) খোদিত এই লিপি থেকে ভারতীয় লিখনরীতির পরিবর্তনমুখী ধারার প্রথম সংকেত পাওয়া যায়। এছাড়াও এখানে আছে শকরাজ মহাক্ষত্রপ সোদাসের মথুরা প্রস্তরলিপি (খ্রীঃ ১ম শঃ) ও মথুরা-বৌদ্ধস্তম্ভলিপি (১২৫ খ্রীঃ), সমুদ্রগুপ্তের এরণ প্রস্তরলিপি (গুপ্ত ব্রাহ্মী। মধ্যপ্রদেশের এরণ থেকে প্রাপ্ত। খ্রীঃ ৪র্থ শঃ), উত্তরপ্রদেশের কোশামের হাসানপুর থেকে প্রাপ্ত, ৩৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দের গুপ্ত ব্রাহ্মী বণমালায় খোদিত মিশ্র সংস্কৃত-প্রাকৃত ভাষার কোশাম লিপি, মালয়েশিয়া থেকে প্রাপ্ত গুপ্ত-ব্রাহ্মীতে খোদিত বুদ্ধ গুপ্তের যুগের লিপি (৫ম শতাব্দী), মিহিরকুলের গোয়ালিযর স্তম্ভলিপি (গুপ্ত ব্রাহ্মী। ৬ষ্ঠ শতাব্দী) মহানমনের বুদ্ধগয়ালিপি (সংস্কৃত ভাষায় কুটিল বা সিদ্ধমাতৃকা বর্ণমালা। ৫৮৮-৮৯ খ্রীষ্টাব্দে) ইত্যাদি। এখানকাব প্রস্তরলিপি সংগ্রহের একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হোল সংস্কৃত ভাষায় প্রাক্-বঙ্গাক্ষরে, ১১শ শতকে খোদিত, রাজশাহী জেলার দেওপাড়া থেকে প্রাপ্ত, ৩৬টি শ্লোকের দেওপাড়া শিলালিপি। বাংলা বর্ণমালাব অনেকগুলিকেই এই লিপিব মধ্যে দেখা গেছে। আব একটি সংগ্রহ প্রাক্ বঙ্গাক্ষরে, সংস্কৃত ভাষায় ১১৩৭ খ্রীষ্টাব্দে খোদিত, বিহারের গোবিন্দপুর থেকে প্রাপ্ত কবি গঙ্গাধরেব প্রস্তরলিপি। পূর্বভারতের আর একটি প্রাচীন লিপি পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার ছাতনা থানার শুশুনিয়া গ্রামেব শুশুনিয়া পাহাড়ের এক গুহার মধ্যে খোদিত কয়েকছত্র লিপি ও একটি সূর্য প্রতীক (শুশুনিয়া লিপির নানাবিধ পাঠান্তর বিভিন্ন গবেষকের গ্রন্থে দেখা যায়। অধিকাংশক্ষেত্রেই লিপিপাঠে কিছু কিছু প্রমাদ ঘটেছে বোধ হয় লিপিটির অস্পষ্টতার কারণে।)। খ্রীঃ ৪র্থ শতকের পূর্বাঞ্চলীয় গুপ্ত ব্রাহ্মী বর্ণমালায় খোদিত এই গুহালিপিটি 'চন্দ্রবর্মার লিপি' নামে পরিচিত। এই প্রসঙ্গে ওড়িশার ভুবনেশ্বরের উদয়গিবি পাহাড়ের হাথিগুম্ফার ছাদেব নিচে খোদিত, কলিঙ্গরাজ খারবেলের গুহালিপি (খ্রীঃ পূঃ ১ম শঃ), মধ্যপ্রদেশের রামগড় পাহাড়েব যোগীমাবা পর্বত গুহায় খোদিত সুতনুকা লিপি (খ্রীঃ পূঃ ৩য় ?) উল্লেখযোগ্য।

এলাহাবাদ মিউজিয়ামে রক্ষিত, বেলেপাথবে খোদিত খ্রীষ্টপূর্বযুগের কয়েকটি ব্রাহ্মীলিপির কথা উল্লেখযোগ্য ঃ যেমন, খ্রীঃ পূঃ ২য় শতকের দুটি স্তম্ভলিপি (নং ৪৫, 'পুসদতয়ে নাগবিকস

ভিক্ষুনিয়ে ও নং ৪৭, 'নাগরখিতস চ মাতু চ কমচুকিয় দানম্') ও এলাহাবাদ জেলার কৌশাম্বী থেকে প্রাপ্ত আর একটি স্তম্ভলিপি (নং ৬৪, 'পুসস থমভো ধম') । একটি দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তির পাদপীঠে খোদিত আছে কুষাণযুগীয় ব্রাহ্মী বর্ণমালার একটি লিপি (নং ৬৯, আনুঃ ১ম শতাব্দী) - 'মহারাজস্য কণিষ্কস্য সম্বৎসরে ২ দি ৮ বোধিসত্ত্বোত্তম প্রতিষ্ঠা পয়তি ভিক্ষুণা বুদ্ধমিত্রা ত্রিপিটকা ভাগবতো বুদ্ধস চম্কমে'।*

পশ্চিমবঙ্গে সংস্কৃতভাষায় উৎকলীয় বর্ণমালায় খোদিত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তরলিপির নিদর্শন, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার কাঁথি থানার বাহিরী দেউলবাড় গ্রামের (জে. এল নং ৪৩৫) পূর্বমুখী জগন্নাথমন্দিরের জগমোহনে প্রবেশপথের দ্বারশীর্ষে কালোপাথরে (লিন্টেল) খোদিত ১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দের চারলাইন লিপি ।

রাজকীয় আদেশ, ধর্মীয় উপদেশ বা সৌধ-মন্দিরের পরিচয়ের জন্যেই যে কেবল প্রস্তরলিপি রচিত হয়েছে তা নয় । কিছু কিছু সাহিত্যকর্মও শিলাপটে খোদিত হয়েছে । আজমীর সংগ্রহশালায় চৌহানবংশীয় রাজা বিগ্রহরাজ বিসলদেব রচিত 'হরকেলিনাটক' ও তাঁর সভাকবি সোমেশ্বর পণ্ডিত রচিত 'ললিতবিগ্রহরাজ নাটকের' দুটি করে খোদিত শিলালিপি আছে । কয়েকটি সর্গে বিভক্ত 'জৈন শিখরপুরাণ' (১১৭০ খ্রীষ্টাব্দ) মেবারের এক জৈন মন্দিরের নিকটস্থ পাহাড়ের পাথরে খোদিত আছে । দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন সংগ্রহশালায় পাথরে খোদিত অনেক 'বীরস্থম্ভলিপি' দেখেছি । এরূপ পাথুরে লিপির দৃষ্টান্তের অভাব নেই ।

পণ্ডিত, কবি বা পদস্থ সরকারী কর্মচারীরা প্রথমে লেখ্য বিষয়টি তালপাতা, ভূর্জপত্র বা অন্য কোন নমনীয় আধারে লিখে দিতো । তা পাঠানো হোত শিলালিপি খোদাইকারদের কাছে। নির্দেশানুযাযী, খোদাইকাররা (এদেরকে 'সূত্রধার' বলেছেন জি. এইচ্. ওঝা, পৃঃ ১৪৮ ।) শিলাখণ্ড বা পর্বতগাত্র মসৃণ করে, সূত্র, খড়ি বা অন্যকোন পদার্থের সাহায্যে সেটির ওপর দাগ টেনে, তাতে প্রথমে কালি দিয়ে অক্ষরগুলি লিখে নিতো । তারপর বিভিন্ন ধরণের সূক্ষ্ম ছেনী ও হাতুড়ীর সাহায্যে খোদাইয়ের কাজ করা হোত । হিন্দুদের শিলালিপি খোদাই করা হোত বেশ গভীর করে আর মুসলীমদের আরবী-ফার্সী বর্ণমালা উঁচু করে রেখে । যেখানে লেখা নেই সেই অংশটি সুকৌশলে খোদাই ও মসৃণ করা হোত । খোদিত অক্ষরের ভুল ত্রুটি সংশোধন করা হোত কোথাও গলিত ধাতব পদার্থ ঢেলে বা অপ্রয়োজনীয় বর্ণকে ছেঁটে দিয়ে ।

কাঁচা বা পোড়ামাটির ইট বা ফলকের ওপর লেখার রীতি যে এদেশে হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসছে, সিন্ধুসভ্যতার সিলমোহরগুলি তার দৃষ্টান্ত । বৌদ্ধযুগে, বৌদ্ধরা মৃৎফলকের ওপর ধর্মীয় অনুশাসন খোদাই করে রাখতো । মথুরা সংগ্রহশালায় এক ভগ্ন দেওয়ালের কয়েকটি ইঁটে খ্রীষ্টপূর্ব যুগের লিপি খোদিত । গোরক্ষপুর জেলার গোপালপুর থেকে প্রাপ্ত, বৌদ্ধসূত্র খোদিত (৩য়-৪র্থ শতাব্দীর লিপি) মৃৎফলকের কথা জানা গেছে । কানিংহাম বিভিন্ন সময়ের বর্ণমালা খোদিত কিছু পোড়ামাটির ফলক সংগ্রহ করেন ।

মৃৎফলকে লেখার কাজ কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমাদের দেশে হয়েছে । সেগুলি হল মন্দির দেবালয়ের পরিচয়জ্ঞাপক লিপিফলক । পশ্চিমবাংলার হাজার হাজার মন্দিরের দেওয়ালে

*'Masterpieces in the Allahabad Museum', Allahabad, R. R Tripathi, 1984, P 8,

দেখা যায় পোড়ামাটির ওপর নানা লিপি। এই সব লিপিই বাংলা বর্ণমালায় খোদিত। পোড়ামাটির ফলকের ওপর বাংলা বর্ণমালায় খোদিত, এদেশের এক দীর্ঘ মন্দিরলিপিটি আছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার রাধাকান্তপুর গ্রামের (জে. এল. নং ৬৭) দাস পরিবারের গোপীনাথের এক রত্নমন্দিরের সম্মুখভাগে। পাশাপাশি জোড়া দেওয়া আটটি পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ, ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের এই দীর্ঘ মন্দিরলিপিটি এখানে তুলে দেওয়া হোল ঃ—

"রাধাকান্তপুরে বাস নাম জনানন্দ দাস ঃ স্বর্গে বাস এই সে কারণে ঃ মহা মহা পুন্য বলে ঃ সপ্তপুত্র ক্ষিতিতলে ঃ জেষ্ঠ পুত্র স্যামদাস নামে ঃ যিনি দাতা পুণ্যোদঅ/প্রকাসিত মহাসয় মোধ্যম ত্রিতিঅ সহদবে ঃ বর্দ্ধমানে পাঠাইআ গোপিনাথে আনাইআ ঃ স্থাপন করিলা এই ঘরে ঃ নবাব পৃথিবিপতি তার / ভএ বেস্ত ওতি ঃ সিমানা ঘেরিআ খোলিল গড় ঃ দামামা দরজা পরে ঃ জয়চোণ্ডি ক্রিপা বরে ঃ পুস্কন্যি খোলিল তারপর ঃ ।। সন্ধান পাইল জদি ঃ সভাসিং/হ নরপোতি ঃ এই হেতু কড়া না আইসে ঃ কম্পবান ক্রোধভরে ঃ আজ্ঞা দিল অনুচরে ঃ হান সির পদাতিক রোসে ঃ ।। বিপক্ষ হইল কাল ঃ কাল হোইল প/রকাল ঃ কিছু না জানিল মহাসঅ ঃ। তাহাতে ছেন্দল মুণ্ড ঃ দুম্না দুম্না ডাকে তুণ্ড ঃ সুনি রাজা মানিল বিস্ময় ঃ কবিতা কোরিতে তার ঃ এইস্থানে আটা ভার ঃ / হোইল দুই সত্তেক বৎসর ঃ বিতনিত পিত্রিকির্ত্তি ঃ এই বংসে অদ্যাবোদি ঃ বন্দনা হোইতেছে সুন্দর ।। আপদ হোইল ঈখে ঃ বিক্ষ হোইল মোন্দিরেতে সারাইতে সা/ধ্য নাহি কার ঃ নারাণ দাসের বংসে ঃ মোদ্ধম বাড়ির অংসে ঃ জোজ্ঞেস্বর জোন্মেছিল সার ।। সন ১২৫১ সালে সগোষ্টি সহিত মেলে ঃ নানা যুকতি করে জনে জনে ঃ কেহ বলে/লআ কর ঃ কেহ বলে একেই সার ঃ জোজ্ঞেস্বরের কিছু না লঅ মনে ঃ পিতরি কির্ত্তি ডুবাইআ ঃ কেমনে কোরিব ইহা ঃ সারাইব জা থাকে ভাগ্যেতে ঃ ভদ্রলোক ডাকাইআ ঃ/হিরু মিস্ত্রি আনাইআ ঃ উদজোগ কোরিল সারা ঃ ইতে ঃ সন ১২৫১ সালে ঃ গোপিনাথ ক্রিপা বলে ঃ মোন্দির কোরিল মেরামতি ঃ হিসাব করহ সভে ঃ ইহাতে নিকাশ পাবে ঃ কোবিতা সমাপ্ত হৈল ইতি ঃ ।।"

পোড়ামাটি ছাড়াও, মন্দিরগাত্রের পুরু চুণবালির আয়তাকার পলেস্তারার ওপরেও মন্দিরের পরিচয়জ্ঞাপক লিপি খোদাইয়ের দৃষ্টান্ত এদেশে অসংখ্য। উভয়ক্ষেত্রেই বাংলা বর্ণমালার নানা আকার আকৃতি লক্ষ্যণীয়।

শিলালেখ বা তাম্রপট্ট রচনার রীতিপদ্ধতিগুলি যে পরবর্তীকালে তালপাতা বা তুলট-পুঁথি নির্মাণের সময়ও অনুসৃত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। পুঁথির পাতায় ছিদ্র করার রীতিটিও তা থেকেই এসেছে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র প্রতিটি পাতার মাঝের বর্গাকার শূন্যস্থানটি সূত্রছিদ্রের জন্যেই নির্দিষ্ট ছিল। এমন বহু বাংলা-সংস্কৃত পুঁথিতে দেখা যায়।

তালপাতার পুঁথির আকারে প্রথম প্রথম তুলটের পুঁথির তৈরী হয়েছে। অবশ্য পরের দিকে বড় আকারের তুলট কাগজের পুঁথিই তৈরী হয়েছে অনেক বেশী। সব পুঁথিই দুপাশে কাঠ, চামড়া বা তালপাতা আর কঞ্চির ফ্রেমে তৈরী পাটা দিয়ে শক্ত করে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হোত। তবে পুঁথির পাতায় সুতো বাঁধার স্থান ছাড়া থাকলেও শেষ পর্যন্ত সেখানে সুতো বাঁধা হয়নি

এমন হাজার হাজার পুঁথিতে ।

বিষয় অনুযায়ী পুঁথির উপাদানগত পার্থক্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে চোখে পড়ে । এটি মধ্যযুগের মাঝামাঝি সময় থেকে বেশী ঘটেছে । যেমন, পুজোপদ্ধতি বা তন্ত্রমন্ত্রের সংস্কৃত পুঁথি তাল বা তেরেট পাতায়, কাব্য-পাঁচালী-বৈষ্ণবসাহিত্য তুলট কাগজে এবং মাদুলি-যন্ত্র-মন্ত্র ভুর্জছালে লেখা হয়েছে । তবে ব্যতিক্রম যে ঘটেনি তা নয় ।

লেখার আধুনিকতম উপকরণ 'কাগজের' উদ্ভব ঠিক কোন সময়ে হয়েছে সে বিষয়ে নানা পণ্ডিতের নানা মত । ৩২৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে, আলেকজাণ্ডারের অন্যতম সেনাপতি নিয়ার্কস তাঁর ভারত বিষয়ক অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, হিন্দুস্তানের মানুষ তুলো থেকে কাগজ তৈরী করতে জানতো । ম্যাক্সমূলর এই প্রসঙ্গে তাঁর 'History of Ancient Sanskrit Literature' গ্রন্থে (পৃঃ ৩৬৭) বলেছেন, নিয়ার্কস কথিত 'কাগজ' আসলে 'কার্পাসপটিকা' বা 'পট্ট' । কিন্তু বুলারের মতে নিয়ার্কস যথার্থই কাগজের কথা বলেছেন । অর্থাৎ 'পট্ট' নয় । সুতরাং তা হলে তো কাগজ এদেশে খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে ব্যবহৃত লেখনসামগ্রী । বুলার প্রমুখগণের অভিমত, ভারতে মুসলমান শাসনকালে প্রথম কাগজের ব্যবহার হয় । কিন্তু তার অনেক আগেই এদেশে কাগজ ব্যবহারের নিদর্শন বাওয়ার কর্তৃক মধ্য এশিয়ার ইয়ারখন্দ নগরের ৬০ মাইল দক্ষিণস্থ কুগিয়র থেকে আবিষ্কৃত, মৃত্তিকার গভীরে প্রোথিত কয়েকটি সংস্কৃতভাষার পত্র (গুপ্তলিপি), যেগুলি ডা. হর্নলের মতে খ্রীঃ ৫ম শতাব্দীর (J A S B Vol. 62, P 8) কাছাকাছি সময়ের । যেভাবে জাপানের হোরিয়ুজি মঠের তালপাতার পুঁথি ভারত থেকেই গিয়েছিল, বাওয়ারের আবিষ্কৃত ঐ কাগজের পুঁথিগুলিও ভারতে লেখা বলে অনুমান করা হয় । অরেলস্টাইন চীনা তুর্কিস্তান থেকে যে ২য় শতাব্দীর কাগজ আবিষ্কার করেছেন, সে বিষয়ে ডা. বার্ণেটের অভিমত, মুসলমান আগমনের অনেক আগে এদেশে কাগজ ব্যবহৃত হয়েছে, যদিও সীমিতক্ষেত্রে । পণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে ধারারাজ ভোজদেবের সময় মালবদেশে প্রথম কাগজ ব্যবহৃত হয় ।[১১] ভারতে প্রাপ্ত প্রাচীনতম কাগজের লিখনের নিদর্শন গুজরাট থেকে পাওয়া গেছে, যার সময়কাল ১২২৩-২৪ খ্রীষ্টাব্দ ।[১২] কাগজে লেখা, কাশ্মিরী লিপির 'শতপথ ব্রাহ্মণ' পুঁথির কথা (১১শ শঃ) শোনা গেছে । কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর জন্মস্থান বর্ধমান জেলার দামুন্যায় তেরেটপত্রে লেখা একটি কবিকঙ্কণচণ্ডী পুঁথির কথা শোনা গেছে, যদিও তার লিপিকাল অজ্ঞাত । ১৪২৭ খ্রীষ্টাব্দে লেখা জৈন পুঁথির কথাও জানা যায় । তবে ব্যাপকভাবে কাগজ তৈরী প্রথম হয় খ্রীষ্টীয় ২য় বা ৩য় শতাব্দীতে চীনদেশে । জলে বাঁশকে ভিজিয়ে তাকে পিষে মণ্ড তৈরী করে তা থেকে প্রথম কাগজ তৈরী হয় ।[১৩] ৭০০ খ্রীষ্টাব্দে আরবরা চীনাদের অধিকার থেকে সমরখন্দ দখল করে নিলে কিছু চীনা সৈনিককে বন্দী করে তারা নিজেদের দেশে নিয়ে যায় । সেই বন্দী সৈনিকদের কাছ থেকেই আরবরা কাগজ তৈরীর কৌশল জেনে নেয় । আরব থেকে কাগজ ক্রমশঃ গ্রীসে এবং ১২শ শতাব্দীতে স্পেনে যায় । এরপর ফ্রান্স, ১২৭৬ এ ইতালি ও ১৩২০তে জার্মানীতে কাগজ তৈরী শুরু হয় । ধীরে ধীরে ইউরোপের নানা দেশে কাগজের ব্যবহার ব্যাপক হয়ে ওঠে । পার্চমেন্ট, ভেলাম ও পালিশ করা দামী চামড়ার স্থান দখল করে সহজলভ্য কাগজ ।[১৪] প্রথমদিকে কাগজ তৈরীর উপাদান হিসেবে কাপড় টুকরো, তুলো, তন্তুযুক্ত কৃষিজ দ্রব্য, কাঠ

ব্যবহৃত হোত । সুতরাং, আপাতত সিদ্ধান্ত, চীনে উদ্ভাবিত হয়ে কাগজ খ্রীষ্টপূর্ব যুগে, ইউরোপ ও আরব হয়ে এদেশে এসে থাকবে ।

১৬শ শতাব্দীতে রচিত কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের 'আখেটিক খণ্ডে' 'কালকেতুর গুজরাট নগরে মুসলমান সম্প্রদায়ের আগমন' প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে -

'কাগজ কুটিয়া নাম ধরায় কাগচী । কলন্দর হয়ে কেহ ফিরে দিবারাতি ।।'

অর্থাৎ, এরা কেউ কাগজ তৈরী করে, কেউ মুণ্ডিতমস্তক, শ্মশ্রুগুম্ফহীন পরিব্রাজক হয়ে ঘুরে বেড়ায় । মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত এই 'কাগচী'রাই হয়তো বাংলার কাগজ প্রস্তুতের কলাকৌশল জানতো । বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, পাট, শণ, তিসি, তুলো ঢেঁকিতে পেষণ করে মণ্ড তৈরী করা হোত ।[১১] সেই মণ্ড কাপড় বা পাৎলা কোন পাত্রের ওপর ঢেলে দিয়ে রোদে শুকানো হোত। কাগজে তুলোর ভাগটাই বেশী থাকতো । তাই বলা হোত 'তুলট কাগজ' । মধ্যযুগের সাহিত্যিক ও অসাহিত্যিক পাণ্ডুলিপি রচনায় এই তুলট কাগজ ব্যাপক ব্যবহৃত হয়েছে । কখনও কখনও মণ্ডের সঙ্গে চূণও মেশানো হোত । পোকার আক্রমণ থেকে কাগজকে রক্ষা করার জন্যে কাগজের মণ্ডের সঙ্গে বা পাতার ওপর কীটনাশক গাছের পাতার রস বা হলুদ মেশানো হোত । বিশ্বকোষ-৩, (পৃঃ ৩৯০) তে প্রাপ্ত বিবরণ অনুযায়ী, সেকালে মালদহ জেলায় ব্যাপকভাবে কাগজ তৈরী হোত । এই কাগজ ছিল উজ্জ্বল, মসৃণ । এই কাগজ বিদেশেও চালান যেতো ।

১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার শ্রীরামপুরের মিশনে উইলিয়ম কেরীর উদ্যোগে কাগজের উৎপাদন শুরু হয় । প্রথমে কাগজ তৈরীর বিভিন্ন কাঁচামাল (শণ, তিসি, তুলো, কাঠগুঁড়ো ইত্যাদি) ঢেঁকিতে মিহি করে গুঁড়ো করে মণ্ড তৈরী করে তা থেকে কাগজ তৈরী হোত । এই কাগজ হাতে তৈরী করা হোত । পরে উইলিয়ম জোনস্ বিদেশ থেকে একটি বারো অশ্বশক্তির স্টীম ইঞ্জিন আনান । ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ মার্চ সেই যন্ত্রের সাহায্যে এদেশে প্রথম কাগজ তৈরী শুরু হয় এবং শিল্পে এটিই প্রথম স্টীম ইঞ্জিন ব্যবহারের ঘটনা । এই কাগজেই, শ্রীরামপুর মিশন তাদের বিভিন্ন বইপত্র মুদ্রিত করে । পুঁথিপত্র বা দলিলদস্তাবেজেও এই কাগজ ব্যবহৃত হওয়া স্বাভাবিক, কেননা মিশনের কলে তৈরী কাগজ এদেশ ছাড়িয়ে বিদেশেও চালান যেতো বলে জানা যায় ।

খ. লেখনী

গ্রীক শব্দ 'কালামোস্' বা লাটিন শব্দ 'কালামুস্' থেকে আরবী শব্দ 'কলম্' এসেছে, যাকে ভারতীয়রা 'লেখনী' বলে থাকে । লেখনী = লিখ + অন্ + ই, অর্থাৎ যা 'লেখন-সাধনী' বা 'অক্ষর তুলিকা ।' প্রাচীনকালে এদেশে লেখার কাজে কী ধরণের লেখনী বা কলম ব্যবহৃত হোত, সে সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য অবগত হওয়া যায় । বুদ্ধজীবনী 'ললিতবিস্তরে' (১ম শতাব্দী) যাকে 'বর্ণক' বলা হয়েছে, তা লেখনীর আদিরূপ । দণ্ডীর 'দশকুমারচরিতে' যাকে 'বর্ণভর্তিকা' বলা হয়েছে, তা হয়তো রঙ্ ব্যবহারের তুলি বা রঙিন খড়ি জাতীয় কিছু । এটি অঙ্কণের কাজেই ব্যবহৃত হোত হয়তো । নলখাগড়া থেকে তৈরী কলমকে বলা হোত 'ইশিকা' । বাঁশ, কাঠ, ধাতব দণ্ড, চিল বা শকুনের পালক থেকে পরবর্তীকালে লেখনী বা কলম তৈরী হয় । লোহার

সূক্ষ্মাগ্র শলাকা দিয়ে তালপাতার ওপর খোদাই করে লেখার কাজ দক্ষিণভারতে বহুকাল ধরে প্রচলিত।[১০] ওড়িশায় এ রীতি আজও ব্যাপকভাবে প্রচলিত। 'যোগিনীতন্ত্র' মতে (উত্তর খণ্ড / ৭ম পটল, ৫-৮) বাঁশ বা কঞ্চি, সোনা-রূপো-তামা বা ধাতুনির্মিত লেখনী দিয়ে লেখার কাজ করতে হোত। আসামে চড়াই পাখির পালক, জেং বাঁশ বা বনটেকিয়া, খাগ, ধাতব শলাকা লেখনী হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে কালি দিয়ে লেখাব জন্য চেরা অগ্রভাব বিশিষ্ট 'কলম' গ্রীসদেশের অবদান কিনা, তা অনুসন্ধানেব বিষয় (গ্রীক শব্দ Calamus > কলম।) অধ্যাপক পঞ্চানন মণ্ডল বলেছেন, ''শর, কঞ্চি, শকুনের পালক বা লোহার কলম দিয়ে বড়ো বড়ো এবং প্রায়শঃই পোক্ত ছাঁদে, বিশেষ পদ্ধতিতে প্রস্তুত কালিতে, সাধারণতঃ তুলোট কাগজের লম্বা ফালিতে বা তালপাতার ওপর এইসকল পুঁথি লেখা হ'ত প্রাচীনতর আদর্শ থেকে।''[১১] বিদেশে কালিভরা পেন আবিষ্কার হবার পরেও এদেশে সূক্ষ্ম অগ্রভাগ বিশিষ্ট কঞ্চির কলম এবং সেইসঙ্গে ধাতব চেরা নিব্ লাগানো কাঠের কলমে লেখার কাজ বিশ-তিরিশ বৎসর আগেও হয়েছে। তবে তালপাতায় লেখা 'পঞ্চরক্ষা' পুঁথিতে (এ. শো.) যে সূক্ষ্ম পদ্মফুলগুলি আঁকা হয়েছে, তা দেখে এদেশের অতি সূক্ষ্ম লেখনী ব্যবহার সম্পর্কে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায়।

গ. কালি

'মসী' শব্দের অর্থ 'কালি' (Encyclopaedia Britannica, Vol 12. 1963, P. 60.)। প্রাচীন কাল থেকে এদেশে লেখার কাজে কালি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বুলারের মতে খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে ভারতীয়রা কালিব ব্যবহার জানতো। কাপড় ও ভূর্জছালে লেখার কাজে কালি ব্যবহৃত হয়েছে। তবে 'পাকা কালি' গ্রন্থাদি লেখার কাজে এবং 'কাঁচা কালি' ব্যবসায়ের হিসাবপত্র লেখার কাজে লাগতো। পিপুল গাছের আঠা বা রস (লাক্ষা) জলে মিশিয়ে, মাটির হাঁড়িতে ফুটিয়ে নিয়ে তাতে সোহাগা ও লোধ (বৃক্ষবিশেষ। Symplocos racemosa) গাছের টুকরো মিশিয়ে দীর্ঘ সময় ধবে নাড়ানো হয়। যখন ঐ তরল পদার্থটি ফুটতে ফুটতে কিছুটা ঘন ও লাল হয়, তখন তাকে তাপ থেকে সরিয়ে এনে ছেঁকে নিয়ে, তিল তেলের প্রদীপের ভুষো একটি কাপড়ের পুঁটলীতে বেঁধে ঐ তরলটির মধ্যে বেশ কিছু সময় ধরে নাড়ানো হয়। একসময় যখন দেখা যায় যে তরলটি লেখনীর দ্বারা লেখার উপযোগী হয়েছে তখন তাকে 'মস্যাধারে' ভরে রাখা হয়। প্রাচীন ভারতের 'পাকা কালি' তৈরীর এই রীতি গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে উত্তর ভারতের রাজস্থান-কাশ্মীর অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। এই কালিতে লেখা অক্ষর কোনক্রমেই জলে ধুয়ে যায় না। ভুষো মেশানোর আগের পদার্থটির রং থাকে ঘন লাল। একে 'অলক্তক' বলা হোত। অন্য দিকে, কাজল, খয়ের ও আঠা মিশিয়ে 'কাঁচা কালি' তৈরী করার রীতি একসময় এদেশে প্রচলিত ছিল। বাদামের খোসা পুড়িয়ে, সেই ছাই গোমূত্রে মিশিয়ে কালি তৈরীর উত্তর ভারতীয় রীতির কথা বুলারের মাধ্যমে জানা গেছে। এই কালিতে ভূর্জপত্রে লেখার কাজ হয়েছে। কাশ্মীরে এভাবে একসময় কালি তৈরী হোত।

জোনরাজ রচিত 'দ্বিতীয় রাজতরঙ্গিনীর' একটি কাহিনীতে দেখা যায় জনৈক লোলরাজ কোন কারণে নিজের 'দশপ্রস্থ' জমির একপ্রস্থ একজন ক্রেতাকে বিক্রি করে। ঐ বছরই তাব

মৃত্যু হয়। তখন তাব সন্তান নোনরাজ নিতান্তই বালক। জমির ক্রেতা চক্রান্ত করে জমির দলিলের কোন কোন লেখা বদল করে। মূল দলিলটি লেখা হয়েছিল 'পাকা কালিতে।' তাতে লেখা ছিল, 'ভূপ্রস্থমেকং বিক্রীতং।' সেই দুষ্ট ক্রেতা 'এ'কারের স্থানে 'দ' ও 'ম' এর স্থানে 'শ' লিখে 'ভূপ্রস্থদশকং' করে দেয় এবং 'দশপ্রস্থ' জমিই ভোগ করতে থাকে। নোনরাজের পক্ষ থেকে রাজা 'জয়নুল আবেদিন' এর রাজসভায় অভিযোগ পেশ করা হয়। রাজা ভূর্জপত্রে লেখা দলিলটি পড়ে নিয়ে তাকে জলে ধুয়ে নেন। ফলে নতুন কালিতে লেখা 'দ' ও 'শ' বর্ণ দুটি ধুয়ে গিয়ে 'পাকা কলিতে' লেখা আগের সেই 'মে' অক্ষরটি দৃশ্যমান হয়। স্বভাবতঃই চক্রান্তকারী ক্রেতা কঠোর শাস্তি ভোগ করে। এ থেকে বোঝা যায়, কোন কালি কত স্থায়ী ছিল। আসামে খনিজ মৃত্তিকা ও গোমূত্র দিয়ে কালি তৈরীর কথা জানা যাচ্ছে।

কালিতে লেখা প্রাচীনতম নিদর্শন (খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতাব্দী) সাঁচীস্তূপ থেকে প্রাপ্ত দুটি প্রস্তরাধার। এগুলিতে বুদ্ধশিষ্য সারিপুত্র ও মহামোগল্লানের 'দেহাস্থি' রক্ষিত ছিল। একটি পাত্রের ঢাকনার ওপর 'সারিপুতস' খোদিত এবং ভেতরে কালিতে 'সা' লেখা। অন্য পাত্রের ঢাকনার ওপরে 'মহামোগলানস' খোদিত এবং ভেতরে কালিতে লেখা 'ম' অক্ষর। বুদ্ধের জীবিতকালে সারিপুত্রের দেহান্ত হয়। মহামোগলান স্বর্গারোহণ করেন বুদ্ধদেবের নির্বাণের (খ্রীঃ পূঃ ৪৮৭ অব্দ) পর। কানিংহামের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঐ স্তূপ নির্মাণের সময় যদি ঐ পাত্র দুটি নির্মিত হয়, তাহলে এই লিপিও ঐ সময়কার অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতাব্দীর। কিন্তু পাত্র দুটি যদি অন্যস্থান থেকে এনে সাঁচীস্তূপে রাখা হয়, তাহলে এগুলি খ্রীঃ পূঃ ৫ম শতাব্দী কালের (Foot note 'The Paleography of India', Ojh, P 156)।

৭ম শতাব্দীতে বাণভট্টের রচনায় 'মসী' শব্দ দৃষ্ট হয়। 'মেলা' শব্দেও কালি। সংস্কৃত সাহিত্যে মস্যাধার বা দোয়াতকে বলা হয়েছে 'মেলানন্দাযতে', 'মেলামণ্ডা', 'মেলান্ধুকা', 'মসীমণি', 'মসীপাত্র', 'মসীভাণ্ড', মসীকূপিকা' ইত্যাদি।

এতক্ষণ যে কালির কথা বলা হল, তা মূলতঃ কালো রঙের। এছাড়াও গ্রন্থের অধ্যায়, বিরাম চিহ্ন, টিকা টিপ্পনী, পত্রাঙ্ক ইত্যাদি লেখার জন্যে লাল কালিও ব্যবহৃত হয়েছে। মধ্যযুগের পুঁথিতে এধরণের ভিন্ন ভিন্ন রঙের কালির ব্যবহার দেখা গেছে অজস্র। পুরোনো যুগেও ভিন্ন ভিন্ন রঙের কালি লেখার কাজে ব্যবহৃত হোত। রঙিন কালি দুভাবে তৈরী হোত। এক তো পূর্বোক্ত লাল কালি 'অলক্তক' বা 'আলতা' প্রস্তুতি। অন্য পদ্ধতিটি হল পারদ ও গন্ধক মিশ্রিত রঞ্জক পদার্থ 'হিঙ্গুল', আঠালো পদার্থ ও জল একসাথে মিশিয়ে তৈরী করা। পুরোনো পুঁথির অধ্যায়ের শুরুও শেষের পুষ্পপ্রতীক বা অলঙ্করণ, টিকা-টিপ্পনী, শ্লোকের অর্ধ ও পূর্ণযতিচিহ্ন, সংশোধন-সংযোজন, পত্রাঙ্ক, লেখার বাইরের দিকে রেখাচিত্র অঙ্কণ, জন্মপত্রিকা বা কোষ্ঠী-ঠিকুজী লেখা, যন্ত্র ইত্যাদি লেখার জন্যে কালো কালির পাশাপাশি ঘন লাল কালিও ব্যবহৃত হয়েছে। তবে সংস্কৃত পুঁথিতেই এর বেশী ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। আর আছে ১৭শ-১৮শ শতকের রামায়ণ-মহাভারত-বৈষ্ণব পুঁথিতে। গ্রন্থকার সংগৃহীত একটি জীর্ণ 'গীতগোবিন্দ' পুঁথি ও একটি 'চণ্ডী' পুঁথিতে লাল কালি ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যনীয়। পুঁথি দুটি ১৮শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধকালের। ওঝাদের মন্ত্রের পুঁথি লাল কালিতে লেখা। এশিয়াটিক সোসাইটির ঘটকর্পরকৃত

'যমককাব্য' (নং ৯২৯৪) ও 'অমরুশতক' (নং ৯৩০৭) পুঁথি দুটি লাল কালিতে লেখা।

এছাড়াও গাছের পাতা দিয়ে সবুজ রঙ, হরিতাল দিয়ে (orpiment) হলুদ রঙ, কাঠকয়লা দিয়ে কালো রঙের কালিও তৈরী হয়েছে। পুঁথির কোন অপ্রয়োজনীয় বা ত্রুটিপূর্ণ অংশ মুছে দেবার জন্যে হরিতাল ঘষে দেওয়া হয়েছে। আবার কালির সঙ্গে সোনা ও রূপোর জল মিশিয়ে লেখার ঔজ্জ্বল্য ও স্থায়িত্ব সৃষ্টির প্রচেষ্টাও কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে। আজমীর-কল্যাণমল পুস্তকসংগ্রহে এমন কিছু 'জৈন কল্পসূত্রে'র পুঁথি আছে (১৭শ শঃ) যার প্রথম দিকের পত্রগুলি সোনার জলের কালিতে লেখা। ঐ সংগ্রহে এধবণের আরও কিছু দৃষ্টান্ত আছে।
অজন্তার গুহাচিত্রগুলিতে কালি জাতীয় নানা বর্ণের পদার্থের ব্যবহাব হয়েছে। অধ্যাপক সরসীকুমার সরস্বতী তাঁর 'পালযুগের চিত্রকলা' গ্রন্থে লিখেছেন, ''আমাদের চিত্রগুলিতে সাদা (সিত, ধবল, শ্বেত), হলুদ (পীত), নীল (শ্যাম), লাল (রক্ত), কৃষ্ণ (কজ্জ্বল), ও সবুজ (হরিৎ) রঙ্ ব্যবহৃত হয়েছে দেখা যায়। পূর্বমধ্যযুগে ভাবতবর্ষে বিভিন্ন রঙ উৎপন্ন হয়েছে খনিজ ও শিলাজাত পদার্থ থেকে। কোন কোন রঙেব আকর রূপে নীল, লাক্ষা, প্রভৃতি দ্রব্যেরও প্রচলন ছিল বলে জানা যায়।'' শঙ্খ বা ঝিনুকেব ভস্ম ও সাদামাটি থেকে তৈরী হয়েছে সাদা রঙ। হবিতাল ('দগাদী' ও 'বর্গী' হবিতাল) থেকে তৈবী হয়েছে হলুদ রং। নীল রঙ এসেছে নীলগাছ থেকে। এছাড়া দরদ (লাল সীসা), লাক্ষা বস, আলতা, গিবি মাটি তো ছিলই। এরপব একটি রঙের সঙ্গে আর একটি রঙ মিশিয়ে ভিন্ন ভিন্ন রঙ তৈরী করে নেওয়া হোত।

বিশ্বভারতীর পুঁথিসংগ্রহে রক্ষিত দুটি পুঁথিতে (নং ৪৫৩ ও ৯৭১) সেকালের কালি তৈরীব দেশীয় পদ্ধতির কথা জানা যাচ্ছে।'' এই রীতি উত্তরপশ্চিম ভারত থেকে বাংলাদেশে এসেছিল কীনা নাকি সারা দেশেই কালি বা রঙ তৈরীর ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছিল, তা অজ্ঞাত।

১. 'লোধ লাহা লোহার গুঁড়ি। অর্কাঙ্গাব জবাব কুঁড়ি।।
গাবের ফল হরিতকী। ভৃঙ্গার্জুন আমলকী।।
বাবলা ছাল ঝাঁটির রস। ডালিম সেচে করবি কষ।।
ভেলায় কর্য একথালি। চারযুগ না উঠবে কালি।।'

২. 'কাজল গোমূত্র লাযের জল। ভৃঙ্গ ভেলা দিয়ে তোল।
পীত কাষ্ঠ দিয়ে রসি। তোটে পত্র না তোটে মসী।।'

অবশ্য তিল, ত্রিফলা, শিমূল বা অর্জুন ছাল, ছাগদুগ্ধ ও লোহার কস দিয়ে কালি তৈবীর রীতি মধ্যবাংলায় একসময় বেশ প্রচলিত ছিল (যুগান্তর, ২৯. ১১. ১৯৮১)। লিপিকর-পুঁথি লিখিয়েরা নিজেরাও যে কালি তৈরী করে নিতেন তাও জানা যাচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহের 'মোহাম্মদ হানিফার লড়াই' (নং ৬৮৬) পুঁথিব লিপিকব বিনীতভাবে লিখেছেন : 'হীন ছদর আলী লেখে দিয়া নিজ কালি / আছল অশুদ্ধ মোরে না দিবেন্ত গালি।।'

যাঁদের বয়স ৬০ থেকে ৭০ এর মধ্যে, তাঁরা বোধ হয় ভুলে যাননি (আমি শহরবাসীদের কথা বলছিনা।), ছাত্রজীবনে গ্রাম্য পাঠশালাব সময তাঁরা যে কালিতে তালপাতায বাঁশের কলমে লিখতেন, তা যৌথ পরিবারের কোন অভিজ্ঞরা বা গ্রামস্থ কোন বিশেষ ব্যক্তি (কালি

তৈরীতে অভিজ্ঞ) তৈরী করে দিতেন। মাটির পাত্রে বালির সঙ্গে আতপচাল কালো করে পুড়িয়ে ভেজে, তাকে গুঁড়ো করে কাপড়ে ছেঁকে জলে গুলে কালি তৈরী হোত। মাটি বা কাঁচের দোয়াতে এই কালি ভরে ভেতরে একটুকড়ো কাপড় দেওয়া থাকতো, যাতে প্রতিবারে কলমে সমান কালি ওঠে, কালি যেন পড়ে না যায়, আর বাঁশ-কঞ্চি-ধাতু-পাখির পালকে তৈরী কলম যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

তবে সব ভালরই কিছু কিছু মন্দ দিকও তো থাকবেই। দেশীয় কালি প্রস্তুত কারকরা পুঁথি পত্রের লেখাকে 'চারযুগ' চিরস্থায়ী করতে গিয়ে কালিতে এমন কিছু কিছু উপাদান মিশিয়েছেন, যার ফলে কাগজ বা তালপাতার লেখা কোন কোন অংশ ক্ষয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে দুষ্পাঠ্য হয়ে গেছে। কালিতে লৌহচূর্ণ ব্যবহারের কুফল বলেও কারো কারো অভিমত।[১৪] আবার অন্যকোন পদার্থের রাসায়নিক বিক্রিয়াতেও এমন ক্ষতি হতে পারে। পুঁথিসংগ্রাহক মাত্রেই দেখেছেন, তুলট বা তালপাতার পুঁথি ভিজে নষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু তার লেখা অনেকাংশেই অক্ষত। যাই হোক, পরবর্তীকালে বাজারে কলের কাগজ আর বড়ি-কালির আবির্ভাব ঘটলে হাতে তৈরী কাগজ আর কালির প্রস্তুতি প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। সম্প্রতিকালে বলপেন আর ডটপেন তো সর্বত্র ব্যবহৃত ; তরল কালির ব্যবহার প্রায় রহিত হয়ে গেছে।

কাগজ তৈরীর জন্যে যেমন 'কাগচী'রা ছিল, কালি তৈরীর তেমন কোন শিল্পী ছিল কীনা, তা জানা যায় না। তবে কাজটি যে সহজসাধ্য ছিল না, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

গ্রন্থপঞ্জী ও সূত্রনির্দেশ

১. ভারতীয় যাদুঘরে রক্ষিত। নং A 19720

২ "The alphabet goes by the name 'Siddhamatrika' or sometimes by 'Kutila' the chief characteristic of which is that the letters show acute angles at the lower or at the right ends and small wedges like the shape of a solid triangle at the top of the vertical lines"- Shyamal Kanti Chakravarty, 'A Descriptive Catalogue of Prakrit and Sanskrit Inscriptions', Indian Museum, 1977, P 7

৩ 'পৃথিবীর ইতিহাস', প্রাচীন যুগ, এফ্ করোভকিন, মস্কো, ১৯৮৬, পৃঃ ৭৯।

৪ 'জাতক', ১ম খণ্ড, ঈশান চন্দ্র ঘোষ, ১৩৯৭।

৫. ছিদ্রযুক্ত কাঠের তক্তা। এর ওপর কালি মাখিয়ে তার ওপর খড়ি দিয়ে লেখা হোত। ছিদ্রটিতে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হোত। দ্রঃ জাতক ১।

৬ 'Indian Paleography'- G Buhller

৭ প্রাগুক্ত।

৮ 'Illustrated palmleaf manuscripts of Orissa', Ed by Subas Pani, Orissa State Museum, Bhubaneswar, 1984, P. I.

৯. প্রাগুক্ত।

১০. অপরিপক্ক, সাদা রঙের পাতা, যা অনেকাংশেই ভেতরে থাকে।

১১. ওড়িশায় পাতাগুলিকে ধানের রাশির মধ্যে কয়েকদিন রাখা হয়।

১২. 'পালযুগের চিত্রকলা', সরসীকুমার সরস্বতী। ১৯৭৮।

১৩ 'Indian Paleography'- G Buhller

১৪. প্রাগুক্ত

১৫ 'Indian Paleography'

১৬ প্রাগুক্ত।

১৭ 'বিশ্বকোষ', ৮ম, সাক্ষরতা প্রকাশন, ১৯৮০, পৃঃ ৬৫।

১৮ 'দুইশতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন', ১৯৮১, পৃঃ ১৪-১৫।

১৯. 'পাণ্ডুলিপি পঠন সহায়িকা', ড কল্পনা ভৌমিক, ঢাকা, ১৯৯২, পৃঃ ৩৩।

২০ ওড়িয়া সহ প্রায় সব দক্ষিণভারতীয় বর্ণমালা গোলাকার। কারণ তালপাতায় ধাতব শলাকা দিয়ে খোদাই করে লেখা। শলাকার সূক্ষ্ম অগ্রভাগ তালপাতাকে সহজেই চেঁড় বরাবর ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

২১ 'বাংলা পুঁথি ঃ রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতীর পুঁথি বিভাগ', পঞ্চানন মণ্ডল, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, বর্ষ ৭৫, সংখ্যা ১, পৃঃ ১২।

২২ 'পুঁথি পরিচয়' ১ম-৪র্থ খণ্ড, পঞ্চানন মণ্ডল, ১৩৫৮-৮৬।

২৩ 'পাণ্ডুলিপি পঠন সহায়িকা', ড. কল্পনা ভৌমিক, ঢাকা, ১৯৯২।

চার

লিখনরীতি

লেখালেখির সাধারণ রীতি

বাংলা পুঁথি ও পাণ্ডুলিপির বিশাল সমুদ্রে বিচিত্র মনিমাণিক্যের অন্ত নেই। পুঁথি লেখা ও তার অলঙ্করণের মধ্যে শিল্পী ও পুঁথিলেখকের নিবিড় শিল্পবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা, অজস্র ভুল বানানে কন্টকাকীর্ণ, অক্ষম লিপিকর বা পুঁথি লেখকের অযত্নলালিত পুঁথির যেমন অভাব নেই, তেমনি চিত্রিত পাটাযুক্ত, অলঙ্করণে সজ্জিত সুদৃশ্য হস্তাক্ষরের পুঁথির সংখ্যাও কম নয়। আধুনিককালের পুঁথিপাঠক বা সম্পাদকের কাছে এই ধরণের সব পুঁথিই সমান গুরুত্বপূর্ণ। কীটদষ্ট, জরাজীর্ণ, অনাদরে পরিত্যক্ত দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরের পুঁথিটিই হয়তো আদি বা মধ্যযুগের বাংলাভাষা-সাহিত্যের কোন অজ্ঞাতপূর্ব সম্পদ, একথা কে অস্বীকার করবে!

পুঁথিশিল্প সামগ্রিকভাবেই 'কুলক্রমাগত' বা 'ঐতিহ্য পরম্পরাগত' (Traditional) শিল্পরীতির সংজ্ঞাতে আলোচ্য। পিতৃ-পিতামহের পুঁথি লেখার কলা-কৌশল যেমন পরবর্তী পুরুষরা অনুসরণ করেছেন, তেমনি আবার পূর্ববর্তী কোন লিপিকর পুঁথিলেখকের লিখন-রীতি পরবর্তী লিপিকররা অনুসরণ করেছেন। বিভিন্ন সময়ে এই লিখনরীতির মধ্যে বৈচিত্র্যও সৃষ্টি করা হয়েছে। ক্যালিগ্রাফি, পুঁথির পত্রচিত্রণ, কিনারায় অলঙ্করণ, বর্ণ সংস্থাপণ, যুক্তব্যঞ্জন গঠন, রেফ অনুস্বার ও চন্দ্রবিন্দু, পত্রাঙ্ক, বিভিন্ন চিহ্ন ব্যবহার, সংশোধন ও সংযোজন প্রক্রিয়া এবং বিশেষতঃ পাটাচিত্রণের বিষয়গুলি এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে। লেখা এবং অলঙ্করণ দুটি কাজ একই ব্যক্তি করেন নি। কারণ পত্র বা পাটাচিত্রণের সঙ্গে বাংলার লোকচিত্রকলার যে সাদৃশ্য দেখা যায়, তাতে মনে হয় এগুলি অন্য কোন পেশাদারী শিল্পীগোষ্ঠিরই কাজ। আগে লেখা, পরে চিত্রাঙ্কণ, আবার কোথাও কোথাও চিত্রাঙ্কণের পরেও লেখা হয়েছে। প্রাচীন পুঁথির চিত্রগুলি অনেক ক্ষেত্রেই পুঁথির বিষয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়। উৎকলীয় পুঁথিতে চিত্রের পরিচিতিও দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে।

কোন একটি পুঁথির পরিচয় জানার জন্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির দিকে দৃষ্টি দিতে হবে—

১. দেবদেবীর নামের পরেই থাকে পুঁথির নাম (চর্যাপদের পুঁথি শুরু হয়েছে এইভাবে ঃ প্রথমে '৫' এর মতো মাঙ্গলিক চিহ্ন। তারপরই ''নমঃ শ্রী বজ্রযোগিন্যৈ ।। শ্রীমৎ সদগুরু বক্তুপঙ্ক জ. ....।'') যেমন, হিন্দু পুঁথিতে '৭ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ ।। নমঃ সর্থনারায়নায় নম ।। অথো

ফেসাবার পালা লিক্ষতে ।।', '৭ শ্রীশ্রী দুর্গাঃ ।। অথ মনসার জাগরণ লিক্ষতে ।।' মুসলিম পুঁথিতে - '৭ শ্রীহবিব ৭ শ্রী আর্ল্লা হোঁ কাফি ।। জঙ্গনা মা হজরত আমিরন মোঁ মিমিন সহন সাহ মর্দ্দান আলি হয়দর ।। ... আর্ল্লার কউসে ফকির নোঙাঞিএঞা মাথা । কহিতে লাগিল পির কার্ল্লামের কথা ।।'[১] "শ্রীহবিব আউজ বিল্লাহে মিনেষ সাএতানের বাজিম । বিছমিল্লাহের রাহমানের রহিম ।। পহিলা আল্লার ধনি কহ মুমিনগণ । জে নামে তরিএঞা জাবে তামাম আলম ।। মন দিএঞা যুণ সর্ত্তপিরের কাহিনি । .... ."[২]

হিন্দুপুঁথি বাম থেকে ডানদিকে আর মুসলমানী পুঁথি ডান থেকে বামদিকে লেখা (খরোষ্ঠী লিখন পদ্ধতি স্মরণযোগ্য) ।

লিপিকর দুভাবে পুঁথি লিখতেন । প্রথমতঃ তিনি বেশ কিছু জনপ্রিয় কাব্যের (যেমন মঙ্গলকাব্য, রামায়ণ, মহাভারত, চৈতন্যজীবনীকাব্য ইত্যাদি) রেডিমেড পুঁথি লিখে রাখতেন । দ্বিতীয়তঃ পুঁথি সংগ্রাহকের ফরমাইস মতো পুঁথিও তিনি লিখতেন । এমন অনেক পুঁথি দেখা যায়, যেগুলিতে (ক) লিপিকরের নাম ধাম থাকলেও পুঁথি মালিকের নাম ধাম নেই, (খ) পুঁথি মালিকের নাম পরে কিছুটা ভিন্ন কালিতে, কখনও কখনও পৃথক হস্তাক্ষরে আছে, (গ) লিপিকর বা পুঁথি মালিক, কারও নাম নেই । 'ক' চিহ্নিত রেডিমেড পুঁথি সংগ্রহকালে সংগ্রহকারীর নাম লেখা হয়নি বা কোন মালিক তা সংগ্রহই করেন নি । তা থেকে গেছে লিপিকরের কাছেই । 'খ' চিহ্নিত পুঁথিগুলি ক্রয় করার সময় মালিক নিজের নাম ধাম লিখিয়ে নিয়েছেন। যাই হোক না কেন, কোন বিষয়ের পুঁথি লেখা হবে সেটি তো লিপিকর প্রথমেই স্থির করে নিতেন । এজন্যে আদর্শ পুঁথিটিকে (যা দেখে বা শুনে অনুলিপি হবে) সযত্নে সংগ্রহ ও রক্ষা করা হোত ।

২ মঙ্গলকাব্যের পুঁথির মধ্যে সাধারণতঃ 'দিগবন্দনা', 'গ্রন্থোৎপত্তির কারণ', 'দেবখণ্ড', 'নরখণ্ড', 'অষ্টমঙ্গলা' এই ধরণের বিভাগ থাকলেও অন্যান্য সব পুঁথিতেই তা থাকার নয়। 'দিগ বন্দনা' গুলি আঞ্চলিক ইতিহাসের মূল্যবান উপাদান । কারণ এগুলিতে স্থানীয় হিন্দুদেবদেবী ও পীর পয়গম্বরদের নাম ও 'আশ্রয়স্থলের' উল্লেখ থাকে । 'গ্রন্থোৎপত্তির কারণ' যে কত গুরুত্বপূর্ণ, 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী' তার অসাধারণ দৃষ্টান্ত । পুঁথির প্রতি পরিচ্ছেদের শেষে থাকে ভণিতা ।[৩] এখানে কবির নাম বা তাঁর পরিচয় জ্ঞাপক উপাধিটি জানা যায় । কয়েকটি পরিচ্ছেদের পরে থাকে কবির নাম ছাড়াও তাঁর ব্যক্তি পরিচিতি । পুঁথি গবেষণায় এই পরিচয়জ্ঞাপক পদগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ । দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি ভণিতা এখানে তুলে ধরা হোল - পুঁথিগুলির লিপিসাল নির্দেশিত।

ক.	'সংগ্রাম দেবের সুত	হরিদাস দেবসুত	পশ্চিমমালিকা পূর্ববাস ।
	সুদাম দেব তার সুত	পূর্ণ্যশ্লোকগুণজুত	তাহার তনয় কৃষ্ণদাস ।।
	মাধবী জঠরে জন্ম	সদা চেষ্টা গানকর্ম্ম	চেতুয়া বলাইকুণ্ডে স্থিতি ।
	কংসাবতী নদীতীর	পিযূস সমান নীর	যথা অধিষ্ঠান সরস্বতী ।।

- শঙ্করের 'শীতলামঙ্গল', লিপি- ১৮৫৯খ্রীঃ ।

খ.	'পিতামহ পুরুশর্ত্তম	জগৎদুঃল্লভ নাম	ত্রীলোচন তাহার কুঙর ।
	তস্যাশূত পিৃয়শাম	শকল গুণের ধাম	চিরকাল চেতুয়া ভিতর ।।
	তস্যশূত শ্রীগোপাল	মান্দারনে কতকাল	নিবাস কোরিল বোন্দিপুরে ।

শ্রীবল্লব তস্যসুত গোবিন্দ চরণে রত হরি বল পাপ জাক দুরে ।।

- কবিবল্লভের 'চন্দ্রকেতুপালা', লিপি ১৮৮০ খ্রীঃ ।

গ. 'খেপুত ভাটরা তড়া গোপালনগর শ্রীবরা পঞ্চপাটে পঞ্চ ভট্টাচার্য ।
দেব অনুগ্রহে কবি এপঞ্চপণ্ডিত সেবি তবে কৈল কবিতায় ধার্য্য ।।
রুক্মিনী কান্ত ভট্টাচার্য তড়াবাসী বিদ্যাধুর্য তার আজ্ঞা করিয়ে পালন ।
ভট্টসার্বভৌম বাসে রামায়ণ রচি শেষে সপুস্তক মন্দির দা (হ)ন ।।
গঙ্গেশ ভট্টাচার্য ঋসি গোপালনগর বাসি শুক্রাচার্য মুনির সমান ।
বুঝিয়া কবিত্ব হিত কৃপা করি যথোচিত তিনি মোর চিন্তিল কল্যাণ ।।
ভোলানাথ ভট্টাচার্য বৃহস্পতি বড় ধুর্য শ্রীপাট শ্রীবরা নিবাসিত ।
প্রথম কবিত্ব ভাগে তার আশীর্ব্বাদ মাগে শতদ্বিজ গোষ্ঠির সহিত ।।
বাঞ্ছারাম বিদ্যাবাগীশ গণে সিন্ধু যেন গিরীশ পুত্র পৌত্র পণ্ডিত প্রবর ।
ভাটরা ভবনে বসি অবিরত দিবানিশি নানা শাস্ত্র শিখালে বিস্তর ।।'

- শ্রীকৃষ্ণকিঙ্করের 'শীতলামঙ্গল', লিপি ১৮৭৬ খ্রীঃ ।

ঘ. 'অজিত সিংহের তাত জসমন্তনরনাথ রাজা রামসিংহের নন্দন ।
তস্য পস্য রামেশ্বর তদাশ্রয় কর্য়্যা ঘর বিরচিল সরস বচন ।। ...
পূর্ববাস যদুপুরে হিমৎ সিংহ ভাঙে জারে রাজা রাম সিংহ কৈল প্রীত।
স্থাপিয়া কৌশিকীতটে বরিয়া পুরাণ পাটে বিরচিল মধুর সঙ্গীত ।।'

- রামেশ্বরের 'শিবায়ন', লিপি ঃ ১৮১৫ খ্রীঃ ।

এইসব বিবরণ থেকে স্থানীয় ইতিহাস বিষয়ক নানা তথ্য পাওয়া যায় ।[৪] তাই এগুলি আঞ্চলিক বাংলার বিস্মৃত স্থান ও কালের ঐতিহাসিক উপাদান ।

৩. ভণিতার মধ্যেই খুঁজে পাওযা যায় কবির কাব্যরচনার কাল । বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই হেঁয়ালির মাধ্যমে কবিরা কাব্যরচনার কাল নির্দেশ করেছেন । এজন্যে সংখ্যাবাচক শব্দগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা জরুরী ('সাল তারিখ নির্ধারণ' অংশ দ্রষ্টব্য)। আবার, পুঁথিটি কোন স্থান ও কালে অনুলিখিত হয়েছে, পুঁথি সম্পর্কে লিপিকরের আর কোন ইচ্ছা বা অনিচ্ছা আছে কীনা এসব জানা যাবে পুঁথির শেষপত্রে 'পুষ্পিকায়'[৫] (বিশদ আলোচনা 'পুষ্পিকা' অংশ দ্রষ্টব্য) ।

কাব্যের মধ্যে কখনও কখনও কবি নিজের রচনা সম্পর্কে ব্যক্তিগত কথাও বলেন । যেমন কবি শঙ্কর তাঁর 'লক্ষাপূজাপালা' পুঁথিতে (লিপি ১২৫৬ বঙ্গাব্দ) লিখেছেন -

'প্রথমের পুথিখানি রচিলাম যতনে । লিখিতে লয্যা তারে গেল কোন জনে ।।
অনেক করিল্যাম চেষ্টা না হল্য উদ্দেশ । দুনেচাড়ি গিত তার রয়্যা গেল শেষ ।।'

আত্মপরিচিতিমূলক পদে কবিরা নিজেদের আশ্রয়দাতা জমিদার বা সম্ভ্রান্ত মানুষের প্রশংসায় পঞ্চমুখ । কোন কোন ক্ষেত্রে কবিদের পারিবারিক পরিচিতিও বিশদ হয়ে গেছে, যা থেকে কোন ঐতিহাসিক সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় না । পূর্বকথিত শ্রীকৃষ্ণকিঙ্করের পুঁথি থেকেই উদ্ধৃতি দিই-

'সাকিম ক্ষেপুত পরগণে মানকুর । তিলকচন্দ্ররাজ অধিকারে নিজপুর ।।

শঙ্কর সন্ততি লক্ষীকান্ত সুবিখ্যাত । সূলপানি সুত তস্য সুত জগর্ন্নাথ ।।
তস্যসুত মুকুন্দ পিতা মাতা কাত্যায়নি । খুল্লতাত আনন্দ শ্রীমতি পিসীরানি ।।
দীনবন্ধু নিমাই আদি চারি সহদর । কনেষ্ঠ নারান কৃষ্ণা ভগ্নি একেশ্বর ।।
অর্জুন ভবানীশ্বর রামজয় দুর্গা । গয়ারাম আদি জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতৃসুতা যজ্ঞা ।।'

- অক্ষয়কুমার কয়াল সংগৃহীত পুঁথি ।

এইসব অতিদীর্ঘ ব্যক্তি পরিচিতি পাঠকের কাছে কতখানি সুখপাঠ্য হোত কে জানে । কিন্তু আঞ্চলিক ইতিহাসের উপাদান রূপে এগুলির গুরুত্ব কম নয় । আর এক নবাবিষ্কৃত কবির রচনা কিছুটা পড়ে নেওয়া যায় -

'পরগণা মণ্ডলঘাটে ভাটোরার সর্নিকটে কুল্যাগ্রাম অতি মনহর ।
সেই কুল্যাগ্রামে বাস চৌধুরী ঠাকুরদাস পুণ্যশ্লোক দেবির কিঙ্কর ।।
তার পতিব্রতা নারি মোরে পুত্র স্নেহ করি দিলা নানা বস্ত্র অলঙ্কার ।
শীতলা চরণ সেবি কহেন শঙ্কর কবি দেবি জারে হল্য ধ্বজাধর ।।'

- শঙ্করের 'বিরাট জাগরণ', ১৮৫৯ খ্রীঃ ।

আগেই বলা হয়েছে, 'গ্রন্থোৎপত্তির কারণ' কত গুরুত্বপূর্ণ হয়, মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্য' তার বলিষ্ঠতম দৃষ্টান্ত । অপরাপর কাব্যেরও এই অংশটি কম গুরুত্বপূর্ণ নয় । এই ধরণের কয়েকটি উদ্ধৃতি ঃ-[৬]

১. 'সুলতান হুসেন সাহা পঞ্চগৌড়ের নাথ । ত্রিপুরার দ্বারে যার সমর্পিল হাত ।।
সোনার পালঙ্ক দিল আর এক ঘোড়া । রাঙ্গা কঞ্চুক দিল লঙ্কের কাপড়া ।।
শ্রীযুক্ত পরাগল খান মহামতি । দারিদ্র্য ভঞ্জন বীর অনাথের গতি ।।
কুতূহলে ভারতের পুচ্ছন্তি কাহিনী । কোন মতে পাণ্ডবেরা হারাইলা রাজধানী ।।
বনবাসে বঞ্চিলেক দ্বাদশ বৎসর । কোন কর্ম করিল তা বনের ভিতর ।।
বৎসরেক আছিলা সবে অজ্ঞাত বসতি । কোনমতে পৌর সে পাইলা বসুমতি ।
সব কথা কহ মোরে সংক্ষেপ করিয়া । দিনেক দিতে পারি পাঁচালি রচিয়া ।।'

- কবীন্দ্র পরমেশ্বরের 'পাণ্ডববিজয়', (এ. ৪৯৭৭) ।

২. 'তৎপরে পদ্মা মোরে দেখাইল স্বপন । কবিত্বের আশা মোর সেহিত কারণ ।।
গুণীর সাক্ষাতে আমি কি বলিব বাণী । কোকিল সাক্ষাতে যেন কাকে করে ধ্বনি ।।
মুনিমুখে শুনিয়াছি সৃষ্টির পত্তন । পদ্মাপুরাণ কথা শুন জ্ঞানিজন ।।'

- নারায়ণদেবের 'পদ্মাপুরাণ', ১৮শ শঃ ।

ইরানের বাদশাহ্ আব্দলস্তের পুত্র কমরুজ্জমান ও চীনের রাজা কলিদাঙ্গমনির কন্যা ছফুরা খাতুনের প্রণয় কাহিনী ('বিদ্যাসুন্দর' কাহিনীর অনুসরণে কি ?) 'কমরুজ্জমান ছাকুরাখাতুন' বা 'রসমঞ্জরী' (রচনাকাল ১৮৭০ খ্রীঃ) কাব্যের রচয়িতা পণ্ডিত মোশারফ আলীর (ঢা. বি. ৭০৪) নিবাস ছিল চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড থানার মুরাদপুর গ্রামে । দীর্ঘকাল বর্মা প্রবাসী কবি লিখেছেন -

'বিদ্যাহীন মোশ্রফ আলী জগতে প্রকাশ ।।

ভাজ্ঞহীন পরাধিন বক্ষে প্রেম সাল । বিদেশে বিপাকে সদা দুক্ষে গেল গেল ।। ...
মিত্র মাঝে একজন নামে আছমত আলি । আর মিত্র আবদুল গফুর ভাগ্যসালি ।।
একদিন সভা করি জোগ মিত্র বরে । ইঙ্গিতে কহিল টুক অধিনের তরে ।।
আর কত মহর্ত্তান কহিল ইঙ্গিতে । নাম নিদ্রশন এক পুস্তক রচিতে ।। ...
কাব্যমুল ছিল আদ্যে গদ্য উপন্যাশ । তছনিপি মোজামেল হক হিন্দুস্থানি ভার্শ ।।'

- 'পুথি পরিচিতি', ঢাকা, ১৯৫৮, পৃঃ ৪৮ ।

পরাণচন্দ্রের 'হরিহরমঙ্গল' (এ. ৩৮৬০) কাব্যটিতে বর্ধমান সম্পর্কিত তথ্যাদি আছে । রাজা তেজশ্চন্দ্রের প্রশংসায় পঞ্চমুখ কবি লিখেছেন-

'বর্দ্ধমান মহাস্থান প্রধান গণনে । তদন্ত একান্ত তবে শুন সর্ব্বজনে ।।
শ্রীযুত শ্রীযুত তেজশ্চন্দ্র বাহাদুর । মহারাজ অধিরাজ যাহার ঠাকুর ।।'

অন্যত্র কবি লিখেছেন -

'নূতনমঙ্গলের সঙ্গীতের হেতু । আজ্ঞা দিল তেজশ্চন্দ্র রাজা ধর্ম্মসেতু ।।
তাঁর অনুগ্রহ আজ্ঞা বন্দিয়া মাথায় । হরিহরমঙ্গল শ্রীপ্রাণচন্দ্রে গায় ।।'

'ভগবদ্গীতার' বঙ্গানুবাদ করেছেন কবি রতিরাম (এ. ৮০২১) । তিনি রামচন্দ্র ও রাধাবল্লভ ভট্টাচার্য- এই দুই সর্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতের প্রশংসা করেছেন উচ্ছ্বসিত ভাষায় । তিনি আরো লিখেছেন -

'জেহিধামে যদ্বৈত প্রভুর বিরাজিত । তান ভৃর্ত্ত রতিরাম যতি যল্পমতি ।। তথাপি গুরুর আজ্ঞা হইল তান প্রতি । লোক পবিত্রাণ হেতু কৃষ্ণগুণবাণী ।। অজ্ঞা দিল গীতা পুণ্য রচিতে পাঞ্চালি ; গুরু আজ্ঞা বেদতুল্য লঙ্ঘন না জায় । জথাগম্য রচিল সক্তি নাহি সমুদায় ।।'

'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের শ্রেষ্ঠতম রচয়িতা এবং মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যকাননের 'উৎকৃষ্টতম সুগন্ধীপুষ্প' কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর আত্মবিবরণীর অনুকরণে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ তাঁর 'মনসামঙ্গল' কাব্যে এক দীর্ঘ আত্মবিবরণী দিয়েছেন । তা থেকে তাঁর সময়কালীন বিবিধ সামাজিক ও ঐতিহাসিক তথ্য জানা যায়, জানা যায় তাঁর কাব্যরচনার নেপথ্য কাহিনী বিষয়ক বৃত্তান্ত । সমকার সেলিমাবাদের শাসনকর্তা বারা খাঁ, বিষ্ণুদাস ও ভাবামল্ল নামক দুজন ঐতিহাসিক ব্যক্তির কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে । দেবী মনসা কবিকে 'মুচিনীর' রূপ ধরে ছলনা করে বলে যান 'ওরে পুত্র ক্ষেমানন্দ/কবিতা কর প্রবন্ধ/ আমার মঙ্গল গায়্যা বোল ।।'

রামকুমারের 'ভাগবত' রচনার নেপথ্যবৃত্তান্ত এবং আত্মপরিচিতি মূলক রচনাংশ-

'রাধাকান্তপুরে বাস মাতামহাশ্রয় । শিবপুর মধ্যে হয় পিতার আলয় ।।
শ্রীযুত শ্রীকৃষ্ণহরি মাতামহো নাম । অবসতি গঙ্গানন্দ চাটুতিসন্তান ।।
রামমোহন সুকুম্যার সন্তান আপনি । ফুলে কানাই ছোট্ ঠাকুরের সন্তানে বাখানি ।।
এই ভাগবত মোর পড়া গ্রন্থ নয় । যেখানে শুনিনু তার শুন পরিচয় ।।
শ্রীযুক্ত স্বরূপচন্দ্র মাহান্ত সন্তান । এসব সন্ধান পাইলাম তার স্থান ।।
আমারে বুঝালে তহো শ্লোক অনুসারে । আমি রচিলাম তাহা করিয়া পয়ারে ।।
পূর্ব্বেতে লিখেছি বাস যেখানে আমার । নাম মোর হয় শুন শ্রীরামকুমার ।।

শাকে চন্দ্রবাণ সিন্ধু সসিযুশোভন । রস অগ্নি পক্ষ গুরু বাঙ্গলার সন ।।'

- 'ভাগবত' ৮ম স্কন্ধ, (এ. ৫০০৭) ।

হরিদত্ত দাসের 'কালিকাপুরাণ' (এ. ৩৬০২) পুঁথিতে 'গ্রন্থোৎপত্তির কারণ' ও অন্যান্য বৃত্তান্ত থেকে এই তথ্য জানা যায় 'ব্যবসা কিতাব আমার অখ্যাত নাহি রাজ ।'

কবিদের আত্মপরিচিতিমূলক এই জাতীয় রচনায় ফুটে ওঠে আঞ্চলিক সমাজ ও ইতিহাসের নানা বৃত্তান্ত ।

পঞ্চদশ শতকের 'মনসামঙ্গল' রচয়িতা কবি বিপ্রদাস পিপ্পলাই তাঁর কাব্যে গঙ্গা তীরবর্তী অনেকগুলি স্থানের নামোল্লেখ করেছেন । রচনাংশটি নিম্নরূপ -

'পূর্ব্বকুল বাহিয়া এড়ায় কলিকাতা । বেতড়ে চাপায় ডিঙ্গা চাঁদ মহারথা ।।
পূজিল বেতাইচণ্ডি চাঁদ দণ্ডধর । হরষিতে সড়ীগায় নায়ের নফর ।।
নানা উপহারে কৈল রন্ধণ ভোজন । ধলণ্ড বহিয়া গেল ক্করিত গমন ।।
কালীঘাটে চাঁদরাজা কালিকা পূজিয়া । চুড়াঘাট বাহিয়া যায় জযধ্বনি দিয়া ।।
ধনস্থান এড়াইল বড় কুতূহলে । বহিল বারুইকুল মহা কোলাহলে ।।'

এছাড়াও, এই কাব্যে কুমারহাট, হুগলী, ভাটপাড়া, কাঁকিনাড়া, মূলাজোড়, পাইকপাড়া, ভদ্রেশ্বর, ইছাপুর, খড়দহ, রিষড়া, কোন্নগর, এড়েদহ, ঘুষুড়ি, চিৎপুর ইত্যাদি আধুনিক স্থান নামও লেখা আছে ।

দ্বিজ বাণেশ্বরের 'মনসামঙ্গল' (এ. ৫৪১৫) পুঁথিতে কবির ব্যক্তিগত ঘোষণার মধ্যেও বৈচিত্র্য আছে । দ্বিজ সহদেবের 'তারকেশ্বরের বন্দনা' (এ. ৫৩৬৪) পুঁথিতে শৈব তীর্থক্ষেত্র তারকেশ্বরের অবস্থানের বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

'মর্দ্ধখানে তারকেশ্বর চৌদিগেতে জোলা । ভক্তগণ পূজা দেয় টালাফুলের মালা ।।
বালিগড়ে পরগণা তার বিলেতে বিশ্বাম । পাতকী তরাতে প্রভু তারেশ্বর নাম ।।
মনে হয় মৃত্যুঞ্জয় একচল্লিস সালে । বিস্বর্দ্ধ বসেছিল শ্রীফলের মূলে ।।'

কবি কানুদাস তাঁর 'আত্মকাহিনীতে' (বি. ভা. ১১৪১) বলেছেন ; 'দুষ্কর্ম্ম করিলাম (আমি) কাটয়া ভিতর । এই হেতু মোনে জোর লজ্জিত অন্তর ।। মোনে ছিল কাটয়ায় না দেখাইব মুখ । ভগবত গৃহস্ত জায় ফাটে মোর বুক ।।' এরপর আরও নানা বৃত্তান্ত পরিবেশিত । বর্তমান মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার সেকালীন কাশীযোড়া পরগনার বিদ্যোৎসাহী জমিদার রাজনারায়ণের সভায় কয়েকজন প্রতিভাশালী কবি আশ্রয় লাভ করেন । এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন 'শীতলামঙ্গল' রচয়িতা নিত্যানন্দ চক্রবর্তী।

তাৎকালিক কিশোরচক পরগণার (বর্তমান তমলুক মহকুমা) 'খয়রা-কানাইচক' নিবাসী নিত্যানন্দ তাঁর পুঁথিতে নিজের বংশপরিচয় সহ তাঁর পোষ্টা রাজনারায়ণের বহুবিধ প্রশংসা করেছেন । ঐ রাজসভাতেই আশ্রিত, 'সারদামঙ্গল' রচয়িতা দয়ারাম দাসও লিখেছেন-

'কাশিজোড়া মহাস্থান মহারাজা নরনারাণ ধন্য ধার্মিক যশোধন ।
হয়্যা তাঁর প্রতিষ্টিত দয়ারাম রচে গীত সারদা চরিত্র উপাখ্যান ।।'

'নরনারাণ' বোধ হয় রাজনারায়ণের পিতা ।

কবি কৃষ্ণরাম দাসের 'দক্ষিণ রায়ের পুস্তকে' (বি. ভা. ৮৮) নৌকাযাত্রার বর্ণনায় বড়দহ, কোদালিয়া, মালঞ্চঘাটা, খলিনানগর, রাজদহ, সুরতের ঘাট স্থানগুলির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। বিশ্বভারতী সংগ্রহের (বি. ভা. ৭৩৩) অজ্ঞাত কবির 'বানের কবিতা' পুঁথিতে সতেরো শতকের আশ্বিন মাসে দামোদরের বন্যার নির্ভরযোগ্য বর্ণনা আছে -

'অবধান কর ভাই সর্ব্বজন । মন দিয়া ষুন সভে কবিত্রি রচন ।।

সন হাজার বাহাত্ত সালে প্রথম আশ্বিন্যে । দামুদরে আইল্যবান ষুন সর্ব্বজনে ।।

আড়া চার জল হৈল পর্ব্বত উপরে । মুনিষ্যু ডুবাতে মন কৈল দামুদরে ।।'

সাড়ে নয় ইঞ্চি × সাড়ে তিন ইঞ্চি আকারের তুলট পুঁথির ছ'টি পাতা জুড়ে বন্যার ভয়াবহ বর্ণনা-

'ডুবিয়া মরিল জলে কত কত ছেল্যা । বুড়াবুড়ি মৈল তারা রাম নারায়ণ বৈল্যা' ।।

রাঢ়-বাংলার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের এমন বর্ণনা বাংলা পুঁথিতে সুদুর্লভ ।

আবদুন নবীর 'আমীর হাম্‌জা' (ঢা. বি. ৬০৭) পুঁথির অপর এক অনুলিপিতে কবির দীর্ঘ পরিচিতি আছে সরল ত্রিপদী ছন্দে । কবির জন্মস্থানের পরিচিতি নিম্নরূপ ঃ-

'স্বর্গে অবতরি সম সুচারু নির্ম্মাণ । চাটিগ্রাম রাজ্য মাঝে (ছিলিমপুর) স্থান ।।

পূর্ব্বে কর্ম্মেতিস গিরি পশ্চিমে সাগর । মৈদ্ধে জেন গর জেন মক্কা সম সর ।।

সেইস্থানে আছে মোর খুদ্র এ উআরি । বিরচিত পঞ্চালিকা তথা ধর্ম্মস্মরি ।।'

-'পুঁথি পরিচিতি ; ঢাকাবিশ্ব. পৃঃ ৩ ।

'নিত্য আচরণীয় ইসলামী শরা- শরীয়ত' বিষয়ক গ্রন্থ, সোলেমান রচিত 'অছিয়তনামা' পুঁথিতে (ঢা. বি. ৫৯) কবির আত্মপরিচয়ে কবির বিনয় -

বলয়া (ভুলুয়া) সহর জানয়তি দির্বস্থান । সেই সে সহর হএ অতি ভাল জান ।।

ছৈদ কাজী যাছে যথ মোছলমান । নানা জাতি য়াছে যথ ব্রাহ্মণ সজ্জন ।।

বহু জাতি য়াছে লোক নাজাএ কহন । সেক ছোলতান (ছোলেমান ?) তাত খুদ্র একজন।।'

গুল বখশের 'কুকি কাটার পুঁথি'র (ঢা. বি. ১৪৮) স্থানীয় ঐতিহাসিক মূল্য বর্তমান । ত্রিপুরা রাজ্যের কুকি প্রজারা ১৯শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বিদ্রোহী হয়ে 'পরগণা রওসনাবাদ' বা বর্তমান ফেণী মহকুমার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে গণহত্যা ও লুঠতরাজ শুরু করে । বিদ্রোহের নেতা ছিল 'রিয়াঙ্গ' নামক একজন কুকি । এর রচনাংশ নিম্নরূপ-

'সুন কহি গুণধাম মুনসীর খিলে এক গ্রাম আছিলেক গিরির নিকট ।...

কুকি সঙ্গে সর্তকরি ব্রহ্ম অস্ত্র কান্দে করি চলি জায় ভৈরব মারিতে ।

শ্রীপঞ্চমির দিনে পূজা করে সর্ব্বজনে এহার বৃথান্ত না জানয় ।

মনে রঙ্গে পূজা করে হেন কালে রিয়াঙ্গেরে দেখি লোক প্রাণ লই ধায় ।।

ভৈরব লইয়া গেল দেখি নর ধাই আইল জিজ্ঞাসিল ধায় কি কারণ ।

নিকটে পায়ন্ত জারে রিয়াঙ্গে ইসারা করে ঘিরিয়া রহিল পাপিগণ ।।

হস্তে খড়গ ধরি কাটে চোদিগে ঘিরিয়া বাটে কেহ কেহ মারেছেল ঘাড়ে....... ।।

ফারসী উপাখ্যান অনুসারে, জনৈক বাঙালী কবি ইজ্জতউল্লাহ রচিত ফারসী কাব্য 'গুলে বকাউলির' বিশিষ্ট অনুবাদক মোহাম্মদ নওয়াজিস খান রচিত পুঁথিতে (ঢা. বি. ৪২৭) আছে দীর্ঘ আত্মপরিচিতি এবং স্থানীয় বৃত্তান্ত। বাণীগ্রামের (সম্ভবতঃ চট্টগ্রাম অঞ্চল) হিন্দু জমিদার বংশের আদি পুরুষ বৈদ্যনাথ রায়ের আদেশে রচিত কাব্যটি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নানাদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ (দ্রঃ 'পুথিপরিচিতি', আহমদ শরীফ, ঢাকা, ১৯৫৮)। কবির বিবৃতির অংশবিশেষ-

'সুন কহি সুবারতা সুধিরতাগণ। বিভাহমঙ্গল তান করিমু রচন।।
জম্বুদ্বিপ মৈদ্ধে চাটিগ্রাম মোহাদেশ। বাজালিআ তার মৈদ্দে মহিমা বিসেস।।
সেই গ্রামে মোহা ২ কুলিন বৈসএ। রূপেগুণে গ্যানে ধ্যানে মোহন্ত আছএ।।
সে সভাত ছিল এক মোহা ভাগ্যবন্ত। নামেত ঠাকুর টোনা জগতে ঘোষন্ত।।
তাহান গ্রহেতে এক আছিল দুহিতা। রূপে গুণে সতি পতিব্রতা সুচরিতা।।'

'গুলে বকাউলির' আর এক অনুবাদক মোহাম্মদ মুকিম (ঢা. বি. ৪১৭) আঠারো শতকের শেষ দিকে রচিত কাব্যে লিখেছেন-

'এবে আপনা'র পির গুরু প্রণামিব। পাদপদ্ম নিবেদিআ বিন এ করিব।।
শ্রীযুক্ত নজুমদ্দিন মহা গুণ শীল। অবোধ অন্ধল প্রতি জ্ঞান চক্ষুদিল।।
তান পদযুগে মোর সহস্র প্রণাম। পরিহার মাগি পুরিবারে মনস্কাম।।
চক্রশালাভূমি মৌদ্ধে পীরজাদা ঠাম। ছৈদ ছোলতান বংশে শাহাদল্লা নাম।।
একে তান ভাত্রিপুত্র দুতি এ জামাতা। সর্ব শাস্ত্র বিশারদ শরিয়ত জ্ঞাতা।।'

এই দীর্ঘ আত্মপরিচয় অংশে চট্টগ্রামের ইতিহাসের বহু তথ্য, চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনেক কবি-সাহিত্যিক, হিন্দুতীর্থস্থান সমূহের নাম আছে। কবি জয়দেবের 'গীত' শোনার আগ্রহ পাঠকদের মধ্যে কেমন, সেই বৃত্তান্তও এখানে বর্ণিত।

অনুরূপ কবিপরিচিতি দেখা যায় কাজী বদিউদ্দীনের 'সিকত-ই-ইমান' (ঢা. বি. ১১৩), নুরুল্লার 'ছিফৎনামা' (ঐ, ৪০৫), সৈয়দ সুলতানের 'নবীবংশ' (ঐ, ৬৫৬, ৮৯৪), আবদুল হাকিমের 'নুরনামা' (ঐ, ২৯৯, ৭০), ইত্যাদি পুঁথিতে। সা বিরিদ খাঁর 'বিদ্যাসুন্দর' পুঁথিতে (ঐ, ৩৮১) কবির বংশ পরিচয় এরূপ-

'পী আর মল্লিক সুত　বিজ্ঞবর শাস্ত্র যুত　উজীআল মল্লিক প্রধান।
তান পুত্র জি ঠাকুর　তিন সিক সরকার　অনুজ মল্লিক মুছা খান।।
রসেও রসিক অতি　রূপে জিনি রতি　পতিদাতা অগ্রগণ্য অর্কসুত।
ধৈর্য্যবন্ত জেন মেরু　জ্ঞানেত বাসব গুরু　মানে কুরু ধর্ম্মে ধর্ম্ম সুত।।
তান সুত গুনাধিক　নানু রাজা ময়ল্লিক　জাগত প্রচার জস ক্ষ্যাতি।
তান সুত গল্পজ্ঞান　হিন সাবিরিদ খান　পদ বন্দে রচিত ভারতি।।'

চিহ্ন ব্যবহার, সংশোধন ইত্যাদি

প্রাচীনকালে শিলালিপি বা তাম্রশাসন নির্মাণ বা রচনার সময় সারা দেশে কিছু কিছু সাধারণ রীতি-নীতি অনুসরণ করা হোত। তাই লিপিরচনায় মোটামুটিভাবে সর্বভারতীয় ঘরাণার (School)

পরিচয় পাওয়া যায় । লেখক রচিত একটি আদর্শ লিপি অনুসরণ করে অনুশাসন খোদাই করা হোত । শিলাপট-তাম্রশাসনের অক্ষরগুলি সারিবদ্ধ করার জন্য খড়ির দাগ দেওয়া হয়ে থাকবে। পরে ছেনি-হাতুড়ী বা সূক্ষ্ম যন্ত্রের দ্বারা খোদাই কাজ করা হয়েছে । তাম্রশাসনের অক্ষরগুলি যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তাই তাম্রপত্রটি ঢালাইয়ের সময় চারিদিকের কিনারা উঁচু করে রাখা হোত । তালপাতার পুরোনো পাণ্ডুলিপিগুলিতে বাম থেকে দক্ষিণে একটানা লেখা চলেছে পাতার দাগ বরাবর । তুলটের পুঁথি লেখার সময় কাগজ ভাঁজ করে নেওয়া হয়েছে (Horizontal Line) । পুঁথিতে সাধারণতঃ প্রতিটি পৃষ্ঠায় একই সংখ্যক লাইন দেখা যায় । আগের লাইনের বাদপড়া অংশ পরের লাইনে এনে ছেদ দেওয়া হয়েছে ।

যে কোন রচনার শুদ্ধ পাঠের জন্যে অনুচ্ছেদ, শব্দ, বাক্যাংশ বা বাক্যের বিভিন্ন অংশে ফাঁক রাখা এবং বিশেষ চিহ্ন ব্যবহার করা হয় । এইসব ব্যবহৃত চিহ্ন 'ছেদ' বা 'যতিচিহ্ন' (Punctuation) নামে কথিত । অনুচ্ছেদে ফাঁক রাখার প্রথম দৃষ্টান্ত খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ অব্দে প্যাপিরাসে লেখা গ্রীক লিপিতে দেখা যায় (Paragraphos) । এরিস্টটল এর প্রবক্তা । খ্রীঃ পূঃ ৩য় অব্দে, বাইজান্টাইনের অধিবাসী এবং আলেকজান্দ্রিয়া সংগ্রহশালার গ্রন্থাগারিক এরিস্টোফেন্স্ সর্বপ্রথম বাক্যাংশের শেষে কমা, কোলন ও বাক্যের শেষে পূর্ণছেদ (Fullstop) ব্যবহার করেন । গ্রীকভাষা শিখতে আসা বিদেশী ছাত্রদের সুবিধের জন্যেই এই রীতি প্রবর্তিত হয় (The New Encyclopaedia Britannica, Vol 29, 1989, P 1067, 1072) । প্রথমদিকে 'বিন্দু' চিহ্নই যতিচিহ্ন হিসেবে বহুল ব্যবহৃত হয় । জর্জ পিউটেনহাম তাঁর 'The Arte of English Poesis' (1589 A. D) এবং সাইমন ডেনিস তাঁর 'Orthoepia Anglicana' (1640 A.D) বইতে কমা, সেমিকোলন, কোলন ইত্যাদির প্রথম ব্যবহার দেখান । 'English Grammer' বইতে (1617 A D) বেন জনসন এটির আরো সার্থক প্রয়োগ দেখান ।

ভারতে ছেদচিহ্নের যাত্রাশুরু অশোক অনুশাসন থেকে । খরোষ্ঠী লিপিতে ছেদ চিহ্নের ব্যবহার নেই । কিন্তু খোটান থেকে প্রাপ্ত 'ধম্মপদে' মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র বৃত্তাকার চিহ্ন দৃষ্ট হয় । স্তম্ভলিপিতে খোদিত অশোক ব্রাহ্মীতে অনেক ক্ষেত্রে শব্দের মধ্যে ফাঁক দেখা যায় ; কালসী লিপিতে দণ্ড ব্যবহৃত হয়েছে । সংস্কৃত রচনায় গদ্যের ক্ষেত্রে বাক্যের শেষে একটি দণ্ড, শ্লোকে একটি লাইনের শেষে একটি দণ্ড এবং দুলাইনের শেষে যুগ্মদণ্ডের ব্যবহার হয়ে আসছে প্রাচীন কাল থেকে । দক্ষিণ ভারতীয় বর্ণমালায় এক জেসুইট মিশনারী ১৮শ শতকে ছেদ চিহ্ন ব্যবহারের সূত্রপাত ঘটান । বাংলা পুঁথিতে সংস্কৃত রীতিরই অনুসরণ দেখা যায় । পরে অবশ্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে চিহ্ন ব্যবহারে বৈচিত্র্য ঘটেছে । প্রাচীন শিলালিপিতে ছেদচিহ্নের ব্যবহার হয়েছে এইভাবে-

(ক) যত্রতত্র । কোথাও আবার মাঝে মাঝে দণ্ডচিহ্ন । কোথাও T এর মত ছেদ ।

(খ) কোথাও ছেদ হিসেবে যুগ্মদণ্ড (Double Vertical Stroke) ব্যবহৃত হয়েছে একটি বাক্যের শেষে বা শ্লোকের শেষে । ৫ম শতাব্দী থেকে ঐ যুগ্মদণ্ডের প্রথমটির মাথায় একটি হুক দেখা যায় (T।) । ৮ম শতাব্দী থেকে চিহ্নটি হল এইভাবে।T । তারপরে এই যুগ্ম দণ্ডটির মাথায় দেখা গেল একটি মাত্রা (TT) ।

(গ) লিপির একেবারে শেষে ব্যবহৃত হয়েছে 'ত্রিদণ্ড (|||) ।

(ঘ) কুষাণ লিপিতে বিসর্গের আবির্ভাব ঘটেছে যতিচিহ্ন রূপে (বাংলা পুঁথিতেও দেখা যায়)। (ঙ) অশোকের কালসী লিপিতে (XI-XIV) একেবারে শেষে ব্যবহৃত হয়েছে অর্ধচন্দ্র চিহ্ন (◡)। পূর্ণচ্ছেদ হিসেবে 'দণ্ড' ব্যবহৃত। সাসারাম লিপিতে প্রতি বাক্যের শেষে দণ্ডচিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে। আবার কর্নাটকের মসকি শিলালিপিতে দণ্ডচিহ্ন ঠিক ঠিক স্থানে বসেনি। ছত্তিশগড়ের (মধ্যপ্রদেশ) রামগড় ও বাংলাদেশের মহাস্থানগড় লিপিতে দণ্ডচিহ্ন ছেদচিহ্ন রূপে ব্যবহৃত। প্রাচীন লিপির মতো পুঁথিতেও আগের লাইনের বাকী অংশ পরের লাইনে এনে বিরাম চিহ্ন দেওয়া হয়েছে। একটি অক্ষরও দরকার মত নিচের লাইনে এসেছে। প্রতিটি লাইনের সৌন্দর্য রক্ষার জন্যে অনিবার্য শূন্যস্থানে ০, বিসর্গ চিহ্ন বা ৮ এর মত চিহ্ন দেওয়া হয়েছে (যেমন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)। কোথাও পুষ্পপ্রতীক বা তারকাচিহ্নও দেওয়া হয়েছে। পুঁথিতে বহু প্রচলিত বিরামচিহ্ন হল অর্ধযতিতে এক দাঁড়ি (।), পূর্ণযতিতে দুই দাঁড়ি(।।), প্রথম চরণের শেষে একটি বিন্দু ও দাঁড়ি (০।), দ্বিতীয় চবণের শেষে বিন্দু ও দুই দাঁড়ি (০।।) দেখা যায়। ত্রিপদী ছন্দে প্রথম পদের শেষে বিসর্গ (ঃ), দ্বিতীয় পদের শেষে বিসর্গ (ঃ) এবং তৃতীয় পদের শেষে (প্রথম চরণে) এক দাঁড়ি ও (দ্বিতীয় চরণে) দুই দাঁড়ি দেওয়া হয়েছে। কোথাও আবার চরণের শেষে এক দাঁড়ি বা দুই দাঁড়ি দেওয়া হয়েছে। দৃষ্টান্তগুলি নিম্নরূপ ঃ—

১ 'নিলজী নিকুর্পে থাক ● কথা গিয়া পাইব তাঁক ● পাপমতী না বাসসি লাজে ●।। বুইল তাক একবার ● তোযমন রাধার ● বোল পালী গেলা দেবরাজে●।।'

— শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

২ 'হেনরূপে জায় দুঁহে হাসিতে খেলিতে ঃ। চন্দ্রভাগা নদি গিয়া দেখিল সাক্ষ্যাতে ঃ।। - শঙ্করের 'পঞ্চানন্দের পালা।' (১৫০ বৎসর পূর্বের লিপি)।

৩. 'আগে আগে নিত্য করে বিদ্যাধরিগণ। গড় কর‍্যা গোবিন্দে করিল সমর্পণ।।' - রামেশ্বরের 'শিবায়ন' (১৮১৫ খ্রীঃ)।

৪. 'পদ্মাবলে ভাঙ্গ্যা নাগ্রিঃ ফুলাধান্য গুলি ।● মৃত্তিকাতে মর্ছ ধর মর্দ্ধে কর কুলি ।।●' - রামেশ্বরের শিবায়ন (১৮২০ খ্রীঃ)।

৫. 'জত সখিগণ ঃ বিবস বদন ঃ রাণির নিকটে জায়। জোড় করি পানি ঃ নিবেদয় বানি ঃ প্রণাম করিয়া (পায়)।। - ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' (১৫০ বৎসর পূর্বের লিপি)।

চর্যাপদের পুঁথিতে অবশ্য একদণ্ড (।) ও যুগ্মদণ্ড (।।) ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রাচীন লিপিমালায় কিছু কিছু মাঙ্গলিক চিহ্ন (Sacred Symbol) দেখা যায়-যেমন স্বস্তিক, ত্রিশূল, বৃত্তের মধ্যে বিন্দু ইত্যাদি। এছাড়া শঙ্খ, পদ্ম, সূর্য, তারকা ইত্যাদিও ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে মনে পড়ে সিন্ধুসভ্যতার সিলমোহরের চিত্রপ্রতীকগুলি। সম্প্রতি হিমাচল প্রদেশের সোলান জেলার ওখড়ুর কাছে খ্রীঃ পূঃ ১ম শতকের কুলিন্দরাজ অমোঘ ভূতির যে রৌপ্যমুদ্রাগুলি পাওয়া গেছে তাতে ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী লিপির সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে হরিণ, স্বস্তিক, সাপ ইত্যাদি চিহ্ন। জৈন ধর্মশাস্ত্র অনুযায়ী এগুলি পবিত্রচিহ্ন। সুতরাং জৈন সংস্কৃতির সঙ্গে এগুলির সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পারে।

১ম থেকে ৪র্থ শতক সময়কালে 'ওঁ' চিহ্ন ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। পুঁথি সাহিত্যে

দেখা যায় হিন্দু পুঁথিতে প্রথমে 'ওঁ' লিখে তারপর 'শ্রীশ্রী হরি', 'শ্রীরামঃ', 'নমঃ গণেশায়', 'শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণঃ', 'শ্রীশ্রী দুর্গাঃ' ইত্যাদি লেখা হয়েছে। মুসলমানী পুঁথিতে 'বিসমিল্লাহি রহমানি রহিম', 'আল্লাহু গনি মোহাম্মদ নবি', 'প্রথমে প্রণাম করি প্রভু করতার। সে জে আল্লা জগপতি করিম ছত্তার' (ঢা. বি. ১৮৯), 'বিচমিল্লা ইত্যাদি' (ঢা. বি. ৩১০), 'আল্লাহ্ গনি মোহাম্মদ নবি' (ঢা. বি. ৪১০) ইত্যাদি দিয়ে লেখা শুরু করা হয়েছে। ৭ সংখ্যাটি ইসলামী মতে পবিত্র সংখ্যা। 'বিসমিল্লাহি রহমানি রহিম' বোঝাতে ৭৮৬ লেখা হয়। কিন্তু ৭ লিখে হিন্দু দেবদেবীর নাম লেখা এবং এর পর লেখার কাজ শুরু করা হয়েছে প্রায় সব হিন্দু পুঁথিতেই। হিন্দু ইসলাম সংস্কৃতি সমন্বয়ের এ এক বলিষ্ঠ দৃষ্টান্ত [উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন লিপিলেখে (১ম-৪র্থ শতক) ৭ চিহ্নের প্রাচীন রূপটিকে 'ওঁ' বলা হয়েছে। (দ্রঃ 'Indian Paleography', Dani, P. 118, 121)। বৌদ্ধ সহজিয়া পুঁথি 'চর্যাগীতিকোষ' শুরু হয়েছে '৫' এর মতো মাঙ্গলিক চিহ্ন দিয়ে।]।

নরেন্দ্রের 'পীপরডুলা তাম্রশাসন' (৬ষ্ঠ শতাব্দী), নয়পালদেবের 'বাণগড় প্রশস্তি' (১১শ শতাব্দী), বিজয়সেনের 'দেওপাড়া প্রশস্তি', লক্ষ্মণসেনের 'তর্পণদিঘি অনুশাসন', বিশ্বরূপসেনের 'তাম্রশাসন' ইত্যাদির প্রথমেই তো '৭' চিহ্নটি খোদিত। ড. দীনেশ চন্দ্র সরকারের মতে, '৭' চিহ্নটির দ্বারা 'সিদ্ধম্' বোঝানো হয়েছে। পরবর্তীকালে এটি 'ওঁ সিদ্ধি' বা 'সিদ্ধিরস্তু' শব্দে উচ্চারিত। এটিকে 'আঁজী চিহ্ন' বলা হয়ে থাকে ('শিলালেখ তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ', পাদটীকা, পৃঃ ৮৪)। বিভিন্ন প্রাচীন শিলালেখ ও তাম্রশাসন শুরু হয়েছে 'স্বস্তি', '৭ স্বস্তি', '৭ ঁ ওঁ নমো নারায়ণায়', '৭ ঁ স্বস্ত্যস্যাং', 'ওঁ স্বস্তি', 'ওঁ', 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়', 'ওঁ নমো বুদ্ধায় ।। স্বস্তি' (মদনপালদেবের মনহলি তাম্রশাসন, ১২শ শতাব্দী, মহীপালদেবের সারনাথ প্রস্তরলিপি, ১১শ শতাব্দী), 'ওঁ ওঁ নমো নারায়ণায়', ইত্যাদি পবিত্র চিহ্ন বা শব্দ দিয়ে। বিভিন্ন 'অসাহিত্যিক' গদ্যলিপি (দলিল দস্তাবেজ ইত্যাদি) শুরু হয়েছে এইভাবে ঃ-

'ইয়াদিকির্দ্দ সকল মঙ্গলালয়', 'নিত্যং স্বস্তি কুর্ব্বতঃ', 'মহামহিম শ্রীযুত ব্যবস্থাপক ভট্টাচার্য মহাশয় বর্গেষু', 'হকিকৎ জবানবন্দী', 'লিখিতং শ্রী .... হকিকৎ পত্রমিদং লিখনং কার্য্যনঞ্চ', 'স্বস্তি সকল মঙ্গলালয়', 'সদুদার চরিতেষু মোকররা মালগুজারি পট্টকমিদং কার্য্যনঞ্চ আগে', 'কস্য জমিজমার পট্ট মিদং কার্য্যনঞ্চাগে', 'লিখিতং শ্রী .... কস্য ওকালত নামা পত্রমিদং কার্য্যনঞ্চী আগে', '৭ ঁ ও আদিকীর্দ্দ সকল মঙ্গলালয়', 'কস্য কবুলতি পত্রমিদং' 'কস্যপত্তনি তালুক বিক্রয় খোশ কবালা পত্রমিদং কার্জ্যনঞ্চাগে', ইত্যাদি।

বাংলার মন্দির লিপিতেও ৭, ওঁ ইত্যাদি মাঙ্গলিক চিহ্ন খোদিত হয়েছে।
বাংলা দেশের বিভিন্ন মন্দির দেবালয়ে রক্ষিত প্রস্তর বা ধাতুনির্মিত বিগ্রহের পাদপীঠে বিভিন্ন লিপি দেখা যায়। আমাদের দেশের প্রাচীন মূর্তিভাস্কর্যে এই ধরণের লিপির সন্ধান কিছু কিছু পাওয়া গেছে। সেখানেও '৭' চিহ্নটি খোদিত। দিনাজপুর জেলার রাজীবপুর গ্রাম থেকে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কৃত পালসম্রাট ৩য় গোপালদেবের রাজত্বকালীন (১২শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ) সদাশিব মূর্তির পাদপীঠে খোদিত লিপিটি নিম্নরূপ ঃ-

''৭ ঁপরমেশ্বরেত্যাদি শ্রীমদেগাপালদেবপাদানাম্বিজয়রাজ্য শ্রীমৎসদাশিবপাদাঃসন্তিহশ্রীপুরুষোত্তমেন প্রতিষ্ঠিতাঃ সং ১৪''[১৭]

ব্যক্তিগত সামাজিক বা সরকারী বহুবিচিত্র সম্বোধনপর্ব লক্ষিত হয়। যেমন- 'মহামহীম শ্রীযুত ...... মহাশয় বরাবরেষু', 'শ্রীচরণ যুগলেষু অগণনীয় প্রণিপাত বিশেষ', 'চিরজীবেষু-পরম যুভাসীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপনঞ্চ বিশেষং', 'প্রণামানিবেদনাঞ্চা আগে', 'জথা-বিহিত সম্মান মিদং', 'ভৃত্ত শ্রী ...... দাসস্য ভূমিদত্ত সস্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদনঞ্চ বিশেষ শ্রীচরণ শুভানুধ্যানে', 'পরম শুভাশী প্রয়োজনঞ্চ', 'নমস্কারা নিবেদনঞ্চাগে', 'সকল মঙ্গলালয় শ্রীজুক্ত ...... স্বতচরিতেষু', 'ষুস্মস্তু পরম শুভাসিষামানন্ত্যং বিজ্ঞপ্তিশ্চাদৌ', 'পরমারাধ্যতম শ্রী....... মহাশয় চরণকমল পঙ্কেরুহেষু', 'সাহেব বরাবরেষু', 'সেবক শ্রী .... প্রণামা নিবেদনাঞ্চা মহাশয়ের চরণ প্রসাদাত য়ে নফরের প্রাণগতিক কুশল', 'ভৃত্যাভ্যাস শ্রী .... দণ্ডবৎ প্রণামা বহবো নিবেদনঞ্চ', 'প্রণতীনামানন্ত্যং নিবেদনঞ্চ মহাসয়াসীর্ব্বাদা দেবাস্মত সারীরিক মঙ্গলং বিশেষঃ পরং', 'স্বস্তি-করুণা বরুণালয় শ্রীযুতং .... মহাশয় মহোগ্র প্রতাপেষু সমাশ্রিতস্য পরমাসী রাসি রসী মোঁহস্ত ভবদীয় ভচ্য মচ্যাহত্মীহ মানস্য তদচ্যাহতং নিবেদনঞ্চ বিসেষঃ', 'অষ্ট আঙ্গ প্রীনিপাত প্রনামা নিবেদনঞ্চাদো', ইত্যাদি। একটি দীর্ঘ সম্বোধনের দৃষ্টান্ত ঃ-

'শ্রীশ্রীদুর্গা জয়তি। স্বস্তি নিরন্তরাসারসংসার পারাবতবণ কারণ শ্রীযুত পরদেবতাচরণারবিন্দপরায়ণ শ্রীল শ্রীহরচন্দ্র ঘোষ অশেষ ব্রাহ্মণ প্রতিপালন সমর্জ্জিতযশঃ সুধাকর- কিরণ প্রকাসীকৃত দিগন্তরেষু পোষ্যস্য পরম শুভাশীরাশী নামানন্ত্যং বিজ্ঞপ্তিশ্চ ..... । ১২৫৩ বঙ্গাব্দে, স্ত্রী মালতীমঞ্জরী দেবী বিরহে কাতরা হয়ে স্বামীকে পত্র লেখার সময় সম্বোধন করে - '৭ শ্রীশ্রীহরিঃ শ্রীচরণ স্বরসি দিবানিসি সাধন পিআসি শ্রীমতি মালতিমুঞ্জরি দেব্যা প্রনম্য রম্য পিঅবর প্রানেশ্বর নিব্ধেনঞ্চাদৌ মহাসএর শ্রীপদস্বররূহ স্বরণমাত্রে অত্র শুভ বিসেষ নিবেদন মহাসঅ ধনাভিলাসে পরদেশে চিরকাল কাল জাপনা করিতেছেন ....।'

মধ্যযুগীয় লিপিলেখে এইসব রীতিপ্রকরণ যে শিলালিপি তাম্রশাসন থেকেই এসেছে তা বোঝা যাবে কয়েকটি প্রাচীন লিপির প্রথমাংশের উদ্ধৃতি থেকে।

১. 'শুভমস্তু শকাব্দাঃ ১১৬৫।। দেবি প্রাতর/বেহিনন্দনবনান্মন্দঃ কদম্বানিলো বা.তিব্যস্তক/রঃ শশীতি কৃতকেনালাপ্য কৌতূহলী।' - চট্টগ্রাম তাম্রশাসন।

২. '৭ ওঁ নমঃ শিবায়।। লক্ষ্মীবল্লভশৈলজাদয়িতয়োরদ্বৈতলীলা গৃহং প্রদ্যুম্নেশ্বর শব্দলাঞ্ছন যধিষ্ঠানং নমস্কুর্মহে। - বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রশস্তি।

৩। '৭ ঁ ওঁং নমশ্চর্চ্চিকায়ৈ।। সুরাসুরশিরংশ্রেণিপটবাসসমাজগৎ। পাণ্ডু বিশ্বকৃতাভ্যর্চ্চাশ্চর্চ্চা চরণরেণবঃ।।' - নয়পালের বাণগড় প্রশস্তি।

৪. 'শৌভাগ্যন্দধদতুলং শ্রিয়ঃ সপত্ন্যা গোপালঃ পতিরভবদ্বসুন্ধরায়াঃ। দৃষ্টান্তে সুরাজ্ঞি যস্মিন্ শ্রদ্ধেয়াঃ পৃথুসগরাদয়োপ্যভূবন্।।' -দেবপালের মুঙ্গের তাম্রশাসন।

শিলালিপি তাম্রশাসনের এইসব দীর্ঘ ব্যক্তিপ্রশস্তি যে পরবর্তীকালের পাণ্ডুলিপি রচনাকেও প্রভাবিত করেছে, তা বলা বাহুল্য। অবশ্য এখানেও সেই কথার পুনরাবৃত্তি, পাণ্ডুলিপি দেখেই তো শিলালিপি নির্মিত খোদিত হয়েছে। তাই শিলালিপি লিখনরীতি পুনরায় পরবর্তী যুগের

পাণ্ডুলিপির লিখনরীতিকে যে প্রভাবিত করেছে তা তো স্বাভাবিক বিষয়।

বাংলা পুঁথি লেখা হয়েছে বাম দিক থেকে ডান দিকে। ব্যতিক্রম মুসলীম পুঁথি। এগুলি ডান দিক থেকে বাম দিকে লেখা। কিন্তু আবার 'লায়লী মজনু' (ঢা. বি. ২২৪) বাম দিক থেকে লেখা হয়েছে। ১১৯৭ বঙ্গাব্দে লেখা ভারতচন্দ্রের দুখানি 'বিদ্যাসুন্দর পুঁথি' (ব. রি. ১৪৭ ও ২৪৯) হিন্দু পুঁথি হয়েও আববী পুঁথির মতোই ডান দিক থেকে বাম দিকে লেখা। গোবিন্দদাসের 'স্মরণ মঙ্গল' পুঁথির (উ. ব. ৫৩৮, ১৮৪৩ খ্রীঃ) লিপিকর দেবীপ্রসাদ সরকার শেষ অংশ থেকে লেখা শুরু করে ক্রমশঃ প্রথমের দিকে এগিয়েছেন। এ এক নতুন রীতি (Descriptive catalogue, Vol. IV, V, N B University, P. 992)। পুঁথি লেখার সময় চারদিকে বেশকিছু অংশ (মার্জিন) ছেড়ে রাখা হয়েছে নানা কারণে —

১. বহু ব্যবহারের ফলে পুঁথির কিনারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাতে লেখার না ক্ষতি হয়। তাম্রশাসনেরও কোন কোনটির কিনারা উঁচু রাখা হোত যাতে লেখার ক্ষতি না হয়।

২. পত্রের দৈর্ঘ্যের দু'দিকে পত্রচিহ্ন দেওয়া হয়েছে ১, ২, ৩ এইভাবে বা ধাবাপাতের এক আনা, দু'আনা চিহ্নে। আবার কোথাও বা দু'ধরণের চিহ্ন একই পত্রে দেওয়া হয়েছে। যেমন ডানদিকে ১,২,৩, বাম দিকে ধারাপাতের চিহ্ন। কোথাও 'পৃষ্ঠাসংখ্যা' দেওয়া হয়নি (অর্থাৎ পত্রের উভয়পৃষ্ঠে)।

৩. অনেক পুঁথির প্রতিটি পাতাতেই পুঁথির নাম লেখা হয়েছে। যেমন, 'অভয়ামঙ্গল', 'আদি লীলা' (চৈতন্যজীবনী কাব্য), 'সুন্দরাকাণ্ড' ইত্যাদি।

৪. লেখার সময় কোন বাক্য বা বাক্যাংশ, অক্ষর বাদ পড়ে গিয়ে থাকলে তা ঐ লাইনের সংখ্যা নির্দেশ করে শূন্যস্থানে বসানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সংশোধনের স্থানে হংসপদ বা কাকপদ চিহ্ন দেওয়া হয়েছে, আবার কোথাও তা নেই।

৫. মূল শ্লোক বা পদের টীকা লেখা হয়েছে ভিন্ন কালিতে। তালপাতা বা তুলট, যাই হোক না কেন, পাতার দৈর্ঘ্য বরাবর লেখা হোত। দলিলদস্তাবেজ লেখা হয়েছে আড়াআড়ি। আবার পদাবলী বা অখ্যাত কবিদের গ্রাম্য গীতিকা, তন্ত্র মন্ত্র ইত্যাদি আধুনিক খাতার মত আকারের কাগজেও লেখা হয়েছে। একালে প্রত্যেক অনুচ্ছেদের গোড়ায় যেমন কিছুটা ছাড় দেওয়া হয়, পুঁথিতে তা রাখা হোত না। যেমন-

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ ।। ৭ শ্রীশ্রীহরি ।। অথো অক্রু আগমন ঃ।। লিক্ষতে ঃ ।।
অক্রুরে ডাকিআ বপ্র যে কহে ভোজ ৭ পতি ঃ ।। তরা পরে নন্দ লয়
জাহ সিগ্রগতি ঃ ।। আজ বংসের মৰ্দ্ধে মোর তুমি বড় বন্ধু ঃ ।। প্রাণ
তুল্য সখা নিবার সোকসিন্ধু ঃ ।। আমাবিনে জান নাঞিঃ আমাতে
বড় ভক্তি ঃ ।। সদত চিন্তহ তুমি আমাদের হিতিঃ ।। সাধহ আমার

-'অক্রূর আগমন', ১৮২৪ খ্রীঃ।

আঠারো-উনিশ শতকের অনেক পুঁথিতে কয়েকটি লাইনের পর নির্দিষ্ট পরিমাণ ফাঁক রাখতে দেখা যায়, বোধ হয় ছাপা বইয়েরই প্রভাব এটি।

তালপাতা যেমন দোভাঁজ, অনেক তুলটের পুঁথির পাতাও সেইভাবে রাখা হয়েছে।

প্রতিটি পাতার একদিকে লেখা হয়েছে, অন্যদিক শূন্য। আবার একক পাতাতেও (single system of page) লেখা হয়েছে, কখনও উভয়দিকে, কখনও একদিকে। প্রতিটি পাতার ডানদিক ও বামদিকে পৃষ্ঠাঙ্ক দেওয়া হয়েছে কিন্তু পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার অনুসৃতি বিষয়ক (continuation) পৃষ্ঠাঙ্ক পরের পৃষ্ঠায় দেওয়া হোত না। সেটি থাকতো পৃষ্ঠাঙ্কবিহীন। বেশীর ভাগ আরবী-ফারসি মুসলমানী পুঁথিই পত্রাঙ্কবিহীন। বিরল ক্ষেত্রে অবশ্য পত্রাঙ্ক আছে। যেমন আলী রাজার 'জ্ঞানসাগর' (ঢা. বি. ৫০০), মোহম্মদ এয়াকুরের 'জঙ্গনামা' (ঢা. বি. ৬৫৩) পত্রাঙ্কবিহীন। কিন্তু পত্রাঙ্কযুক্ত পুঁথিও পাওয়া গেছে। যেসব পুঁথিতে চিত্রাঙ্কন বা অলঙ্করণ করা হয়েছে তাদের লেখার কাজ আগে হয়েছে। পরে লিপিকরের রেখে যাওয়া শূন্যস্থানে চিত্রকর চিত্রাঙ্কন করেছেন। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পদ্মপুরাণ' (ঢা. বি. ২৭৯৯) চিত্রিত পুঁথিটি দেখে স্পষ্টই মনে হবে আগেই চিত্রাঙ্কনের কাজটি শেষ করা হয়েছে। তারপর লেখা হয়েছে। পরবর্তীকালে যেসব পুঁথি সম্পাদনা করে প্রকাশ করা হয়েছে সেখানে নানাবিধ রীতির অনুসরণ ঘটেছে। যেমন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রকাশিত ''শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের' সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ পত্রগুলিকে ১/১, ১/২ ; ২/১, ২/২ এইভাবে নির্দেশ করেছেন। আবার বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত ড. পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত পুঁথির পত্রগুলি ১/ক, ১/খ ; ২/ক, ২/খ এইভাবে নির্দেশ করা হয়েছে। অধ্যাপক নীলরতন সেন তাঁর 'চর্যাগীতিকোষ' ফটোমুদ্রণ গ্রন্থে চর্যাপদের পত্রাঙ্ক দিয়েছেন এইভাবে- ২ক, ২খ ; ৩ক, ৩খ।

কথায় বলে 'যত্নেন লিখিতং গ্রন্থং পুত্রবৎ পরিপালয়েৎ।' তাই পুঁথির পাতার মাঝ বরাবর ছিদ্র দিয়ে শক্ত দড়ি প্রবেশ করিয়ে পুঁথিকে শক্ত করে বাঁধা হোত। আবার ভেতরে দড়ি বা সুতো না দিলেও পুঁথির দুদিকে দুটি শক্ত পাটা দিয়ে দড়ি দিয়ে এভাবে বাঁধা হোত যাতে পোকা বা ধুলোবালি না প্রবেশ করতে পারে।

একালে গদ্যলেখকরা যেভাবে লাইনের কিছুটা অংশ ছেড়ে প্রথম লেখা শুরু করেন, সেকালে পুঁথি লেখকরা তা করেন নি (আনন্দ গোপাল সেনগুপ্ত সম্পাদিত প্রবন্ধের বিখ্যাত মাসিক 'সমকালীন' এই রীতি কঠোরভাবে মেনে চলতো।)। কেবল নতুন অনুচ্ছেদের সময় ছাড় দেওয়ার রীতি যথাযথ বলে মনে করতেন 'সমকালীন' সম্পাদক। তিনি ব্যক্তিগত ভাবে বর্তমান লেখককে বিষয়টি তথ্য সহকারে বুঝিয়েছিলেন একসময়।

অনেক ক্ষেত্রেই পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার শব্দ বা শব্দাংশ পরের পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে। প্রতিটি পাতায় কটি লাইন থাকবে তা নিয়ে লিপিকর আগে থেকেই একটা হিসেব করে নিতেন বলে মনে হয়। যদিও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরের দৃষ্টিকটু পুঁথি বা পাণ্ডুলিপির অভাব নেই, তবুও পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষরে, লাইন এতটুকু না বেঁকে লেখা হয়েছে পটুত্বের সঙ্গে। কোন কোন পুঁথির পাতার বর্ণসজ্জা এত নিখুঁতএবং ক্ষুদ্রাকার, প্রশ্ন জাগে কত সূক্ষ্ম লেখনীর সাহায্যে এসব লেখা হয়েছে।

পুঁথি বা পাণ্ডুলিপির এক একটি চরণ বা এক একটি বাক্যের বর্ণস্থাপনে কোন ফাঁক রাখা হয় নি। পরপর বর্ণগুলি বসে গেছে। যেমন,

'এতযুনিবলেদুতআঁখিপালটিয়া। আপনভালাইচাহআইসউঠিয়া।।
পাসাযহারিযাতোবভাইপঞ্চজন। পোনকোরিয়াপাসাখেলিলএখন।।'

- 'কবিচন্দ্র রামায়ণ'।

'লিখিতংজেলাহুগুলিসেলমাবাদপরগণারনওশাকিনেরশ্রীরামকানাইঅধিকারীকস্যপৌত্রিক-ব্রহ্মত্তরলাখরাজকবলাপত্রমিদংকার্য্যনঞ্চাগেসন১২৩৫শালাঅব্দেজাহানাবাদপরগণার-ঠাকুরানিচকগ্রামেরপূর্ব্বমাঠপাড়াচককুণ্ডেরপূর্ব্বআমারপৌত্রিকব্রহ্মত্তরতিনশালিজমি১বন্দ......'

- ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের 'কওলাপত্র' ।

বাংলা পাণ্ডুলিপির এই একটানা বর্ণসংস্থাপন প্রাচীন লিপি থেকেই এসেছে। অশোকের তাম্রশাসন থেকে শুরু করে পরবর্তীকালের শিলালিপি তাম্রশাসনে এই রীতির অনুসরণ ঘটেছে রীতিগতভাবে (Traditional)। কয়েকটি প্রাচীন শিলালিপির আংশিক উদ্ধৃতি নিম্নরূপ ঃ-

১."পরমদৈবতপরমভট্টারকমহারাজাধিরাজশ্রীকুমা/রগুপ্তেপৃথিবীপতৌতৎপাদগৃহীতস্যপুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তাবুপরিকচিরাতদত্তস্য/ ভোগেনানুবহমানককোটিবর্ষবিষয়েতন্নিযুক্তককুমারামাত্যবেত্র/বর্ম্মনি অধিষ্ঠানাদিকরণঞ্চনগরশ্রেষ্ঠিধৃতিপালসার্থবাহবন্ধুমিত্রপ্রথ/মকুলিকধৃতিমিত্রপ্রথমকায়স্থশাংম্বপাল পুরোগেসম্ব্যবহরতিযতঃস.........."

- ১ম কুমার গুপ্তের দামোদরপুর তাম্রশাসন । উত্তরভারতীয় ব্রাহ্মী বর্ণমালা (৪৪৮ খ্রীষ্টাব্দ) ।

বাংলার ইঁট-পাথরের মন্দির দেবালয়ের দেওয়ালে যে সব পরিচয়জ্ঞাপক লিপি (প্রস্তর, পোড়ামাটি বা চুণবালির) আছে সেখানেও অনুসৃত হয়েছে অনুরূপ রীতি । কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ ঃ-

১. 'শুভমস্তুশকাব্দাঙ্কে ভূমিবিন্দুমহীপতৌ । শ্রীকাশীশ্বরমিত্রেনবিষ্ণবেযৎসমর্পিতম্ ।।'

- নদীয়া জেলার রানাঘাট থানার বীরনগরের মুস্তৌফী পরিবারের ভগ্ন আটচালা মন্দিরের লিপি (১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দ) ।

২. 'শ্রীশ্রীরাধাকান্তজিউ....../অশীতিতমশকাব্দেশ্রীল শ্রীরাধাকান্তস্য/ শ্রীমন্দিরারম্ভ ইতি । সুভমস্তুসকাব্দা ।/ ১৬৮৩ মাহ মাঘ ১৭ রোজ মন্দির আরম্ভ ।/ মহারাজা শ্রীযুত তিলোকচন্দ্র রায়স্য অধিকার পরিচারক শ্রীকানুরাম দাস সাকিম/ আকুই তস্য জায়া শ্রীমতি চাপাদাসি শ্রীশ্রী চরণেয়র্পণ করিলেন । কারিগর শ্রীইস্বরি/ সাকিম বল্যাড়া সংপূর্ন্ন সকাব্দা ১৬৮৬ ।'

- বাঁকুড়া জেলার ইঁদাস থানার আকুই গ্রামের রায় পরিবারের রাধাকান্ত জীউর পঞ্চরত্ন মন্দিরের প্রস্তরলিপি (১৭৬১- ৬৪ খ্রীষ্টাব্দ) ।

৩. "শ্রীশ্রীভৈরবেশ্বর/ দেবতা স্থাপন/পরগণে ভুরুসিষ্ট বরু/ ইপুর সাকিনের শ্রীযুত/ রামচন্দ্র নন্দীকৃত/ শকাব্দা ১৭৬৩ স/ন........৪৩ সাল ।"

- হাওড়া জেলার উদয়নারায়ণপুর থানার খিলা-বরুইপুরের নন্দী পরিবারের ভৈরবেশ্বর দেউলের লিপি (১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দ) ।

অনুরূপভাবে ১৩শ শতকে লেখা (১২১১ শকাব্দ) বৌদ্ধ পুঁথি 'পঞ্চরক্ষার' শেষাংশ -

"পরমেশ্বরপরমসৌগতপরমরাজাধিরাজশ্রীমদেগৌ/ ড়েশ্বর মধুসেনদেবকানাংপ্রবর্দ্ধমান বিজয়রাজ্যে/ যত্রাঙ্কেনাপিশকনরপতেঃ শকাব্দাঃ ১২১১ ভাদ্রদী ২ ।"

পুঁথি-পাণ্ডুলিপি লেখার পর, সংশোধনের সময়, ভুল করে লেখা বা বাদ পড়ে যাওয়া অক্ষর, শব্দ, বাক্যাংশ বা বাক্য প্রয়োজন মত মার্জিনে লেখা হয়েছে বা কেটে দেওয়া হয়েছে । এই ধরণের সংশোধন বা সংযোজন পদ্ধতিকে বলা হয় 'শোধিত পাঠ' বা 'তোলাপাঠ'

(adscript) ।[৮] এই কাজের জন্যে কয়েকটি সংশোধন চিহ্ন (Caret) বিভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, গুণচিহ্ন বা কাটা চিহ্ন (×), যোগচিহ্ন (+), কাকপদ বা হংসপদ (∧∨, চর্যাপদের মূল পুঁথিতে এই জাতীয় চিহ্ন ব্যবহৃত), বিসর্গ (ঃ), অর্ধচন্দ্র (◡), তীরচিহ্ন (<,>), 'অতএব' ও 'যেহেতু' চিহ্ন (∴, ∵), বৃত্তাকার বিন্দু অঙ্কন (⁚⁚), শব্দের শীর্ষদেশে সারিবদ্ধ বিন্দু (⁚⁚⁚⁚), শব্দের নিচে সারিবদ্ধ বিন্দু (.........), ওপরে বা নিচে সারিবদ্ধ বিন্দু (⁚⁚⁚) ইত্যাদি । খ্রীষ্টীয় ১৩শ শতকে লিপিকৃত চর্যাপদের পুঁথিটির পাতায় পাতায় সংযোজন সংশোধনের চিহ্ন বর্তমান। যেমন, ১খ পৃষ্ঠায় প্রথম পংক্তিতে চিহ্ননির্দেশসহ 'শ্রী' ওপরে লেখা হয়েছে । ২ক, পৃষ্ঠায় 'কায়ত্যাদি' চিহ্নসহ ওপরে লেখা, 'শ্চ' ওপরে লেখা । 'কালাগ্নি'র ল-এর আ-কার কাটা হয়েছে। ২খ পৃষ্ঠায় 'হি' ও 'প্র' মার্জিনে লেখা হয়েছে । ৩ক পৃষ্ঠায় 'দা', 'য়ন্ন', 'মা' চিহ্ন দিয়ে মার্জিনে লেখা হয়েছে । অনুরূপ সংযোজন সংশোধন দেখা যায় ৯খ, ১০খ, ১১খ, ১২ক, ২১খ, ২২খ, ২৬ক, ২৬খ, ২৭ক, ৩১ক, ৫২খ ইত্যাদি পৃষ্ঠাগুলিতে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুঁথিতে 'তোলাপাঠ' পদ্ধতি এতই পরিচ্ছন্ন যে, তা বুঝতে অসুবিধে হয় না । যেমন, ১৭৩/১ পৃষ্ঠায় প্রথম ভণিতার পর (২য় লাইন) 'ধানুষীরাগঃ' শব্দের পর যে 'একতালী' শব্দটি বসবে তা ঐ পৃষ্ঠার ওপরে 'একতালী ২' লিখে নিচের দিকে একটি ছোট সরলরেখা এঁকে কোথায় এটি বসবে তা নির্দেশিত। লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত রামানন্দ যতির 'চণ্ডীমঙ্গল' পুঁথির প্রতিটি পৃষ্ঠাতে আছে হংসপদ-কাকপদের ব্যবহার ।[৯] অবশ্য এদেশের হাজার হাজার বাংলা পুঁথিতে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই । প্রাচীন তাম্রশাসনে ভুল অংশকে হাতুড়ি দিয়ে পিটে তার ওপর শুদ্ধপাঠ খোদিত হয়েছে । মন্দির লিপিতেও আছে এমন সংশোধনের প্রক্রিয়া । অন্যতম দৃষ্টান্ত, বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর শহরের ভট্টাচার্য পাড়ার মুরলীমনোহর মন্দিরের (১৬৬৫ খ্রীঃ) লিপি ফলকে শেষ পংক্তির 'পূর্ণেন্দু' শব্দের বাদ পড়ে যাওয়া 'ন্দু'অক্ষরটি নিচে পৃথকভাবে খোদিত হয়েছে ।

এইসব সংশোধনরীতি প্রাচীন শিলালেখ-তাম্রশাসনেও দেখা যায় । পংক্তি বা শ্লোকের ওপর বা নিচের অংশে জুড়ে দেওয়া হয়েছে কাকপদ বা হংসপদ চিহ্ন নির্দেশ করে । বুদ্ধগয়া থেকে প্রাপ্ত অশোকচল্লের সময়কালীন লিপির (১২ শ শঃ) প্রথম লাইনে 'তথাগতো হ্যবদৎ' লেখার 'তো' বাদ পড়ে গিয়েছিল । সেখানে হংসপদচিহ্ন দিয়ে বাদপড়া অংশ দেওয়া হয়েছে । মহাবন প্রশস্তির (৯ম শঃ) ৮ম সারিতে 'নয়োন্নতমতি' শব্দের বাদ পড়া 'নয়ো' নিচে লেখা হয়েছে, ব্যবহৃত হয়েছে (০) শূন্য চিহ্নটি । ঐ লিপিটিতে আরো সংশোধন ঐভাবেই করা হয়েছে। ভুলক্রমে খোদিত বর্ণ, অক্ষর বা বাক্যাংশ ছেনির দ্বারা উড়িয়েও দেওয়া হয়েছে, শূন্যস্থানে গলিত ধাতু দিয়েও ভরে দেওয়া হয়েছে ।

পুঁথির পংক্তিতে ।। 'ধ্রু'।। লিখে শ্লোকের সংখ্যা এবং 'ধ্রুবপদ' নির্দেশিত । একটি পরিচ্ছেদ শেষ হবার পর লিপিকর একসারি সুদৃশ্য তারকাচিহ্ন বা ফুল এঁকে দিয়েছেন অনেক ক্ষেত্রেই ।

সংশোধিত পুঁথির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত ১৭১৭ খ্রীঃ অব্দে অনুলিখিত ১০৮৬ সংখ্যক কবিকঙ্কণ চণ্ডীর পুঁথি । পণ্ডিত সুকুমার সেন এ সম্পর্কে বলেছেন, 'পুঁথিটিতে এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে যা আমি অন্য কোন পুরানো পুঁথিতে দেখি নাই । কোন

কোন পৃষ্ঠায় মার্জিনে অন্য পুঁথি হইতে রূপান্তব, পাঠান্তর এমন কি গোটা গোটা পদ উদ্ধৃত দেখা যায় ।'[১০] পুঁথি যারা লিখতেন, তাঁরা অনেকেই বানানে কৃতবিদ্য ছিলেন না, ভাষা-সাহিত্যে তেমন দখল ছিল না । ব্যতিক্রম সংস্কৃত পুঁথির লিপিকররা । তাঁরা টোল-চতুষ্পাঠীতে পড়াশুনো করে বানান বিষয়ে অনেকটা সামর্থ্য অর্জন করতেন । তাই দেখা যায়, বাংলা পুঁথিতে যেমন বানান ভুলের পাহাড়, সংস্কৃত পুঁথি তা থেকে অনেকাংশেই মুক্ত ।

বাংলা পুঁথি লেখা হত প্রধানতঃ শ্রুতিকে অনুসরণ করে । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৬০ সংখ্যক পুঁথি কবিশেখরের 'গোপালবিজয়' এর পুষ্পিকায় এর সমর্থন মেলে ঃ 'শ্রীকবিশেখর মুখপদ্মবিনির্গত শ্রীগোপালবিজয় সম্পূর্ণ ।' পুঁথিটি সতেরো শতকের প্রথমদিকে লেখা হয় । যাই হোক, শুনে লেখার কাজে ভুলভ্রান্তি স্বাভাবিক । দেশের সব এলাকার মানুষের উচ্চারণরীতি তো এক নয় । সেকালের প্রায় নিরক্ষর সাধারণ সমাজে কোন শব্দের উৎপত্তি বা অর্থ সম্বন্ধে স্পষ্ট জ্ঞান মানুষের ছিল না । ফলে পনেবো শতক থেকে আঠারো-ঊনিশ শতক পর্যন্ত সময়কালে লেখা বাংলা পুঁথিপত্র বা দলিল দস্তাবেজে অজস্র বানান ভুল ঘটে গেছে । প্রাকৃত থেকে অপভ্রংশ শব্দের আবির্ভাব এবং তার ওপর সংস্কৃত শব্দের প্রভাব শব্দের উচ্চারণ ও বানানে নানা সমস্যার সৃষ্টি করে । এছাড়া আঞ্চলিক উচ্চারণরীতি তো ছিলই । একটি প্রাসঙ্গিক বক্তব্য তুলে ধরা যাক ঃ 'প্রাকৃত অপেক্ষা সংস্কৃত শব্দেব বানানে বর্ণবিভ্রাট বেশী ঘটিত, ইহার কারণ দুইটি, সংস্কৃত শব্দের ব্যুৎপত্তি সাধারণ লোকের জানা থাকিত না এবং উচ্চারণ অনুসারে বানান লেখা হইত । বানান শব্দের ব্যুৎপত্তি অনুসারে হয় এবং উচ্চারণ অনুসাবে হয়। কিন্তু প্রাচীনকালে এই উভয়েব মিশ্রণ চলিত । এইরূপ কোন আদর্শের অভাবে যতদিন না মুদ্রাযন্ত্র আসিয়াছিল, বর্ণ-ব্যত্যয় ততদিন অবাধে চলিযাছিল ।'[১১] কিন্তু এদেশে বাংলা মুদ্রণব্যবস্থা চালু হবার পরও তো গ্রামে গঞ্জে যত্রতত্র বহু পুঁথি লেখা হয়েছে । এই সেদিন পর্যন্ত, বিশেষ করে ধর্মগ্রন্থ বা ঐ ধরণের পবিত্র বইপত্রের মুদ্রিত রূপ মানুষ ব্যবহার করতে চাইতো না । হাতে লেখা পুঁথিই মান্য করা হোত । তাছাড়া 'ছাপাহাটের বৃত্তান্ত' দূর পল্লীর মানুষের কাছে তেমন পৌঁছতোও না । ফলে হাতে লিখে অনুলিপি করা, সেইসঙ্গে বানানভুলে ভরা বাংলা পুঁথিই হাতে হাতে ফিরতো ।

বানান-সমস্যা

পুরোনো পুঁথিতে 'বানান-সমস্যা'ও যেন লিখনরীতিব মধ্যেই পড়ে যায় । সেকালে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না । মূল পাণ্ডুলিপি দেখে তাব অনুলিপি করা হত হাতে লিখে । কাজটি করতেন লিপিকরেরা । সমাজে নিরক্ষর-অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত মানুষের সংখ্যাই ছিল বেশী । উচ্চারণে কোন শিষ্টরীতি মেনে চলা হোত না । টোল-চতুষ্পাঠীতে পড়া সংস্কৃত ভাষা সাহিত্যে দক্ষ মানুষ ছাড়া কোন শব্দের উদ্ভব, পরিবর্তন বা অর্থ সম্পর্কে বেশীর ভাগ মানুষের কোন ধারণাই ছিল না । ফলে পুঁথিপত্র বা দলিল-দস্তাবেজ লেখার সময় অনিবার্যভাবেই ঘটতো বানান বিভ্রাট । এক একটি শব্দের বানানে ভিন্নরূপ দেখা গেছে । তবে তৎসম শব্দের বানানেই বিভ্রাট তো বেশী । প্রাকৃত বা অপভ্রংশ শব্দের ক্ষেত্রে সেই সংকট প্রকট ছিল না ।

বানান ভুলের এক প্রধান কারণ উচ্চারণে অসাম্য । এইক্ষেত্রে অনুসবণ করার মতো কোন আদর্শই ছিল না । মুদ্রাযন্ত্র আসার পর বাংলা বানানের বর্ণবিভ্রাট দূর হয় । প্রাচীন বাংলা পুঁথিতে বানানভুলের কয়েকটি মূল ঘটনা নিম্নরূপ ঃ-

১. ই-ঈ বা উ-ঊতে পার্থক্য দেখা যায় না । সেইভাবে অ এবং য় এর ব্যবহার ঘটেছে যথেষ্ট । যেমন য়ামার, য়তপর, অনাআসে ।

২. শ-য-স এর ব্যবহারে বিভ্রাট ঘটেছে । যেমন শ্বামী,যস্টী ।

৩. ম-ফলা, য-ফলা, ব-ফলার বিচিত্র ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। যেমন উদ্বান, বিদ্যান, আত্যারাম, আত্যীয় ।

৪. জ ও য, ঋ ও র এবং খ ও ক্ষ এব ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটনা । যেমন জদি, দ্রঢ়, বিক্ষাত, ক্ষ্যাতি ইত্যাদি ।

৫ 'ইয়া' যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়াপদগুলির পরিবর্তন ঘটেছে । এইভাবে- খাইয়া > খায়্যা, যাইয়া > যায়্যা, পাইয়া > পায়্যা ।

৬. ঘোষবর্ণ-অঘোযব র্ণ, অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ বর্ণ, অনুনাসিক বর্ণযুক্ত শব্দের ক্ষেত্রেও ঘটেছে বানান সমস্যা ।

৭ য-ফলা, ম-ফলা, ব-ফলাব পরিবর্তে ব্যঞ্জনবর্ণেব দ্বিত্ব ঘটেছে- বাক্য > বাক্ক, জন্ম > জম্ম, অন্বেষণ > অন্নেষণ ।

৮ রেফ এর বিচিত্র ব্যবহার - যুদ্ধ > যুর্দ্ধ, বিখ্যাত > বির্খ্যাতি ।

৯ ন, ণ ও ল ব্যবহারে পার্থক্য উদ্ধার করা দুরূহ ।

দিগবন্দনা

বাংলা পুঁথিতে 'দিগবন্দনা' একটি উল্লেখ্য বিষয় । কাব্যের প্রথমাংশে কবিরা সিদ্ধিদাতা গণেশ থেকে শুরু করে বিভিন্ন পৌরাণিক ও লৌকিক দেবদেবী গুরু, পিতামাতা, পূর্ববর্তী কবি সকলের উদ্দেশ্যেই শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন । হিন্দু কবিরা পীরপয়গম্বরদের বন্দনা করেছেন উদার উন্মুক্ত হৃদয়ে । বিশেষ করে আঞ্চলিক দেবদেবীদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে কবিরা নিজেদের অজ্ঞাতসারে বাংলার অখ্যাত ও বিস্মৃতপ্রায় আঞ্চলিক ইতিহাসের উপাদানসম্ভার ভাবীকালের গবেষকদের জন্যে সাজিয়ে রেখে গেছেন । মুকুন্দরাম তাঁর চণ্ডীমঙ্গলে দিগবন্দনা সীমাবদ্ধ রেখেছেন শাস্ত্রীয় দেবদেবীর মধ্যেই (পরবর্তীকালের অনুলিপিতে কোথাও কোথাও অবশ্য আঞ্চলিক দেবদেবীব বন্দনা দেখা যায় । এগুলি অবশ্য প্রক্ষিপ্ত) । কিন্তু মানিকরাম গাঙ্গুলি (ধর্মমঙ্গল), রামানন্দ যতি (চণ্ডীমঙ্গল), হরিদেব (রায়মঙ্গল), রামেশ্বর ভট্টাচার্য (শিবায়ন), কবিচন্দ্র (রামায়ণ, মদনমোহন বন্দনা), শঙ্কর (মদমমোহন বন্দনা), ক্ষেমানন্দ (মনসামঙ্গল), গোষ্ঠদাস (মহাপ্রভু মঙ্গল), কবি শঙ্কবদেব (শীতলামঙ্গল), নিত্যানন্দ চক্রবর্তী (শীতলামঙ্গল), শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর (শীতলামঙ্গল, পঞ্চাননমঙ্গল) প্রমুখ কবিদের 'দিগবন্দনা' অজস্র আঞ্চলিক হিন্দুদেবদেবী ও পীরপয়গম্বরের বন্দনায় পরিপূর্ণ (আগ্রহী পাঠককে 'বিশ্ববাণী' পত্রিকার আশ্বিন ও কার্তিক ১৩৯৭ সংখ্যা দুটিতে প্রকাশিত বর্তমান লেখকের 'পুরোনো পুঁথিব দিগবন্দনায়

আঞ্চলিক ইতিহাস' রচনাটি পড়তে অনুরোধ জানাই) ।

বাঁকুড়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর, নদীয়া, হাওড়া, হুগলী, কলকাতা, ২৪ পরগণা, বীরভূম জেলার নানাস্থানে ছড়িয়ে থাকা শত শত দেবদেবী ও দেবস্থানের সশ্রদ্ধ উল্লেখ দিগবন্দনায় দেখা যায় । বিশ্বভারতীতে রক্ষিত, অজ্ঞাত কবির 'দিগবন্দনা' পুঁথিটিতে (বি. ভা. ৯৩৯) মাহেশের জগন্নাথ, বল্লভপুরের বল্লভী, খড়দহের শ্যামসুন্দর, অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ, বন্দীপুরের শ্যামরায়, চিৎপুরের মঙ্গলা, বরানগরের কালী, আমতার মেলাইচণ্ডী, মাকড়দহের সুলোচনা, তালপুরের ষষ্ঠী, সেওড়াফুলির গুমা, মথুরাবাটীর চণ্ডী, চোঙ্ঘুরালির মাকাল ঠাকুর, সাঁকরাইলের বিলোচনী, দশঘরার বিশালাক্ষী, কৃষ্ণনগরের গড়েশ্বরী, কুচিলার সর্বমঙ্গলা, কানপুরের ভদ্রকালী, চম্পাইনগরের বিষহরি, নিমতলার কালী, ত্রিবেণীর চামুণ্ডা, ভদ্রেশ্বরের মহাদেব, বালির কল্যাণেশ্বর, গোলপাড়ার বিনোদরায়, খুরুটের স্বরূপনারায়ণ, চণ্ডীতলার চণ্ডী, জনাইয়ের কালী, জোড়ুরের ভগবতী, ভল্লুকের বিসাই, গুপ্তিপাড়ার হনুমান, মহানদের করিমপীর, ত্রিবেণীর দফরগাজী, সারেঙ্গার পীর সারেঙ্গ ইত্যাদি শতাধিক হিন্দু ইসলাম দেবদেবীর বন্দনা আছে । এছাড়াও বিভিন্ন পুঁথিতে উল্লিখিত দেবদেবীর নামের একটি নমুনা তালিকা এখানে তুলে ধরা হোল ভবিষ্যৎ গবেষকদের কাজের সুবিধার্থে ঃ-

বেলাডিহার বাঁকুড়া রায়, শীতলসিংহ, ফুলুইয়ের ফতেসিংহ, বৈতলের বাঁকুড়া রায়, পাণ্ডুগ্রামের ধর্ম, শ্যামবাজারের দলুরায়, দেপুরের জগৎরায়, গোপালপুরের কাঁকড়াবিছা, ইন্দাসের বাঁকুড়া রায়, গবপুরের স্বরূপনারায়ণ, বরুজগ্রামের মোহনরায়, জাড়ার কালুরায়, তারকেশ্বরের তারকনাথ, শিয়রের শান্তিনাথ, কামেশ্বরের নেড়াদেউল, ব্রাহ্মণভূমের ঝাড়েশ্বর, চন্দ্রকোনার মল্লেশ্বর, রঘুনাথ, বেতাইয়ের কোঙরেশ্বর, খানাকুলের ঘন্টেশ্বর, বগড়ির কৃষ্ণরায়, বিষ্ণুপুরের মদনমোহন, সাবড়াকোনের রামকৃষ্ণ, ধুলাপুরের কেলেসোনা, বাঘনাপাড়ার বলরাম, কৃষ্ণনগরের গোপীনাথ, তমলুকের জিষ্ণুহরি, গোরুটির রামগোপাল, বোড়োর বলরাম, যাজপুরের রাধাশ্যাম, অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ, বালসীর নারায়ণ, ,কাটোয়ার চৈতন্যনিতাই, কামারহাটী-দেশড়া-পড়াশের পঞ্চানন, ভিতরগড়ের সত্যপীর, ক্ষেপুতের ক্ষেপ্তেশ্বরী, আমতার মেলাইচণ্ডী, কালীঘাটের কালী, মৌলার রঙ্কিনী, বিক্রমপুরের বিশালাক্ষী, বরদার বিশালাক্ষী, রাজবলহাটের রাজবল্লভী, শিয়াখালা ও বন্দীপুরের বাশুলী, বর্ধমান ও গড়বেতার সর্বমঙ্গলা, হিংগুলাটের হিংগুলাটেশ্বরী, ঢাকার ঢাকেশ্বরী, কিরীটকোণার কিরীটেশ্বরী, সেনপাহাড়ীর শ্যামারূপা, আনুড়ের বিশালাক্ষী, লাউগ্রামের দণ্ডেশ্বরী, বোঁয়াইয়ের চণ্ডী, আঁকুড় ছিরামপুরের ত্রিপুরাসুন্দরী, বেলার চণ্ডী, ছাতনার বাশুলী, তমলুকের বর্গভীমা, পলাশীর পলাশচণ্ডী, ভাণ্ডারগড়ের ভাঁড়ারচণ্ডী, গোগ্রামের ভগবতী, যশোহরের যশোরেশ্বরী, সাগরদ্বীপের কপিলমুনি, ভুরশুটের রাজরাজেশ্বরী, রামপাড়ার কপিলেশ্বর, ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা, তারাপীঠের তারা, কঙ্কালীতলার কঙ্কালী, বক্রেশ্বরের শিব, পুরীর জগন্নাথ, বিমলাভবানী, নান্নার চামুণ্ডা, ইছাপুরের বিশাললোচনী, মসানীর কালিকা, বৈরার বৈরাচণ্ডী, পাণ্ডুয়ার আশি হাজার পীর, ত্রিবেণীর দাফর খাঁগাজী, আরাণ্ডীর দলুরায়, শান্তিনাথ, কালুরায়, শীতলা, মান্দারণের কালী, কপাট্যার ধর্ম, বোয়ালিযার চণ্ডী, বালিয়ার সিংহবাহিনী, বলিহারপুরের গোঁড়িবুড়ী, নবদ্বীপের শ্রীচৈতন্য, বালিডাঙ্গার সর্বমঙ্গলা, বারাসতের বিনোদিনী,

বেতড়ের বেতাই, হিজলীর কালুরায়, রতনপুরের ভদ্রকালী, মির্জাপুরের সিংহবাহিনী, বাঁয়াখালির মহামায়া, জামদারগড়ের জামদগ্নি মহামায়া, জাতুগ্রামের কালুরায়, চেতুয়ার চাঁদ খাঁ পীর, ঘাটালের বাঁকুড়া রায়, পানুয়ার কালী ইত্যাদি। পীরপয়গম্বরদের বন্দনাতেও কবিপ্রচেষ্টার ঘাটতি নেই। একটি দৃষ্টান্ত রামেশ্বরের শিবায়ন পুঁথি (মৎসংগৃহীত)। কবি লিখেছেন -

'সকলদেবতা বন্দো নওাইয়া সির। এক লাক আশিহাজার বন্দ সত্যপির ।।
মাহাম্মদ আদি বন্দ আর হাজুরথ। রুষুল দেবতা বন্দ কোর্‌য়া দণ্ডবৎ ।।
কোরান কেতাব বন্দ দোনসীর উপর। চন্দন খাঁ সাহেব বন্দ যোড় করি কর ।।
আর বন্দ কামতার করিয়া সাল্বাম (?)। আসরে স্মরণ করে তোমার গোলাম ।।
ইমাম হুষুল বন্দ এই দুই ভাই। রাযুল দেওান বন্দো সাল্বাম পোছাই ।।
দুনিয়ার ভিতর আছে জত পির। সভার কৌশবন্দ নুঙাইয়া সির ।।
মিএগখাঁর সাহেব বন্দ খড়্গাপুরে। বন্দিব উরজালাল হুগুলি সহরে ।।
তাজখাঁ মসনদ আলা দরিয়ার পির। তাহার কৌউস বন্দ নুঙাইয়া সির ।।
গোরাচান্দ পির বন্দ সাল্বাম বাজায়্যা। সাহেব প্রদুল্ব বন্দ সির নুঙাইয়্যা ।।
চেতুআর চাঁদ খাঁ বন্দ জোড়করি কর।..... (এর পর পুঁথিটি খণ্ডিত)।'

ইসলামী পুঁথিতেও অনুরূপ বন্দনাপর্ব লক্ষ্য করা যায় -

'আএ প্রভু নিরাঞ্জন ক্রিপার সাগর। বিস্বরণ হন্তে আল্লা তোমি রৈক্ষা কর ।।
সমুদ্র সঞ্চর মোর জ্ঞানহিন বল। এহেন সঙ্কটে আল্লা তোমার প্রবল ।।
পীর পদে প্রণমিএ ছইদ হাছন। মির মাহাম্মদ সাহা তাহান নন্দন ।।'

- শেখ মুতালিবের 'কিয়াতুল মুছল্লিন' (পুঁথি পরিচিতি)।

'প্রথম প্রণাম করি প্রভুনিরঞ্জন। স্বর্গ মৈত্যে পাতাল জে জাহার স্রিজন ।।
পএগাম্বর সব আদি জথ অলিগণ। তার পাছে প্রণমি এ নবীর চরণ ।।'

- শেখ পরাণের 'নুরনামা' (ঢা. বি. ১৯৪, প্রাগুক্ত)।

কবি দয়াল তাঁর 'জ্ঞান চৌতিশা' পুঁথিতে (ঢা. বি. ৬০৩) বলেছেন -

'জনক জননী গুরু চরণ বান্দিয়া। কহিনু চৌতিসা শিশু বুদ্ধি আকলিয়া ।।
আলিপেরে আজি (আঞ্জি) বোলে নিজ দেসী ভাসে। আলাম প্রথমে বন্দি হিন্দুআনি শেষে ।।'

- ('পুঁথি পরিচিতি', পৃঃ ১৪১)।

ভণিতা

'ভণ' ধাতুর সঙ্গে অন প্রত্যয় যোগ করে হয় 'ভণন' শব্দ, যার অর্থ কথন বা বিরচন। তা থেকেই 'ভণিতা'। (✓ভণ + অন + ইতা)। 'শব্দকোষ'কার হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "বৈষ্ণব পদাবলীর বা মনসামঙ্গল কাব্যাদির প্রবন্ধের শেষে কবির নামযুক্ত পঙ্‌ক্তি।" শব্দটির নানাবিধ ব্যবহার এইরূপ ঃ- 'দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ। লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জান ।।' (চর্যাপদ ।।), 'চণ্ডীদাস ভণে করি অনুমানে ঠেকেছে কালিয়া ফাঁদে

(চণ্ডীদাস)', 'ভণিবেক নারায়ণ ক্রন্দনলাচাড়ী (বাইশকবির মনসামঙ্গল ।।)', 'ভণত তোহারি যশ গোবিন্দ দাস (গোবিন্দ দাস) ।।', 'শ্রীজয়দেবভণিতংগীতম্ (গীতগোবিন্দ) ।।' 'কাশীরাম দাস ভণে শুনি পুণ্যবান (মহাভারত) ।।' সুতরাং দেখা যাচ্ছে চর্যাপদের যুগ থেকে শুরু করে 'ভণিতা' শব্দটি যেমন ব্যবহৃত তেমনি তারও পূর্ববর্তী প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের সূত্র ধরে সমগ্র মধ্যযুগ তো বটেই, কবি শ্রীমধুসূদন এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ('ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' ৯ সংখ্যক পদে 'ভণে ভানু অব শুন গো কানু ।') কিছু কিছু কবিতাতেও 'কবিনাম' বা 'ভণিতা' ব্যবহৃত। পুঁথি সাহিত্যের লিখনরীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ভণিতা। কবি তাঁর রচনার শেষ অংশে (পরিচ্ছেদ বা রচনাংশে), নিজের নামটি সংযুক্ত করে দিয়ে পাঠককে নিশ্চিন্ত করেছেন এই বলে যে, এটি তাঁরই রচনা, অন্য কারো নয়। সেই সঙ্গে কবি তাঁর পোষ্টা বা কাব্যসাধনার প্রেরণাদাতার নামধাম ইত্যাদি আরও নানাবিধ তথ্য তুলে ধরতেন (পূর্বে আলোচিত)। অবশ্য কোন কোন রচনার ভণিতায় লিপিকর যে নিজের নাম ধাম বসিয়ে সাহিত্য গবেষণায় স্থায়ী সমস্যা সৃষ্টি করেন নি, তাও নয়। সেখানে মূল রচয়িতাকেই হারিয়ে যেতে হয়েছে। তবে ভণিতাবিহীন পুঁথিও যে পাওয়া যায়নি তা নয়। আবার এমন দৃষ্টান্ত বহু, যেখানে কোন লিপিকর বা কবিযশঃপ্রার্থী অখ্যাত কবি নিজের রচনায় বিশিষ্ট কবির নাম 'ভণিতা' রূপে ব্যবহার করেছেন। একদিক থেকে এটি মহত্ত্বের দৃষ্টান্ত হলেও পুঁথি গবেষণার কাজে এ এক 'উঠকো ঝামেলা'।

গ্রন্থপঞ্জী ও সূত্রনির্দেশ

১ 'গরীব গদাই' (পুঁথি পরিচয় ৪র্থ, শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল, বিশ্বভারতী, ১৯৮০, পৃঃ ১৩৬)। বি ভা ১৫৪২।

২ 'পোস্তক কেচ্ছা মানিক ছওদাগর', (প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫৯)। বি ভা ১৫৪৭।

৩ 'বৈষ্ণব পদাবলী বা মঙ্গলকাব্যাদির প্রবন্ধের শেষে কবির নামযুক্ত স্তবক', বঙ্গীয় শব্দকোষ ২য়, হরিচরণ বন্দ্যোঃ, ১৯৭৮, পৃঃ ১৬৫৪।

৪ আঠারো উনিশ শতকের কবিদের পুঁথিতে দীর্ঘ আত্মপরিচিতি দেখা যায়। বেশীর ভাগই মুকুন্দরামের 'গ্রন্থোৎপত্তির কারণ'এর অনুকরণ।

৫ 'পুঁথির পুষ্পিকা পদ বা Post Colophone Statement হচ্ছে গ্রন্থের মূল বিষয়ের বর্ণনার শেষে মূল গ্রন্থকারের ও গ্রন্থের পরিচায়ক, পুনরাবর্তিত সর্বশেষ ভণিতার পরে লেখা লিপিকরের আত্মকাহিনীমূলক পদ।' - পঞ্চানন মণ্ডল, ব সা. প. প বর্ষ ৭৫, সংখ্যা ১, পৃঃ ১৩।

৬ 'A Descriptive Catalogue of the Vernacular Manuscripts ', Royal Asiatic Society of Bengal, Vol IX, 1941, P 46

৭ 'শিলালেখ তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ', ড দীনেশচন্দ্র সরকার, কলকাতা ১৯৮২, পৃঃ ১৩০।

৮ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'বৌদ্ধগান ও দোহা' গ্রন্থে একে 'কপালটুকী' বলেছেন (দ্রঃ 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' পৃঃ ২, ৩, ৪)।

৯ 'রামানন্দ যতীর চণ্ডীমঙ্গল', অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৯৬৯, পৃঃ ৬।

১০ 'কবিকঙ্কণ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল', সুকুমার সেন, সাহিত্য একাডেমী, ১৯৭৫, পৃঃ ৪।

১১ 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা পুঁথি শালায় রক্ষিত প্রাচীন পুঁথির পরিচয়, ২য় খণ্ড, মণীন্দ্রমোহন বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র পাল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৪।

১২৩৬ বঙ্গাব্দে (১৮৩০ খ্রীঃ) লেখা জমি বিক্রীর দলিল ।

পাঁচ

পুঁথির অলঙ্করণ ঃ পাটাচিত্র ও পুঁথিচিত্র

আধুনিক যুগে মুদ্রিতগ্রন্থের প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জার মতো, সেকালে হাতে লেখা পুঁথিপাণ্ডুলিপির যুগেও অনুরূপ শিল্পরীতি প্রচলিত ছিল । পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত পুঁথির অলঙ্কৃত পাটা ও পাতাগুলিই তার দৃষ্টান্ত । বাংলার ঐতিহ্যসম্পন্ন চিত্রশিল্পের ধারা পাটাচিত্র, পুঁথিচিত্র, রথচিত্র, মৃৎপ্রতিমার চালচিত্র, গুহাচিত্র ইত্যাদির মধ্যে দিয়েই প্রবাহিত হয়ে এসেছে । এর মধ্যে পাটাচিত্র ও পুঁথিচিত্র এখানে প্রাসঙ্গিক । এইসব চিত্রাঙ্কন যেমন বিভিন্ন রাজা বা সামন্তপ্রভুদের আনুকূল্যে-অনুপ্রেরণায় ঘটেছে, তেমনি শিল্পীর 'কুলক্রমাগত' মানসিকতা তাকে এইসব সাবলীল চিত্রশিল্পচর্চায় চিরকাল উৎসাহিত করেছে । বিভিন্ন সংগ্রহে ওইসব পুরানো পাটাচিত্র ও পুঁথিচিত্রের বলিষ্ঠতা ও পারিপূর্ণতা দেখে একথা সহজেই মনে আসে যে, দীর্ঘকয়েক শতকের বা সহস্রাব্দের চর্চা ও অনুশীলনের ফলশ্রুতি এটি । বাংলার আর্দ্র জলবায়ুর প্রকোপে পাটাচিত্র ও পুঁথিচিত্রের খুব পুরানো নিদর্শন নষ্ট হয়ে গেছে । যা পাওয়া গেছে, তা ১০ম শতাব্দীর পূর্বেকার নয় । এগুলি সবই পাল ও সেন রাজবংশের সময়কার । প্রথমদিকে তালপাতা এবং পরের দিকে হাতে তৈরী তুলট কাগজের পুঁথির ওপর যে সব বহুবর্ণময় চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পুঁথির বক্তব্যবিষয়ের সঙ্গে সম্পর্করহিত । পুঁথির প্রচ্ছদ বা পাটাচিত্রের ক্ষেত্রেও একথা বলা চলে ।

বাংলার চিত্রশিল্পের অন্যতম প্রাচীন নিদর্শন মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার লালজলের গুহাচিত্র (Indian Museum Bulletin, XVI, P 47-59) । এছাড়া অজয় ও কুনুর অববাহিকায়, বর্ধমান জেলার প্রত্নক্ষেত্র 'পাণ্ডুরাজার ঢিবি' থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে নানাধরণের অলঙ্কৃত মৃৎপাত্র ।[১] বৌদ্ধগ্রন্থ 'দিব্যাবদান' এবং 'বীতাশোকাবদান' কাহিনীতে দেখা যায়, পুণ্ড্রবর্ধন নগরের (উত্তরবঙ্গ) নির্গ্রন্থী আজীবিকরা[২] এমন একটি চিত্র অঙ্কন করেছেন, যেখানে বুদ্ধদেব নির্গ্রন্থীদের পায়ের নীচে পড়ে আছেন । এ চিত্র দেখে সম্রাট অশোক ক্রুদ্ধ হয়ে পুণ্ড্রবর্ধনের নির্গ্রন্থীদের নির্বিচারে হত্যা করেন ।[৩] এছাড়া বাংলার পটুয়া শিল্পের ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে, আজীবিক ধর্মপ্রচারক, নালন্দার অধিবাসী গোশাল মঙ্খলিপুত্ত পূর্বাশ্রমে ছিলেন এক পটুয়ার পুত্র । রাজগৃহ নগরীর আশে পাশে পট প্রদর্শন করে তিনি জীবিকা অর্জন করতেন (খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী) ।[৪] খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতকে লেখা পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'তে গ্রাম্য পটুয়াদের কথা আছে । পতঞ্জলীর মহাভাষ্যে 'শৌভিক' নামক এক নাটগোষ্ঠীর কথা আছে, যারা অঙ্কিত পটচিত্র সামনে রেখে পথের ধারে কংসবধের কাহিনী অভিনয় করে দেখাতো । এছাড়া অন্যান্য বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্র, কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' ও 'মালবিকাগ্নিমিত্রম' ভবভূতির 'উত্তর রামচরিত',

বাণভট্টের 'হর্ষচরিত', বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষস' ইত্যাদি প্রাচীন রচনায় পটুয়া ও চিত্রপ্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়। সেই প্রাচীন পটচিত্রের লুপ্তপ্রায় ধারাটি আজও গ্রামবাংলার নানাস্থানে পটুয়া বা চিত্রকর নামক জনগোষ্ঠীর মধ্যে কোনক্রমে টিকে আছে। পাটা ও পুঁথিচিত্র এইসব প্রাচীন রীতিরই অনুসরণ। 'বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে' চিত্রসূত্রে (৪২/৫১-৫৩) চিত্রশিল্প সম্পর্কিত কিছু কিছু সংকেত পাওয়া যায়।

কিন্তু এই চিত্রশিল্পের যাত্রা কবে থেকে তা আজও অজ্ঞাত। ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে রচিত তিব্বতী ঐতিহাসিক লামা তারানাথ 'বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস' গ্রন্থে বাংলার পাল ও সেন যুগের শিল্পচর্চার কথা বলতে গিয়ে ধীমান ও তাঁর পুত্র বীতপাল নামক দুজন শিল্পীর কথা বলেছেন।[৫] এঁরা যথাক্রমে পূর্বভারতীয় ও নেপালী শিল্পরীতি এবং মধ্যভারতীয় শিল্পরীতির প্রবর্তক। গুপ্তযুগীয় শিল্পরীতি এঁদেরই মাধ্যমে পরবর্তীকালে শিষ্যপরম্পরায় ছড়িয়ে পড়ে বলেই অজন্তার গুহাচিত্রের অঙ্কনশৈলীর প্রভাব পালযুগের পাটাচিত্র ও পুঁথিচিত্রে র ওপর পড়তে দেখা যায়। বোঝা যায়, উপাদান, স্থান, আনুকূল্য ও পারিপার্শ্বিকতার পার্থক্যবশতঃ বাংলা-বিহার-নেপালের পুঁথিচিত্র ও পাটাচিত্রে শিল্পীদের কাজের সঙ্গে অজন্তার শিল্পীদের কিছুটা তারতম্য দেখা গেলেও, তাঁরা যে একটি প্রাচীন ঘরানাকেই অনুসরণ করে এসেছেন, তা বোঝা যায়। অবশ্য পরবর্তী সময় থেকে এই শিল্পে রং ও রেখার কাজে কিঞ্চিৎ ভিন্নতা দেখা যায়। ১৩শ শতকের মুসলীম আক্রমণেও এই শিল্পচর্চায় ভাটা পড়ে নি বরং বাংলার মল্লরাজধানী বিষ্ণুপুর অঞ্চলে এই শিল্প যেন আরও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়েছে। রাজস্থানের রাজপরিবারের সঙ্গে মল্লরাজপরিবারের সম্পর্ক, পশ্চিম ও উত্তরভারত প্রত্যাগত বণিক ও পুরী তীর্থযাত্রীদের যাত্রাপথে অন্যতম বিশ্রামস্থল বিষ্ণুপুর হওয়ায় রাজস্থানী চিত্রশৈলীর মেবার- মালব-বুঁদি-জয়পুরী প্রভাব পড়ে যায় বিষ্ণুপুর ও আশেপাশের বিভিন্ন অঞ্চলের এই চিত্রশিল্পে। পরবর্তীকালে মুর্শিদাবাদকে কেন্দ্র করে মুঘলচিত্ররীতি ও পরবর্তীকালে কোম্পানী যুগের পাশ্চাত্য রীতির প্রভাব পড়লেও অন্ত্য-মধ্যযুগীয় পাটা ও পুঁথিচিত্রণে বাংলার নিজস্ব অঙ্কনপদ্ধতি অনেকাংশেই অবিকৃত থেকেছে। উত্তরবাংলার কোচবিহার অঞ্চলে পড়েছে রাজস্থানী প্রভাব- সেও রাজপরিবারের আত্মীয়তা সূত্র। দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গে (প্রধানতঃ মেদিনীপুর) পড়েছে ওড়িশার প্রভাব, যেহেতু ঐ সমগ্র অঞ্চলই ছিল ওড়িশা রাজ্যের এলাকাভুক্ত।

পাটাচিত্র

একালের মুদ্রিতগ্রন্থে যেমন বিষয় অনুসারী প্রচ্ছদচিত্র থাকে, সেকালেও তেমনি পুঁথির কাঠের পাটায় নানা বর্ণময় চিত্রাঙ্কন করা হোত। পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত এইসব বর্ণাঢ্য পাটাগুলি বঙ্গীয় চিত্রশিল্পের মূল্যবান নিদর্শন। গিলগিটের ধ্বংসপ্রাপ্ত বৌদ্ধস্তূপ থেকে ব্রাহ্মী অক্ষরে লেখা যে সব বৌদ্ধপুঁথি পাওয়া গেছে, সেগুলির কোন চিত্রিত পাটা পাওয়া যায় নি।[৬] এগুলির সময়কাল খ্রীঃ ৪র্থ-৮ম শতাব্দী। পাল ও সেন যুগের যে সব পাটা পাওয়া গেছে, সেগুলির অঙ্কনশৈলী এটাই প্রমাণ করে যে এইসবই বহু শতাব্দীর শিল্পানুশীলন ও একনিষ্ঠচর্চার

ফল। কলকাতার রাজ্য সংগ্রহশালা, এশিয়াটিক সোসাইটি, ভারতীয় যাদুঘর, আশুতোষ মিউজিয়াম, ঠাকুরপুকুর গুরুসদয় মিউজিয়াম, বিষ্ণুপুর যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন, হুগলী জেলার রাজবলহাট অমূল্য প্রত্নশালা, হাওড়া জেলার নবাসন আনন্দ নিকেতন, বীরভূম জেলার বিশ্বভারতী সংগ্রহশালা, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত আছে বেশ কিছু চিত্রিত পাটা। বিদেশের সংগ্রহশালায় রক্ষিত পাটারও সন্ধান পাওয়া গেছে।[৮]

পুঁথির আকারে পাৎলা মসৃণ কাঠের পাটার ওপর চূণের প্রলেপ দিয়ে সাদা রঙের পটভূমি তৈরী করে, কাঠের পাটার ওপর তেঁতুলবীজ সেদ্ধ করে তৈরী শক্ত আঁঠার সাহায্যে শক্ত কাপড় টান টান করে সেঁটে অথবা কাঠের ওপর গালার আস্তরণ লাগিয়ে তার ওপর অঙ্কনেব কাজ করা হয়েছে। কাপড় সেঁটে চিত্রাঙ্কনের ধারা রথের প্যানেলে চিত্রাঙ্কনের মধ্যে আজও টিকে আছে। সেকালে সাধারণতঃ গাছগাছড়া বা প্রাকৃতিক উপাদানেই এসব রং তৈরী করা হোত।

আবিষ্কৃত পুঁথির পাটাগুলিকে শিল্পসমালোচক রাজস্থান ও পাহাড়ী শৈলী, ওড়িশী শৈলী ও স্থানীয় লোকায়ত শৈলী এই তিন ভাগে ভাগ করে থাকেন।[৮] ১৭শ-১৮শ শতক বা তারও পরে বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, হুগলী, বীরভূম, মেদিনীপুব, মুর্শিদাবাদ ও কোচবিহার জেলায় পুঁথির পাটা অঙ্কনের কাজের দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত পাটাগুলি।

বাংলা, বিহাব ও নেপালে এই চিত্রশিল্পের কাজ হয়েছে। তবে বৌদ্ধধর্মের পুঁথিতেই যে এদেশে প্রথম চিত্রিত পাটা সংস্থাপিত হয তার দৃষ্টান্ত কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি সংগ্রহেব বৌদ্ধপুঁথি 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' (G 4713)। পালরাজ ১ম মহীপাল দেবের ৬ষ্ঠ রাজ্যাঙ্কে, ৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এই পুঁথিটি চিত্রিত এবং অনুলিখিত হয। অবশ্য অধ্যাপক সবসীকুমার সরস্বতী তাঁর এই শিল্পবিষয়ক অসাধারণ গ্রন্থ 'পালযুগের চিত্রকলায়' আলোচ্য পাটাটিকে পুঁথির পরবর্তী সময়কার বলে মনে করেন। তালপাতায় লেখা এই পুঁথির পাটার চিত্র দীনেশচন্দ্র সেনের 'বৃহৎবঙ্গ' গ্রন্থে মুদ্রিত হয়। খ্রীঃ ১০ম থেকে ১২শ শতাব্দী সময়কালের মোট চব্বিশখানি তারিখযুক্ত চিত্রিত পুঁথির কথা অধ্যাপক সরসীকুমার সরস্বতী বলেছেন এবং সেগুলির চিত্রিত পাটার কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন।

জয়সল্মীর জৈনভাণ্ডারের ১১শ শতাব্দীর তালপাতার পুঁথির পাটা এবং দক্ষিণভারতের মুদবিদরী দিগম্বর ভাণ্ডারের ১২শ শতাব্দীব পুঁথিব অলঙ্কৃত পাটা দুটি যথাক্রমে পশ্চিম ও দক্ষিণভারতের পাটাচিত্রের প্রাচীন নিদর্শন। এ থেকে এমন সিদ্ধান্ত করা বোধ হয় অসঙ্গত হবে না যে, পশ্চিম বা দক্ষিণভারতে পুঁথি বা পাটা চিত্রণে জৈনরাই পথিকৃৎ।

পাল-সেন যুগের পর মুসলীমযুগে পাটা চিত্রণেব কাজ হ্রাস পেলেও একেবারে যে বন্ধ হয়ে যায় নি তার প্রমাণ তালপাতায় মৈথিলী-বাংলায় লেখা বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক 'কালচক্রতন্ত্র' পুঁথিটি।[৯] ১৫০৩ বিক্রমসংবৎ বা ১৪৪৬ খ্রীষ্টাব্দে বিহারের আরাতে অনুলিখিত এই পুঁথিটি বর্তমান কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহ। মৈথিলী-বাংলায় লেখা, লিপিকর রামদত্তেব তালপাতার পুঁথি 'পিঙ্গলতাত্তিব ব্যাখ্যা' (১৪৯১-৯২ খ্রীঃ)। এর পাটার একটিতে কৃষ্ণ-গোপী, অন্যটিতে

দশাবতার চিত্র অঙ্কিত (ব্রিটিশ লাইব্রেরী সংগ্রহ)।

স্থানীয় জমিদার বা ভূস্বামীদের আনুকুল্যে বঙ্গীয় চিত্রশিল্পের ধারা পাটা ও পুঁথিচিত্রের মাধ্যমে পরিপুষ্টি লাভ করেছিল। নানাস্থান থেকে প্রাপ্ত চিত্রিত পাটাগুলি তার নিদর্শন। তাৎকালিক মল্লরাজধানী বিষ্ণুপুরে, তালপাতার আকারে তুলটকাগজ কেটে ১৪২১ শকাব্দে (১৪৯৯ খ্রীঃ) বাংলায় লেখা 'বিষ্ণুপুরাণ' পুঁথির পাটাটিতে আঁকা হয়েছে বিষ্ণুর দশাবতারের বহুবর্ণময় চিত্র।

বিষ্ণুপুর মল্লরাজ পরিবার শ্রীনিবাস আচার্যের নিকট বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হবার পর মল্লভূমিতে বৈষ্ণবধর্মের প্লাবন ঘটে। তার প্রভাব পড়ে এখানকার চিত্রশিল্পে। বিষ্ণুপুর যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে রক্ষিত প্রায় ৪০টিরও বেশী চিত্রিত পাটা প্রয়াত মানিকলাল সিংহ বাঁকুড়া জেলার লয়ের, নারায়ণপুর, উলিয়াড়া, বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুরের নানাস্থান থেকে বিভিন্ন সময় সংগ্রহ করেন। দেশের অন্যান্য সংগ্রহশালাতেও বিষ্ণুপুর থেকে সংগৃহীত পাটা আছে। এইসব পাটার বিষয়বস্তু গোপীসহ কৃষ্ণের রাসলীলা, তাম্বূললীলা, বিষ্ণুর দশাবতার, রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক, মথুরালীলা, চৈতন্যদেবের কীর্তন, কালী, শিবদুর্গা ইত্যাদি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামে[১০] আছে বিষ্ণুপুর থেকে প্রাপ্ত, ১৭শ শতকে অঙ্কিত রাসলীলা, মথুরায় কৃষ্ণ, মথুরা থেকে কৃষ্ণের প্রত্যাবর্তন বিষয়ক চারখানি পাটা। এখানকার ১৮শ শতকের দুটি পাটার বিষয়বস্তু রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক ও বীরহাম্বির রাণী সুদক্ষিণা ও শ্রীনিবাস আচার্য। মেদিনীপুর থেকে প্রাপ্ত ১৮শতকে অঙ্কিত কীর্তনরত চৈতন্যদেব ও শিবপার্বতী বিষয়ক পাটা দুটি বিষ্ণুপুর শিল্পশৈলীর অবদান বলেই অনুমিত। একই কথা প্রযোজ্য বীরভূম থেকে প্রাপ্ত ১৭শ শতকের দুটি পাটা (বিষয়ঃ ওড়িশারাজ প্রতাপরুদ্র ও চৈতন্যদেব; কৃষ্ণের মথুরায় প্রত্যাবর্তন) ও হুগলী থেকে প্রাপ্ত গোষ্ঠলীলা (১৮শ শতক) বিষয়ক পাটাগুলির ক্ষেত্রে। বরং মুর্শিদাবাদ থেকে প্রাপ্ত ১৬শ-১৭শ শতকের পাটাটিতে ভয়ঙ্করী কালীর চিত্রটি বড় বিচিত্র।

বিষ্ণুপুরী পাটাচিত্রগুলির[১১] পোষাক-পরিচ্ছদ অঙ্গভঙ্গিমা, অলঙ্কার ইত্যাদির ক্ষেত্রে উচ্চমানের রাজস্থানী চিত্রকলার প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই লক্ষ্যণীয়। আবার চৈতন্যলীলার পাটায় মুঘল বা বিদেশী প্রভাবও পণ্ডিতরা লক্ষ্য করেছেন। রামরাজার পাটাচিত্রে উল্লেখ্য বিষয়, রামের জুলফি, গোঁফ, মুকুট, হাফপ্যান্ট বা ডোরাকাটা শার্ট পরিহিত হনুমান, মোগলাই পাগড়ি পরিহিত ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন। বিষ্ণুপুর থেকে প্রাপ্ত ১৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দের দশাবতার পাটা সম্পর্কে J. C. French বলেছেন "This work is an example of primitive Hindu art which sprang up after the storm of the Muhammadan invasion had subsided "[১২] ভোলানাথ ভট্টাচার্য তাঁর 'Krishna in the Traditional Painting of Bengal' বইতে লিখেছেন "It is also probable that the transition had already started with some wooden patas or covers of the time of Bir Hambir, the Malla King of Bishnupur, in the present district of Bankura, which contained brilliantly coloured and gracefully delinested illuminations on Vaishnava subject. These paintings may be said to occupy a position halfway between the pats drawn in Gujrati style and the later parts in Bengal."

ঠাকুরপুকুর গুরুসদয় মিউজিয়ামে রক্ষিত, বাঁকুড়া থেকে সংগৃহীত প্রায় ১২টি পাটার

মধ্যে বেশীরভাগই বৈষ্ণবীয় বিষয়ে অঙ্কিত। বীরভূম থেকে প্রাপ্ত পাটা দুটির (১৯শ শতক) একটিতে দশাবতার ও অন্যটিতে ষাঁড়ের ওপর উপবিষ্ট শিব, কালী, দুর্গা ইত্যাদি চিত্রিত।

ভারতীয় যাদুঘরে রক্ষিত, সম্ভবত মুর্শিদাবাদ থেকে প্রাপ্ত ৫৫ সে.মি. x ১৩ সে.মি. আকারের ১৯শ শতকের পাটার বিষয়বস্তু, দক্ষিণভারতের মাহেষ্মতী নগরীতে অনুষ্ঠিত অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য ও বৈদিক উত্তরভারতীর মধ্যে বিতর্কসভা। অপর দিকে আছে রামচন্দ্র, বানরসেনা, তীরধনুসহ লবকুশ।[১৩]

কোচবিহাররাজ হরেন্দ্রনারায়ণ (১৭৮৩-১৮৩৯ খ্রীঃ) ও রাজা শিবেন্দ্রনারায়ণের সময়কার চিত্রিত পাটাগুলিতে রাজস্থানী প্রভাবের কারণ জয়পুরের সঙ্গে কোচবিহার রাজপরিবারের আত্মীয়তাবশতঃ সাংস্কৃতিক লেনদেন।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সংগ্রহের দুটি পাটার একটি মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল (উ. ব. ৫২০), অন্যটি দ্বিজ কবিরাজের মহাভারত গদাপর্ব পুঁথি (উ. ব. ৫৯)। পুঁথিদুটি যথাক্রমে মালদহ ও কোচবিহার থেকে সংগৃহীত। শেষের পাটাটিতে মহাভারত কাহিনী চিত্রিত। পুঁথির পাটায় মহাভারত কাহিনী চিত্রণ অভিনব। ঢাকা মিউজিয়াম সংগ্রহে কৃষ্ণলীলা ও চৈতন্যলীলা পাটা আছে, রামায়ণ ও মহাভারত কাহিনী বিষয়ক পাটাও এখানে আছে।

পাটাচিত্রে বহির্বঙ্গীয় প্রভাবের একটি বলিষ্ঠ প্রমাণ দিয়েছেন তারাপদ সাঁতরা। আশুতোষ মিউজিয়ামে রক্ষিত শিবদুর্গা চিত্রাঙ্কিত একটি পাটার একস্থানে শিল্পীর নামের পাশে 'সাং জয়পুর হাল সাং বালুচর, জেলা মুর্শিদাবাদ' লেখাটি তিনি উদ্ধার করেন। অর্থাৎ জানা গেছে বাংলাব পাটাচিত্রের কোন কোন শিল্পী রাজস্থান বা উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে বাংলায় এসেছেন। তীর্থভ্রমণ, ব্যবসাবাণিজ্য, রাজপারিবারিক সম্পর্ক ছাড়াও, মুসলমান শাসনাধিকারের সময় উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমভারত থেকে যে সব সৈনিক বা রাজকর্মচারী এদেশে পরে এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে রাজা-জমিদার হয়ে যান, তাঁরা নিজের দেশ থেকে শিল্পী-কারিগরদের এদেশে আনিয়ে এই ধরণের শিল্পচর্চায় নানা উৎকর্ষ ঘটিয়ে থাকবেন। বাংলার সঙ্গে সেকালের মথুরার সম্পর্ক নিবিড় থাকায় উত্তর ভারতীয় শিল্পধারা মথুরা হয়ে বাংলায় যে এসেছে, তার প্রমাণ বাংলার পাটাশিল্পে মথুরারীতির নিবিড় স্পর্শ। অনুরূপভাবে, দক্ষিণ পশ্চিমবাংলায় পড়েছে ওড়িশা রীতির প্রভাব। গবেষক তারাপদ সাঁতরা তাঁর সদ্যোপ্রকাশিত 'পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প ও শিল্পীসমাজ' (কলকাতা, ২০০০) বইতে আঠার শতকের মধ্যভাগ থেকে উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত সময়কালের কয়েকটি পাটার কথা বলেছেন, যেগুলি মেদিনীপুর জেলার রামগড় রাজবাড়িতে সংরক্ষিত। এদের সম্পর্কে শ্রীসাঁতরার অভিমত, "বিষয়বস্তু সাধারণতঃ রাম, কৃষ্ণ, শিব ও চৈতন্যলীলা সংক্রান্ত। এছাড়া দু'একটি পাটাচিত্রে বৈষ্ণবভক্ত হিসেবে স্থানীয় শ্রেষ্ঠী ও ভূস্বামীদেরও চিত্রিত করা হয়েছে। বেশ বোঝা যায়। বাংলায় পুঁথির আবরণ হিসেবে পাটাচিত্রণের ধারাবাহিকতা ইসলাম বিজয়ের পর কিছুটা ছিন্ন হলেও পরবর্তী পনের থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত অটুট ছিল (পৃঃ ১০৮)।" প্রয়াত লোকচিত্রকলাবিদ সুধাংশু কুমার রায় জানিয়েছেন, এই রাজবাড়ির পূর্বপুরুষ গুজরাট থেকে এসেছিল এবং পরে রাজপরিবার প্রভু শ্যামানন্দের কাছ দীক্ষিত হয়। এখানকার পাটাচিত্রে স্বাভাবিক কারণেই গুজরাটি বা রাজস্থানী

চিত্রকলার প্রভাব পড়ে গেছে। পশ্চিমবাংলার এইসব পাটাচিত্রণে প্রধানতঃ সূত্রধর শিল্পীদের শৈল্পিক অবদানের বিষয়টি পণ্ডিতরা একবাক্যে মেনে নিয়েছেন। কারণ বাংলার কাষ্ঠ-পাষাণ-মৃৎশিল্পের বিশেষ করে মন্দিরভাস্কর্যের অলঙ্করণের সঙ্গে পাটাচিত্রের বিষয়বস্তুর সাদৃশ্য এই বিশ্বাসকে বলিষ্ঠ করে। গ্রাম্য ছুৎমার্গের ক্ষেত্রে, হিন্দু মানুষ 'আধাহিন্দু আধামুসলীম' পটুয়াদের আঁকা পাটা বোধ হয় পুঁথিতে কখনই জুড়তেন না। সেখানে দেবস্থপতি সূত্রধরদের অবদান যে সাদরে গৃহীত হবে, তা আর বিচিত্র কি !

ওড়িশা রাজ্যসংগ্রহশালায় (ভুবনেশ্বর) রক্ষিত 'রামায়ণ ও ভাগবতের' সুদৃশ্য পাটাগুলিতে ঈষৎ লোহিত পটভূমিতে অঙ্কিত চিত্রগুলির অভিনবত্ব নিতান্তই মনোমুগ্ধকর।

পাটাচিত্রণরীতি শেষ পর্যন্ত কী অবস্থায় পৌঁছেছিল তার অন্যতম দৃষ্টান্ত দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের অন্তর্গত আড়রা গ্রামের অশোক চট্টরাজের পারিবারিক সংগ্রহের একটি বৈষ্ণবীয় পুঁথির একজোড়া কাঠের পাটা। ৩৯ সেমি × ১৪ সেমি × ১ সেমি আকারের পাটা দুটির উভয়দিকই চিত্রিত ছিল। কিন্তু বহুব্যবহার এবং ভক্তিবশতঃ চন্দন ও জল দেবার ফলে পাটাদুটির ওপরের অলঙ্করণ প্রায় একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে। এগুলি শতাধিক বৎসরের পুরোনো। পাৎলা গালার লালরঙের পটভূমি তৈরী করে তার ওপর কালো রঙে সীমারেখা, চুল, আঙুল, চোখ অঙ্কন করে বিভিন্ন রঙে চিত্রগুলি অঙ্কিত। প্রথম পাটার ওপরের দিকেরও ১০-১৫ শতাংশ অলঙ্করণ মাত্র টিকে আছে। বকাসুরবধরত কৃষ্ণ, লাঙ্গল কাঁধে বলরাম ও আর দুজন গোপবালকের অংশবিশেষ দেখা যায়। কৃষ্ণের বর্ণ ঘন খয়েরী, অন্য সকলের হলুদ। প্রত্যেকের পরিধেয় বস্ত্র ছোট করে হাঁটুর ওপর পরা। সামনের কোলভাগে কোমরবন্ধনীর অংশ ঝুলন্ত। পাটাটির ভেতরের দিকে হাল্কা লাল রঙের পটভূমিতে নৌকাবিলাসের অলঙ্করণ। লম্বা, হলুদ রঙের নৌকাটি তরঙ্গময় যমুনার ওপর বয়ে চলেছে, হাল ধরে কৃষ্ণ উপবিষ্ট। পরণে আঁট সাঁটো 'সর্টস্' এর মতো বস্ত্র। গলায় মালা, হাতে পায়ে অলঙ্কার, মাথার চুল উঁচু করে বাঁধা। কৃষ্ণের পদতলে উপবিষ্টা খর্বাকৃতি গোপিনীর পরণে ও মাথায় পৃথক হলুদ বস্ত্রাংশ। তার পিছনেই বামহস্তে লাঠি ধরে বড়াই, সে দৃঢ়মুষ্টিতে রাধার বামহস্ত ধরে আছে। তার বাঁকা কোমর এবং অনাবৃত উর্দ্ধদেহাংশে শুষ্ক ও ঝুলন্ত স্তন দুটি তার বয়োবৃদ্ধিকে স্পষ্ট করেছে। তার গাত্রবর্ণ কিছুটা ঘনলাল। রাধার দেহবর্ণ হলুদ। তার মাথায় ঢাকা মেরুণ রঙের ওড়না। পরনে ঘন খয়েরী রঙের ঘাগরা। তার কানে গলায় হাতে অলঙ্কার। তার অনাবৃত বক্ষদেশে শিল্পী সদ্যোন্নত দুটি স্তনের কেবল বৃন্তদুটি চিত্রিত করে তার অল্পবয়সটিকেই তুলে ধরেছেন। রাধার পিছনে আর এক গোপিনী। তার দেহবর্ণ লাল, ঘাগরাটি হলুদরঙের, মাথায় ঢাকা হলুদ ওড়না। তার পিছনে আরো দুজন গোপিনীর একজন দাঁড়িয়ে, অন্যজন হাঁটুমুড়ে নৌকায় বসে। এদের সকলের পরণে ঘাগরা, ওড়না। চলন্ত নৌকায় দেহভার সামলাতে এরা প্রত্যেকেই প্রত্যেককে ধরে আছে। রাধার চোখে মুখে ভয়ার্ত ভঙ্গিটি অপরূপ। সকলেই কৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে। বড়াই যেন কৃষ্ণকে কিছু বলতে চায়। বড়াই ছাড়া প্রত্যেকের মাথায় অর্ধচন্দ্রাকৃতি ঝুড়িতে একটি বা দুটি হাঁড়ি বসানো।

অপর পাটাটির বাইরের দিকে দুটি নারীমূর্তির সামান্য অংশ মাত্র দেখা যায়। ভেতরের দিকে লাল পটভূমিতে অঙ্কিত গোপিনীদের বস্ত্রহরণের অপরূপ দৃশ্যটি। হলুদ কাণ্ড, শাখাপ্রশাখা আর সবুজ পাতার কদম্ববৃক্ষের ডালে বসে কৃষ্ণ বীরদর্পে বংশীবাদনরত। গাছের ডালে বাঁধা যমুনায় স্নানরতা গোপিনীদের কয়েকটি বস্ত্র। মোট সাতজন গোপিনী বৃক্ষতলে কাতর ভঙ্গিতে দণ্ডায়মানা। পাঁজনের মধ্যে দুজন একেবারে বিবস্ত্র। উভয়েই এক হাত তুলে কৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে কিছু বলছেন আকুল ভঙ্গিতে। অপর হাতে গোপন অঙ্গ আবৃত করতে গেলেও তা দৃশ্যমান হয়ে গেছে। অন্যজনের পরণে অতিসামান্য বস্ত্রখণ্ড। দুজন উলঙ্গ গোপিনী গাছের নীচে অধোবদনে লজ্জায় উপবিষ্টা। এদের সকলেরই এলো চুল, হাতে পায়ে অলঙ্কার।

পাটাদুটির অলঙ্করণে খুব সূক্ষ্ম কারুকার্য লক্ষ্য করা না গেলেও কৃষ্ণ ও গোপিনীদের নাক ও চোখের গঠন বিচিত্র। অঙ্কনশৈলীর সঙ্গে সাদৃশ্য দেখা যায় আশুতোষ মিউজিয়ামের 'গোষ্ঠলীলা' পাটার সঙ্গে। হুগলী অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত ঐ পাটার মতই আড়া গ্রামের পাটাগুলিতেও সেই রাজস্থানী প্রভাব। ঘাগরা, ওড়না, নাক ও চোখের গঠন, দেহভঙ্গিমা থেকে সেই সিদ্ধান্তই করা যায়।

দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলেরই নামো সগড়ভাঙ্গা গ্রামের সাধন গুঁইয়ের পারিবারিক পুঁথিটির (বিভিন্ন পুঁথির বিচ্ছিন্ন একরাশি পাতার সংগ্রহ) একজোড়া কাঠের পাটার অলঙ্করণে অনুরূপ শৈল্পিক দক্ষতার স্বাক্ষর থাকলেও অযত্ন অবহেলায় পাটা দুটি প্রায় নষ্ট হতে চলেছে। কিন্তু প্রথমোক্ত পাটাগুলির সঙ্গে এগুলির অঙ্কনশৈলীগত পার্থক্য তো আছেই। আলোচ্য পাটাদুটিতে অঙ্কিত চিত্রের বিষয়বস্তু নিতান্তই অভিনব। দু'দল বৈষ্ণব কোমর বেঁধে ঘুষি বাগিয়ে পরস্পরের উদ্দেশ্যে মারমুখী ভঙ্গিমায় দৃশ্যমান। একদল বৈষ্ণবের মাঝে কোন বিশিষ্ট বৈষ্ণব দণ্ডায়মান। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সঙ্গে সহজিয়া বৈষ্ণবদের এমন মারামারির দৃশ্য নিয়ে আর কোন পুঁথির পাটা চিত্রিত হয়েছে কীনা জানা নেই। লোকশিল্পের এই অনন্যসাধারণ নিদর্শন এখনও নানাস্থানে অজ্ঞাত অবস্থায় পড়ে আছে। এমন অনাবিষ্কৃত অনালোচিত পাটার সন্ধান আজও গ্রাম বাংলায় পাওয়া যায়। মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার বাসুদেবপুর গ্রামে পঞ্চানন রায় মহাশয়ের ব্যক্তিগত সংগ্রহে দশাবতারের বহুবর্ণ চিত্র অঙ্কিত দুটি পাটা দেখেছিলাম ১৯৭৩ সালে। পাটাদুটির সূক্ষ্ম অলঙ্করণ ও বর্ণসংস্থাপন উচ্চস্তরের চিত্রশিল্পরীতির নিদর্শন।

এই সব অমূল্য নিদর্শন নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ অ্যালবাম প্রকাশিত হওয়া দরকার ছিল।

পুঁথিচিত্র

পালযুগে বৌদ্ধ পুঁথিচিত্রণের মধ্যে দিয়েই বাংলা পুঁথি অলঙ্করণের সূত্রপাত ঘটেছে। এরমধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য মহাযান বৌদ্ধপুঁথি 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা'। এরপর আছে বজ্রযান বৌদ্ধ 'পঞ্চরক্ষা', 'কারণ্ডব্যূহ', 'কালচক্রযান' পুঁথির অনুলিপিগুলি। বাংলায় সর্বপ্রাচীন পুঁথিচিত্রের নিদর্শন হল এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত, পালরাজ ১ম মহীপালদেবের সময় ৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দে অনুলিখিত (G 4713) তালপাতার বৌদ্ধপুঁথি 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা।' এতে আছে বারোখানি রঙিন চিত্র-বৌদ্ধদেবদেবীদের। পালরাজারা ছিলেন বৌদ্ধধর্মের

পৃষ্ঠপোষক। স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের অনুলিপি ও প্রচারও তাঁরা বহুলাংশে করেছেন। 'পালযুগের চিত্রকলার নিদর্শন' হিসেবে যে সাতাশখানি চিত্রিত পুঁথির বিবরণ অধ্যাপক সরসী কুমার সরস্বতী দিয়েছেন,[১৪] তাদের মধ্যে কুড়িটি পুঁথি বিভিন্ন পাল রাজাদের সময়ের, একটি রাজা গোবিন্দচন্দ্রদেবের সময়ে, দুটি রাজা হরিবর্মদেবের সময়ে লেখা। শেষোক্ত রাজারা পালযুগে পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করতেন। একটি পুঁথিতে 'লক্ষ্মণ সেন গতসম্বত' লেখা। এগুলি সবই প্রাক মুসলীম যুগের পুঁথি। আর তিনটি পুঁথি ১২৮৯ খ্রীঃ, ১৪৪৬ খ্রীঃ ও ১৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দে অনুলিখিত ও চিত্রিত। পুঁথিগুলির সর্বমোট চিত্রসংখ্যা চারশোরও বেশী। পালযুগের আদিতম পুঁথিচিত্রগুলির সঙ্গে গুপ্তযুগের অজন্তা ও বাঘ গুহাচিত্রগুলির নিকট সম্বন্ধ দেখা যায় রেখা ও রঙের বিচিত্র উপস্থাপনায়। পূর্বোক্ত চব্বিশখানি চিত্রিত পুঁথি ১০ম শতকের শেষভাগ থেকে ১২শ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত সময়কালের। মুসলীম আক্রমণের পর পুঁথিচিত্রে দীনতা এসেছে পাটাচিত্রের মতই। সরসীকুমার সরস্বতী অনেকগুলি চিত্রিত নেপালী পুঁথির কথা বলেছেন- যেগুলির অঙ্কনশৈলী পালযুগীয় পুঁথিচিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত (১১শ-১৩শ শতাব্দী)।

বাংলাদেশের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামে রক্ষিত নেপারী অক্ষরে লেখা 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' পুঁথি দুখানির কথা উল্লেখযোগ্য। এগুলি তালপাতায় লেখা। প্রথম পুঁথিটি (ব. রি. ৬৮৯) ১৯১টি পত্রবিশিষ্ট।[১৭] এতে আছে বিভিন্ন বৌদ্ধদেবদেবীর (অখোভ্যদেব, পৃঃ ১ক; পীতপ্রজ্ঞা পারমিতা পৃঃ ২ খ; বৈরোচন দেব, পৃঃ ৯০ খ, অষ্টভুজা পীত মারীচী দেবী, পৃঃ ৯১ ক; অমিতাভ পৃঃ ১০৯ খ, এবং মঞ্জুবর, পৃঃ ১৯১ ক) বহুবর্ণময় চিত্র। পুঁথির পাতার মাঝামাঝি এগুলি আঁকা হয়েছে।

এ বিষয়ে ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন "The main divinity stands or is seated in the centre against the background either of an architectural design or of an elongated or semi round aureode, or inside a terraced temple respresentation ('Painting', History of Bengal, Vol I, Dacca, 1943, P. 551)"। অপর পুঁথিটিও তালপাতার (ব. রি. ৮৫১), কিয়দংশে খণ্ডিত।[১৮] এর যে ১২টি পাতা পাওয়া যায়নি, সেগুলিও সম্ভবত চিত্রময় ছিল। পুঁথিটির বিভিন্ন পাতায় মাঝামাঝি স্থানে আঁকা আছে ৭.২ সেমি x ৬.৩ সেমি আকারের মহাযানী বৌদ্ধ দেবদেবীর ৪৯টি চিত্র। এঁরা হলেন অমিতাভ (পৃঃ ১ঘ) পীতপ্রজ্ঞাপারমিতা (পৃঃ ২ঘ), লোচনা (পৃঃ ২৯ঘ), নবাত্মক হেরুক (পৃঃ ৪৪খ), ত্রিনয়নী দশভুজাদেবী (পৃঃ ৯১ক), হেবজ্র (পৃঃ ৯৮খ, ২০৯খ), নৈরাত্মা (পৃঃ ৯৯ক), সম্বর (পৃঃ ১৩৪খ, ২০১খ, ২৮৮খ, ৪১৮খ, ৪৪৫খ), বজ্রভারাহি (পৃঃ ১৩৫, ৪১৯ক, ৪৪৬ক), যমী (পৃঃ ১৭৩খ, ৩২৬ক, ৫২৮ক), যম (পৃঃ ১৭৪ক, ৪২৫খ), বুদ্ধকপাল (পৃঃ ১৮৮খ, ২৩৩খ, ৪০০খ), স্বনাস্যা (পৃঃ ১৮৯ক), সুকরাস্যা (পৃঃ ২০২ক), সিংহাস্যা (পৃঃ ২১০ক), চিত্রসেনা (পৃঃ ২৩৪ক, ৪১০ক), সুগতিসন্দর্শন লোকেশ্বর (পৃঃ ২৫৫খ), বজ্রপাণি (পৃঃ ২৫৬ক), মায়াজালক্রমক্রোধলোকেশ্বর (পৃঃ ২৮০খ), শক্তিদেবী (পৃঃ ২৮১ক), বজ্রগান্ধারী (পৃঃ ২৮৯ক), অষ্টভুজা কুরুকুল্লা (পৃঃ ২৯৭ক), বিশ্বমাতা (পৃঃ ৩১১ক), যমন্তক (পৃঃ ৩২৬খ), ত্রৈলোক্যবিজয় (পৃঃ ৩৪৫খ). শক্তি (পৃঃ ৩৪৬ক), আর্যাবজ্রভারাহি (পৃঃ ৩৫৭ক, ৩৮৯ক), হেরুক

(পৃঃ ৩৮৮খ, পদ্মনর্তেশ্বর লোকনাথ (পৃঃ ৪৩৫খ), মহাবলা (পৃঃ ৪৩৬ক), বজ্রবৈরেচনী (পৃঃ ৪৫৯ক), তক্রীরাজ (পৃঃ ৪৭৭খ), ভ্রূকুটি (পৃঃ ৫১৩ক), যমারি (পৃঃ ৫২৭খ) এবং যম্ভল (পৃঃ ৫৩০খ)।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অপর একটি চিত্রিত বৌদ্ধশাস্ত্র তালপাতায় লেখা 'কারণ্ডব্যূহ' (ব. রি. ৮৫২)।[১৭] এটিও নেওয়ারী (কুটিল) অক্ষরে লেখা। লিপিকাল ২১০ নেপালী সংবৎ (১০৯০ খ্রীষ্টাব্দ)। এতে অঙ্কিত আছে মহাযান বৌদ্ধধর্মের চারদেবতা ও তিন দেবীর বহুবর্ণময় ক্ষুদ্রাকার চিত্র। এগুলি হল রত্নপাণি বোধিসত্ত্ব (পৃঃ ১খ), ষড়ক্ষরী লোকেশ্বর ও ষড়ক্ষরী মহাবিদ্যা (পৃঃ ২ক), বজ্রতারা (পৃঃ ২৮খ), উর্দ্ধপাদবজ্রভারাহি (পৃঃ ২৯ক), আকাশগর্ভ লোকেশ্বর (পৃঃ ৬৬খ) ও জটামুকুট লোকেশ্বর (পৃঃ ৬৭ক)।

কলকাতার আশুতোষ মিউজিয়ামের 'পঞ্চরক্ষা' পুঁথিটি ১১০৫ খ্রীষ্টাব্দে নেপালে প্রস্তুত। এটিই সেই সময়কার একমাত্র কাগজে লেখা এবং চিত্রাঙ্কিত বৌদ্ধপুঁথি।[১৮] ১২শ শতাব্দীতে অনুলিখিত ও চিত্রিত, ভারতীয় যাদুঘরের 'পঞ্চরক্ষা' পুঁথির চিত্রশৈলীতে মধ্যযুগীয় বৈশিষ্ট্যের আভাস লক্ষ্য করা যায়।[১৯] কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহ, ১৫০৩ সংবতে (১৪৪৬ খ্রীঃ) অনুলিখিত ও চিত্রিত, অলঙ্কৃত একজোড়া পাটাসহ তালপাতায় মৈথিলী-বাংলা লিপিতে লেখা বৌদ্ধপুঁথি 'কালচক্রতন্ত্র' এবং বোম্বাইয়ের Haridas Swali সংগৃহীত, একই লিপিতে লেখা (১৪৫৫ খ্রীঃ) 'কারণ্ডব্যূহ' পুঁথি দুটি[২০] মুসলীম যুগের পূর্বভারতীয় পুঁথিচিত্রণের বলিষ্ঠ দৃষ্টান্ত। পুঁথিতে বর্ণিত বিষয়ের সঙ্গে অঙ্কিত চিত্রগুলির যে অসঙ্গতি সে বিষয়ে সরসীকুমার সরস্বতীর অভিমত, চিত্রগুলিকে ঠিক পুঁথিচিত্র না বলে পুঁথির অলঙ্করণ বলাই সঙ্গত। আবার অলঙ্করণের ক্ষেত্রেও সবসময় কোন নির্দিষ্ট বিধি অনুসৃত হয় নি। অর্থাৎ সমকালীন বৌদ্ধধর্মীয় মানসিকতারই প্রকাশ ঘটেছে এই সব চিত্রে। অঙ্কিত বিষয়বস্তু, যেমন, পূর্বকথিত বিভিন্ন দেবদেবী, বুদ্ধদেবের জীবনের নানা ঘটনাবলী ইত্যাদি কখনও কখনও একই পুঁথিতে একাধিকবারও আঁকা হয়েছে। পুঁথিগুলির পুষ্পিকা সূত্রে জানা গেছে নালন্দা, বিক্রমশীলা, বিক্রমপুর, আপণক ও অন্যান্য বৌদ্ধবিহারে এগুলি অনুলিখিত (ও চিত্রাঙ্কিত) হয়। 'পুষ্পিকা' থেকে আরও জানা যায়, পুণ্যলাভের জন্যে দাতারা বিভিন্ন বৌদ্ধবিহারে সমবেত হয়ে ধর্মীয় পুঁথির লিপি ও চিত্রাঙ্কণ করাতেন। বিহারগুলিতে একাজের যথাযথ ব্যবস্থা থাকতো। লিপিকর ও চিত্রকররা নিজেদের কাজে কতখানি দক্ষ ছিলেন, পুঁথিগুলিই তার প্রমাণ। প্রথমে লেখা, তারপর চিত্রাঙ্কন। দুঃখের বিষয়, লিপিকরদের নাম পাওয়া গেলেও চিত্রকরদের নাম অজ্ঞাত।

১০৬৮ খ্রীষ্টাব্দে অনুলিখিত ও চিত্রিত 'জৈন কল্পসূত্র' পুঁথিটিকে এদেশের পুঁথিচিত্রের আদি নিদর্শন বলা যায়। এটি গুজরাটে লেখা। আবার জড়ানো পটের মতো ৭৯টি চিত্র সম্বলিত গুজরাটী কাব্য 'বসন্ত বিলাস' পুঁথির কথাও জানা গেছে। উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদ মিউজিয়ামের কয়েকটি বিচিত্র পুঁথির কথা উল্লেখযোগ্য। যেমন নাগরীলিপিতে লেখা তুলটের জৈন পুঁথি (১৬শ শতক), বইয়ের আকারে বাঁধানো নরহরি দাসের 'অবতার চরিত' (সংবৎ ১৭৩৩ বিক্রমী -১৬৭৬ খ্রীঃ), কেশবচরণ বৈষ্ণব লিপিকৃত 'ব্রজবিলাস' (সংবৎ ১৭৭৮ - ১৭২১ খ্রীঃ), মীরহসনের 'মসনবী মেহেরুন্নেসা' (১৮শ শতক) পুঁথিগুলি বহুবর্ণময় চিত্রে শোভিত। আসাম

রাজ্য সংগ্রহশালার 'ভাগবত', 'গীতগোবিন্দ', 'লবকুশের যুদ্ধ' পুঁথির চিত্রগুলি পূর্বভারতীয় লোকচিত্রকলার অন্ত্যমধ্যপর্বের নিদর্শন। কলকাতার ভারতীয় যাদুঘরে ফারসী কাব্যের ১০৪ পৃষ্ঠার পুঁথিটিতে জাহাঙ্গীর ও শাজাহানের স্বহস্তলিপি আছে। ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দের এই পুঁথিটিতে আছে সোনালী, নীল ও লালরঙের চিত্রাবলী। মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারী, কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, বিহারের পাটনা মিউজিয়ামে এধরনের অনেকগুলি চিত্রিত পুঁথি আছে। সম্প্রতি সন্ধান পাওয়া গেছে আকবরের সভাসদ আবুল ফজলের লেখা ফারসী ভাষার রামায়ণ পুঁথির। দক্ষিণদিল্লী নিবাসী এক অবসরপ্রাপ্ত সেনা অফিসার চিরঞ্জীৎলাল সেহ্‌গল তাঁর পূর্বপুরুষের রক্ষিত এই বিরল পুঁথিটির সন্ধান দিয়েছেন। নানা প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী রঙে এতে আঁকা আছে লক্ষ্মণ ও লবকুশের যুদ্ধ, সীতার স্বয়ম্বরসভা, বালী ও সুগ্রীবের যুদ্ধ, রাবণের সীতাহরণ ইত্যাদি চিত্র। পুঁথিটি সোনালী কালিতে লেখা।[২১] মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল রাজপ্রাসাদে রক্ষিত, বহুচিত্রে শোভিত 'শাহনামা' পুঁথির কথা শোনা গেছে। মুঘল সম্রাটদের আগ্রহে এবং অন্যদিকে গুজরাটের জৈনসম্প্রদায়ের উদ্যোগে যে ব্যাপক পুঁথি অলঙ্করণের কাজ হয়েছে, তারই দৃষ্টান্ত এগুলি।

সম্প্রতি বরোদা চিত্রশালায় রক্ষিত 'সৌন্দর্যলহরী' ও 'শিবমহিমস্তোত্র' নামক দুখানি অলঙ্কৃত সংস্কৃত পুঁথির কথা জানা গেছে। শৈবধর্মবিষয়ক পুঁথিতে অলঙ্করণ বিরল ঘটনা। গুজরাটী ও রাজস্থানী শৈলীর মিশ্ররীতিতে পুঁথি দুটির চিত্রগুলি অঙ্কিত[২২]। ওড়িশা রাজ্য সংগ্রহশালায় (ভুবনেশ্বর) রক্ষিত বহু চিত্রিত পুঁথির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'গীতগোবিন্দ' ন'খানি, 'উষাবিলাস' ছ'খানি, 'চিত্রকাব্যবন্ধোদয়' ও 'চৌষট্টিরতিবন্ধ' নানা বর্ণের চিত্রে শোভিত। এছাড়া 'বিদগ্ধমাধব', 'গোপীচন্দন', 'অধ্যাত্মরামায়ণ' পুঁথিগুলিতে আছে সাদাকালো চিত্র।[২৩] সম্প্রতি ওড়িশা ললিতকলা আকাদেমী রঙিন চিত্রসম্বলিত 'অমরুশতকম্' কাব্যখানি প্রকাশ করেছেন।

মুসলীম শাসনের পর এদেশের পুঁথি চিত্রণের কাজের গতি কিছুটা হ্রাসপ্রাপ্ত হলেও যেটুকু হয়েছে সেখানে বহির্ভারতীয় চিত্রকলার প্রভাব কিছু কিছু পড়েছে। অন্যতম দৃষ্টান্ত, গৌড়ের সুলতান নসরৎ শাহের জন্য ১৫৩১-৩২ খ্রীষ্টাব্দে হামিদ খান কর্তৃক অনুলিখিত, লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামের পুঁথি 'শরফনামা।'

বিভিন্ন সময়ে অলঙ্কৃত তিনখানি গুরুত্বপূর্ণ পুঁথির প্রতি রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ড. অশোককুমার দাস।[২৪] প্রথম পুঁথিটি সরসীকুমার সরস্বতী-সংগৃহীত ভাগবত ১০ম স্কন্ধের পুঁথি। এটি অসংখ্য চিত্রশোভিত, ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে লিপিকৃত ও চিত্রাঙ্কিত। দ্বিতীয় পুঁথিটি নাগরী অক্ষরে হিন্দীভাষায় লেখা তুলসীদাস রচিত 'রামচরিতমানস'। অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষ ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে এটি উদ্ধার করেন। দ্বিজ ইচ্ছারাম মিশ্র কর্তৃক ৩৪২ পৃষ্ঠার এই পুঁথিটি ১৭৭২-৭৫ খ্রীষ্টাব্দে লিপিকৃত। এতে আছে ১৫২টি বহুবর্ণময় চিত্র। মহিষাদলের রাণী জানকী দেবীর নাম এতে উল্লেখ করা হয়েছে। বোধ হয় এটি তাঁর পাঠের জন্যেই অনুলিখিত। পুঁথিটি মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জ থেকে আবিষ্কৃত (আশুতোষ মিউজিয়ামে রক্ষিত)।[২৫] ওড়িশা, মুঘল ও রাজস্থানী রীতির মিশ্রণে অঙ্কিত এর চিত্রগুলি স্থানীয় মেদিনীপুরের লোকশিল্পী (মহিষাদল অঞ্চল) বা মুর্শিদাবাদের মুঘলশিল্প ঘরানার শিল্পীদেরই শিল্পকর্ম। তৃতীয় পুঁথিটি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'

কাব্যের। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে স্টেলা ক্রামরিশ চুঁচুড়ার জমিদার রমাপ্রসাদ মণ্ডল সংগৃহীত এই দুর্লভ পুঁথিটির বিষয়ে প্রথম আলোচনা করেন।[১৬] বাংলা অক্ষরে লেখা এই পুঁথির চিত্রকর 'কৃষ্ণচন্দ্রশর্ম্মণঃ'। এতে আছে ৩৭টি চিত্রিত পৃষ্ঠা। চিত্রের বিষয়বস্তু কৃষ্ণলীলা ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী।

মুর্শিদাবাদের নবাব আলীবর্দী খাঁ (১৭৪০ ১৭৫৬) থেকে শুরু করে সিরাজউদ্দৌলা এবং মীরকাশিম পর্যন্ত (১৭৬০-৬৩) সময়কালে ও উদ্যোগে মুর্শিদাবাদে যে চিত্র ঘরানার (School of painting) বিকাশ ঘটে তা সমকালীন হিন্দু জমিদার ও সামন্তদেরও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। অযোধ্যার রাজপুত্র কামরূপ ও সিংহল-রাজকন্যা কামলতার প্রেমকাহিনীমূলক চিত্রিত পুঁথি, ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে লিপিকৃত 'দস্তুর-ই-হিন্দ' ও ১৭৬১-৬৩তে লিপিকৃত ও অঙ্কিত, 'রজমনামা'তে মুর্শিদাবাদ ঘরানার প্রভাব বর্তমান।[১৭] এই ধরণের অনুরূপ অলঙ্কৃত পুঁথি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের 'নলদমন' (৩১টি চিত্র) ও লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে রক্ষিত, ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের 'নলদয়মন্তী'।

এশিয়াটিক সোসাইটি সংগ্রহ বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' আদিলীলার (G 10,715) অলঙ্কৃত তুলট কাগজের পুঁথিটির (৪১ সেমি x ১৪ সেমি) প্রতিটি পৃষ্ঠাই নানাবর্ণের সীমারেখায় অলঙ্কৃত। প্রথম পাতায় কুলকারি নক্‌শাঙ্কিত আয়তক্ষেত্রের মধ্যে লাল ও নীল রঙে পাশাপাশি দুটি প্রস্ফুটিত পদ্ম অঙ্কিত। আয়তক্ষেত্রের চারকোণে অঙ্কিত চারটি পদ্মের মধ্যে তিনটি দৃশ্যমান। অপর একটি পাতায় পাঁচ ছত্র লিপি-

'শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবোজয়তি।। শঙ্খোম্বরং শক্রধনু
গোষ্পদাখ্যং ত্রিকোণকং। অর্দ্ধচন্দ্রস্ত্রয়ংকুম্ভাঃ পঞ্চজম্বু
ফলানিচ। মীনোরাসেচপদয়োস্ত্রয়স্ত্রিংশৎ সুলক্ষণঃ।
উর্দ্ধরেখাযশ্চক্রং পদ্মংধ্বজোঙ্কুশং বজ্র তথাষ্টকোনঞ্চ
স্বস্তিকানাং চতুষ্টয়ং। পঞ্চজম্ব ফলান্যত্র দক্ষিণে চরণে হরিঃ।।'

এরই মাঝামাঝি স্থানে চৈতন্যদেবের যুগ্ম পদচিহ্ন অঙ্কিত। তাতে মঙ্গলঘট, মৎস্য, যুগ্মবজ্র, বৃত্ত, চন্দ্রকলা, ধ্বজা, অঙ্কুশ, ইত্যাদি পবিত্র চিত্র অঙ্কিত। ১২৫৬ বঙ্গাব্দে (১৮৫০ খ্রীঃ) 'ব্রজমোহন দেবশর্ম্মণঃ' বাংলা অক্ষরের এই পুঁথিটি অনুলিপি করেন।

বিশ্বভারতী সংগ্রহের বীরভূম জেলার কোঙরডিহি অঞ্চলের ভগবতীচরণ মিস্ত্রির লেখা চারখানি চিত্রিত পুঁথির কথা উল্লেখযোগ্য। এর চিত্রগুলি কালো কালিতে অঙ্কিত। মহাভারতের আদিপর্বের প্রথম পাতায় গণেশ, শান্তিপর্বের প্রথম পাতায় মহিষাসুরমর্দিনী; কৃষ্ণদাসের 'নারদসংবাদ' পুঁথির শেষ পাতায় তুলি বা লেখনী হাতে চৌকিতে উপবিষ্ট পুরুষ এবং 'দুর্গাপঞ্চরাত্র' পুঁথির প্রথম পাতায় কৃষ্ণের ছবি অঙ্কিত। এখানে একটি চিত্রিত 'অন্নদামঙ্গল' পুঁথিও আছে। নানাবর্ণের চিত্রে শোভিত বিশ্বভারতী সংগ্রহের পুঁথির মধ্যে আছে রামায়ণ, মহাভারত ও বৈষ্ণব সাহিত্যের কয়েকটি পুঁথি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তুলটের পুঁথি 'রথযাত্রা' ও 'মথুরাবিরহের' প্রথম পাতায় জগন্নাথের বহুবর্ণ চিত্র উল্লেখযোগ্য। এইসব চিত্রই ১৮-১৯ শতকের বা তারও পরবর্তীকালের। বিশ্বভারতী সেন্ট্রাল লাইব্রেরীতে যে

প্রায় দুশো আরবী ও পারসী পুঁথি আছে তার কয়েকটি মুর্শিদাবাদের নবাব প্রাসাদ থেকে প্রাপ্ত। কয়েকটি পুঁথি কবিগুরু নিজে পারস্য থেকে সংগ্রহ করে আনেন। সবকটি পুঁথিই চামড়া বাঁধাই, চিত্রিত, রঙিন কালিতে সুদৃশ্য হস্তাক্ষরে লেখা। বাংলা পুঁথি না হলেও, এদের কয়েকটির নাম উল্লেখ করি। যেমন 'দেওয়ান-ই-হাফিজ', 'কুলিয়াৎ-ই-সাদি', 'মসনবী-ই-রুমি', 'খাম্‌সা-ই-নিজামি' ইত্যাদি।

সম্প্রতি বাংলাদেশের টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর থানার ভাড়রা গ্রামে ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে লেখা (ঢা. বি. ২৭৯৯) 'পদ্মপুরাণ' পুঁথির কথা জানা গেছে।[১৮] এতে নারায়ণদেব ও অন্যান্য মনসামঙ্গল কবিদের ভণিতা আছে। পুঁথিটির বিভিন্ন পাতায় লেখার মাঝে মাঝে বর্ণাঢ্য চিত্র অঙ্কিত। চিত্রগুলির সাজসজ্জা, অলঙ্কার, নাক ও চোখের গঠন, ওড়না, ঘাগরা সবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্যের তান্ত্রিক পুঁথিটি ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তুলট কাগজে লেখা ও চিত্রাঙ্কিত। ২৬২ পৃষ্ঠার এই পুঁথিটির এগারটি পৃষ্ঠা জুড়ে আঁকা আছে কুলকচক্র, রাশিচক্র, নক্ষত্রচক্র ইত্যাদি তান্ত্রিক প্রতীকধর্মী চিত্রাবলী।[১৯]

এইসব চিত্রাঙ্কণের রীতিপ্রকরণ বিষয়ে অধ্যাপক সরস্বতী তিনখানি শিল্পগ্রন্থের কথা বলেছেন।[২০] এর মধ্যে একটি হল ১১শ শতকে বিদ্যোৎসাহী পরমারবাজ ভোজদেব রচিত 'সমরাঙ্গনসূত্রধার'। এই গ্রন্থে চিত্রকর্মের আটটি অঙ্গের কথা বলা হয়েছে ঃ বর্তিকা, ভূমিবন্ধন, লেখ্যকর্ম, রেখাকর্ম, বর্ণকর্ম, বর্তনাক্রম, লেখন বা লেখকরণ ও দ্বিককর্ম। গুপ্তযুগে লেখা শিল্পকর্মবিষয়ক রচনা 'বিষ্ণুধর্মোত্তর' গ্রন্থেও অনুরূপভাবে চিত্রের আটটি গুণের কথা বলা হয়েছে। অপর দুটি শিল্পগ্রন্থের একটি ১২শ শতকের প্রথমভাগে চালুক্যরাজ সোমেশ্বর ভূলোকমল্ল সংকলিত 'অভিলষিত চিন্তামণি' বা 'মানসোল্লাস'। অন্যটি ১৬শ শতকে কেবলবাসী শ্রীকুমার রচিত 'শিল্পরত্ন' গ্রন্থ। শেষোক্ত গ্রন্থদুটি প্রথমোক্ত গ্রন্থের পরিপূরক। পালযুগের চিত্রকলায় অনুরূপ রীতি অনুসৃত হয়েছে। পুঁথিচিত্রে সাদা, হলুদ, গাঢ়নীল, লাল, সবুজ ইত্যাদি যে সব রং ব্যবহৃত হয়েছে তা সবই হরিতাল, খড়িমাটি, গাছের পাতা, লালমাটি, কয়েতবেল, কাঠকয়লার গুঁড়ো, শামুকের খোলার ছাই, লাক্ষা, লালসীসা ইত্যাদি প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী এবং সবই জলরঙে আঁকা। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রং পরিমাণমত মিশিয়ে নতুন রং তৈরী করা হয়েছে।

আসামের 'অগুরু' গাছের ছাল বা সাঁচীপাতা গন্ধক, বাঁশপাতা, নাগেশ্বর গাছের পাতা, তালপাতা, ভুটানের 'হেমশিলা' বাঁশের ভেতরের মাটি পুড়িয়ে তৈরী পদার্থ দিয়েও রং তৈরীর কথা জানা গেছে।[২১]

প্রতিবেশী রাজ্য আসামের পুঁথি, ভাস্কর্য ও চিত্রশৈলী বিষয়ে নানা বৃত্তান্ত জানা গেছে। (দ্রঃ 'অসমর পুথিচিত্র', ড. নরেন কলিতা, গুয়াহাটি ১৯৯৬)। কনৌজরাজ হর্ষবর্ধনকে কামরূপরাজ ভাস্করবর্মা একদা যে সব উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন, তার মধ্যে সাঁচিপাতের পুঁথি, ছবি আঁকার লেখনী, মসীপাত্র, অঙ্কিত পটচিত্র ছিল (খ্রীঃ ৭ম শতক)। পরবর্তীকালে আহোমরাজ ও স্থানীয় সামন্তসম্প্রদায়ের আনুকূল্যে সেখানকার লোকচিত্রকলা নানাভাবে বিকশিত হয়। ১০৭১ খ্রীঃ রাজা ইন্দ্রপালের গুয়াকুচি তাম্রফলকে খোদিত পদ্ম, শঙ্খ, চক্রচিহ্ন ; কামরূপরাজ মাধবদেবের নীলাচল তাম্রশাসনে খোদিত কুলদেবতা গণেশের রেখাচিত্র আসামের চিত্রচর্চার

প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য দেয় ।

চিত্রাঙ্কনের পটভূমিরূপে বিবিধ আঠালো পদার্থ মিশ্রিত হলুদ বা মাটির প্রলেপ দেওয়া বস্ত্রখণ্ড, অগর গাছের ছাল বা সাঁচিপাতা,প্রাসাদের দেওয়াল ইত্যাদি ছাড়াও হাতির দাঁতের খণ্ড (মাধবকন্দলির 'রামায়ণ', অযোধ্যা, ১৫ শ অধ্যায়) ব্যবহৃত হয়েছে । পুঁথি লেখার জন্যে সাঁচিপাতা বিশেষ পদ্ধতিতে প্রস্তুত করা হোত । অঙ্কনের জন্য জায়গা ছেড়ে রাখা হোত । অনেক সময় অঙ্কন করার পরে পুঁথি লেখা হয়ে থাকতে পারে । রং তৈরী করা হোত হিঙ্গুল, হরিতাল, নীল, খড়িমাটি, লাউয়ের খোলা বা কলাইখোসার ছাই, শঙ্খচূর্ণ, হলুদ, খনিজ মাটি ইত্যাদি দিয়ে । স্থানবিশেষে সোনা-রুপোর জলও ব্যবহৃত হয়েছে। তুলি তৈরী হোত পাট, ছাগলের দাড়ির চুল, পাখির পালক দিয়ে । মাটির প্রলেপ দিয়ে তার ওপর প্রথমে ঘন রং দিয়ে সীমারেখা এঁকে পরে তা বিভিন্ন রং দিয়ে ভরে দেওয়া হোত । আলতাতেও আঁকার কাজ হয়েছে, তবে তা দীর্ঘস্থায়ী হয় নি । অবশ্য বাংলার শেষ দিককার পুঁথিচিত্র ও পাটাচিত্র অঙ্কনের সময় উপাদান ব্যবহারে কিছু হের-ফের যে ঘটে নি, তা বলা যায় না ।

প্রধানতঃ লোকশিল্পীরা আঁকার কাজ করলেও 'পারিজাত হরণ' নাটকের শশধর আতা, 'কল্কিপুরাণের' ঘনশ্যাম খরখরিয়া ফুকন, 'কর্ণপর্বের' দুর্গাদাস দ্বিজ প্রমুখ পুঁথিলেখকেরা নিজেরাই চিত্রাঙ্কনের কাজ করেছেন ।

আসামের পুঁথিচিত্রের আদি নিদর্শন রূপে নওগাঁও থেকে প্রাপ্ত ১৭শ শতাব্দীর 'চিত্রভাগবত' পুঁথিটিকে নির্দেশ করা হয় । আহোমরাজ রুদ্রসিংহের (১৬৯৫-১৭১ খ্রীঃ) পূর্বেই (১৬৯১-৮৩ খ্রীঃ) এই অসাধারণ চিত্রিত পুঁথিটির কাজ শেষ হয় । এর শিল্পকর্মে প্রাক-আকবরী, রাজপুত, পাহাড়ী ও জৈন শৈলীর প্রভাব লক্ষ্যণীয় । এছাড়াও 'ভক্তিরত্নাবলী' (১৬৮৩ খ্রীঃ), 'গীতগোবিন্দ' (১৬৯৫-১৭১৩ খ্রীঃ), 'অজামিল উপাখ্যান' (১৭১৫ খ্রীঃ), 'আনন্দলহরী' (১৭২০ খ্রীঃ) আসামের চিত্রিত পুঁথির নিদর্শন ।

১৮শ শতাব্দীর প্রথম দিকে আহোম রাজসভাকে কেন্দ্র করে রাজা শিবসিংহ (১৭১৩-১৭৪৪ খ্রীঃ) ও তাঁর রাণীর অনুপ্রেরণায় পুঁথি চিত্রণে ব্যাপকতা লক্ষ্যণীয় । শঙ্করদেবের ধর্মআন্দোলনও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল । উল্লেখযোগ্য পুঁথি হস্তীবিষয়ক 'গজেন্দ্রচিন্তামণি' (১৭১৩ খ্রীঃ), 'হস্তীবিদ্যার্ণব' (১৭৩৪ খ্রীঃ), কবিরাজ চক্রবর্তীর 'শঙ্খচূড়বধ' (১৭২৬ খ্রীঃ), রামানন্দ দ্বিজের 'বৃহৎ উষাহরণ' (১৭৩৫ খ্রীঃ), ৬ষ্ঠ স্কন্ধ ভাগবত (১৭৩৭ খ্রীঃ), কবিচন্দ্রের 'ধর্মপুরাণ' (১৭৩৫ খ্রীঃ), ভোলানাথ দ্বিজ ও আত্মারাম দ্বিজ বিরচিত 'মহাভারত-শৈলপর্ব', শিবসিংহের সময়েই চিত্রিত । আহোম সাম্রাজ্যের চরম সমৃদ্ধির কাল স্বর্গদেব রাজেশ্বর সিংহের সময়টি (১৭৫১-১৭৬৯ খ্রীঃ) । একটি রঙ্গোলী কীর্তনের পুঁথি (১৭৫৯ খ্রীঃ) 'কথা ভাগবত', 'কুমরহরণ', 'উদ্যোগপর্ব' পুঁথিগুলি ঐ সময়কালে চিত্রিত । বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত 'সচিত্রকীর্তন' (১৭৩১ খ্রীঃ) আর একটি উল্লেখযোগ্য চিত্রিত অসমীয়া পুঁথি । এইসব পুঁথির চিত্রশিল্পীদের নামও জানা গেছে । পূর্ণকাম আতার 'সুন্দরাকাণ্ড' (১৭৬৭ খ্রীঃ) আসামের পুঁথিচিত্র জগতে এক অনবদ্য সংযোজন ।

দরং রাজ সমুদ্রনারায়ণের আদেশে সূর্যঘড়ি দৈবজ্ঞ রচিত 'দরং রাজবংশাবলী' পুঁথির

চিত্রাঙ্কন হয়েছিল ১৮০০ খ্রীঃ বা কাছাকাছি সময়ে।

১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে দরংরাজ কৃষ্ণনারায়ণের সভার 'সচিত্রভাগবত ৮ম স্কন্ধ' চিত্রিত হয়। ১৯ শতকের চিত্রিত পুঁথিগুলির মধ্যে 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ', শঙ্করদেব রচিত 'পারিজাতহরণ' (১৮৩৬ খ্রীঃ), 'কর্ণপর্ব' (১৮৪১ খ্রীঃ), 'অধ্যাত্মরামায়ণ' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আসামের চিত্রিত পুঁথির মধ্যে পত্রসীমানা চিত্রিত পুঁথিগুলিকে 'লতাকাটা পুঁথি' বলা হয়েছে।

পুঁথির ব্যবহার হ্রাসপ্রাপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই পাটা ও পুঁথি অলঙ্করণের কাজও বন্ধ হয়ে যায়। বাংলার কোন কোন পটুয়া পল্লীতে পট অঙ্কনের কাজ কিছু কিছু হলেও পুঁথি চিত্রণের কাজ একবারেই বন্ধ হয়ে গেছে স্বাভাবিকভাবেই। এখন, এইসব ঐতিহ্যপূর্ণ শিল্পনিদর্শনগুলি সংগ্রহশালায় বা ব্যক্তিবিশেষের সংগ্রহেই স্থান পেয়েছে। ওড়িশায় তালপাতার ওপর ছবি আঁকার লোকায়ত রীতি আজও প্রচলিত থাকলেও পশ্চিমবঙ্গে এর আর কোন অনুশীলন নেই।

গ্রন্থপঞ্জী ও সূত্রনির্দেশ

১. A Bulletin of the Directorate of Archaeology, W. B. No -2, Calcutta, 1964, P 28-29.

২. এঁরা গোশাল মঙ্খলীপুত্রের শিষ্য। গোশাল ছিলেন ভগবান মহাবীরের সমসাময়িক ও বন্ধু। উভয়ে 'পণিতভূমিতে' (বর্ধমান জেলার পশ্চিমাঞ্চল) কয়েকবৎসর একত্রে অতিবাহিত করেন। দ্রঃ 'Lord Mahavira And his Times', K. C. Jain, Delhi, 1991, P 48.

৩ পুণ্ড্রবর্ধননগরী যে অশোকের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল এবং সেখানে যে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী অনেক মানুষ ছিলেন, খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতকের মহাস্থান লিপি তার অন্যতম প্রমাণ বলে বলা হয়েছে।

৪ 'Lord Mahavira And his times, K C Jain, Delhi, 1991, P. 46'

৫ 'পালযুগের চিত্রকলা', সরসীকুমার সরস্বতী, কলকাতা, ১৯৭৮।

৬ বিশ্বকোষ ১৫, সাক্ষরতা সং ১৯৮৩, পৃঃ ১৮২।

৭. 'পালযুগের চিত্রকলা'।

৮ 'বাংলার চিত্রকলাঃ পুঁথিচিত্র, পাটাচিত্র, চালচিত্র, সরা, দশাবতার তাস', ড অশোককুমার দাস, পশ্চিমবঙ্গ, ৪.৮.৭২।

৯ 'Indigenous Tradition of Painting in Bengal (13th to 18th Cen)' Jayanta Chakravarty Indian Museum Bulletin, 1988-89, P. 15

১০ 'Manuscript, Pata, and Scroll Painting in the 19th and 20th Century, Ibid, Sipra Chakravarty, P 40-48.

১১ 'আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন পরিচিতি', বিষ্ণুপুর, পৃঃ ১৮।

১২ Land of Wrestless, Indian Art and Letters, Vo I, 1927

১৩ Indian Museum Bulletin, 1988-89, P 40-48.

১৪. 'পালযুগের চিত্রকলা', সরসীকুমার সরস্বতী, কলকাতা, ১৯৭৮।

১৫ 'A Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Varendra Research Museum Library', Vol I, Sachindra Nath Siddhanta, Rajsahi, 1979, P. 383-384

১৬ Ibid, P 385-400

১৭. Ibid P. 402-406

১৮ 'বাংলার চিত্রকলা', অশোক ভট্টাচার্য কলকাতা, ১৯৯৪, পৃঃ ১৬।

১৯. Indian Museum Bulletin, 1988-89, P 15

২০ Ibid, P 15

২১ সাপ্তাহিক বর্তমান, কলকাতা, ২৬.১ ৯১, পৃঃ ১৬ ।

২২ 'দু'খানি অভিনব পুঁথিচিত্র', সুধা বসু, 'অমৃত', ১৩বর্ষ, ১১ সংখ্যা, ১৩৮০ ।

২৩ 'Illustrated palmleaf manuscripts of Orissa', Orissa State Museum, Bhubaneshwar, 1984

২৪ 'বাংলার চিত্রশিল্প ঃ পুঁথিচিত্র, পটচিত্র চালচিত্র, সরা, দশাবতার তাস', ড অশোককুমার দাস, পশ্চিমবঙ্গ, ৪ আগষ্ট, ১৯৭১, পৃঃ ৬৭৫ ৬৮৩ ।

২৫ 'Catalogue of Painting of the Asutosh Museum Ms of the Ramcharitamanasa', Calcutta, 1981

২৬. 'An Illustrated Gitagovinda Ms ' Stella Kramrish, Journal of the Indian Society of Oriental Art, Vol II, No -2 1934 'বৃহৎবঙ্গ' দীনেশচন্দ্র সেন ,'Eastern Indian Manuscript painting', Rajatananda Dasgupta

২৭ Indian Museum Bulletin, 1988-89, P 42

২৮ 'বাংলা পাণ্ডুলিপি পাঠসমীক্ষা', মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া, ঢাকা, ১৯৮৪, চিত্র ।

২৯. 'Manuscript, Pata And Scroll Painting in the 19th and 20th Century', Sipra Chakravarty, Ind Mns , bull , 1988-89, P 42

৩০ 'পালযুগের চিত্রকলা', সরসীকুমার সরস্বতী, ১৯৭৮ ।

৩১. 'Eastern Indian Manuscript Painting' Rajatananda Dasgupta, Bombay 1972

ছয়

পুঁথির মালিক ও পাঠক

প্রায় ২৫০০খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সুমেরীয়রা পোড়ামাটির টালিতে লেখা বইতে সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার গড়ে তুলেছিল। ভারতের প্রাচীন সভ্যতা হরপ্পা-মহেঞ্জোদরোতে লেখালেখির চর্চা যে ছিল, রহস্যময় শীলমোহরগুলি তার প্রমাণ । তবে পোড়ামাটির টালিতে লেখা দীর্ঘলিপি এই সভ্যতা থেকে আবিষ্কৃত হয় নি বলে বিদ্যাচর্চা (পড়া, লেখা ও অনুশীলন) যে সেখানে ছিল না, তা বলা যায় না।

পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রস্থল মিশর জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চায় যথেষ্ট উন্নত ছিল । গণিতশাস্ত্র, বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিদ্যায় প্রাচীন মিশরীয়দের অবদান কম নয় । সুতরাং এই সব জ্ঞান লিপিবদ্ধ করতে তাদের নিজস্ব চিত্রলিপিতে লেখা প্যাপিরাস অনেক সংগৃহীত ছিল তাদের গ্রন্থাগারে । তার কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে । ব্যাবিলন শহরে ১৬০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে গ্রন্থ-সংগ্রহালয় গড়ে ওঠে । খ্রীঃ পূঃ ১৩শ শতাব্দীতে মিশরের রাজা দ্বিতীয় রামেসিস থিব্‌স ও মেম্‌ফিস্ শহরে প্যাপিরাসে লেখা বইয়ে সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার গড়ে তোলেন । গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডার মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া শহরে ৩৩১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে একটি বৃহৎ গ্রন্থাগার গড়ে তোলেন । তবে মধ্য প্রাচ্যের অন্তর্গত (মেসোপটেমিয়া) আসিরিয়ায প্রাপ্ত নিদর্শন থেকে এ বিষয়ের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত মেলে । খ্রীঃ পূর্ব ৭ম শতকে শত্রুর আক্রমণে অসিরিয় সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায় । জ্ঞান বিজ্ঞানের কেন্দ্রগুলি অগ্নিকান্ডের ফলে বিধ্বস্ত হয়ে যায় । কিন্তু পরবর্তীকালে আসিরিয়ার রাজধানী নিনেভে উৎখননের পর সেখানে পাওয়া যায় একটি গ্রন্থাগার । প্রায় কুড়ি হাজার গ্রন্থ সেখানে সংবক্ষিত ছিল । আর মাটির ফলকে এই গ্রন্থগুলি লেখা ছিল বলে অগ্নিসংযোগে তাদের ক্ষতি না হয়ে উপকারই হয়েছিল । মানব সভ্যতার ইতিহাসে নিনেভের এই গ্রন্থাগারটি ছিল এক প্রাচীন গ্রন্থসংগ্রহ বিশেষ ।

ইউরোপে খ্রীষ্টধর্মের প্রচার এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ঘটার সঙ্গে সঙ্গে গড়ে ওঠে শত শত গ্রন্থাগাব । মধ্যপ্রাচ্যেও গড়ে ওঠে গ্রন্থাগার । তবে এইসব গ্রন্থাগার বেশীর ভাগই ছিল ধর্মীয় মঠের অধিকারে । খ্রীষ্টধর্মের কয়েকশত (আনু. ৫ম বা ৪র্থ খ্রীঃ পূঃ) বৎসর পূর্বে এদেশেও গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে । তক্ষশীলা, বারাণসী, পাটলীপুত্র রাজগৃহ ইত্যাদি স্থানগুলি ছিল প্রাচীন ভারতের জ্ঞানবিজ্ঞানের কেন্দ্র । সেখানেও গড়ে ওঠে পুঁথি সংগ্রহ । তবে বৌদ্ধযুগেই পুঁথি অনুলেখনের কাজ হয়েছে সবচেয়ে বেশী । সেই সময় তাম্রলিপ্ত, পাটলিপুত্র, নালন্দা, বিক্রমশীলায় গড়ে ওঠে বৃহৎ গ্রন্থসংগ্রহ । হিউয়েন সাঙের বিবরণ থেকে জানা যায় নালন্দায় 'রত্নদধি' নামক

বিশাল গ্রন্থাগারে রক্ষিত ছিল সহস্র সহস্র শাস্ত্র ও দর্শনগ্রন্থ। ওদন্তপুরীর পুঁথিসংগ্রহ ১৩শ শতকে তুর্কী আক্রমণে ধ্বংস হয়ে যায়। বিভিন্ন বৈদেশিক আক্রমণে ভারতের এমন বহু পুঁথিসংগ্রহ ভস্মে পরিণত হয়েছে। অনুরূপভাবে জৈন বিহার বা উপাশ্রয়গুলিও হয়ে ওঠে এক একটি বিশাল পুঁথিশালা। এদেশের ইসলামী শাসকরাও গড়ে তোলেন সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার।

প্রাচীন ভারতে গ্রন্থাগারকে বলা হোত 'ভারতী ভাণ্ডাগার' বা 'সরস্বতী ভাণ্ডাগার'। এ ধরণের গ্রন্থাগার ছিল জৈন-বৌদ্ধ মঠ বা বিহার, উপাশ্রয় বা সঙ্ঘারামের সঙ্গে যুক্ত। রাজপরিবারের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের সংখ্যাও কম নয়। মঠ মন্দির বা বিদ্যানিকেতনে গ্রন্থ বা পুঁথি দান করা ছিল সেকালে ধনী বণিকদের কাছে এক পবিত্র কাজ। একাদশ শতকের 'ধরা' রাজ্যের ভোজের গ্রন্থাগারের খ্যাতি ছিল সেকালে। পরবর্তীকালেও দেখা গেছে বিভিন্ন ধর্মীয় মঠ বা সংস্থায় সংগৃহীত হয়েছে বহু পুঁথি।

চালুক্যরাজ বিশালদেব বা বিশ্বমল্লের (১২৪২-১২৬২ খ্রীঃ) 'ভারতী ভাণ্ডাগার' দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন পুঁথির সংগ্রেহ পূর্ণ ছিল। 'নৈষধীয়', 'কামসূত্র', 'রামায়ণ', ইত্যাদির পাণ্ডুলিপি এখানে সযত্নে রক্ষিত ছিল। পরবর্তীকালে বিভিন্ন দেশীয় রাজন্যবর্গও সুবিশাল গ্রন্থাগার স্থাপন করে নিজ নিজ গ্রন্থ রসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। আলোয়ার, বিকানীর, মহীশূর, তাঞ্জোর প্রভৃতি রাজগ্রন্থাগারে সংগৃহীত প্রাচীন পুঁথির তালিকাও প্রকাশ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তাঞ্জোরের কথা বলতে হয়। মাদ্রাজের তিরুচিরাপল্লী থেকে ৫৫ কিমি. দূরে অবস্থিত তাঞ্জোর মারাঠা আমলে প্রতিষ্ঠিত 'সরস্বতীমহল' বা 'সরস্বতী ভাণ্ডারম্' নামক পুঁথিশালা দক্ষিণভারতের এক প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। তাঞ্জোর রাজপ্রাসাদের একাংশে স্থাপিত এই পুঁথিশালায় সংগৃহীত আছে ১৯০৭৪টি সংস্কৃত পুঁথি, ২৬০৬টি তামিল পুঁথি, ৭৭৬টি তেলগু পুঁথি। এছাড়া ইংরাজী, ফরাসী, ইতালী, গ্রীক ইত্যাদি ভাষার পুঁথি সবমিলিয়ে এখানে আছে ৩৬ হাজার পুঁথি। প্রাচীন পুঁথির এতবড় সংগ্রহ ভারতের আর কোথাও আছে কিনা জানা নেই। রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখেছেন "In India, there are several large collections in the palaces of the Hindu Rajas..... The most extensive collection is perhaps the Saraswati Bhandaram of His Highness the Maharaja of Tanjore (Descriptive Catalogue of Sanskrit Mns. Part-1st,1977)".

৬২০ খ্রীষ্টাব্দের কবি বাণ তাঁর 'হর্ষচরিতে' 'পুস্তক ভাষক' নামক পুঁথিপাঠ বিশেষজ্ঞের কথা বলছেন। প্রাচীন বা সমকালীন পুঁথির পাঠোদ্ধার করা বা পাঠ করে শোনানোই তাঁদের কাজ (এদেশেও ছিলেন পাঠক 'ব্রাহ্মণ'; পুঁথি পাঠই বোধ হয় তাঁদের কাজ ছিল। পশ্চিমবঙ্গে 'পাঠকপাড়া' নামের পল্লীর সন্ধান আছে)। পূর্ব ও উত্তরপূর্ব ভারতেও বিভিন্ন রাজ গ্রন্থাগারের সন্ধান পাওয়া গেছে। চর্যাপদের পুঁথিগুলি নেপালের রাজগ্রন্থাগার থেকেই মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় উদ্ধার করেন। বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ১৩১৬ বঙ্গাব্দে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমার কাকিল্যা গ্রামের দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (শ্রীনিবাস আচার্যের দৌহিত্র বংশ) গোশালা থেকে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের' পুঁথিটি আবিষ্কার করেন, তাও বিষ্ণুপুর মল্লরাজ পরিবারের গ্রন্থাগারের সংগ্রহ বলে কারো কারো অভিমত। তৎকালীন দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের ব্রাহ্মণভূম পরগণার অধিপতি বাঁকুড়া রায় ও তৎপুত্র রঘুনাথ রায় গ্রন্থরসিক মানুষ না হলে

ভাগ্যবিড়ম্বিত কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বা তাঁর যুগান্তকারী সাহিত্যকর্ম 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যকে হয় তো আমরা পেতাম না । কর্ণগড়রাজ যশোবন্ত সিংহ এবং কাশীযোড়ার রাজা রাজনারায়ণ গ্রন্থরসিক না হলে যথাক্রমে শিবায়ন রচয়িতা রামেশ্বর ভট্টাচার্য, শীতলামঙ্গল রচয়িতা নিত্যানন্দ চক্রবর্তী ও সারদামঙ্গল রচয়িতা দয়ারাম দাসের সাক্ষাৎ পাওয়া যেত না । উক্ত রাজনারায়ণের সভায় ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের অংশ বিশেষ এবং ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বৃহন্নারদীয়পুরাণ অনুলিখিত হয় । বর্তমান মেদিনীপুর শহরের নিকটস্থ আবাসগড়ের রাজসভাতেই কবি কাশীরাম দাস তাঁর মহাভারত রচনা করেন । বর্ধমান রাজাদের আনুকূল্যে অনেক কবি নানাবিধ কাব্য রচনা করেন । মহিষাদলের রাজপরিবারের গ্রন্থরসিকতার কথাও জানা গেছে । বিষ্ণুপুর মল্লভূমের মল্লরাজারাও ছিলেন গ্রন্থরসিক ও সংগ্রাহক । মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার এরেটী গ্রামের তাৎকালিক ভূস্বামী রামদুলাল দাস মান্নাও ছিলেন এক গ্রন্থরসিক মানুষ । অনেক পুঁথিতেই তাঁর নামধাম উল্লিখিত । সুতরাং এইসব দেশীয় রাজন্যবর্গের গ্রন্থসংগ্রহ তাঁদের গ্রন্থপ্রীতিরই সাক্ষ্য বহন করে । পরবর্তীকালে সংগৃহীত শতশত বাংলা পুঁথিতে এঁরা ছাড়াও আরো অনেক সম্ভ্রান্ত রাজা জমিদারদের নাম দেখা যায় পুঁথি মালিক ও সংগ্রাহক হিসেবে । টোল চতুষ্পাঠীর পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ, পাঠশালার গুরু মশায়, কবিরাজ, গ্রহবিপ্র, গায়েন, ওঝা, জ্যোতিষী, সাধারণ মানুষ সকলেই নানাধরণের পুঁথি সংগ্রহ করতেন । জীবিকার্জন বা ধর্মকাহিনী শ্রবণের আন্তরিক তাগিদ, লোকচিকিৎসা, সংগীত শিক্ষা ইত্যাদি নানা প্রয়োজনে সংগৃহীত হোত পুঁথি । একালে ড্রইংরুমের শোকেসে বই সাজিয়ে রেখে অনেক মানুষ যেভাবে রুচির পরিচয় দিয়ে রাখেন, সেকালে কিন্তু তা ছিল না । পুঁথির পাঠ বা ব্যবহার হোত নিয়মিত । পুঁথি ছিল জীবনের সম্পদ। সেকালের গ্রন্থ সংগ্রাহকদের পরবর্তী বংশধররা উত্তরাধিকার সূত্রে পূর্বপুরুষদের সংগৃহীত পুঁথির মালিক হয়ে যান । আবার একালের অজ্ঞ কুসংস্কারাচ্ছন্ন বহু পুঁথি মালিক পূর্বপুরুষদের সেইসব সংগ্রহ বহুক্ষেত্রেই নদী, পুষ্করিণী বা অগ্নিতে নিক্ষেপ করে 'পুণ্য অর্জন' করেন । অনেক বাড়িতেই অযত্নে অবহেলায় পড়ে আছে পুঁথির স্তূপ । চাইতে গেলে হাজার আপত্তি, এমন কী সেসব হাতে নিলে 'অভিশম্পাতের' সম্ভাবনা । আবার কেউ কেউ ভাবেন, ঐ সব কাগজে তাদের পরিবারের গোপন কথাবার্তা লেখা আছে । টোল-চতুষ্পাঠী, মক্তব, মাদ্রাসা, মন্দির, দেবালয়, পাঠশালা, বৈষ্ণবের আখড়া, ওঝার গৃহ, সাধারণ গৃহস্থ বাড়ি, জ্যোতিষী, গ্রহবিপ্র, হাকিমকবিরাজ, পুরাণপাঠক, জমিদারের প্রাসাদ থেকে দরিদ্রের পর্ণকুটির সর্বত্রই যে হাতে লেখা পুঁথির কদর ছিল তাতে সন্দেহ নেই । আবিষ্কৃত পুঁথির পুষ্পিকা থেকে পুঁথির ক্রেতা-সংগ্রাহক বা মালিকদের নামধাম পাওয়া যাচ্ছে অজস্র । কয়েকটি পুষ্পিকা এখানে তুলে দেওয়া হল -

১. 'ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে যৌবনলীলা সূত্রকথনং নাম সপ্তদশ পরিচ্ছেদঃ ।।' শকাব্দ ১৭০৮ । মল্লশক সন ১০৯২ সাল স্বস্তি মল্লমহীমহেন্দ্রমল্লাবনীনাথ মহারাজাধিরাজ শ্রীলচৈতন্যসিংহ দেবস্য পুস্তকমিদং ।।'

-সাহিত্যপরিষৎ পুঁথি নং ২৩৮ ।

২. 'ইতি দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ সমাপ্ত । লিখিতং শ্রীকিশোরীমোহন দাস সরকার । নিবাস বুজারগত। পাঠার্থমিদং শ্রীগঙ্গাহরি ভকত সাং গোপালগঞ্জ । সন ১২২৬ সাল তাং ২৫শে আষাঢ় ।।

- 'মহাভারত' (এ. ৪০৪৮) ।

৩. 'পঠনার্থে শ্রীভোলানাথ শীহমহাপাত্র । সাঃ ভেদা পরগণে শীমলীপাল তরফ ধুলাপুর ।। লিখিতং শ্রী রামধন দাস পরগণে রাইপুর, সাঃ সীতারামপুর ।। বেলা দুই প্রহর শমাপস্তং ।। ইতি সন ১২৬৯ সাল তারিখ ১৩ ফাল্গুন....।।'

-'মহাভারত' (বি. ভা. ১১১৩) ।

৪. 'লিখিতং শ্রীরামনারায়ণ দেবশর্ম্মা সাং সাগরপুর পং চেতুয়া । এ পুস্তক শ্রীমথুরামোহন মাজী সাং রামকৃষ্ণপুর পরগণে চেতুয়া সরকার মান্দারন সন ১২৬১ সাল বিতারিখ ১৮ জ্যেষ্ঠী..... ।'

-'মহাভারত' আদিপর্ব (মৎসংগৃহীত) ।

৫. 'ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের তিন লিলার প্রলাপ সংপুর্ন্য । দিষ্টমাত্র লিখনং এ হাতে আমার দোষ নাস্তিকং । পাঠনার্থে শ্রীআনন্দ কার্য্যা সাং মাঝুরা পং রাইপুর সন ১২৫৪ সাল ।।'

-'চৈতন্যচরিতামৃত' (উ. ব. ৫৮০) ।

৬. 'এই পুস্তক শ্রীন্যামত য়ালি পীছরে মনছুর য়ালী সাকিন হাইদগাঁও স্তানে পটীয়া জিলে চট্টগ্রাম ইতি সন ১২১৪ মঘী তারিখ ১ শ্রাবণ ।'

-'সিরাজকুলুপ' (ঢা. বি. ৩৮৮) ।

এইসব উদ্ধৃতিতে উল্লিখিত মহারাজ চৈতন্যসিংহ, গঙ্গাহরিভকত, ভোলানাথ শীহ মহাপাত্র, মথুরামোহন মাজী, আনন্দ কার্য্যা, ন্যামত য়ালিরাই সেকালের পুঁথি মালিক-পাঠক । এইধরণের অসংখ্য মালিকের নাম ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন পুঁথির পাতায় (মালিক, বাসস্থান ও পুঁথির নাম উল্লিখিত) ঃ-

কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী, রতনপুর, ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল; গৌরহরিদাস, উদয়গঞ্জ, বিদগ্ধমাধব; গোপাল রায়, ভবানীপুর, কুতুবপুর, মেদিনীপুর, মহাভারত; গুণরাম লোহ, হজরতপুর, কবিচন্দ্রের প্রসাদচরিত্র; গুরুপ্রসাদ দাস দত্ত, মোহনপুর, রায়ড়া, রামশঙ্করের তরণীসেনের পালা; গৌরমোহন দাসদত্ত, বেলডাঙ্গরা, কাশীরামদাসের সাবিত্রী পালা; চিনিবাস দে, বনকাটী, ছাতনা, অনুসুখ দাসের কালীয়দমন, যজ্ঞেশ্বর ঘোষাল, ধুলাপুর, সিমিলাপাল, শঙ্করের গুরুদক্ষিণা; দুর্গাপ্রসাদ চৌধুরী, লক্ষ্মীপুর চন্দ্রকোনা, কবিকঙ্কণ চণ্ডী; নবীনচন্দ্র লায়েক, পহলানপুর, সমরশাহী, কবিচন্দ্রের ভাগবত; বিজয়রাম মাল, মাগুরা, কবিচন্দ্রের কুন্তীর বাণ ভিক্ষা; বিষ্টুপদ পাঠক, পড়াআইতি, কবিচন্দ্রের দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ; বৈকুণ্ঠ পতদার, সঙ্গতগঞ্জ, বিষ্ণুপুর, অষ্টশব্দী; গরীবকীর্তনীয়া, লক্ষ্মীপাঁচালী; রামসোন্দর মোহরি, নলগ্রাম, চণ্ডীমঙ্গল; হিরামন মাহানদার, চট্টগ্রাম জেলার আন্ধারমানিক, মাধবাচার্যের চণ্ডীমঙ্গল; মেহর চান্দঠাকুর, আন্ধাবমানিক, মঘাধর্ম ইতিহাস; রামজয় মহাজন, কাননগো পাড়া, সঞ্জয়ের মহাভারত; দামোদর মজুমদার, কাশীরাম দাসের মহাভারত; ভৈরব মণ্ডল, বেল্যাপানা, দ্বিজচন্দ্রের কর্ণপালা, কৃত্তিবাসের রামায়ণ; দেবীপ্রসাদ ও শিবপ্রসাদ সরকার, মহাভারতসহ অন্যান্য বেশ কিছু পুঁথি; আনন্দ কার্য্যা, মাঝুরা, কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত; রূপচরণ কস্য, মানভঞ্জন, মানিক দত্তের ভবানী বন্দনা, জগজ্জীবনের মনসামঙ্গল ; বিশ্বনাথ কর্মকার, গড়বেতা, বগড়ি কংসবধ; মতিরাম গোঁসাই, পাথরচাড়্যা, বগড়ি, কবিচন্দ্রের দাতাকর্ণ পালা ও দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ; মোহম্মদ জমা খাঁ, বড়হাট,

ভুরুকুণ্ডা, বীরভূম, হাসাম দীনের গোবিন্দ চন্দ্র পুস্তক, রঘুনাথ ভুএগ্রামালি, শ্যামবাজার, জাহানাবাদ, কবিচন্দ্রের দাতাকর্ণ; রঘুনাথ মহান্তি, তরুপুব, শিমলাপাল, মহাভারত সৌতিপর্ব; যুগল কিশোর রায়চৌধুরী, ভাওয়াল, কৃত্তিবাস রামায়ণ ও নিমাই সন্ন্যাস, হরেকৃষ্ণ দাস নন্দী, হাতিয়া, দ্বিজ পরশুরামের সুদামাচরিত্র; এছাড়া এরেটি মেদিনীপুরের রামদুলাল দাস মান্না, চেতুয়া সাগরপুরের নবীন চক্রবর্তী, মুড়াগাছার জগমোহন কয়াল, কাকটিয়া মেদিনীপুরের কালীচরণ সেন, সাতঘরার সনাতন দাস, বাতিকর বীরভূমের রসিকলাল সিংহ, কলাগ্রাম মেদিনীপুরের ধনঞ্জয় দেবশর্মা, কুলিয়া হাওড়ার দয়াল দাস, পাত্রসায়ের বাঁকুড়ার গুরুচরণ দত্ত গন্ধবণিক প্রমুখ পুঁথিমালিকের নাম পুরানো পুঁথি থেকেই পাওয়া যায় । গোবর আডার কাশীনাথ বসু, সামাগ্রীদহের পঞ্চানন আসদাস, পহলানপুরের অক্রুর সরকার, নিজেদের পুঁথি নিজেরা নকল করে নিয়েছেন (বিভিন্ন কবির লেখা)। সেকালে মেয়েরাও যে পুঁথি লিখতেন, পড়তেন, সংগ্রহ করতেন, সেকথাও জানা গেছে। আবার কখনো কখনো লিপিকর হেঁয়ালীর মাধ্যমে নিজের বা মালিকের নাম ধাম লিখেছেন লিপিকৃত পুঁথিতে । ১২২৩ বঙ্গাব্দে রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়নের একটি পুঁথির পুষ্পিকায় আছে- "গ্রন্থ সাক্ষর যার জানিবে নিশ্চয়। বালিয়া পরগণার পূর্ব্বদিগ হয় ।। আশ্রমের কথা কহি শুন গুণধাম । তিনকূলে উপাদান খুরুট নামে গ্রাম ।। র অক্ষরে নাম মোর নিবেদন শুন । পড়িবেন গ্রন্থখানি করি বিলক্ষণ ।।"

সাত

সাল তারিখ নির্ধারণ

পুঁথি-পাণ্ডুলিপি, দলিল-দস্তাবেজ, ধাতু ও প্রস্তরলিপি, চিঠিপত্র ইত্যাদি বিষয়ক গবেষণায় সাল তারিখ নির্ধারণ একটি জরুরী বিষয় । লেখক ও লিপিকররা নানাভাবে পুঁথি-পাণ্ডুলিপিতে রচনাকাল বা লিপিকাল নির্দেশ করে থাকেন । অনেক ক্ষেত্রে সালতারিখ লেখা না থাকলেও লিপি, ভাষা ইত্যাদি নানা পদ্ধতিতে তা নির্ণয় করতে হয় । শকাব্দ, গুপ্তাব্দ, মল্লাব্দ, বঙ্গাব্দ, চৈতন্যাব্দ অমলি ইত্যাদি নানা ধরণের অব্দ পুরোনো দিন থেকে প্রচলিত । সুকৌশলে সেগুলিকে আন্তর্জাতিক অব্দ 'খ্রীষ্টাব্দে' পরিণত করে নিতে হয় । অনেকক্ষেত্রে সালতারিখ এমন হেঁয়ালীতে নির্দেশ করা থাকে, যাকে খ্রীষ্টাব্দে নিয়ে আসতে পণ্ডিতদের গলদঘর্ম হতে হয় । মধ্যযুগের বাংলা-পুঁথি সাহিত্যে এই ধরণের সংকটময় দৃষ্টান্তের অভাব নেই ।

শিলালিপি-তাম্রশাসন

আমাদের দেশের প্রাচীনতম লিখিত নিদর্শন শিলালিপি ও তাম্রশাসনগুলি । পূর্বভারতে আবিষ্কৃত প্রাচীনতম বগুড়া-মহাস্থানগড়ের শিলালিপিটি (খ্রীঃ পূঃ ৩য় অব্দ) সালতারিখবিহীন হলেও পরবর্তীকালের শিলালিপিতে সময় নির্দেশ করা হয়েছে অনেক ক্ষেত্রেই । অবশ্য প্রাচীনযুগে ভারতের জৈন, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য রাজাদের সময় নির্দিষ্ট কোন সালের ব্যবহার প্রচলিত ছিল না। তাই তাঁরা লিপিলেখে নিজেদের রাজ্যাঙ্কের কাল দিতেন । খ্রীঃ পূঃ ১ম শতাব্দীতে উত্তরপশ্চিমের শক রাজারা প্রথম সালের ব্যবহার শুরু করেন । পরে সেটি 'বিক্রমসংবৎ' নামে পরিচিত হয় । খ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দীর কুষাণ সম্রাট কণিষ্কের রাজ্যাভিষেক থেকে যে সাল গণনা শুরু হয় পরে তা 'শকাব্দ' নামে খ্যাত হয় । অবশ্য সম্রাট অশোকের অরৌরা (উত্তরপ্রদেশের মীর্জাপুর জেলা) গিরি অনুশাসনের পাঠ (দ্রঃ 'শিলালেখ-তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ', ড. দীনেশচন্দ্র সরকার, কলকাতা, ১৯৮২, পৃঃ ১২-১৫) অনুযায়ী পণ্ডিতদের সিদ্ধান্ত, 'বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর থেকে ২৫৬ রাত্রি প্রবাসে অতিবাহিত করার পর' অশোক ঐ অনুশাসন প্রচার করেন । ৫ম শতাব্দীর দামোদর পুর তাম্রশাসনটি শুরু হয়েছে 'সং ১০০ (+) ২০ (+) ৮ বৈশাখ দি ১০ (+) ৩ পরমদৈবত পরমভট্টারক' দিয়ে । অর্থাৎ ১২৮ গুপ্তাব্দের ১৩ বৈশাখ এটি ঘোষিত হয় । বাইগ্রাম তাম্রশাসনেও অনুরূপ কাল নির্দেশিত । রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরের ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে ২০শ পংক্তিতে 'সন্ ১০০ (+) ৫০ (+)৯ মাস দি ৭' অনুযায়ী ১৫৯ গুপ্তাব্দের ৭ মাঘ এটি প্রচারিত হয় । বুধগুপ্তের দামোদরপুর তাম্রশাসনে খোদিত সাং '১০০ (+) ৬০ (+) ৩ আষাঢ় দি ১০ (+)৩' অনুযায়ী ১৬৩ গুপ্তাব্দের ১৩ আষাঢ় এটির ঘোষণাকাল। ৬ষ্ঠ শতাব্দীর বৈন্যগুপ্তের

গুণাইঘর তাম্রশাসনের শেষে লেখা 'সং ১০০ (+) ৮০ (+) ৮ পোষ্য দি ২০ (+)৪' থেকে জানা যাচ্ছে এটি ১৮৮ গুপ্তাব্দের ২৪ পৌষ' খোদিত ও ঘোষিত হয়। অনুরূপভাবে ধর্মাদিত্যের ফরিদপুর তাম্রশাসন রাজার ৩য় রাজ্যাঙ্কের ৫ বৈশাখ (৬ষ্ঠ শতাব্দী), মল্লসারুল তাম্রশাসন গোপচন্দ্রের ৩য় রাজ্যাঙ্কের ২৭ শ্রাবণ (৬ষ্ঠ শতাব্দী), ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসন রাজা ধর্মপালের ৩২ বিজয়বর্ষের ১২ অগ্রহায়ণ, 'কেশব প্রশস্তি' বা মহাবোধি লিপি ধর্মপালের ২৬ রাজ্যাঙ্কের ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় পঞ্চমদিবসে শনিবার, ২য় গোপালদেবের বাগীশ্বরী শিলালিপি গোপালের ১ম রাজ্যাঙ্কের আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের ৮ম দিবসে, মদনপালদেবের মনহলি তাম্রশাসন রাজার ৮ম রাজ্যাঙ্কে, মহীপালদেবের সারনাথ প্রস্তরলিপি ১০৮৫ শকাব্দের ১১ *পৌষ, ভোজবর্মণদেবের বেলাভ তাম্রশাসন রাজার ৫ম রাজ্যাঙ্কের ১৪ই শ্রাবণ ঘোষিত এবং* খোদিত হয়। এইসব বৃত্তান্ত শিলালিপি তাম্রশাসন থেকেই জানা যায়। কয়েকটি শিলালিপি-তাম্রশাসনে সাল তারিখ এইভাবে নির্দেশিত ঃ-

১. 'শ্রীঅভিবর্দ্ধমান-বিজয়রাজ্যে সম্বৎ ৩২ মার্গ-দিনানি১২....।'

(ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসন। আঃ ৮০২ খ্রীষ্টাব্দ)।

২. 'ষড়বিংশতিতমে বর্ষে ধর্ম্মপালে সহীভুজি। ভাদ্রবহুলপঞ্চম্যাং সূনোর্ভাস্করস্যাহনি।।'

(ধর্মপালের মহাবোধি শিলালিপি। ৭৭০-৮১০ খ্রীষ্টাব্দ)।

৩. 'বিলিখ্যমানে দশপঞ্চ-সংখ্যসম্বৎসরে সিদ্ধিমগাচ্চ কীর্ত্তিঃ ।।' ।'

(নয়পালদেবের গয়া প্রস্তরলিপি। ১০৩৮-১০৫৫ খ্রীষ্টাব্দ)।

৪. 'সম্বৎ ১ আশ্বিন সুদি ৮ পরমভট্টারকমহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর-শ্রীগোপাল-রাজনি শ্রীনালন্দায়াং শ্রীবাগীশ্বরী - ভট্টারিক। সুবর্ণব্রীহি সক্তা।।'

(২য় গোপালদেবের প্রস্তরলিপি। ৯৪০-৯৬০ খ্রীষ্টাব্দ)।

৫. 'অব্দে বিক্রম ভূভুজগুনশরে বাণে তথা রূপকে পৌষে মাসি তিথৌ স (প্তমকে) চ পক্ষে চ বলক্ষেতরে। রুধিরোদগারিতবৎসরে দিনে সুরগুরোর্ধর্ম্মার্থস্তিরে সীষ্ট শীরাজধরঃ সচেষ্টরো কীর্ত্তিমিমাং চ কারিতং ।। শুভমস্তু' (পাটনা বঙ্গাক্ষর অভিলেখ)।

গুণ=৩, শর=৫, বাণ=৫, রূপক বা রূপ=১। এই অর্থ অনুযায়ী, ত্রিগুণ, পঞ্চশর, পঞ্চবাণ এবং একরূপ দ্বারা গণিত রাজ্যবিক্রমের সংবৎসরে (সংবৎ ১৫৫৩) এবং বৃহস্পতি চক্রের 'রুধিরোদগারি সংজ্ঞক' বৎসরে পৌষমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় ৭মী তিথি বৃহস্পতিবারে গঙ্গাতীরে পীঠসহ শ্রীরাজধর নির্মিত হলেন এবং এই কীর্তি (অর্থাৎ কীর্তি জ্ঞাপক মন্দির) নির্মাণ করানো হল। মঙ্গল হোক।' এটি ১৪৯৬ খ্রীষ্টাব্দ।

(দ্রঃ 'শিলালেখ তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ', ড দীনেশচন্দ্র সরকার, ১৯৮২, পৃঃ ১৭৩-১৭৫।)।

পুঁথি-পাণ্ডুলিপি

প্রাচীন শিলালিপি তাম্রশাসনে বৎসর, মাস ও দিন নির্দেশ যেভাবে হয়েছে, মধ্যযুগের দলিল-দস্তাবেজ, সরকারী কাগজপত্র এবং বাংলার মন্দির মসজিদ দেবালয়ের নির্মাণকালনির্দেশক লিপিফলকে অনেকক্ষেত্রে সেভাবেই সাল তারিখ নির্দেশ করা হয়েছে। তবে মধ্যযুগের মন্দির দেবালয়ের লিপিফলকে কালনির্দেশ করার সময় যে বিচিত্র কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে তার

অর্থ উদ্ধারের জন্যে বিশেষ জ্ঞান দরকার । পুঁথির ক্ষেত্রেও ঘটেছে অনুরূপ ঘটনা । প্রাচীন পুঁথি ও পাণ্ডুলিপি গবেষণার ক্ষেত্রে পুঁথির রচনাকাল বা লিপিকাল খুঁজে বের করা এক জরুরী বিষয়, সন্দেহ নেই । তবে কালনির্ণয়ের এই কাজটি সর্বত্র সহজ নয় । পুঁথিতে দু'ধরণের কাল থাকে- ১. কবি বা গ্রন্থকারের গ্রন্থরচনার কাল; ২. লিপিকর কর্তৃক পুঁথি অনুলিপি করার কাল । উভয়ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য, আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর গুরুত্বপূর্ণ উক্তিটি এখানে অপরিহার্যঃ- "কিন্তু আমাদের এমনই ভাগ্যদোষ যে, পুরানো পুঁথির শেষের দিকটাই হয়ত খণ্ডিত হইয়া পড়ে, অথবা শেষ পাতাটা বর্তমান থাকিলেও বাঙ্গালা দেশের পোকা ঠিক তারিখের অঙ্কটাই পছন্দ করিয়া কাটিয়া ফেলে । কোন কোন গ্রন্থকার গ্রন্থ পরিচয় দিতে গিয়া রচনার বার, তিথি, নক্ষত্র, অতি সূক্ষ্মভাবে নির্দেশ করেন, কেবল বৎসরটা নির্দেশ করিতে ভুলিয়া যান।" *

-'মুখবন্ধ' 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১০ম সং, ১৩৮৫ ।

এছাড়াও উভয়ক্ষেত্রে, নানাবিধ জটিলতা বিভিন্ন সময় দেখা দিয়েছে বা দিয়ে থাকে । প্রথম সমস্যা হল শকাঙ্কের[১] যথাযথ অর্থ উদ্ধার । পাঠশালায় শিশুদের পঠিত ধারাপাতে 'একে চন্দ্র', 'দুয়ে পক্ষ', 'তিনে নেত্র', 'চারে বেদ', যেভাবে পড়া হয়েছে, কবি শকাঙ্কের ব্যাখ্যাও তদ্রূপ । মূলতঃ সংস্কৃত ভাষা থেকে অসংখ্য সংখ্যাবাচক শব্দ বাংলা ভাষায় এসেছে এবং তা শিলালিপি, অনুশাসন, মন্দির দেবালয়ের প্রতিষ্ঠালিপি, সংস্কৃত বাংলা পুঁথি, বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়েছে । একটি দৃষ্টান্ত ঃ

'ঋতু শশী বেদ শশী পরিমিত শক ।
সুলতান হুসেন সাহ নৃপতি তিলক ।।'

কবি বিজয়গুপ্ত তাঁর 'মনসামঙ্গল' কাব্য রচনার কাল নিজের কাব্যে এইভাবে নির্দেশ করেছেন। ঋতু, শশী, ও বেদ শব্দগুলির অর্থ যথাক্রমে ৬, ১, ৪ । এই অর্থ অনুযায়ী ৬, ১, ৪, ১ অর্থাৎ ৬১৪১ শক বা শকাব্দ বোঝায় । কিন্তু 'অঙ্কস্য বামাগতি' নিয়মানুযায়ী[২] দক্ষিণ থেকে বামে অঙ্কগুলি সাজালে পাওয়া যায় ১৪১৬ শকাব্দ । তখন গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহ (১৪১৬ শকাব্দ +৭৮ =১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দ) । এখন, এই সংখ্যাবাচক শব্দগুলির সঙ্গে পরিচয় না থাকলে পুঁথির কালনির্ণয় বাধাপ্রাপ্ত হবে ।

দ্বিতীয় সমস্যা, সংখ্যাবাচক শব্দের সঠিক অর্থ প্রয়োগে দক্ষতার অভাব । এমন কিছু কিছু সংখ্যাবাচক শব্দ আছে, যেগুলি দুটি অর্থ প্রকাশ করে । যেমন নেত্র =২, ৩; পদ =২,৩; দিক =৪,১০ । রচনাংশে 'নেত্র' শব্দ থাকলে তার কোন অর্থটি গ্রাহ্য হবে, তা পুঁথি পাঠককে সুকৌশলে স্থির করতে হবে ।

তৃতীয় সমস্যা, লিপিপাঠে অক্ষমতা । পুঁথির লিপিতে কোন সংখ্যাবাচক শব্দ আছে,

---

* 'আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস' শ্লোকটি কৃত্তিবাসের জন্মকাল সম্পর্কিত বলে অনেকের বিশ্বাস । কিন্তু চিন্তাহরণ চক্রবর্তী তাঁর 'কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুঁথি-আদিকান্ড' রচনায় (ব.সা.প.প. বর্ষ ৬৫ সংখ্যা ৪, পৃঃ ২৫৩-২৬২) এই বিষয়ক ভ্রম নিরসন করেছেন । রঘুবংশের রাজকুমারদেব জন্মতারিখ নির্দেশ করা হয়েছে 'আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণমাঘ মাস' শীর্ষক কয়েকটি শ্লোকের মাধ্যমে ('প্রাচীন পুঁথির পরিচয়' ২য় খন্ড, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৪, ভূঃ পৃঃ ২, অর্থাৎ রঘুবংশের রাজকুমারদের জন্মতারিখকেই কৃত্তিবাসের জন্মতারিখ বলে ঘোষণা করা হয়ে এসেছে।

সেটির যথার্থ পাঠোদ্ধার না হলে কালনির্ণয় বাধাপ্রাপ্ত হবে। পুঁথির লেখায় 'ইন্দু' শব্দ থাকলে লিপিপাঠে অক্ষম পাঠক যদি তাঁকে 'বিন্দু' পড়েন তাহলে 'ইন্দু' শব্দের অর্থ ১ হয়ে যাবে 'বিন্দুর' অর্থ শূন্য। ফলে সমগ্র হিসেবটি অবাস্তব হয়ে যাবে।

চতুর্থ সমস্যা, সমকালীন ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞানের ঘাটতি। কবি শকাঙ্কের অর্থ উদ্ধারের জন্যে মধ্যযুগের ইতিহাস সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা চাই। বিজয়গুপ্তের পুঁথিতে সুলতান হুসেন শাহের উল্লেখ দেখে তাঁকে ঐ সুলতানের সমকালীন মানুষ বলা যাচ্ছে। সেখানে 'ঋতু শশী বেদ শশী' লেখা না থাকলেও বিজয়গুপ্তের সময়কাল নির্ণয়ে অসুবিধে হোত না। বিপ্রদাস তাঁর 'মনসামঙ্গল কাব্য' রচনার কাল নির্দেশ করে লিখেছেন-

'শুক্লা দশমী তিথি বৈশাখ মাসে। সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ।
শিয়রে বসিয়া পদ্মা কৈলা উপদেশে।। নৃপতি হুসেন শা গৌড়ের সুলতান।।'

এখানে 'বৈশাখ' মাস বোধ হয় 'জ্যৈষ্ঠ' মাস হবে। কেন না জ্যৈষ্ঠমাসেই মনসাপূজা হয়ে থাকে শুক্লা দমশীতে। সিন্ধু =৭, ইন্দু =১, বেদ =৪, মহী =১, অনুযায়ী ১৪১৭ শকাব্দ বা (+৭৮) ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে হুসেন শাহের রাজত্বকালে এ কাব্য রচিত হয়। কিন্তু কাব্যটিতে চাঁদসদাগরের বাণিজ্যযাত্রার বর্ণনায় হুগলী, ভাটপাড়া মূলাজোড়, কামারহাটি, ঘুষুড়ি, কলিকাতা, চিৎপুর, বেতড় ইত্যাদি আধুনিক স্থানের নাম উল্লেখ দেখে অনেকেই সন্দেহ করেন, কবি যথার্থই ১৫ শতাব্দীর মানুষ ছিলেন কীনা।[৪]

পঞ্চম সমস্যা, লিপিকরের ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি নির্ধারণ। পুঁথি নকল করতে করতে লিপিকরদের মধ্যে একধরণের দুর্বল কবিত্ব এসে যেতো। তাই ছন্দ মিলিয়ে কবি শকাঙ্কের মধ্যে একটি শব্দের মধ্যে অন্য একটি শব্দ বসিয়ে দিতেন তাঁরা। ফলে সৃষ্টি হয়ে গেছে কত ধরণের সমস্যা। যেমন কবি মুক্তারাম সেনের[৫] 'চণ্ডীমঙ্গল' বা 'সারদামঙ্গল' কাব্য। কাব্য রচনার কাল পুঁথিতে আছে এইভাবে -

'গ্রহ ঋতু কাল শশী শক শুভ জানি।
মুক্তারাম সেনে ভণে ভাবিয়া ভবানী।।'

গ্রহ=৯, ঋতু=৬, কাল=৩, শশী=১। এইভাবে দক্ষিণ থেকে বামে ১৩৬৯ শকাব্দ বা (+৭৮) ১৪৪৭ খ্রীষ্টাব্দ হয়। কিন্তু এই সময়কাল কবির কাব্যে প্রদত্ত বিবরণ ও তথ্যের সঙ্গে মেলে না। লিপিকর 'কায়' লিখতে গিয়ে 'কাল' লিখে বিপত্তি ঘটিয়েছেন। কায়=৬,। তাহলে ১৬৬৯ শকাব্দ বা ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দ হয়। এটিই কবির কাব্যরচনার কাল। আঠারো শতকের প্রথম দিকে সরকার মান্দারনের চেতুয়া পরগণার কলাইকুন্ড গ্রামে আবির্ভূত কবি শঙ্করের 'শীতলামঙ্গলের'[৬] বিভিন্ন পুঁথিতে দেখা যায় দুটি পদ -

'সন এগার চুয়ালিস সালে শুক্রবার সন্ধ্যাকালে
শুক্লপক্ষ আটাস্যা আশ্বিনে।
কাতর শঙ্করে বলে ঝড়বিষ্টি মহিতলে
শিতলা সদয় সেই দিনে।।'

অর্থাৎ ১১৪৪ বঙ্গাব্দ বা (+৫৯৪) ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে কবির কাব্য রচিত হয়। আবার কোন কোন

পুঁথির লিপিকর 'সন এগার'এর স্থলে 'সন হাজার' লিখে কবির সময়কাল ১০০ বছর পিছিয়ে দিয়েছেন, যদিও পুঁথির অন্যান্য তথ্যের সঙ্গে এই সময় আদৌ মেলে না । সুতরাং এইসব সমস্যার জট থেকে মুক্ত হতে না পারলে কোন একটি পুঁথি বা পাণ্ডুলিপির কালনির্ণয় সঠিক হবে না । পনেরো-ষোলো শতকের কবিদের পুঁথিতে সালতারিখ নির্দেশে তেমন কোন জটিলতা নেই । কিন্তু সতেরো-আঠারো শতকেই যত জটিলতা, যত চাতুর্য । কবি রামেশ্বরের 'শিবায়নে' বলা হয়েছে-

'শকে হল্য চন্দ্রকলা রাম করতলে ।
বাম হল্য বিধিকান্ত পড়িল অনলে ।।'

চন্দ্রকলা =১৬, রাম =৩, করতল =২, অর্থাৎ ১৬৩২ শকাব্দ বা (+৭৮) ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে কবির কাব্য রচিত হয় । কিন্তু দ্বিতীয় পংক্তিটির ব্যাখ্যা রহস্যময় হয়ে দাঁড়ায় ।

মন্দিরলিপি

পুঁথির 'কবি শকাঙ্ক' বিষয়ে আলোচনার প্রসঙ্গে বাংলার মন্দিরলিপিগুলিতে সংখ্যাবাচক শব্দের ব্যবহার লক্ষ্যণীয় । এইসব মন্দিরলিপিতে রচয়িতাদের পাণ্ডিত্য ও চাতুর্যের বহুবিধ পরিচয় পাওয়া যায় । লিপিগুলি নিম্নরূপ ঃ-

'প্রাসাদং শরশূণ্যহস্তিধরণৌ সকা অন্তিকে ।
সংনির্মায় শিবেন্দ্রভূপমহিষী শ্রীশ্রীল কামেশ্বরী ।।'

- ডাঙ্গর আয়ী মন্দির/কোচবিহার শহর ।

শর =৫, শূন্য =০, হস্তী =৮, ধরণী =১, অর্থাৎ ১৮০৫ শকাব্দে (১৮৮৩ খ্রীঃ) মন্দিরটি নির্মিত হয়।

'শুভমস্তু শকাব্দাঃ ১৫৭৭ । শাকেহশ্বমুনিবাণেন্দৌ/বৈশাখে শুক্লপক্ষকে/ তৃতীয়ায়াং ভৃগুদিনে/আরম্ভোস্য বভুবহ ।।' -লালজী মন্দির । চন্দ্রকোনা । পঃ মেদিনীপুর ।

অশ্ব =৭, মুনি =৭,বাণ =৫, ইন্দু =১ । ১৫৭৭ শকাব্দ বা (+৭৮) ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে শুক্লপক্ষের তৃতীয় তিথি শুক্রবারে মন্দিরটির নির্মাণ শুরু হয় ।

'শাকে খ বাণ বাণ শশ/ধর সহিতে মাসবাসাঢ় সংখে'/

-প্রেমসখী গোস্বামীর সমাধিমন্দির । চন্দ্রকোনা। পঃ মেদিনীপুর ।

খ =০, বাণ =৫, শশধর =১ । অর্থ, ১৫৫০ শকাব্দ বা ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দ ।

'মল্লাব্দে শশিসপ্তরন্ধ্রবিমিতে.....' -মুরলীমোহন মন্দির। বিষ্ণুপুর। বাঁকুড়া ।

শশি =১, সপ্ত =৭, রন্ধ্র =৯ । এটি যেহেতু মল্লাব্দ ৯৭১, তাই এর সঙ্গে ৬৯৪ যোগকরে ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায় ।

'শুভমস্তু শকাব্দাঙ্কেভূমিবিন্দু মহীপতৌ ।
শ্রীকাশীশ্বর মিত্রেন বিষ্ণরেষৎ সমর্পিতম ।।' -বিষ্ণুমন্দির । বীরনগর, নদীয়া ।

ভূমি =১, বিন্দু =০, মহীপতি =১৬, ধরে ১৬০১ শকাব্দে কাশীশ্বর মিত্র বিষ্ণুমন্দির নির্মাণ করেন (১৬৭৯ খ্রীঃ) ।

কবি বা গ্রন্থকারের গ্রন্থ রচনার কাল

সেনরাজ বল্লালসেন পরিণতবয়সে 'অদ্ভুতসাগর' গ্রন্থ রচনা শুরু করেন কিন্তু শেষ করতে পারেন নি । এটি শেষ করেন তাঁর পুত্র লক্ষ্মণসেন । গ্রন্থটিতে একস্থানে আছে -

'শাকে খনবখেন্দ্বব্দে আরেভেহদ্ভুতসাগরং ।
গৌড়েংদ্রকুঞ্জরালান স্তম্ভবাহুমহীপতিঃ ।।'

খ =০, নব =৯, ইন্দু =১, এই অনুযায়ী ১০৯০ শকাব্দে 'অদ্ভুতসাগরের' রচনা শুরু হয় । অর্থাৎ এটি যে কবির গ্রন্থ রচনার কাল, পাঠকের তা বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না । এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, পুঁথিতে বিচিত্র ধরণের সাল বা অব্দের উল্লেখ ঘটেছে । এগুলি যেমন কবি বা গ্রন্থকার ব্যবহার করেছেন, তেমনি লিপিকররাও ব্যবহার করেছেন । যেমন অমলি সাল, চৈতন্যাব্দ, ত্রিপুরাব্দ, দানিশাব্দ, নেপাল সংবৎ, বঙ্গাব্দ, মঘীসন, মল্লাব্দ, লক্ষ্মণাব্দ, শকাব্দ, সংবৎ, হিজরী, ইলাহীসন, নীবার সংবৎ, কলচুরি সংবৎ ইত্যাদি । এগুলির পরিচিতি এবং এগুলিকে কীভাবে পরিণত করতে হবে তা নিচে নির্দেশ করা হল ঃ-

খ্রীষ্টাব্দ

যীশুখ্রীষ্টের জন্মগ্রহণের পর থেকে খ্রীষ্টাব্দ গণনা করা হয় । পৃথিবীর সর্বত্র এই অব্দ প্রচলিত । পুঁথিতে যে কালই নির্দেশ করা হোক না কেন, তাকে খ্রীষ্টাব্দে পরিণত করে নিতে হয় । সাধাবণতঃ বাংলা সালের সঙ্গে ৫৯৩ বা ৫৯৪, মল্লাব্দের সঙ্গে ৬৯৪ যোগ করলে খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায় । সারা পৃথিবীতেই এই সাল ব্যবহৃত হয় ।

শকাব্দ

শকরাজ কণিষ্ক প্রবর্তিত অব্দ শকাব্দ । * এ বিষয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পন্ডিতগণ একমত । খ্রীষ্টজন্মের ৭৮ বৎসর পর থেকে এটির গণনা শুরু । শকাব্দ+৭৮ = খ্রীষ্টাব্দ । শকাব্দ = সম্বৎ - ১৩৫, খ্রীষ্টাব্দ - ৭৮, বঙ্গাব্দ+৫১৫ । 'শকাব্দ, বঙ্গাব্দ, লক্ষ্মণাব্দ ও সম্বৎ ইত্যাদি এক অব্দ হইতে অন্য অব্দ বাহির করিবার মৈথিলী ভাষায় এক গাঁথা প্রচলিত ছিল । যথা - 'শাকে সো সন জনাবসোই রহিত বাণ (৫) শশি (১) বাণ (৫) যো হোই ।। আসন জমারহে সো দেখহু। শর (৫) শশি (১) বাণ (৫) হীন করি লেখহু । বাকী রহে সো লং সং প্রমাণ গুরু জ্ঞানীজন ভাষা মান।। অরূ চৌষট (৬৪) একাদশ (১১) দীজে । লংসং সহিত সম্বৎ করি লীজে।। অর্থাৎ শকাঙ্ক হইতে ৫১৫ বাদ দিলে যাহা থাকে তাহাই সন অর্থাৎ বঙ্গাব্দের পরিমাণ এবং সেই বঙ্গাব্দের পরিমাণ হইতে ৫১৫ বাদ দিলেই লক্ষ্মণাব্দের পরিমাণ হয় ; সেই লক্ষ্মণাব্দের পরিমাণ সহ ১১৬৪ যোগ দিলে সম্বৎ পরিমাণ জানা যায় । লক্ষ্মণাব্দে ১০৩০ যোগ করিলেই শকাব্দ বাহির হয় ।'"

---

*'সিংহ শূরীর' 'লোকবিভাগ' কাঞ্চীরাজ পল্লব সিংহবর্মণের ২২তম রাজ্যাঙ্ককে শকাব্দ ৩৮০ বলেছেন । অর্থাৎ শকাব্দের শুরু ৩৮০-২২ =৩৫৮ খ্রীষ্টাব্দে। বরাহমিহিরের 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকায়' শকাব্দ উল্লিখিত । জৈনগ্রন্থ 'মুহূর্তমার্তন্ডের' মতে রাজা শালিবাহনেব জন্ম থেকে শকাব্দ শুরু (২য় শতক) । 'কল্পপ্রদীপিকা' অনুসারে সাতবাহনরাজ গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী কর্তৃক শক ক্ষত্রপদের পরাজিত করার সময় থেকে শকাব্দ শুরু ('Text Book of Indian Epigraphy', Murty, P 67-68)

বিক্রমাব্দ

এর সঙ্গে ৫৬ (বা ৫৮) যোগ দিলে খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায় ।

ত্রিপুরাব্দ

বিশ্বকোষের মতে পার্বত্য স্বাধীন ত্রিপুরায় প্রচলিত এই অব্দ ৬২১ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ হয় । বঙ্গাব্দ আরম্ভ ৫৯৩ খ্রীষ্টাব্দে । অতএব বঙ্গাব্দ ও ত্রিপুরাব্দের মধ্যে পার্থক্য ২৮ বৎসর । কিন্তু একাধিক বাংলা পুঁথিতে যে ত্রিপুরাব্দের উল্লেখ দেখা যায় তা বিশ্বকোষের অভিমত সমর্থন করে না । বাংলা পুঁথির ত্রিপুরাব্দ বঙ্গাব্দের সঙ্গে ৩ বৎসব যোগ দিলেই পাওয়া যায় । দৃষ্টান্ত-'১২২৮ বা ১২৩১ ত্রি', কলমী পুঁথির বিবরণ ১৫/৫, মহাভাবত ঐষীক পর্ব, সঞ্জয় ।[৮] মতান্তরে ৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরারাজ্যে মহারাজ বীররাজ কর্তৃক এই ত্রিপুরাব্দ প্রচলিত হয় । এ হেতু ত্রিপুরাব্দের সঙ্গে ৫৯০ যোগ করলে খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায় ।[৯] যেমন, ১২৪৪ ত্রিপুরাব্দ +৫৯০=১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দ। ত্রিপুরাব্দ+৫১২=শকাব্দ ।

দানিশাব্দ

বঙ্গাব্দ থেকে ১১৫৭ বিয়োগ দিলে দানিশাব্দ পাওয়া যায় । দানিশাব্দের সঙ্গে ১৭৫০ যোগ কবলে খ্রীষ্টাব্দ হয় । দানিশাব্দ +১১৫৭=বঙ্গাব্দ ।

অমলি সন

'মেদিনীপুর অঞ্চলে ব্যবহৃত অমলি সনের উল্লেখ বিশ্বকোষে আছে । তাহাতে খ্রীষ্টাব্দ ও অমলি সনের পার্থক্য ১৫৫৫ বৎসর নির্দেশ করা হইয়াছে । ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে অমলি সনের শুরু' ।[১০] কখনও কখনও সন ও বঙ্গাব্দ একই । বঙ্গাব্দ বলতে গিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে শকাব্দ বা শকাব্দ বলতে গিয়ে কখনও কখনও বঙ্গাব্দও বলা হয়েছে, তেমনি অমলি সনকে বঙ্গাব্দও বলা হয়েছে। দৃষ্টান্ত ঃ (ক) 'সন ১১৮৫ অমলি শকাব্দা ১৭০০ সালে লিখা হইল', বি. ভা ৯০১ । ভাগবত ১ম স্কন্ধ, সনাতন বিদ্যাবাগীশ ।[১১] (খ) মাহ আষাঢ় ১৫ সস ১১৮৫ অমলি সকাব্দা ১৭০০ সালে সমাপ্ত তেসাং ।।' বি. ভা. ৯০৩ । ভাগবত ৩য় স্কন্ধ, সনাতন বিদ্যাবাগীশ ।[১২] এই দুটি ক্ষেত্রে শকাব্দ ১৭০০ পাওয়া যাচ্ছে । শকাব্দ ১৭০০ =১১৮৫ বঙ্গাব্দ । এখানে অমলি ও বঙ্গাব্দ একই ।[১২] (গ)'তাং ২০ মাহ ফাল্গুন সন ১২৩০ অমলি ইতি ।।' বি. ভা. ৯২০ । মহাভারত, কর্ণপর্ব, কাশীরাম দাস । এখানে, অমলি ১২৩০ বিশ্বকোষের নির্দেশিত অমলি সাল হলে ১৫৫৫ +১২৩০=২৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দ হয় । সুতরাং এক্ষেত্রেও অমলি বলতে বঙ্গাব্দকেই বোঝানো হয়েছে।[১৪]

মল্লাব্দ বা বিষ্ণুপুরী সন

বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুবের মল্লরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আদিমল্ল ৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দ বা ১০১ বঙ্গাব্দে রাজ্য স্থাপন করেন । সুতরাং সেই সময় থেকেই মল্লাব্দ গণনা করা হয় । মল্লাব্দের সঙ্গে ৬৯৪ (মতান্তরে ৫৯৬) যোগ করলে খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায় । আবার, বঙ্গাব্দ - ১০১ =মল্লাব্দ ।

চৈতন্যাব্দ

১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হন । সেইদিন থেকে

বৈষ্ণবসমাজে চৈতন্যাব্দের ব্যবহার শুরু হয়। বৈষ্ণব পুঁথি ও লিপিমালায় বহুক্ষেত্রেই চৈতন্যাব্দের ব্যবহার হয়েছে। চৈতন্যাব্দের সঙ্গে ১৪৮৬ যোগ করলে খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যাবে।

হিজরী সন

ইসলাম ধর্ম প্রবর্তক হজবত মহম্মদ ৬২২ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই জুলাই মক্কা ছেড়ে মদিনায় চলে যান। সেদিন থেকেই হিজরী সন গণনা করা হয়। হিজরী সনেব সঙ্গে ৬২২ যোগ করলে খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। খলিফা উমর (৬৩৩-৪৪ খ্রীঃ) এটির প্রবর্তক। আরবী, পারসীক, সংস্কৃত ও বাংলা লিপিতে এটি ব্যবহৃত।

লক্ষ্মণাব্দ

রাজা বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেন ১১১৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহন কবেন। সেদিন থেকেই লক্ষ্মণাব্দ গণনার শুরু। লক্ষ্মণাব্দের সঙ্গে ১১১৮ যোগ করলে খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়।

গাঙ্গ অব্দ

ওড়িশা অঞ্চলে বহুল ব্যবহৃত। পূর্ব-গঙ্গ বাজারা এর প্রবর্তক। নানা অভিমতে ৪৭৫ খ্রীঃ, ৪৯৭ খ্রীঃ, ৫০৪ খ্রীঃ থেকে এর শুরু। সম্প্রতি পণ্ডিতরা এর সঙ্গে ৪৯৬ যোগ করে খ্রীষ্টাব্দ নির্ণয করছেন।

সিংহাব্দ

গুজরাটের কাথিয়াবাড় অঞ্চলে প্রচলিত। ১১১৩ বা ১১১৪ খ্রীঃ থেকে প্রচলিত।

বঙ্গাব্দ

পণ্ডিত সিলভ্যাঁ লেভি অনুমান করেছিলেন, বাঙ্গলা অব্দের সঙ্গে তিব্বতের বাজা স্রঙ্সনগামপোর নামের অংশ 'সন' কথাটি থাকে বলে ঐ রাজার রাজ্যাভিষেক থেকে (৫৯৫ খ্রীঃ) বঙ্গাব্দের শুরু। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের কোন পাথুরে প্রমাণ নেই। 'সন' আরবি শব্দ। 'সাল' ফারসী শব্দ। কোন কোন অভিমতে গৌড়রাজ শশাঙ্ক এই অব্দের প্রচলন করেন। কিন্তু মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষদের শশাঙ্ক-রাজত্বকালীন তাম্রশাসনে 'সম্বৎ৮' ও 'সম্বৎ১০' এর উল্লেখ আছে, বঙ্গাব্দ উল্লিখিত হয় নি। শশাঙ্কেব অধীনস্থ রাজা মাধববর্মণেব গঞ্জাম লিপিতে 'গুপ্তাব্দ' লেখা হয়েছে। এমন কী শশাঙ্কের সময় থেকে পরবর্তী হাজাব বছরের মধ্যে রচিত কোন লিপিতেই 'বঙ্গাব্দ' নেই। সুতরাং শশাঙ্ক থেকে বঙ্গাব্দের প্রচলন হয় নি। পূর্বভারতের কৃষিনির্ভর রাজস্ব সংগ্রহের, সুবিধের কথা ভেবে সম্রাট আকবর বঙ্গাব্দ প্রবর্তন করেন। সম্ভবতঃ বাংলার হিন্দু প্রজাদের কাছ থেকে ইসলামী 'হিজরা' অব্দ উল্লেখে রাজস্ব আদায় বাধাপ্রাপ্ত হয়ে থাকবে। তাই 'বঙ্গাব্দ' প্রবর্তনের মধ্যে দিয়েই হিন্দু প্রজাদেব আনুগত্য লাভ সহজ হয়। বঙ্গাব্দের সঙ্গে ৫৯৩ বা ৫৯৪ যোগ করলে খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায় (এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা দ্রষ্টব্য : 'বঙ্গাব্দের উৎসকথা', সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সনের সূচনা কবে থেকে' ; প্রবন্ধ, ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, দেশ, ১৩মে, ২০০০; 'বাংলা সনের উৎস বিতর্ক,' সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পত্র, দেশ, ৩০ অক্টোঃ ২০০০')।

ফসলি সাল

বাংলা দেশ বিজয়ের পর বাদশাহ আকবর বাংলার বারো ভূঞাদের বিরোধিতা, মুসলীম অসন্তোষ, খণ্ড খণ্ড বিদ্রোহ ইত্যাদির মুখোমুখি হন। রাজস্ব আদায় ও শাসনকার্যের সুবিধের কথা ভেবে, রাজস্বসচিব টোডরমলের পরামর্শে তিনি সম্রাট হবার ২৯তম সৌর বৎসরে (১৫৮৫ খ্রীঃ,৯৯২ হিজরী) পূর্বভারতের বিভিন্ন সুবায় এই অব্দ প্রবর্তন করেন। এটি ফসলের সঙ্গে যোগ রেখে প্রবর্তিত হয়। এটি হিজরী সনেরই নামান্তর। বাঙালী হিন্দুরা ধর্মীয় কারণে (হিজরী সনের মাসগুলির দিনসংখ্যার মত এর দিনগুলি ছিল) এই সাল মানতে চান নি। তাই তিনি ফসলি সালেব প্রথম মাস 'কুয়া'র (আশ্বিন) পরিবর্তে বৈশাখ মাসকে বৎসবের প্রথম মাস ধরে ৯৯১ বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ (১৫ এপ্রিল, ১৫৮৪) থেকে সৌর অব্দ বঙ্গাব্দ প্রবর্তন করেন। তবে, পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশেও এর ব্যবহার হোত বলে জানা গেছে।

মঘী সন

ব্রহ্মদেশে মঘীসন প্রচলিত। কোন এক আরাকান রাজ ৬৩৮ বা ৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দে এই সন প্রবর্তন করেন। সুতরাং মঘীসনের সঙ্গে ৬৩৮ (বা ৬৩৯) যোগ করলে খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। চট্টগ্রাম এলাকা থেকে সংগৃহীত পুঁথিতে সাধারণতঃ এই সন দেখা যায়। বঙ্গাব্দ -৪৫ =মঘী সন।

নেপাল সংবৎ

৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে নেপাল সংবৎ প্রবর্তিত হয়েছে। তাই নেপাল সংবতের সঙ্গে ৮৮০ যোগ করলে খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়।

গুপ্ত সংবৎ

এই সনটির সঙ্গে ৩১৯ যোগ করলে খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়।

হর্ষ সংবৎ

এর সঙ্গে ৬০৬ যোগ করলে খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়।

বিলায়তী সন

এর সঙ্গে ৫৯২ যোগ করলে খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়।

সম্বৎ

খ্রীষ্টজন্মের ৫৭ বৎসর আগে উত্তর ভারতের কোন রাজা এই অব্দের প্রবর্তন করেন। তাই সম্বৎ থেকে ৫৭ বিয়োগ দিলে খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। বঙ্গাব্দের ৬৫০ বৎসর পূর্বে এটি শুরু হয়েছে। তাই বঙ্গাব্দ +৬৫০ =সম্বৎ।

মন্দারণ সন[১৫]

রাজড়া সন +১০১ =মন্দারণ সন।

রাজড়া সন[১৬]

মন্দারণ সন - ১০১ =রাজড়া সন।

রাজ সন[১৭]

বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর অঞ্চলে লেখা,পুঁথিতে রাজসন, বিষ্ণুপুরী সন ও মল্লাব্দে কোন পার্থক্য নেই।

যবননৃপতে শকাব্দ

আকবরের সময় প্রবর্তিত । এটি বঙ্গাব্দের নামান্তর ।[১৮] কোচবিহার স্টেট লাইব্রেরির নারায়ণ দ্বিজ রচিত 'নারদীয় পুরাণে' (নং ২৮) এই সাল উল্লিখিত ।

রত্নপীঠস্য নৃপতি শকাব্দ

'প্রাচীন কামরূপ রাজ্য চারিপীঠে বা ভাগে বিভক্ত । কামপীঠ, রত্নপীঠ, স্বর্ণপীঠ, সৌমার পীঠ। বর্তমান কোচবিহার অঞ্চল রত্নপীঠের অন্তর্গত । রত্নপীঠস্য নৃপতি শকাব্দ বলিতে কোচবিহাব রাজ্যশকই বুঝাইয়া থাকে ।'[১৯] রাজশক ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আরম্ভ হয় ।[২০]

সদর সন

এটি বঙ্গাব্দের নামান্তর । অর্থাৎ, সদর সন +৫৯৩ বা ৫৯৪ = খ্রীষ্টাব্দ ।

জমিদারী সন

এর সঙ্গে ১০১ যোগ করলে বঙ্গাব্দ হয় । তারপর ৫৯৩ বা ৫৯৪ যোগ করলে খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায় । অর্থাৎ, জমিদারী সন+৬৯৫ = খ্রীষ্টাব্দ ।

নছরৎশাহী সন

বঙ্গাব্দ +২ = নছরৎশাহী সন । হুসেন শাহের পুত্র নসরৎশাহ এর প্রবর্তক ।

কলচুরি সংবৎ

মধ্যপ্রদেশেব বস্তার ও জব্বলপুর অঞ্চলের চেদী রাজ্যের শাসক ছিলেন কলচুরি রাজারা । কীলহর্নের মতে ২৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ আগষ্ট থেকে এঁদের রাজত্ব শুরু । সুতরাং এর সঙ্গে ২৪৯ যোগ কবলে খ্রীষ্টাব্দ হয় ।

এছাড়া 'লিচ্ছবি অব্দ', 'বল্লভ অব্দ' , কোল্লাম অব্দ', 'সপ্তর্ষি অব্দ', 'জৈন নির্বাণ', 'বুদ্ধ নির্বাণ' ইত্যাদি অব্দও প্রচলিত ছিল । আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত 'খ্রীষ্টাব্দ' একনজরে এইভাবে প্রাপ্তব্য ঃ-

শকাব্দ +৭৮ । বিক্রমাব্দ +৫৬ বা ৫৮ । চালুক্য বিক্রমাব্দ +১০৭৫ । ত্রিপুরাব্দ +৫৯০ । দানিশব্দ +১৭৫০ । অমলিসন +৫৯৪ । গাঙ্গ অব্দ +৪৯৬ বা ৪৯৮ । মল্লাব্দ +৬৯৪ বা ৬৯৬। চৈতন্যাব্দ +১৪৮৬ । হিজরী সন +৬২২ । লক্ষ্মণাব্দ +১১১৮ । সিংহাব্দ +১১১৩ বা ১১১৪। বঙ্গাব্দ +৫৯৩ বা ৫৯৪ । ফসলি সন +৬২২ । মঘীসন +৬৩৮ বা ৬৩৯ । নেপাল সংবৎ +৮৮০ । গুপ্ত সংবৎ +৩১৯ । হর্ষ সংবৎ+ ৬০৬ । বিলায়তী সন +৫৯২ । সম্বৎ - ৫৭ । কলচুরি সংবৎ +২৪৯। এছাড়াও, বীরনির্বাণ সংবৎ (- ৫২৭), 'বুদ্ধনির্বাণ অব্দ' (- ৪৮৭),'মৌর্যসংবৎ' (- ৩২০), 'সেলুকিডি সংবৎ' (- ৩১২), 'ভাটিক সংবৎ' (+৬২৩), 'পড়ুবৈপ্পু সংবৎ' (+১৩৪০), রাজ্যাভিষেক সংবৎ (+১৬৭৩), 'উত্তরী ফসলি সন' (+৫৯৪), 'দক্ষিণী ফসলি সন' (+৫৯০, 'ইলাহী সন' (+১৫৫৫) থেকেও খ্রীষ্টাব্দ নির্ণয় করে নিতে হয় ।

(ক) খ্রীষ্টাব্দ-বঙ্গাব্দ-বিষ্ণুপুরী ঃ 'সন ১৮২৫ সাল তারিখ বাঙ্গালা সন ১২৩২ সাল । তারিখ ২০ আসার সন বিষ্ণুপুরী ১১৩১ সাল' । ক. বি. ৩৬৮৭ । মহাভারত-গদাপর্ব কাশীরাম দাস । (খ) খ্রীষ্টাব্দ- বঙ্গাব্দ-মঘী ঃ 'ইতি সন ১২১৩ সাল বাঙ্গালা সন ১১৬৮ মঘি সন ১৮০৬ ইংরেজীতারিখ ২২ ফিবরেল ১২ ফাল্গুন বাঙ্গালা তারিখ ইংরেজী রোজ রবিবার রাত্রি ছ এ ডন্ড সম এ পুস্তক লিখনং সমাপ্ত ।' সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী ।

(গ) খ্রীষ্টাব্দ-বঙ্গাব্দ-মল্লাব্দ ঃ 'ইতি সন ১২৩২ সাল তাবিখ ৬ আগষ্ট, মল্ল সন ১১৩১ সাল ইঙ্গরেজী সন ১৮২৫ সাল তারিখ ১৯ জুন ।' ক. বি. ৩৬৮৮ । মহাভারত শল্যপর্ব, কাশীরাম দাস ।

(ঘ) খ্রীষ্টাব্দ-বঙ্গাব্দ-শকাব্দ ঃ 'সন ১২০৮ সন বারসত্ত আট সাল, তারিখ ১৬ সোলাগ্রি জৈষ্ঠী রোজ.....ইতি সকাব্দা ১৭২৩ সতের সও তেইস সক ইঙ্গিরাজী সন ১৮০১ আঠার সও এক সাল ।' ক. বি. ১৩৮৩ । মহাভারত আদিপর্ব, কাশীরাম দাস ।

(ঙ) যবননৃপতে- শকাব্দ-রত্নপীঠস্য - নৃপতে শকাব্দঃ 'সাকে ১৭২৩ যবন নৃপতে সকাব্দ । ১২০৮ বত্নপীঠস্য নৃপতে সকাব্দা ২৯২ ।' নাবদীয় পুরাণ-নারায়ণ দ্বিজ ।

চারটি অব্দ উল্লেখ করা হয়েছে এরূপ পুঁথির দৃষ্টান্ত —

(ক) খ্রীষ্টাব্দ-জমিদারী-বঙ্গাব্দ-শকাব্দ ঃ 'শকাব্দ ১৯৫৮ সক সন ১২৪৩ সাল জমিদাবী সন ১১৪২ সাল ইঙ্গরাজী ১৮৩৬ সাল তারিখ ৬ জৈষ্ঠী সনিবাব ১৮ মারচ ।' ক. বি. ২১৭০ মহাভারত মুসলপর্ব-কাশীরাম দাস ।

(খ) খ্রীষ্টাব্দ-বঙ্গাব্দ-মঘী-শকাব্দ ঃ

''ইতি সন ১৭৩৯ শকাব্দা সন ১২২৪ বাঙ্গালা, সন ১৮১৭ ইংরেজী সন ১১৭৯ মঘী তারিখ ১৭ জৈষ্ঠ রোজ বৃহস্পতিবার তিথি চতুর্দশী' নিত্যমঙ্গলচণ্ডিকার পাঁচালী ।

(গ) মঘীসন-ইংরেজীসন-বাংলাসন-শকাব্দ ঃ

'ইংরেজী শাকের কথা কর অবদান । অধভাগে বঙ্গসন করিমু বয়ান ।।
ছলছা আর্দ্ধালই রুদ্র জোগকরি । তাহার দক্ষিণে আদ্রা রাখিলাম জরি ।।
অতিরাত্র গগন রাখিবা তার পীঠে । ইংরেজী শকাব্দ এই বুজবুধ শ্রেষ্ঠে ।। জানবি মাহে.....।'

-'পদ্মাবতী-আলাউল' (ঢা. বি. ২৬৭) ।

অবশ্য, বঙ্গাব্দ, শকাব্দ, মল্লাব্দ, হিজরী, চৈতন্যাব্দ যে পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে, অন্যান্যগুলি সেইভাবে ব্যবহৃত হয় নি । সেগুলির ব্যবহার আঞ্চলিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল । এইসব সালতারিখ যেমন সহজসরল গদ্য বা পদ্যে লেখা হয়েছে তেমনি হেঁয়ালীর মাধ্যমে শ্লোকের আকারেও লেখা হয়েছে, সুকুমার সেন যাকে 'কবি শশাঙ্ক' বলেছেন -তা সে বাংলা বা সংস্কৃত, যে পুঁথিই হোক না কেন । সেইসব শ্লোকের শব্দার্থ উদ্ধার করে যেমন 'অঙ্কস্য বামাগতি'র অনুসরণ ঘটে, তেমনি 'দক্ষিণগতিও' অনেক সময় প্রয়োজন হয় ।

বাংলা রামায়ণের আদি কবি কৃত্তিবাস লিখেছেন 'আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুণ্যমাঘ মাস ।' বোঝা গেল, আদিত্য = সূর্য; মাঘমাসের পঞ্চমী তিথিতে সূর্যবার বা রবিবারে কবির জন্ম। অব্দটির উল্লেখ নেই । তাই কবির জন্মসালও আমাদেব আজানা । কিন্তু বিজয়গুপ্ত তাঁর 'মনসামঙ্গলে' স্পষ্টই উল্লেখ করেছেন-

'ঋতু শশী বেদ শশী পরিমিত শক । সুলতান হুসেন শাহ নৃপতি তিলক ।।'

ঋতু =৬, শশী =১, বেদ =৪ অনুযায়ী দক্ষিণ দিক থেকে বামে সাজিয়ে ১৪১৬ শকাব্দ হয় । এব সঙ্গে ৭৮ যোগ করলে পাওয়া যাবে ইংরেজী সাল বা খ্রীষ্টাব্দ । এটিই কবিব কাব্য রচনার কাল। 'মনসামঙ্গলের' আর এক কবি বিপ্রদাস পিপলাই লিখেছেন-

'সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ । নৃপতি হুসেন শাহ গৌড়ের সুলতান ।।'

সিন্ধু =৭, ইন্দু =১, বেদ =৪, মহী =১ । অঙ্কের বামগতি অনুযায়ী ১৪১৭ শকাব্দ (হুসেন শাহের রাজত্বকাল) বা ১৪১৭ +৭৮ =১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দ কবির কাব্য রচনার কাল ।

দ্বিজবংশীদাসের 'মনসামঙ্গলের' রচনাকাল নিম্নরূপ -

'জলধির মাঝেতে ভুবনমাঝে দ্বার । শকে রচে দ্বিজবংশী পুরাণ পদ্মার ।।'

জলধি =৭, দ্বার =৯, ভুবন =১৪, । এই অনুযায়ী ১৪৯৭ শকাব্দ বা ১৪৯৭ +৭৮ = ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দ কবির কাব্য রচনার কাল ।

যদিও পণ্ডিতগণ এই সাল মানতে চান না, তবুও কবিকঙ্কণ চণ্ডীর কোন কোন পুঁথির নিম্নরূপ কালনির্দেশটি আলোচ্য -

'শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা । কতদিনে দিলা গীত হরের বণিতা ।।'

রস =৬, বেদ =৪, শশাঙ্ক =১, অনুযায়ী ১৪৬৬ শকাব্দে কবিব চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচিত হয় । রূপরাম চক্রবর্তীব ধর্মমঙ্গল কাব্যের রচনাকাল নিম্নরূপ -

'তিনবাণ চারিযুগে বেদ যত রয । শাকে সনে জড় হৈলে কত শক হয ।।
রসেব উপর রস তাহে রস দেহ । এই শাকে গীত হৈল লেখা কর্যা লহ ।।'

তিনবাণ = ৫ x ৩ = ১৫, চারিযুগ = ৪ x ৪ = ১৬, অর্থাৎ ১৫১৬ শকাব্দ । এ থেকে ৪ বা বেদ বিয়োগ দিলে থাকে ১৫১২ শকাব্দ । এটিই কবির কাব্যবচনার কাল হতে পারে । কিন্তু রস, রস, রস =, ৯৯৯, এটি হিজরী সন সম্ভবতঃ । হিজরী সনের সঙ্গে ৬২২ যোগ করে যেভাবে খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায় তা কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে না । সুতরাং পুঁথির এই কালনির্দেশে কোন ভুলত্রুটি থাকতে পারে । খেলারামের 'ধর্মমঙ্গলে'ব রচনাকাল নিম্নরূপ -

'ভুবন শকে বায়ুমাস শরের বাহন । খেলারাম করিলেন গ্রন্থ আরম্ভন ।।'

ভুবন =১৪, বায়ু =৪৯, শরের বাহন ধনু =৯ বা পৌষমাস । অর্থাৎ ১৪৪৯ শকাব্দের পৌষমাসে কবি গ্রন্থ রচনা শুরু করেন ।

দ্বিজ রামদেবের 'অভয়ামঙ্গল' রচনার সময়কাল নিম্নরূপ -

'ইন্দু বাণ ঋষি বাণ শক নিয়োজিত । বচিলেক রামদেব সারদা চরিত ।।'

ইন্দু =১, বাণ =৫, ঋষি =৭ অনুযায়ী ১৫৭৫ শকাব্দ ।

নিত্যানন্দ চক্রবর্তীর 'শীতলামঙ্গল' রচনার কাল -

'সনেতে রাখিয়া শিব রসে দিয়া বিধু । নিত্যানন্দ রচে গান অক্ষরে অক্ষরে মধু ।।'
শিব বা রুদ্র =১১, রস =৬, বিধু =১ । সুতরাং ১১৬১ সন বা বঙ্গাব্দে কবির কাব্য রচিত হয়। প্রাণরাম কবিবল্লভের কাব্য রচনার কাল নির্দেশ নিম্নরূপ -

'শকে বসু বসু বাণ চন্দ্র সমন্বিত । কালিকামঙ্গল তথি হইল বিদিত ।।
বসু = ৮, বাণ =৫, চন্দ্র =১ অনুযায়ী ১৫৮৮ শকাব্দ কবির কাব্য রচনার কাল ।
'পঞ্চাননমঙ্গল', 'শীতলামঙ্গল', ইত্যাদি পুঁথি রচয়িতা শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর লিখেছেন -

'মহীর পিষ্ঠে মহী দিয়া গিরিবর । গগণে উঠিয়া গীত রচিল কিঙ্কর ।
বামেতে রাখিয়া অঙ্ক বুঝহ পণ্ডিত । চন্দ্রচূড় বলে কত কালের কবিত ।।'

মহী=১, গিরি=৭, গগণ=০, অনুযায়ী ১১৭০ বঙ্গাব্দ কবির কাব্যরচনার কাল । এখানে বাম থেকে দক্ষিণে অঙ্ক সাজিয়ে নেবার কথা কবিই বলে দিয়েছেন ।
এক নবাবিষ্কৃত কবি শঙ্কর তাঁর 'শীতলামঙ্গল' কাব্য রচনার কাল স্পষ্ট করেই উল্লেখ করেছেন-

'সন এগার-চুয়াল্লিশ সালে শুক্রবার সন্ধ্যাকালে
শুক্লপক্ষ আটাশ্যা আশ্বিনে ।।'

মঙ্গলকাব্যধারার সর্বশেষ কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' রচনার কাল নিম্নরূপ-

'বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরুপিলা ।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা ।।'

বেদ =৪, ঋষি =৭, রস =৬, ব্রহ্ম =১ অনুযায়ী 'বামাগতি' সূত্রানুসারে ১৬৭৪ শকাব্দ ।

এ তো গেল কবিদের কাব্যরচনার কাল । যে সমস্ত লিপিকর পুঁথি নকল করতেন, তাঁরাও সুকৌশলে পুঁথি নকলের সাল তারিখ নির্দেশ করতেন লিপিকৃত পুঁথির পুষ্পিকাপত্রে । উড়িষ্যায় লিপিকৃত কবিকঙ্কণ চণ্ডীর (বিশ্ব. নং ৯১৬) একটি পুঁথির লিপিকর মহাগ্রাম নিবাসী শ্রীরামপ্রসাদ দাস বোস সংস্কৃত ভাষায় বঙ্গাক্ষরে লিখেছেন -
''কবিকঙ্কণেন যত্নকৃতং গ্রন্থং তৎসম্পূর্নং ।। শুভমস্তু শকাব্দা ১৭৩৯ সৌর শ্রাবণেস্য বিংশতি দিবসে দিবা এক দণ্ড সময়ে ছায়াসুতবারে পঞ্চম্যাং তিথু কর্কটলগ্নে সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ সন ১২২৪ সাল ।।''
অর্থাৎ ১৭৩৯ শকাব্দের শ্রাবণমাসের ২০ তারিখ শনিবার (সূর্যের স্ত্রী ছায়ার পুত্র শনি) দিবা এক দণ্ডে পুঁথির অনুলিপি করা শেষ হয় ।

লিপিকর কর্তৃক পুঁথি-পাণ্ডুলিপি লিপিকরণের কাল

বাংলা পুঁথির লিপিকবরা বিভিন্নভাবে পুঁথি লেখার সময়কাল নির্দেশ করেছেন । এ থেকে সংশ্লিষ্ট পুঁথিটি কোন সময়ের লেখা, তা সহজেই জানা যায় ।

১. অঙ্ক লিখে কাল নির্দেশ

(ক) সন ১০৫৯ সাল তাং ১৯ ভাদ্র । সা. প ১৭৩ । গোবিন্দ বিজয় মণিহরণ-গুণরাজ খান। (খ) সন ১১৯২ সাল তাং ৫ জৈষ্ঠ্য । বি. ভা. ৩৬ । হংসদূত-নরসিংহ দাস । (গ) সন ১১১৪ সাল তারিখ ২৫ বৈশাখ । এ. সো. ৪৮৫৩ । প্রহ্লাদ চরিত্র-শ্রীমন্ত দাস । (ঘ) সন ১২৭৫ সাল তাং ৭ মার্গ রোজ শনীবার । ম. স. ৩ । গঙ্গারচরিত্র- অখিঞ্চন দাস ।

২. কথায় কাল নির্দেশ

(ক) 'বারসও চৌতিষ সাল' ক. বি. ৪০৪৬। মহাভারত-অশ্বমেধ পর্ব- কাশীরাম দাস। (খ) 'এগার সও একাসি সাল' ক. বি. ১৭০৮। মহাভারত শান্তিপর্ব- নিত্যানন্দ ঘোষ। (গ) 'সতের শত বেয়াল্লিশ পরিমাণে শক।' সা. প. ২৫১। চৈতন্যচরিতামৃত আদিখণ্ড-কৃষ্ণদাস কবিরাজ (১৭৪২ শক =১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ)।

৩. কবি শকাঙ্কের মাধ্যমে কাল নির্দেশ

(ক) 'অতঃপর কহী সুন সন বিবরণ। গোপালের (১২) পীষ্ঠে অম্বর (০) সোভন।। দক্ষিণেতে গ্রহ (৯) করিয়া সাজন। সিংহ রাষ্যে (ভাদ্রমাস) পুঁথি সাঙ্গ সুন সর্ব্বজন।। রুদ্রান্তক (১২) রোজ হইল কি বলিব আর। কুহান্তক (শুক্লপক্ষ) হইয়া প্রতিপদ সার।।' ক. বি. ২৭০০। মহাভারত শল্যপর্ব- কাশীরাম দাস। অর্থাৎ ১২০৯ সনে ভাদ্র মাসের ১২ তারিখ শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে পুঁথি লেখা হয়। এখানে 'অঙ্কস্য বামাগতি' অনুসরণ করা হয় নি (য. ভ.পৃঃ ৩৭৬)। (খ) 'ভাস্কর (১২) দক্ষিণপানে নেত্র (৩) বসাইআ। তার ডাইনে বসু (৮) রাখি জত্তন করিআ।। ঋতু (৬) বসু (৮) দিন জান বিশ্চিক (অগ্রহায়ণ) মাসের। লিখন সমাপ্ত রোজ গুরু অসুরের (শুক্র)।।' আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংগ্রহ, ঢাকা। - গরকির বচন (য. ভ. পৃঃ ৩৭৬ -ওয়াজুদ্দিন চৌধুরী। অর্থাৎ ১২৩৮ মঘী, অগ্রহায়ণ মাসের শুক্রবার পুঁথিটি লেখা হয়। ১২৩৮ + ৬৩৮ =১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ। (গ) 'শূর্য সপ্তেন্দু শাকে চ সিত পক্ষে চ আশ্বিনে।' বি. ভা. ১৪৬১। গোবিন্দলীলামৃত - যদুনন্দন দাস। সূর্য =১২, সপ্ত =৭, ইন্দু =১। বামদিক থেকে, ১৭২১ শকাব্দের আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে পুঁথিটি লেখা হয়। (ঘ) 'সাকে সিন্ধাগ্নিবাণেন্দৌ। লিখিতং শ্রীরাধাচরণদাস শর্ম্মণস্য।।' সা. প. ২৫০। চৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যখণ্ড - কৃষ্ণদাস কবিরাজ। সিন্ধু =৭, অগ্নি =৩, বাণ =৫, ইন্দু =১। ১৫৩৭ শকাব্দ =১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দ। (ঙ) 'রুদ্রপীঠে সমুদ্র সমুদ্র পিঠে বাণ। সনের গণনা এই বুঝ সাবধান।।' বি. ভা. ৮৪৮। প্রহ্লাদচবিত্র - ভরত পণ্ডিত। রুদ্র =১১, সমুদ্র =৭, বাণ =৫,। এখানে 'বামাগতি' নিয়ম অনুসরণ করা হয় নি। এটি ১৫৭৫ বঙ্গাব্দ বা ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দ।

৪. অব্দ উল্লিখিত হয় নি। কেবল তারিখ ও মাস নির্দেশ

(ক) 'তারিখ ২৩ ফাল্গুণে সাকিম সনামুখী লিখিতং শ্রীবংশীদাস বাউল।।' এ. ৪৯৪২। আনন্দলহরী - মুকুন্দ দাস। (খ) 'ইতি তারিখ ২৯সে বৈশাখ।' এ. ৫৪৩৪। তত্ত্বমঞ্জরী - বৃন্দাবনদাস। (গ) 'তারিখ ৩১শে অঘাণ মৌজে সোণামুখী....।' এ. ৪৮৬৯। প্রেমদর্পণ - জগন্নাথ দাস। (ঘ) 'ইতি তারিখ ২০ অগ্রহাঅণ।' ক. বি. ৪৪। রামায়ণ অরণ্যকাণ্ড - কৃত্তিবাস।

৫. অঙ্ক ও অক্ষরযোগে একই কালনির্দেশ

(ক) 'ইতি সন ১২৫৭ বারসও সাতান্ন সাল তারিখ ১৪ অগ্রহায়ন।' বি. ভা. ১১৯। গোবিন্দমঙ্গল - কৃষ্ণদাস। (খ) 'ইতি সন ১১১১ এগার সও এগার সাল তারিখ ১১ই ভাদ্র।' এ. ৩৫৮৬ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা - নরোত্তম দাস। (গ) 'সন ১১২৫ এগার সও পুচিস সাল।। তাং ৩১ জ্যোষ্টি পঞ্চম্যাস্তিথৌ।।' সা. প. ৩১৮। তত্ত্ববিলাস - বৃন্দাবন দাস। (ঘ) 'তারিখ ৪

চৌটা শ্রাবণ । রোজ মঙ্গলবার বেলা এক প্রহরে সমাপ্ত হইল । সন ১১৯৯ নিরানব্বই সাল আখেরী ।' ব. বি. ১৪ । সুখদেবচরিত - যদুনাথ দাস । (ঙ) 'ইতি সন হাজার ৭৮ সাল তারিখ ১৭ ই সতরঙ আষাঢ় সাকিম দক্ষিণখণ্ড ।.....১লা আশ্বিন নকল হইল ।'বি. ভা. ১৭০৮ । মহাযোগতত্ত্বসার । (চ) 'ইতি শ্রীতাং সন ১২৫৮ সাল বার সর্ত্ত আটার্ন সাল মাহ আশ্বিন ।। ১০ আশ্বিন রোজ বৃহস্পতিবার রাত্রি ৪ চারিদণ্ডে সমাপ্ত ।' ইতি ।। বি. ভা. ৭২৩ । অঙ্গদের রায়বার - কৃত্তিবাস। (ছ) 'সন ১২ স ৪৫ সাল ।' ক. বি. ১৫৩০ । মহাভারত সৌপ্তিক পর্ব - কাশীরাম দাস । (জ) 'ইতি সন ১১১১ এগার শও এগার সাল তাবিখ ১৮ই শ্রাবণ ।' এ. ৩৭৪৭। নামসংকীর্ত্তন - নরোত্তম দাস । (ঝ) ইতি সন ১২৪৬ বার সও ছেচাল্লিষ সাল তারিখ ২১ বৈশাখ সুক্রুবার । এ. ৪৯২৬ । নিগম - গোবিন্দ দাস। (ঞ) 'ইতি । সন বার ১২ সয় ৩৬ সাল ১১ কার্ত্তিক সমবার তিথি চতুদ্দসি ।' বি. ভা ১০০৬ । অন্নদামঙ্গল (কালীব্রত) - ভারতচন্দ্র।

৬. একই কাল নির্দেশে বিভিন্ন অব্দ

(ক) 'ইতি সকব্দা ১৭২৮/৪/৩১ ।। সন ১২১৩ সাল তারিখ ৩১ শ্রাবণ ব্রহস্পতিবার ।' বি. ভা. ১৮১ । মনসামঙ্গল - কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ । (খ) 'শকাব্দা ১৭৫৪ সন ১২৩৬ সাল ২১ শে আষাঢ় আরম্ভ ২১ শে শ্রাবণ সমাপ্ত ।' এ. ৪৯০৫ । সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় - মুকুন্দ দাস । (গ) 'শকাব্দা ১৭১৯ সাতর সও উনিশ শাল সন ১২০৩ সাল ..।' এ. ৫৪২৬ । স্মরণদর্পণ - রামচন্দ্র দাস । (ঘ) 'শকাব্দা ১৭০৮ সতেরসও আট ।। মল্লশক সন ১০৯২ সাল ।।' সা. প. ২৩৮ । চৈতন্যচরিতামৃত - কৃষ্ণদাস কবিরাজ । (ঙ) 'সন ১১৩৭ সাল শকাব্দা ১৬৫২ মাহ মাঘ নাগাদি ২৮ রোজ ।' বি. ভা. ১৪৮৭ । দুর্লভসার - লোচন দাস । (চ) 'ইন্দু অদ্রি সেতু সক পরিমান । রস সর পাখা বিধু বঙ্গের প্রমান ।। অত্র ('অভ্র' হবে) বাণ কবি ('করী' = হস্তী) ইন্দু ইঙ্গরেজির সনে। ইন্দ্র চন্দ্র পক্ষ সোম মঘি পরিমানে ।।' উ. ব. ৪৩৯ । চণ্ডীমঙ্গল - দ্বিজ মাধব । 'অঙ্কস্য বামাগতি' অনুযায়ী, বঙ্গাব্দ ১২৫৬ (রস=৬, সর=৫, পাখা=২, বিধু=১), ইংরেজী সন বা খ্রীষ্টাব্দ ১৮৫০ (অভ্র=০, বাণ=৫, করি বা করী=৮, ইন্দু=১), মঘী সন ১২১১ (ইন্দু=১, চন্দ্র =১, পক্ষ =২, সোম =১ । মঘী সন + ৬৩৯ = খ্রীষ্টাব্দ)। শকাব্দ = ১৭৭১ (ইন্দু =১, অত্রি =৭, সেতু =৭,। 'অদ্রি' হবে না)। অবশ্য ১৭৭২ শকাব্দ হলে হিসেবটি যথার্থ হয় ।

৭. কবিতায় লিপিকাল

'পুস্তক লিখন সন/কহি তার বিববণ/সকাব্দ সহিতে মঘি গত । মঘি পরিমাণ ছহি/সহস্রেক চৌরান্নই/সকাব্দা চৌরপন্ন সোল সত ।।' ইউসুফ জোলেখা - শাহ মাহম্মদ সগীর । (খ) 'সাওয়ালের তের রোজ পূর্ণিমাব দিনে । বাবশ আটত্রিশ মঘি কার্ত্তিক পুনি খনে ।। এলাহি গজব ভেজে বাঙ্গালা জামিনে । রোজ মঙ্গলবার ছিল জান সব জনে ।।' গরকীর বচন - ওয়াজুদ্দিন চৌধুরী । (গ) 'জথ হৈল মগি সন লয় (লও) পরিমানি । এক পরে সন্য (শূন্য) ছও পাচ (পাঁচ) দিযা গোনি ।।'-সেখ মনসুরের 'শ্রীনামা' । (ঘ) 'ঋতু নিধি অভ্র আদি হিজরী বহিল । আমির হামজার পুথি সমাপ্ত হইল ।' অর্থাৎ, ১০৯৬ হিজরী বা ১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দ । -আবদুল নবীর 'আমীর হামজা'। (ঙ) 'সন ১২০৪ মঘী যে আছিল । সপ্তমাহে আসার তারীখ তুলী দিল । রোজ সমবার দশ ঘরি রাত্রে । জমা দিল আউল চান্দে বাঢ় তারিখ এ ।'-হায়দর আমেদের 'এলমাজ বাদশার

পুথি'।

৮. বাংলা ও সংস্কৃত ভাষা মিলিয়ে লিপিকাল

(ক) 'সকাব্দে সোড়স সতে সৈকাসীতিসমন্বিতে।। সমাপ্তশ্চায়ং শ্রীচৈতন্যভাগবত আদিখণ্ডঃ।। ইতি সন ১০৮৩ সালে ১৬ অগ্রানে সোমবারে এ পুস্তক লিখ সমাপ্ত হইলেন।' সা. প. ২০৫। চৈতন্যভাগবত আদিখণ্ড - বৃন্দাবন দাস। 'কবি শকাঙ্কের' অর্থ =১৬৯৮ শকাব্দ। (খ) 'ইতি সন ১০৬৩ সাল ভাদ্রস্যাষ্টাবিংশতি দিনে সমাপ্তা। লিখিতা দীন রঘুনাথ দাস।।' এ ৩৭২৫। গোবিন্দরতিমঞ্জরী - ঘনশ্যাম। (গ) 'পুস্তকঞ্চ নিজং জ্ঞেয়ং সাক্ষবঞ্চ নিজং তথা। নিবাসং নাজরা গ্রামং চণ্ডিকা ধ্যান তৎপরং।। সকাব্দা ১৭১৮।' এ. A1.। কবিকঙ্কণ চণ্ডী - মুকুন্দরাম চক্রবর্তী।

৯. লিপিকাল অনুল্লিখিত

(ক) 'শ্রীগুরুসত্য লিখিতং শ্রীপঞ্চানন শর্ম্মা সাকিম পাকতড়্যা গ্রাম মোকাম স্বর্ণমুখী পাঠক শ্রীসনাতন দাস।' এ. ৪৮৬৩। সব্বরসতত্ত্বসার - রসিকদাস। (খ) 'এ পুস্তক শ্রীগোপীনাথ সিংহ সাকিম দত্তপুকুরিয়া সং মিদ। শ্রীশ্রীগোপাল সিংহ।' এ ৩৫৩০। মনসামঙ্গল - বিপ্রদাস পিপলাই। (গ) 'অর্জুনের গুমান সমাপ্ত।। লিখিত শ্রীকাসিনাথ পাল সাং কআপাট পরগণে বগড়িঃ সাষুড়ে।' বি. ভা. ৮৪৯। অর্জুনের গুমানভঞ্জন - দ্বিজ কবিচন্দ্র।

১০. কেবলমাত্র সাল নির্দেশিত। তারিখ অনুল্লিখিত

(ক) 'লিখিতং শ্রীপঞ্চানন সেন ১১৮৫ সাল।' সা প. ১৮৮। একান্নপদ (পদনির্ণয়) - গোবিন্দদাস। (খ) 'তদহং ইতি গ্রন্থ সোমাপ্ত।। সন ১২০০ সন।' সা. প ৩১৩। উপাসনামাহাত্ম্য। (গ) 'ইতি সন ১১৯৪ সাল শ্রীরামসঙ্কর দত্তদাস্য পাঠানার্থে পুস্তকমিতি।।' এ. ৮০২১। ভগবদ্গীতা - রতি দাস। (ঘ) 'সন ১২১২ সাল লিখিতং শ্রীরাজিবর চঙ্গ। সাকিম সানিঘাট মোকাম কৃষ্ণপুর' এ. ৫৩৬১। কালিকামঙ্গল - ভারতচন্দ্র।

১১. অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্ত কালনির্দেশ

(ক) 'সুভমস্তু সকাব্দা ১৭৮ সক ভাদ্রস্য ২৭ সপ্তবিংশতি দিবসে শনিবাসরে।' সা. প. ২১৮। চৈতন্যভাগবত মধ্যখণ্ড- বৃন্দাবন দাস। (খ) 'সুভমস্তু সকাব্দা ১৭০১৭ সক মাহে ২৬ কার্ত্তিক।' সা. প. ৩২৬। তত্ত্বনিরূপণ - বৃন্দাবন দাস। (গ) 'সন ৮৮ আসি বিরাসি ষালঃ।। তারিখ ১৫ বৈশাখঃ।' সা. প. ৩১৬। ভক্তিচিন্তামণি - বৃন্দাবন দাস।

১২. লিপির শুরু ও শেষ নির্দেশ

(ক) 'এই পুস্তক সন ১২৩৯ সনে ৫ আশ্বীন বৃহস্পতিবার বেলা দের প্রহরের সময় সমাপ্ত হইল....তাহার পর সন ১২৫৫ সন মাহে মাঘ মোকাম মধুপুরা জিলে ভুলুয়া সমাপ্ত হইল।' সা. প. ১২২। রামায়ণ উত্তরাকাণ্ড - কৃত্তিবাস। (খ) 'সাকিম পরগণে পাজনেরের সুতারগাছি শকাব্দা ১৭০৫ সতর সও পাঁচ শকের মাহ ফাল্গুনে আরম্ভ আর সতর সও ছয় অগ্রহায়ণে সমাপ্ত হইল।' এ. ৫৪১৯। অন্নদামঙ্গল - ভারতচন্দ্র।

১৩. তিথি নির্দেশ

(ক) 'ইতি তাং ২৪ মাহ ফাল্গুন অর্কবাসরে কৃষ্ণপক্ষে দ্বাদসি গতং ত্রিয়োদসি এই তিথির মধ্যে দিবা তৃতিয় প্রহরে এ পুস্তক লিখিয়া বিশ্রাম দিলাঙ্ ।' বি. ভা. ৯২০ । মহাভারত - কাশীরাম ও অন্যান্য । (খ) 'ইতি তাং ১৪ মাহ বৈশাখ তিথৌ কৃষ্ণা চতুর্দ্দশি ভৌম বাসরে বেলা তৃতিয় প্রহরে মদ্ধে...।' বি. ভা. ৯১৮ । রামায়ণ - কৃত্তিবাস ইত্যাদি ।

১৪. অঙ্কে ও কথায় দুটি পৃথক সাল নির্দেশ

'শকাব্দা ১৬২২ সন হাজার এগার শহ্ ছয় শাল ।' সা. প. ২ । রামায়ণ আদিকাণ্ড - কৃত্তিবাস ।

১৫. ইংরেজী অব্দ নির্দেশ

(ক) 'পাঠকতা স্বরূপলাল দাস সাকিম সিহড় পরগণে খটঙ্গী মতালকে জেলা বিরভাম সন ১৮৩০ (?) সাল তারিখ ১৪ই মারচ মঃ সন ১২৩৬ সাল তারিখ ২রা চৈত্র রোজ রবিবার ।' এ. ৪৯১০ । অর্জুনসম্বাদ । (খ) 'সন ১৮৬৮ তারিখ মাহে ১ জানুয়ারি ।' য. ভ: ৩৭৭ । কৃষ্ণলীলা - শ্রীঈশান । (গ) সন ১৮৪১ ইংরেজীতে লেখা ।

প্রাগুক্ত । মনসার ধূপজাটী । (ঘ) '১৮৭৫ ইং ।' প্রাগুক্ত । অলঙ্কার সংগ্রহ - রাজীবলোচন দাস।

আরবী 'আবজাদ' রীতিতে অনেক পুঁথিতে সাল তারিখ নির্দেশ করা হয়েছে । এটি কবি শকাঙ্কের মতই সংখ্যাবাচক শব্দ ব্যবহারের রীতি । শেখ মুতালিবের 'ফিফায়তুল মুসল্লিন' রচনার কাল এইভাবে নির্দেশিত (ঢা. বি. ৫৭৮) -

'সপ্তমে হইল পুনি এবাদত নাম ।
যেই দিনে সাঙ্গ হইল পুস্তক তামাম ।'

তামাম =৪৮১, এবাদত =৪৭৭, সুতরাং ৪৮১ + ৪৭৭ =৯৫৮ হিজরী (১৫৫১-৫২ খ্রীষ্টাব্দ) কাব্য রচনার কাল ।

সৈয়দ মুহম্মদ আকবর আলির 'জেবল্লমুলুক সামারোখ' (ঢা. বি. ৬১) পুঁথির রচনাকাল নিম্নরূপ ঃ-

'লিখন সমাপ্ত হৈল কাকে ডিম্ব দিল ।
আরবা আনাছের মধ্যে ভাস্কর ভাসিল ।।'

'আরবা (তু) আনাসির' থেকে ১০৮৪ হিজরী বা ১৬৭২ - ৭৩ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায় ('পুঁথি পবিচিতি', আহমদ শরীফ, পৃঃ ১৬০) ।

'জেবলমুলুক সামারোখ' পুঁথির আর একটি লিপিতেও (ঢা. বি. ৫০৮) একই শ্লোক দেখা যায়। এই ধরণের আরও কিছু দৃষ্টান্ত ঃ-

'সালশাকে বসুপৃষ্ঠে ঠেকিল অম্বর ।
নির্ঘাত মারিল বাণ চন্দ্রের উপর ।।
এই শাকে পুঁথি হইল চণ্ডী অনুভব ।
ডিল্লীর তক্তেতে তখন বাদশা আরংজেব ।।'

-'চণ্ডিকামঙ্গল', কবিকঙ্কণ (ব. বি. ৪৩৭) ।

চন্দ্র =১, বাণ =৫, অম্বর =০, বসু =৮ অনুযায়ী ১৫০৮ শকাব্দ বা (+৭৮) ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দ পুঁথিটির রচনাকাল রূপে অনুমিত'। এখানে 'বামাগতি' রক্ষিত হয় নি।

'ইন্দুবিন্দু সিন্ধুতে প্রবর্ত্ত মন্দসন।
বৃষমাসের ত্রিশ দিনে দণ্ড শিব নন।।'

-'সত্যপীরের কথা', ফকিররাম (ব. রি. ৫৭৬)।

ইন্দু =১, বিন্দু =০, সিন্ধু =৭ অনুযায়ী ('অঙ্কস্য বামাগতি') ১৭০১ শকাব্দ বা ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দ হয়।

'বিন্দুবাজ (রাম ?) রিতু বিধু শক নিয়ুজিৎ।
শ্রীরামজীবনে ভণে আদিত্য চরিৎ ১৬৩০ শকাব্দ।'

-'আদিত্য চরিত্র', দ্বিজরামজীবন (ব. রি. ১২৮)।

বিন্দু =০, রাম =৩, ঋতু =৬, বিধু =১। 'অঙ্কস্য বামাগতি' অনুযায়ী ১৬৩০ শকাব্দে (১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দ) পুঁথিখানি লেখা হয়।

'রিতু নিধি অভ্র আদি হিজরী বহিল।
আমির হামজার পুথি সমাপ্ত হইল।।'

-'আমীর হামজা', আবদুল নবী, (ঢা বি. ৬০৭)।

ঋতু =৬, নিধি =৯, অভ্র =০, আদি =১। অর্থাৎ ১০৯৬ শকাব্দে (১৬৮৪ খ্রীঃ) পুঁথিটি লেখা হয়।

'ভাস্কর দক্ষিণ পানে নেত্র বসাইআ।
তার ডাইনে বসু রাখি জত্তন করিআ।।
ঋতু বসু দিন জান বিশ্চিক মাসের।
লিখন সমাপ্ত রোজ গুরু অসুরের।।'

-'গরকির বচন', ওয়াজুদ্দিন চৌধুরী (ঢা. বি. ৫১৯)।

১২৮৬ সনের (সম্ভবতঃ মঘী সন) ৮ অগ্রহায়ণ শুক্রবার পুঁথিটি লেখা হয় (দ্রঃ পুঁথি পরিচিতি, আহমদ সরীফ, পৃঃ ১১৭)।

'দশ শত বাণ শত বাণ দশ দধি।
রাত্রি হইয়া গেল সংসার অবধি।'

-'সত্যকলি বিবাদসংবাদ' মোহম্মদ খান (ঢা. বি. ৩৯৩)।

১০০০ + ৫০০ + ৫০ + ৭ = ১৫৫৭ শকাব্দ + ৭৮ =১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পুঁথিটির রচনাকাল।

'পুস্তক লিখন সন/কহি তার বিববণ/সকাব্দ সহিতে মঘিগত।
মঘি পরিমাণ ছবি/সহস্রেক চৌরান্নই/সকাব্দা চোরপন্ন সোলসত।।
বিতারিখ একাদস/হরযুত মিত্রমাস/দসদন্ড ভৃগুসুতবার।
শুক্কলা অষ্টমী তিথি/খেত্রগত বৃহস্পতি/ ধনু লগ্নে সমাপ্ত পত্রয়ার।।'

- 'ইউসুফ জোলেখা', শাহ মোহাম্মদ সগীর (ঢা. বি. ১২৫)।

অর্থাৎ, ১০৯৪ মঘী বা ১৬৫৪ শকাব্দ (১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দ) পুঁথিটির লিপিকাল।

সংখ্যাবাচক শব্দ পরিচিতি (Chronograms)*

বাংলা ও সংস্কৃত পুঁথি-পাণ্ডুলিপি বা মন্দিরলিপি ইত্যাদিতে যে সব সংখ্যাবাচক শব্দ ব্যবহার করে সাল তারিখ নির্দেশ করা হয়েছে, সেগুলি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে 'কালনির্ণয়' দুষ্কর। সেই শব্দগুলির পরিচিতি দেওয়া হল ঃ

০ - শূন্য, অভ্র, অম্বর, অনন্ত, অন্তরীক্ষ, আকাশ, খ, কান্তামধ্য, গগন, গগনমণ্ডল, নভঃ, ঘনাশ্রয়, পঞ্চমভূত, বিয়ৎ, বিন্দু, বিহায়স, দ্যো, দিব, নভস্তল, বায়ুমণ্ডল।

১ - এক, অত্রিনেত্রজ, অত্রিজাত, অব্জ, অব্ধিজ, অজ, অক্ষর, ইন্দু, ঈশী, ওষধীশ, ওষধীনাথ, কলাধার, কলানিধি, কলাপ, কুমুদবান্ধব, কৌরবকুলাধিপ, গুরু, চন্দ্র, চন্দ্রমা, তুহিনকর, দ্বিজপতি, দ্বিজরাজ, ধাতা, নক্ষত্রেশ, নক্ষত্রপতি, নিশামনি, নিশিরাজ, নিশাকর, নিশাপতি, বসুধা, বিধু, বিধাতা, ব্রহ্মা, বসুমতী, ভুবন, ভূমি, মর্ত্য, মৃগাঙ্ক, মহী, মেষ, মৃগলাঞ্ছন, যামিনীনাথ, যামিনীভূষণ, রজনীকর, শশধর, শশাঙ্ক, শশী, শুভ্রাংশ, সিতাংশু, শীতরশ্মি, শশবিন্দু, শশলাঞ্ছন, শশভৃৎ, শুচি, সোম, সুধাকর, সুধাংশু, হিমকর, হিমাংশু, হরিণাঙ্ক, ধরণী, ক্ষিতি, ভূ, অবনী, ঈশ্বর, অদ্রীশ, ধ্রুব, আত্মা, বিভু, জগৎপিতা, বিশ্বপিতা, বিশ্বপতি, ব্যোমকেশ, মহাদেব, রূপ, নায়ক, তনু, অব্দ, উচ্চৈঃশ্রবা, রাম, ঐরাবত, ত্রিদিব, নরগাত্র, ইন্দ্রাশ্ব, কলেবর, শ্রী, শুক্রাক্ষি।

২ - দুই, অক্ষ, অয়ন, অশ্বিন, অগ্নিচক্ষু, অনিল, অত্যুকথা, অত্রিদৃক, অসীধারা, ঈক্ষণ, উভ, বৃষ, পক্ষ, কর, পদ, যম, করতল, কোল, বাহু, দৃষ্টি, ভুজ, ভুরু, কর্ণ, দ্বিতয়, উভ, নদীতীর, যুগ, যুক্, পাদ, নবশ্রুতি, হস্তীরদ, কপোল, তটিনীতীর, সর্পরসনা, স্ত্রী, নরপাণি, বিষ্ণুপত্নী, গজদন্ত, বাহু, ওষ্ঠ, ভুজ, কুচ, কর্ণ, কর, ভ্রু, বারণমদ, মাতঙ্গ, যম, নাসত্য, দ্বিপদন্ত, যুগ্ম, জানু, যুগল, পাখা, পদতল, দৃষ্টি, চক্ষু, অক্ষি, গুল্‌ফ, রাঘবাত্মজ, দ্বন্দ্ব, জঙ্ঘা, নরভুজ, যামল, মিথুন, রামনন্দন, হোরা, নিতম্ব, বৃষ।

৩ - তিন, কাল, নেত্র, দহন, শিবেক্ষণ, মিথুন, অগ্নি, অনল, রাম, লোকনাথ, শিবচক্ষু, শক্তি, দুর্গা, মুণ্ড, সন্ধ্যা, মর্গ, শিরাত্রয়, শিবলোচন, রাম, কার্ষিক, ত্রিবেদী, গণ, কালাগ্নি, গায়ত্রী, ত্রয়, লোক, ত্রি, কটু, কুল, কাল, কার্য, কোন, কূট, বংশত্রয়, বর্গ, চক্র, গুণ, গর্ত্ত, লোচন, চক্ষু, জগৎ, ভুবন, বিষ্টপ, সংসার, দেব, দিব, দন্ড, তাপ, তন্ত্রী, মদ, দোষ, ব্যাধি, জাতক, ঋণ, তত্ত্ব, ধাম, পাপ, পদ, পাতকত্রয়, পিটক, পুর, পারীণ, পুরাসুর, পুষ্কর, পুরুষত্রয়, বর্ণ, বর্ত্ম, বর্ণক, ত্রিফলা, বলি, বিদ্যা, বেণী, মধু, মূর্তি, কাল, বিষ্ণু, লোকেশ, ভূত, নারী, রুদ্রাক্ষি, ত্রিতয়, ত্র্যক্ষ, লোকী, শরণ, বত্ন, মুগ, মহীকোণ, শূলশিখা, ঈশদৃক, বিষ্ণুপত্নী, প্রণাম, নমস্কার, নতিকরণ, তপনতনয়, সহোদরা, শিবাক্ষি, বহ্নি, হুতাশন, হুতাশ, মৃগী, নারী, মধ্যা, শিখা, বিষ্ণুপদ, ভাগীরথী, জাহ্নবী, তুষগ্রহ, সর্বভুক, সর্বশুচি, গঙ্গা, ত্রিবেণী, গঙ্গামার্গ, সুরধুনী, শুষ্ণ, কৃশানু, পাবক, দহন, বৈশ্বানর, অত্রি, বিভাবসু, বহ্নিচরণ।

---

*'The chronograms apparently identify a grouping numerals symbolically expressed' Text Book of Indian Epiography; K Satya Murty, Delhi, 1992, P 71

৪ - চার, বেদ, শ্রুতি, যুগ, কর্কট, প্রহর, অর্ণব, আশ্রম, উদধি, অভিনয়, চতুর্মুখ, বিষ্ণুবাহু, সম্প্রদায়, ব্রহ্মানন, কাল, ভদ্র, বৃন্দা, ব্রহ্মাস্য,অঙ্গ, অব্ধি, বিষ্ণুমূর্তি, চতুর্ব্যূহ, কাল,বর্গ, কর্ম্মযুগ, নারী, বামা, সেনাঙ্গ, বাম, হস্তপদ, স্নান, সিন্ধু, রত্নাকর, সমুদ্র, অম্বুধি, বর্ণ, কোষ্ঠ, দিশ, দিক, সাধন, জলনিধি, সাগর, পয়োধি, পাথার, বারিধি, সতী, কন্যা, ক্ষিতি, পশু, পুরুষার্থ ।

৫ - পাঁচ, শর, বাণ, মার্গন, ইন্দ্রিয়, অক্ষ, ব্যঞ্জন, কর্ম, কষায়, গঙ্গা, গব্য, গুণ, তত্ত্ব, তন্ত্র, তিক্ত, নদ, পর্ব, পল্লব, পিতা, কলম্ব, মুদ্রা, বত্ন, লক্ষণ, লোহক, শস্য, অঙ্গ, অঙ্গুলি, অস্ত্র, আয়ুধ, ভূত, ইষু,বায়ু, কাম, সিংহ, অনিল, সন্ধি, কোষ, কোল, কোষায়, উপাষক, ইন্দ্রিয়, কোষবিদ্যা, গঙ্গা, গুণ, গব্য, গুঁড়ি, চূড়ক, গৌড়, তন্মাত্র, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয়, নীবাজন,, পক্ষী, নিম্ব, নখ, দ্রাবিড়, দেবতা, দ্রাবক, পুষ্প, পাণ্ডব, পাত্র, পিত্ত, প্রেত, প্রাণ, প্রদীপ, বন্ধন, বর্ণ, বটী, বট, বক্ত, রঙ্গ, মুদ্রা, মূত্র, মহাযজ্ঞ, মহানদী, মহাপাতক, ম, কামগুণ, বায়ু, বর্গল, বল্কল, সুগন্ধিক, লবণ, লৌহ, লোকপাল, রূপ, চক্রবর্তীচিহ্ন, রাজচিহ্ন, অগ্নি, অঙ্ক, আল, অপ্সরা, তীর্থ, আনন্দ, অমৃত, আম্র, উপাচার, বিষয়, অর্থ, বিশিখা, সায়ক, কোষ্ঠ, কন্যা, বট, বৃক্ষ, ন্যায়, মূল, শিবাস্য, শিবানন, পঞ্চানন, বৃহৎমূল, সবরাস্য, স্বল্পমূল, বৃত্তি ।

৬ - ছয়, কন্যা, গঙ্গা, চক্র, গুণ, চক্রবর্তী, ত্রিশিবোনেত্র, বজ্রকোণ, প্রজ্ঞা, শাস্ত্র, গয়া, দুর্গ, রস, তর্ক, ঋতু, বর্গ, কায, কর্ম, শাস্ত্র, ভৃঙ্গপাদ, গুহানন, রাজ্য, আনন, বিপু, কায়া, কার্তিকেয়, দর্শন, অঙ্গ, নন্দী, অরি, অভিজ্ঞ, যড়ঙ্গক, যড়জ, গোজাত, বেদাঙ্গ, গব্য, লবণ, শক্র, ভাব, শিবানুচর, ভগ, অধ্যাত্ম ইন্দ্রিয়, যট্‌পদ, ঐশ্বর্য, কুসুমলিট্‌পদ (ভ্রমর বা মৌমাছির পা ছয়টি)।

৭ - সাত, অব্ধি, ঋষি, সমুদ্র, জলধি, মুনি, সাগর, সিন্ধু, অশ্ব, সুর, তাল, শৈল, মৈত্র, ছিদ্র, দ্বীপ, ধাতু, রথী, স্বব, গোত্র, সিদ্ধ, স্বামী, নগ, বার, মহীধর, ভুলা, অগ্নি, জিহ্বা, অর্চ্চি, অংশু, তন্তু, বহ্নিশিখা, অত্রি, তুবগ, বাজী, ঘোড়া, হয়, তুরঙ্গম, ঘোটক, অঙ্গ, লোক, ভুবন, স্বর্গ, পাতাল, পবলোক, উদধি, জলনিধি, অর্ণব, সিন্ধু, বারিধি, ক্ষিতি, রত্নাকর, পারাবার, পাথাব, পাযোধি, গঙ্গাধর, সলিলনিধি, গিরি, পৃথ্বীধর,মহী, বসুধর, অচল, অগ, অব্দ, নরকার্দ্ধী, তল, পুরী, বীজ, মাতা, ব্রীহি, সপ্তাংশ, বৃশ্চিকগ্রন্থী, মহর্ষি, আবরণ, অস্ত, মাতা, সপ্তী, রথী, দ্বীপ, দ্বীপা, প্রকৃতি, সাম, সপ্তপদী, দ্বীপপতি, বার, দিন, অহ, ঋষিমণ্ডল, সপ্তক, স্বরগ্রাম, বক্ত, ধাতু ।

৮ - আট, বৃশ্চিক, বসু, করি (করী), কল্যাণ, গজ, নাগ, ইভ, বিধিশ্রুত্যনুগত, দৃষ্টি, ব্রহ্মাকর্ণ, দ্রব্য, গুণ, মহিষী, পরিষদ, নায়িকা, সখী, ধৃর্ত্তি, অহি, সর্প, দিক, দিকরক্ষক, অঙ্গ, কুঞ্জর, মাতঙ্গ, হস্তী, কুলাচল, ঐশ্বর্য, পাশ, বর্গ, ভুজ, ভৈরব, দুর্গাভুজ,, লোকধর্ম, সাত্ত্বিক, বস্ত্র, প্রণাম, উপাচার, অর্ঘ্য, ভোগী, সেনাঙ্গ ।

৯ - নয়, সুকৃত, ধনু, নব, নিধি, গ্রহ, অঙ্ক, দ্বার, অঙ্গদ্বার, বৃহতি, ভূখণ্ড, দ্রব্য, ব্যাঘ্রীস্তন, স্থায়ীভাব, নবমী, দুর্গা, নট, উপাধ্যায়,পঞ্চমূল, সুধাকুণ্ড, সেবধি, অস্ত, গো, পবন, বীর, নন্দ, ভক্তি, শিলা, ধান্য, শায়ক, শক্তি, রঙ্গ, রত্ন, বর্ষ, প্রস্থান, ছিদ্র, রস, পত্রিকা ।

১০ - দশ, দিক, প্রমিত, চন্দ্রবিন্দু, শশীবিন্দু, রন্ধ্র, মকর, দেবযোনি, শিবনেত্র, শিবকর্ন, ক্লেশ, বুদ্ধবল, দুর্গাভুজ, মহাবিদ্যা, শীল, হরা, অশ্বমেধ, হস্তাঙ্গুলি, পদাঙ্গুলি, রাবণমস্তক, কৃষ্ণাবতার, বিশ্বদেব, ইন্দুবাজী, কৃষ্ণাবতার, অবস্থা, বিশ্ব, আশা, কর্ম্ম, অবতার, রূপক, সূত, অগ্নিমূর্তি,

অগ্নিকন্যা, নির্ঘন্ট, রাবণমুণ্ড ।

১১ - এগার, কুম্ভ, শূলী, ভব, ঈশ্বর, ঈশ, বৃষধ্বজ,করণ, মহাদেব, ইন্দ্রিয়, ত্রিষ্টুপ, ভর্গ, শিব, ঈষান, দ্বাব, একাদশ, মূর্তি, রুদ্র, হর, রুদ্রাক্ষর, অক্ষৌহিণী, যুগ্মইন্দু, যুগ্মচন্দ্র, যুগ্মধাতা, ইন্দ্রবজ্রা।

১২ - বার, মীন, মিত্র, রাশি, আত্মা, ভগণ, দেবমাতা, অদিতি, পুত্র, বন, মদ্য,-যাত্রা, দ্বাদশী, দ্বাদশ, কার্তিকলোচন, রবি, দিবাকর, দিনকর, ইন্দ্রিয়, ভানুরশ্মি, অর্ক, অরুন, মিহির, প্রভাকর, সবিতা, সংক্রান্তি, কলিন্দ, দিনমণি, সাধ্য, দিনপ্রণী, সেনানীনেত্র, তুষিত, আভাস্বর, ভানু, দ্যুমণি, ব্যয়, মাস, মার্তণ্ড, জগতী, নভশ্চক্ষু, আদিত্য ।

১৩ - তেরো, বিশ্ব, অঘোষ, রুচিরা, কাম, মন্মথ, প্রতিমুখাঙ্গ, ত্রয়োদশ, বিশ্বদেব, তাম্বূলগুণ, মঞ্জুভাষিণী ।

১৪ - চোদ্দ, মৃগ, অভিনয়, শক্র, লোক, ইন্দ্র, মনু, যম, ধ্রুবতারকা, ইন্দ্রিয়, চতুর্দশ, বিদ্যা, পুরুষ, শর্করী, ভুবন ।

১৫-পনর, পঞ্চদশ, পক্ষ, তিথি, অহ, ত্রিপঞ্চ, মালিনী ।

১৬ ষোল, চন্দ্রকলা, শশীকলা, ইন্দুকলা, ক্ষৌণিপাল,বসুধেশ, মহীপতি, ষোলকলা, গৌরী, অষ্টি, নৃপ, ভূপ, মাতৃকা, ষোড়শী, দান, উপাচার, নাড়ী, বিদ্যাদেবী ।

১৭-সতেরো, সপ্তদশ, মন্দাক্রান্তা, সংস্কার ।

১৮-আঠারো, অষ্টাদশ, ভারত, উপদ্বীপ, উপপুরাণ, পীঠ, ধৃতি, পর্ব, ধান্য, পুরাণ, স্মৃতি, দ্বীপ, বিদ্যা ।

১৯ - ঊনিশ, ঊনবিংশ, দেববাদ্য ।

২০ - কুড়ি, বিংশ, বিশ, অঙ্গুলি, রাবণাক্ষি, রাবণকর, নখ, কৃতি ।

২১ - একুশ, একবিংশ, প্রকৃতি, স্বর্গ, মূর্ছনা, উৎকৃতি ।

২২ - বাইশ, দ্বাবিংশ, জাতি, কৃতি ।

২৩ - তেইশ, ত্রয়োবিংশ, বিকৃতি ।

২৪ - চব্বিশ, চতুর্বিংশ, তীর্থঙ্কর, জিন, গায়ত্রী, কেশব, অর্হৎ, সিদ্ধ ।

২৫ - পঁচিশ, পঞ্চবিংশ, অতিকৃতি ।

২৬ - ছাব্বিশ, ষড়বিংশ,বাক্যদোষ, উৎকৃতি ।

২৭ - সাতাশ, সপ্তবিংস, ভ, নক্ষত্র ।

২৮ - আটাশ, অষ্টাবিংশ, তত্ত্ব, উষ্ণিক্ ।

৩৩ - তেত্রিশ, ত্রয়স্ত্রিংশৎ, ত্রিদশ, সুর, গগণপতি, নভপতি ।

৪৯ - ঊনপঞ্চাশ, বায়ু, অনিল, উপপাতক, মলয়, মরুৎ, পবন ।

এই সংখ্যাবাচক শব্দগুলির মধ্যে কোন কোনটি আবার একাধিক অর্থ প্রকাশ করে । যেমন নেত্র ২, ৩; পদ-২,৩; চক্ষু - ২, ৩; দৃষ্টি -২, ৩; ঋতু-৩, ৬; রস - ৬, ৯; সিন্ধু, রত্নাকর, সাগর -৪, ৭; দিক -৪, ১০; সতী -৪, ৫; ভূত - ৫, ৩; গঙ্গা-৫, ৬; কর্ম -৫, ৬;শস্য -৫, ৬; গব্য -৫, ৬; লৌহ -৩, ৫, ৮; অব্ধি -৪, ৭; স্থিতি -৪, ৭; অঙ্গ -৫, ৭;ভুবন বা লোক -৩, ৭; ঐশ্বর্য - ৬, ৮; ইন্দ্রিয়-১১, ১২ ইত্যাদি ।এগুলির ক্ষেত্রে সালতারিখ নির্ণয়ে যথেষ্ট সাবধানতা এবং সূক্ষ্ম

বিচার করার দরকার হয়। তা না'হলে পুঁথি পাণ্ডুলিপির সময়কাল পঞ্চাশ-একশো বছর এদিক ওদিক হয়ে যাবে। তবে এ কাজটি বলা যত সহজ, করা ততই কঠিন, নিষ্ঠা এবং সুগভীর অনুশীলন সাপেক্ষ। এই বিষয়ক আলোচনার শেষ পর্বে বিনয়ের সঙ্গেই একটি কথা নিবেদিত হল ঃ পুঁথি-পাণ্ডুলিপির অঙ্গে লেখা 'সালটিকে' সবসময় অভ্রান্ত মনে করা বোধ হয় ঠিক নয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহের হাজার হাজার পুঁথির মধ্যে প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপিটি হল 'সারদা তিলক'। ১৪৩৯ খ্রীষ্টাব্দে লিপিকৃত শ্রীলক্ষ্মণ দীক্ষিত রচিত, এই সংস্কৃততন্ত্রের পুঁথিটি গাছের ছালে (ভুর্জ ?) লেখা। মোট পত্র সংখ্যা ১-২৬, ২৯-১৩০। এছাড়াও আছে তুলটে লেখা 'বিষ্ণুপুরাণ' (লিপি ১৪৬৬ খ্রীষ্টাব্দ), মহাভারতের 'বনপর্ব' (তুলট। লিপি ১৪৭১ খ্রীঃ), মেদিনী রচিত 'অনেকার্থকোষ' (তুলট। লিপি ১৪৯৯ খ্রীঃ), কবিকর্ণপুর রচিত 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' (লিপি ১৫৭২ খ্রীঃ) ইত্যাদি। এগুলির ভাষা সংস্কৃত। বর্ণমালা বাংলা। কল্পনা ভৌমিক তাঁর 'পাণ্ডুলিপি পঠন সহায়িকা' গ্রন্থে (বাংলা একাডেমী, ঢাকা) এ জাতীয় তথ্যের সঙ্গে ঐ পুঁথিগুলির যে ছবি দিয়েছেন তা দেখে আমাদের মনে হয়েছে, 'সারদা তিলক' ও 'মহাভারত' পুঁথি যতখানি প্রাচীন, অন্যগুলি সে তুলনায় অনেকটাই অর্বাচীণ বলা যেতে পারে। ১৭শ-১৮শ শতকের অনুলিপি। অবশ্য এই সিদ্ধান্ত মূল পুঁথি নিরীক্ষণ করে করাই সমীচীন।

গ্রন্থপঞ্জী ও সূত্রনির্দেশ

১ "বর্তমানাষ্টাশীত্যুত্তর-শত-সংবৎসরে পৌষমাসস্য চতুর্বিংশতিতম দিবসে দূতকেন মহাপ্রতীহার....... ' Select Inscriptions, Dr D C Sircar, P 331

২. 'মধ্য বাঙ্গালার অনেক গ্রন্থকার ও পুঁথিলেখক সংখ্যাসূচক বিশেষ্য শব্দের দ্বারা রচনাকাল ও লিপিকাল নির্দেশ করিয়াছেন।' -শ্রীসুকুমার সেন, 'ভাষার ইতিবৃত্ত', ১০ম সং, পৃঃ ২৬৪। 'আঙ্কিক শব্দ' যোগেশচন্দ্র রায়, সা প. প ৩৬ বর্ষ, সং ৪, পৃঃ২১৫-২৪৮।

৩. অঙ্কগুলিকে ডানদিক থেকে বামদিকে সাজিয়ে নেওয়া হয় 'অঙ্কস্য বামাগতি' অনুযায়ী।

৪. 'বিপ্রদাস কি প্রাচীন কবি' যতীন্দ্রমোহন দত্ত, কথাসাহিত্য, ১৩৭১, পৃঃ ১৩৯১।

৫. 'সারদামঙ্গলের কবি মুক্তারাম সেনের বংশ পরিচয়', সাহিত্য পবি. প. বর্ষ ৪০, সংখ্যা ৪, পৃঃ ১৫৯-১৬৬।

৬. 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কবি শঙ্কর' ত্রিপুরা বসু, (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপ্রকাশিত পি. এইচ ডি. গবেষণাপত্র), ১৯৮০।

৭. 'বাংলা পুঁথির তালিকা সমন্বয়', ১ম খণ্ড, যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, ১৯৭৮, পৃঃ ৩৭৯।

৮. ঐ. পৃঃ ৩৭৭।

৯. 'পাণ্ডুলিপি পঠন সহায়িকা', কল্পনা ভৌমিক, ঢাকা, ১৯৯২, পৃঃ ৭৮।

১০. যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭৭।

১১. পুঁথি পরিচয়, ২য় খণ্ড, শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল, বিশ্বভারতী, ১৯৫৮, পৃঃ ২৬৫।

১২. ঐ, পৃঃ ২৬৮।

১৩. যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৭৭।

১৪. ঐ। ১৫. ঐ, পৃঃ ৩৭৮। ১৬ ঐ। ১৭. ঐ। ১৮ ঐ। ১৯. ঐ।

২০. 'কোচবিহার জেলার পুরাকীর্তি', ড. শ্যামচাঁদ মুখোপাধ্যায়, ১৯৭৪, পৃঃ ৬৩।

২১. 'বাংলা পুঁথির তালিকা সমন্বয়', ১ম খণ্ড, যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা ১৯৭৮, পৃঃ ৩৭৫-৩৮২ দ্রঃ।

আট

লিপিকর

এ দেশে ছাপাখানা চালু হবার আগে পর্যন্ত যাবতীয় বইপত্র হাতে লিখেই তার সংখ্যাবৃদ্ধি করা হত। প্রাচীন পুঁথির যারা অনুলেখক বা Copiest ছিলেন, তাঁদেরই বলা হত 'লিপিকর'। সেকালের পুঁথিলেখকের সঙ্গে একালের প্রেসের কম্পোজিটারের কাজের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। ছাপা বইতে কম্পোজিটারের নাম থাকে না। কিন্তু হাতে লেখা পুঁথিতে লিপিকরের নাম, ধাম, নানা ব্যক্তিগত কথা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা সবকিছুই দেখা যায়। অবশ্য এই লেখার কাজে রত মানুষদের সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে অনেক পুরোনো দিন থেকেই।

বিশেষজ্ঞদের মতে, শক্ত পদার্থ বা ধাতু নিয়ে কর্মরত মানুষদের দিয়েই পাথর খোদাই বা ধাতুফলকে লেখার কাজ করানো হোত। ১৩৯৫ খ্রীঃ কৃত, বিহার শরীফ থেকে প্রাপ্ত প্রস্তর ফলকে 'স্বর্ণকারেন কামদেবেন কর্ম্মিণঃ' দেখা যায়। 'পঞ্চনাম' শ্রেণীভুক্ত কর্মকার, স্বর্ণকার, সূত্রধর, পিতলশিল্পী এবং ভাস্করদের (পাথর খোদাই শিল্পী) লিপি খোদাইয়ের কাজে লাগানো হোত ('Some Epigraphical Records of the Mediaval Records from East India', D. C. Circar, 1979, P 45)।

'লিপি' ও 'লিপিকর' শব্দ দুটি প্রথম দৃষ্ট হয় যথাক্রমে অশোক ও পাণিনির ব্যাকরণে (খ্রীঃপূঃ ৫ম শতক)। অশোক যুগে পারসিক-হখামনিশীয় 'দিপি' শব্দ থেকে উদ্ভূত 'লিপিকর' বা 'দিপিকর'রা ছিল লিপিলেখক। অশোকের শাহবাজগঢ়ী লিপিতে 'নিপিসিতম্' শব্দটি আছে, যার অর্থ 'লেখা' (দ্রঃ ১৪নং লিপি)। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে 'লেখক' শব্দটির উল্লেখ দেখে মনে হয়, সম্রাট অশোক বা তাঁরও পূর্বে এদেশে এই ধরণের জীবিকার প্রচলন ছিল। 'বিনয়পিটক' (বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থ) উৎকৃষ্ট জীবিকা হিসাবে লেখক বৃত্তির কথা বলেছে। বুলার বলেছেন 'The oldest name of these men lekhaka, used in the canon of the Southern Buddhists and the epics' তিনি আরোও বলেছেন 'Lekhaka undoubtedly denotes the person who prepared the documents to be incised on copper or stone'. লিপিকর পণ্ডিতরা লিপি রচনা করতো। খোদাইকাররা তা খোদাই করতো।* অর্থাৎ লেখকের মূল লিপিটি দেখে ভাস্কর বা খোদাইকাররা তা শিলাখণ্ডে খোদাই করতো। পরবর্তীকালে পাণ্ডুলিপি

*'There were two stages The fisrt was the writing of the inscription on the stone by a Lipikara and the second was the actual work of cutting the letters on the stone The former was done by a literate man, but the latter was the work of a stonecutter who was probably illiterate', 'Indian Paleograpy', A H. Dani New Delhi, 1997, P 33

রচয়িতা বা লিপিকররা লেখক নামে পরিচিত হয়। 'কায়স্থ' বা 'কারকুন' শ্রেণীর লেখকরা ছাড়াও সেযুগে জৈন বা বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এবং হিন্দু ব্রাহ্মণরাও একাজ করতেন। আলেকজাণ্ডারের ভারতবিজয়ের সময়, খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ অব্দেও এদেশের মানুষ লেখার কালির ব্যবহার জানতো বলে জানা গেছে। আন্ধেরের আবিষ্কারে প্রাপ্ত একটি কালিতে লেখা লিপিকে লিপিবিজ্ঞানী বুলার প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন (খ্রীঃ পূঃ ৩য় বা ২য় শতক)। কোষগ্রন্থে 'লিপিকর' শব্দের অর্থ 'লেখক'। 'বাসবদত্তা' নামক প্রাচীন গ্রন্থে সবশ্রেণীর লেখককেই 'লিপিকর' বলা হয়েছে। তবে অশোকের অনুশাসনে উল্লিখিত 'লিপিকররা' করণিক বা Clerk-এর ভূমিকাই পালন করে থাকবে। অশোকের ব্রহ্মগিরি, জটিঙ্গা রামেশ্বর ও 'সিদ্ধপুরা অনুশাসন' যিনি বা যাঁরা রচনা করেন, সেই 'পদ' নিজেকে 'লিপিকর' বলেছেন ('এস কতবিয়ে চ ইধপডেন লিখিতম লিপিকরেন' - ব্রহ্মগিরি, লিপি-২)।

৭ম ও ৮ম শতকের বল্লভীবংশীয় লিপিতে নথিপত্রের লেখক (সন্ধিবিগ্রহাধিকৃত) 'দিবিরপতি' উপাধি গ্রহণ করেছেন। পারস্য ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেনের সময়ই পার্সী 'দেবির' বা পরে 'দিবির' শব্দটির আবির্ভাব হয়ে থাকবে। কল্‌হনের 'রাজতরঙ্গিনী' এবং ১১শ, ১২শ শতকের অন্যান্য কাশ্মিরী রচনায় 'দিবির' শব্দটি উল্লিখিত।

'লোক প্রকাশে', 'গঞ্জদিবির' (বাজার-লেখক), 'গ্রাম দিবির' (গ্রাম-লেখক), 'নগরদিবির' (শহর-লেখক) এবং 'খভাষা দিবির' (কোষ্ঠীলেখক বা জ্যোতির্বিদ) উল্লিখিত। এখানে দিবির অর্থে 'করণিক' বা 'হিসাব-লেখক'কেই বোঝানো হয়েছে বলে মনে করা হয়। 'যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি'তে উল্লিখিত 'কায়স্থ'গণ ৮ম শতকে এই বৃত্তিতে নিযুক্ত ছিলেন এবং পদস্থ রাজকর্মীরূপে পরিগণিত হতেন। গুপ্তযুগের পূর্বেই কায়স্থ শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটেছিল- লিপি রচনা করা যাদের বৃত্তি ছিল। ৯ম শতাব্দীর রাষ্ট্রকূট অনুশাসনে 'বালভকায়স্থ বংশ', দ্বাদশ শতাব্দীর গাড়োয়াল অনুশাসনে 'শ্রীবাস্তব্যকুলোদ্ভূত কায়স্থ', এদের উল্লেখ আছে। কুলিক, কায়স্থ, পুস্তপাল, প্রমুখ কর্মচারীদের কথা ঐ সময়কার অনুশাসনে দেখা যাচ্ছে : মধ্যযুগের প্রথমভাগেই এই লিপিকর 'কায়স্থ' শ্রেণী একটি জাতিতে পরিণত হয়।

প্রাচীন লিপিতে লেখক বা লিপিকরদের 'করণ', 'করণিক', করণিন, 'শার্সানিক' ও 'ধর্মলেখিন' ইত্যাদি নামে পরিচিত হতে দেখে এটাই বোঝা যায় যে সেকালে এই বৃত্তি বা পদটির বোধহয় বেশ গুরুত্বই ছিল। ষষ্ঠ শতকের বৈন্যগুপ্তের গুণাইঘর তাম্রশাসনে 'সান্ধিবিগ্রহারিকরণ-কায়স্থ-নরদত্ত' কে লেখক হিসেবে দেখা যাচ্ছে। দামোদরপুর তাম্রশাসনে (৬ষ্ঠ শতাব্দী) মন্ত্রী ভোগচন্দ্রকে লেখক হিসেবে পাওয়া যাচ্ছে :

কীলহর্ণ বলেছেন, আইনের নথিপত্র রচয়িতা বা লিপিকররাই 'করণ' নামে পরিচিত হতেন। এঁরা কোন একটি বিশেষ জাতি (Caste) বা সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন না। ভারতীয় লিপি বা বর্ণমালার উন্নয়নে ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ ও জৈন সন্ন্যাসীদের অবদান যেমন, তেমন এই 'লেখক' বা 'লিপিকর'দের কৃতিত্বও কম নয়। পেশাদার লেখকদের রচনাটি অনুকরণ করেই মিস্ত্রী-শিল্পীরা ('সূত্রধর', 'শিলাকূট', 'রূপকার' বা 'শিল্পীন') সেই 'প্রশস্তি' বা 'কাব্য' ধাতুফলক বা প্রস্তরখণ্ডে খোদাই করতো। বুলার 'পিতলকার', 'লোহকার' বা 'অয়স্কার', 'কংসার', 'সূত্রধর',

'হেমকার' বা 'সুনর', 'শিল্পীন', 'বিজ্ঞানিক' এর কথা বলেছেন। অবশ্য বিরলক্ষেত্রে রচয়িতা বা লেখকরাই খোদাইয়ের কাজটি করেছেন। প্রশস্তি বা অনুশাসন রচনা ও খোদাইয়ের কাজ তত্ত্বাবধান করতেন 'অমাত্য', 'সন্ধিবিগ্রহিক', 'রহসিক', 'সেনাপতি', বা 'বলাধিকর্তা' পদস্থ বিশিষ্ট রাজকর্মচারীরা। লক্ষ্মণসেনের সুন্দরবন তাম্রশাসন (১২শ শতাব্দী), তর্পণদিঘি তাম্রশাসন ও আনুলিয়া তাম্রশাসনে 'সন্ধিবিগ্রহিক' নারায়ণ দত্তকে পাওয়া যাচ্ছে। বিশ্বরূপসেনের মদনপাড়া তাম্রশাসনে (১২শ শতাব্দী) 'শ্রীকোপিবিষ্ণু'কে 'গৌড়মহাসান্ধিবিগ্রহিক' বলা হয়েছে। বল্লালসেনের নৈহাটি তাম্রশাসনে (১২শ শতাব্দী) বলা হয়েছে, 'শ্রীবাসুশাসনে কৃতদূতং হরিঘোষ সান্ধিবিগ্রহকিম্'। কলহনের বিবরণানুযায়ী জানা যায়, কাশ্মীরের রাজারা অনেক সময় 'পত্তোপাধ্যায়' (Chargeman) নিয়োগ করতেন। এঁদের কর্মক্ষেত্রটিকে (Office) আধুনিক যুগের রেকর্ড অফিস বা নথিদপ্তরের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। বুলার বলেছেন 'Finally the existences of manuals for clerks and writers must be mentioned. We still possess several works of this kind, among which the Lekapanchasika' gives the rules drafting not only private letters, but also landgrants and the treaties between kings, while a section of Ksemendra Vyasadasa's' 'Lokaprakasa' shows how the Various kinds of bonds, bills of exchange (Hundi) and so forth ought to be done' ('Indian Paleography')। বলা বাহুল্য, পরবর্তীকালীন পুঁথিলেখক বা লিপিকরদের প্রসঙ্গে আসার পূর্বে আমাদের এইসব বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত হওয়া দরকার। 'স্তম্ভেশ্বর দাস' (১ম কুমারগুপ্তের ধনাইদহ তাম্রশাসন, ৫ম শতাব্দী), 'সুভতর পুত্র ভোগতর নাতি, তাতত' (ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসন, ৮ম শতাব্দী), 'সূত্রধর বিষ্ণুভদ্র' (নারায়ণ পালের গরুড়স্তম্ভলিপি, ৯ম শতাব্দী), সমতটে জাত, সুভদাসের পুত্র 'মঙ্ঘদাস'(নারায়ণ পালের ভাগলপুর তাম্রশাসন, ৯ম শতাব্দী), পোসতিগ্রামের বিজয়াদিত্যের পুত্র 'শ্রীমহীধর' (১ম মহীপালেব বাণগড় তাম্রশাসন, ১০ম-১১শ শতাব্দী), 'বারেন্দ্রক শিল্পীগোষ্ঠী চূড়ামণি রাণক শূলপাণি' (বিজয়সেনের দেওপাড়া অনুশাসন ১১শ শতাব্দী), অধীপসোমের পুত্র 'সত্তসোম' (নয়পালদেবের গয়া প্রস্তরলিপি, ১১শ শতাব্দী), বিখ্যাত শিল্পী মহীধরের পুত্র 'শশিদেব' (৩য় বিগ্রহপালের আমগাছি তাম্রশাসন, ১১শ শতাব্দী) এর নাম দেখা যায় খোদাইকার বা সূত্রধররূপে।[১] আদি বা মধ্যযুগের পুঁথি লেখকদের পূর্বসূরীরূপে শিলালিপি-তাম্রশাসনের এই সব লেখক-লিপিকর-খোদাইকারদের নির্দেশ করা যেতে পারে। পণ্ডিচেরী মিউজিয়ামে রক্ষিত কর্ণাটকরাজ ১ম শ্রীরঙ্গরাজের তাম্রলিপিতে (১৫৮৫ খ্রীঃ) রচয়িতা 'স্বয়ম্ভুর'র নাম আছে। এঁর পিতা 'সভাপতি' ছিলেন ঐ রাজসভাব সভাকবি, নিয়মিত অনুশাসন রচয়িতা। স্বয়ম্ভুপুত্র 'রাজনাথ', স্বয়ম্ভুভ্রাতা 'কামকোটি', কামকোটির পুত্রদ্বয় 'কৃষ্ণকবি কামকোটি' ও 'রাম' সকলেই পারিবারিক বৃত্তি অনুযায়ী অনেক প্রশস্তি রচনা করেন।* এঁদেরই প্রদর্শিত পথ ধরে পরবর্তীকালের পুঁথি লিপিকররা কাজ করেছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায়, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার চন্দ্রকোনা পৌরসভার অন্তর্গত অযোধ্যাপল্লীর ঠাকুরবাড়িতে রক্ষিত লালগড়ের লালজীউমন্দিরের পাথরের উৎসর্গফলকটির শেষে যে 'পৌরাণিক শ্রীমোহন চক্রবর্তী'র নাম

*'A copperplate inscription of Srirangaraya-I' Filliozat and Vasundhara, Pondicherry, 1986.

খোদিত, তিনি এই লিপিটির রচয়িতা। গোকুল দাস এ লিপির খোদাইশিল্পী। ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দের এই মন্দির লিপিটি ১৭শ শতাব্দীর বাংলা বর্ণমালা সংক্রান্ত এক ঐতিহাসিক দলিল।

অনুরূপ কাজ করতেন, পুঁথির লিপিকররা। অনুশাসনের রচয়িতাদের লেখা মূল লিপি খোদাইকাররা পাথর বা ধাতুর ফলকে খোদাই করতেন। লিপিকররা আদর্শপুঁথি দেখে পুঁথি লেখার কাজ করতেন।

সেকালে ছাপাখানা ছিল না। তাই গ্রন্থরসিক মানুষেরা নিজেদের প্রয়োজনমত পুঁথি নকল করিয়ে নিতেন। আবার অনেক সময় 'রেডিমেড' পুঁথিও পাওয়া যেতো। একালে, প্রেসে টুলে বসে অক্ষর সাজিয়ে সাজিয়ে বা কম্পিউটারে শব্দ সাজিয়ে যে কম্পোজিটর মূল্যবান সাহিত্যকর্মকে সাজিয়ে দেন, তাঁর নাম কিন্তু ছাপা বইতে থাকে না। থাকে প্রেস মালিকের নাম - এই শ্রমসাধ্য কাজটির সঙ্গে হয়তো আদৌ তিনি জড়িত নন। সেকালের পুঁথিলেখক কিন্তু নিজের লেখা পুঁথির শেষে নিজের নাম, ঠিকানা, ধর্মমত, সুখ-দুঃখ, নানা ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা ইত্যাদি অনেক কথা সুকৌশলে অথবা অকপটে পুঁথির শেষাংশে লিখে দিয়েছেন। কালের মহাপ্রান্তরে হারিয়ে যাওয়া এইসব অখ্যাত অজ্ঞাত লিপিকরদের অশেষ করুণাতেই আদি ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য, ভাগবত, মহাকাব্য, মঙ্গলকাব্য, পাঁচালী কাব্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় সম্ভব হয়েছে। তবে একথা ঠিক নয় যে, বৃদ্ধ বয়সে মানুষ পুঁথি নকল করতে আসতেন ('বাংলা পুঁথির নানাকথা', অচিন্ত্য বিশ্বাস, পৃঃ ২০)। পেশাদারী কাজ হিসেবে যেমন অনেকে এ কাজ করতে আসতেন, তেমনি শখ মেটাতে বা পুণ্য অর্জনের লোভেও অনেকে এ কাজ করতেন। এখানে জাতি, ধর্ম, ধনী-দরিদ্রের কোন ভেদাভেদ ছিল না।

পুঁথি নকলের কাজে হিন্দু-মুসলমান, ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ কোন জাতি বিচার ছিল না। সেকালে একাজ জীবনযাপনের অন্যান্য কাজকর্মের মতই স্বাভাবিক ছিল। সাধারণ কৃষক থেকে মহারাণী পর্যন্ত সকলেই পুঁথি লিখেছেন। একাজ ছিল আবার একশ্রেণীর মানুষের জীবিকা। মুসলমান লিপিকররা ইসলামী পুঁথি ছাড়াও অনেক হিন্দুকাব্যও নকল করেছেন। লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত মহাভারতের কয়েকটি পুঁথির লিপিকর জামাল মাহমুদ। এছাড়া মণির মহম্মদ, ফতে মহম্মদ, আজিজর রহমান, মিচকিন ইলিয়াস, বাচা মিঞা, হামিদ মল্লিক, তালিমদ্দিন প্রমুখ মুসলমান লিপিকরের পুঁথি পাওয়া গেছে। বৃত্তি, ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণকামনা, পরজন্মের সুখানুসন্ধান, শোকজ্বালা থেকে মুক্তি, এইসব নানাকারণে পুঁথি নকল করা হোত। মৃত্যুর পরে আবার জন্ম হলে পুঁথি লেখার কাজ করার বাসনাও কেউ কেউ প্রকাশ করেছেন। তবে জীবিকা নির্বাহের ব্যাপারটাই বোধ হয় ছিল সবচেয়ে বড় ব্যাপার। 'ধান কিনতে যাবার সময়' নদীপথে নৌকায় অবসর বিনোদনের কালেও পুঁথি লেখা হয়েছে। এই শ্রেণীভুক্তদের 'শৌখিন লিপিকর' বলা যেতে পারে। অন্যরা ছিলেন 'পেশাদারী লিপিকর'। পুঁথি নকলের কাজটিকে যে বিশেষ কোন মর্যাদা দেওয়া হত না, তাও নয়।

পেশাদার লিপিকররা কাগজকলম কালি সহ নানাস্থানে ঘুরে ও ক্রেতার ফরমাইস মতো পুঁথি নকল করতেন - যেমন মন্দির-স্থাপত্য ভাস্কর্যের কাজ করতেন ভ্রাম্যমান সূত্রধর শিল্পীর দল। সম্পন্ন, বিদ্যানুরাগী, ধর্মপ্রাণ গৃহস্থ এই সব লিপিকরদের সাদরে নিজগৃহে আহ্বান

জানিয়ে তাঁদের দিয়ে পছন্দমত পুঁথি লিখিয়ে নিতেন । সেকালের এমন এক একজন গ্রন্থরসিক মানুষের সন্ধান পাওয়া গেছে, যাঁরা অসংখ্য পুঁথি নকল করিয়েছেন নিজেদের পড়ার জন্যে । সেকালের তমলুক মহকুমার কাশীযোড়া পরগণার রাজা রাজনারায়ণ এবং ঘাটাল মহকুমার এরেটার জমিদার রামদুলাল মান্না, মেদিনীপুরের এই দুই গ্রন্থরসিক ভূস্বামীর নামযুক্ত অনেক পুঁথি পাওয়া গেছে । আবার একালের দলিল লেখার সেরেস্তার মতো লিপিকরের পুঁথি লেখার সেরেস্তাও ছিল হয়তো । কোন কোন রাজা-জমিদার মাইনে করা লিপিকর রাখতেন, ভাল পুঁথির সন্ধান পেলে তা নকল করিয়ে নিতেন । এইসব লিপিকর অবশ্য জমিদারীর অন্যান্য লেখার কাজও করতেন ।

পুঁথি লেখার পারিশ্রমিক যে আশানুরূপ ছিল না এবং তাতে যে অনেক লিপিকরই সুখী ছিলেন না। সেই অকপট দুঃখের স্বীকারোক্তি করেছেন অনেক লিপিকর । আবার, অন্য কোন কাজ না থাকলে, শরীরে তেমন শক্তি না থাকলে, জীবিকা অর্জনের অন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থা না থাকলে, মানুষ শেষ পর্যন্ত জীবিকা হিসেবে পুঁথি লেখার কাজ করত । বিশ্বভারতীর একটি চণ্ডীমঙ্গল পুঁথির (নং ৬২৪০) শ্রীনন্দদুলাল দেবশর্মা কিংবা 'সুদামার দারিদ্র্যভঞ্জন' পুঁথির (নং ৬২৩৯) লিপিকর কেনারাম দেবশর্মার অভিমতানুযায়ী, খরার দুর্বিপাক, কোন কাজ নেই, অগত্যা পুঁথি লেখার কাজই নিতে হয়েছিল । বড় দুঃখের সঙ্গে পুঁথি নকল করতে করতে 'আঙ্গুল হাড়া হৈয়া তিনমাস দুঃখ পাইনু', 'ঘাড়ের মধ্যে সাল হৈয়া বড় বেতা পাইয়া এহি পুস্তক সমাপ্ত করিলাম', 'বহুকষ্টে বাতযোগে পাতি হইযা লিখিলাম' ইত্যাদি বেদনাময় উক্তি অনেকেই করেছেন । 'কেয়ামৎনামার' লিপিকর বলেছেন, 'জগতের ভাই ইষ্টমিত্র বন্ধু-বান্ধব নাহি তাহা সকলের আমি দয়া চাহি । আমার নাম শ্রীমণির মহম্মদ সাং গোপালচরণ পরগণে বামনডাঙ্গাতে । ঘর নষ্ট দোষে আসিয়াছি আমার খাওযা পরাইবার নযা করে লোক নাহি । নাবালক দুইটা ছাওয়াল । শেষকালে আমার এহি হোল ।' 'গোরক্ষবিজয়ের' লিপিকর মির্চাকিন ইলিয়াস ছিলেন 'দৈবেহীন অতি ক্ষীণ বৃদ্ধ জরাজীর্ণ ।' এইসব পুঁথি লেখকদের "অধোমুখে, স্তব্ধদৃষ্টিতে, পিড়াসিদ্ধ অর্থাৎ আসনসিদ্ধ হয়ে বসে বসে দিনের পর দিন পুঁথি নকল করতে করতে... পিঠ, কোমর, ঘাড় হয়তো বেঁকে যেত যন্ত্রণায় কিন্তু তবুও বিরাম ঘটতো না অনুলিখনে (শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল, 'বাংলা পুঁথি ঃ রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতীর পুঁথি বিভাগ', সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৭৫ বর্ষ সংখ্যা ১)" । মধ্যযুগের বাংলা-পুঁথির সাম্রাজ্যে সারাজীবন ধরে বেশ কিছু পুঁথি নকল করেছেন, এমন অনেক লিপিকরকে খুঁজে পাওয়া গেছে । বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর পাঠক পাড়ার গুরুদাস দত্ত, সোনামুখীর বংশীধর বাউল বর্ধমান জেলার পাহাড়পুরের বিশ্বনাথ সিংহ, কোন এক ময়নাপুরের গদাধর বাড়ুই তাদেরই কয়েকজন ।

বাংলা পুঁথির একজন বিশিষ্ট লিপিকর পঞ্চানন আস দাশের লেখা অনেক পুঁথির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে । পুঁথি লেখার স্থান বা বাসস্থান হিসেবে দৈবকিনন্দনপুর, সামাএীদহ বড়চাতুরি ও গোপালপুর গ্রামগুলির নাম তিনি বিভিন্ন পুঁথিতে উল্লেখ করেছেন । এরমধ্যে সামাএীদহ ও বড়চাতুরির উল্লেখ বেশীর ভাগ পুঁথিতে আছে । উল্লিখিত স্থানগুলি একসময় শিক্ষাসংস্কৃতিতে যথেষ্ট উন্নত ছিল এবং ঐ অঞ্চলে অনেক পুঁথিই অনুলিখিত হয় । শান্তিনিকেতনের

পার্শ্ববর্তী বড়চাতুরী গোয়ালপাড়া প্রাচীন গ্রাম । এমনও হতে পারে, পঞ্চানন বিভিন্ন গ্রামে বিভিন্ন পুঁথি নকল করেছেন । তাঁর পরিচিতি নিম্নরূপ ঃ

"নকলকার আস দাসস্য দাসানুদাস, ইতি ।। পূর্বের লিখিত গ্রন্থ পত্র হৈল জরা । লিখিতে কাঁপএ কর আমি বৃদ্ধ মরা ।। সকাব্দ আমার জন্ম ১৬৬৮ সকে জন্ম মধুমাসে । ১৭৪৮ সতের সত্তা য়ষ্ঠ চল্লিশ সকে গ্রন্থ নকলি ফাল্গুনের পঞ্চদশ দিবসে । য়ক্ষরের বুতিক্রমে না করিহ রোস । সব শ্রোতাগণের পায় মাগ্যা নিল দোস । য়তি দিন হিন আমি বড় দুরাচার । শ্রীগুরু বৈষ্ণব ক্রিপা করি কর মোরে ভবসিন্ধু পার ।। নকলকার শ্রীপঞ্চানন য়াস দাসস্য ।। উমের সন ১১৬৩ সালে চৈতত্র মাসে জন্ম ।"

সুখ-দুঃখ মিশ্রিত জীবনের অধিকারী এই বিশিষ্ট লিপিকরের যে পুঁথিগুলি বিশ্বভারতী পুঁথিশালার সংগৃহীত, তা হল (লিপিসাল বঙ্গাব্দে উল্লিখিত) ঃ-

গোবিন্দদাস রচিত 'নিগমগ্রন্থ' (১১৮১ বঙ্গাব্দ), নরসিংহদাস অনূদিত 'হংসদূত' (১১৮৩), কৃষ্ণদাসের 'বৃন্দাবনলীলাস্থান বর্ণন' (১২৩৮), যুগলকিশোরদাসের 'আগমগ্রন্থ' (১২২৩), কৃষ্ণদাসেব 'চৈতন্যতত্ত্বসার' (১২৩৮), নরোত্তমদাসের 'বৈষ্ণবামৃত' (১২৪২), রসময়দাসের 'শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লী' (১১৭২), নরোত্তমদাসের 'সাধ্যপ্রেমচন্দ্রিকা' (১২৪০), কৃষ্ণদাসের 'আত্মজিজ্ঞাসা' (১২৩৩), নরোত্তম ও রাধাবল্লভের 'প্রার্থনা'র পদ পঁয়ত্রিশটি (১২৩০), কৃষ্ণদাসের 'দণ্ডটীকা', দামোদর দাসের 'বৃন্দাবন পটল' (১২৩৮) ও কৃত্তিবাসের 'অঙ্গদের রায়বার' (১২০০), বিবিধ কবির 'স্মরণমঙ্গল' (১১৮৪), 'রাধারসকারিকা' (১২৩৩), 'অক্ষরবর্ণন' (১২৪৩), 'একান্নপদ' (১১৪৩) ইত্যাদি ।

পঞ্চাননের লিপিকৃত পুঁথিগুলির দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে ১১৭২ বঙ্গাব্দ থেকে ১২০০ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত পুঁথি লেখার কাজ করে আবার দীর্ঘদিন পর ১২৩০ থেকে ১২৪৩ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত তিনি লেখার কাজ করেছেন । মাঝে কয়েকটি বছর তিনি স্থানান্তরে গিয়ে পুঁথি লিখেছেন এবং সেসব পুঁথি হয়তো আজও অনাবিষ্কৃত কিংবা লেখার কাজ তিনি সাময়িকভাবে বন্ধ রেখেছিলেন । ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, মাঘ ও ফাল্গুন মাসেই তিনি লেখার কাজ করেছেন । এই বিশিষ্ট লিপিকর সম্পর্কে আর কোন তথ্য পাওয়া যায় নি । অসমর্থ বয়সে পুঁথি লিখতে গিয়ে তিনি প্রকাশ করেছেন জন্মান্তরেও পুঁথি লেখার প্রবল বাসনাটিকে ঃ 'অতিবৃদ্ধ মুঞি নিকট মরণ। লোভ্যোত্র লিখি কিছু না জানি মরম ।। জদি জন্ম হয় পুন সংসার ভিতর ।ইহাতেই লোভ যেন থাকে নিরন্তর ।।" তাঁর এই স্বভাব নিঃসন্দেহেই বৈষ্ণবজনোচিত ।

অপর এক বিশিষ্ট পুঁথিলেখক রামপ্রসাদ বোস উড়িষ্যার তাৎকালিক কটক সরকারের অন্তর্গত পরগণা পায়ন্দা পহরাজপুরের বারদা গ্রামের এক গ্রন্থরসিক ব্যক্তি গৌরহরি দত্তের জন্যে নকল করেছেন ভাগবত, মহাভারত ও রামায়ণের অনেকগুলি পুঁথি । উড়িষ্যার মাতকন্দনগর পরগণার মহাগ্রাম ও খোরদার অধিবাসী রামপ্রসাদ ১২২৯ থেকে ১২৩৪ বঙ্গাব্দ সময়কালে সনাতন বিদ্যাবাগীশ অনূদিত ভাগবতের ৫ম ও ৬ষ্ঠ স্কন্ধ, মহাভারতের সভাপর্ব, কর্ণপর্ব, উদ্যোগপর্ব, ভীষ্মপর্ব, অশ্বমেধপর্ব, স্বর্গারোহণপর্ব, শান্তিপর্ব, অযোধ্যাপর্ব ইত্যাদি পুঁথি লিখেছিলেন। বারদা গ্রামের দত্তপরিবার ছিলেন গ্রন্থরসিক । ঐ পরিবারের দর্পনারায়ণ দত্ত

মহাদেব দত্তকে দিয়ে ১১৮৫ বঙ্গাব্দে ভাগবতের ১ম, ২য়, ৩য়, ৭ম ও ৮ম স্কন্ধ এবং ভাগিনেয় গোপীনাথ ঘোষকে দিয়ে ৪র্থ স্কন্ধ ১১৯৮ বঙ্গাব্দে অনুলিপি করান। ১২৩০ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসের এক রবিবারের সন্ধ্যায় ভাগবতের ৫ম স্কন্ধ লেখা শেষ করে রামপ্রসাদ পুঁথির শেষাংশে লেখেন, 'খোরদা মোকামে শ্রীভাই গৌরহরি দত্তজা মহাশয়ের মনোনিতে এ পুস্তক ত্বদিয়া শ্রীরামপ্রসাদ দাস বোস ইহা লিখিয়া বিশ্রাম দিলাম ।।'

পুঁথি লেখার মত কষ্টকর কাজে জীবন অতিবাহিত করেও কাজটিকে তিনি পরম নিষ্ঠার সঙ্গেই করে গেছেন। মহাভারতের 'উদ্যোগপর্ব' পর্যন্ত লিখে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন, 'জদ্যপি আয়ু সেশ থাকে তবে আর পর্ব্ব লিখিব এ পরে শ্রোতাঠাকুরদিগকে এই ভেট গ্রন্থ পাঠ করিবেন। কিন্তু কেহো গোপনিয় না করেন।' তাঁর বিনীত স্বভাবের প্রকাশ ঘটেছে এইভাবে: 'জদ্যপি লিখিবাতে দোসেহ হৈয়া থাকে তবে মহাশয়েরা আমার দোষ ক্ষমা করিবা ।। জে অক্ষর ও পয়ার না থাকে তাহাকে অনুগ্রহ করিয়া লিখিয়া দিবেন ।।' 'এক নিবেদন বক্তা ঠাকুরদিগে লিখেবাতে জে দোষাদোষ আছে তাহা মহাশয়েরান তাহাকে সুর্দ্ধ করিবেন এ পুস্তক অনেক জত্নে শ্রীভাই দত্তজা মহাশয় লেখাইলেন আমিহ কিছুই লেখিতে না জানি।' 'বক্তা ঠাকুর মহাশয়দিগে আমার শতংকোট নমস্কার ।। আমার দোশাদোশ ক্ষমা করিবা ।।' বহু দুঃখে তিনি 'গ্রন্থ' লিখেছেন। তাই গ্রন্থকে 'পুত্রবৎ' পালন করারর অনুরোধ পুঁথি মালিকের কাছে রাখার অধিকার তাঁর আছে। সেকালের সাহিত্যরীতির অনুসরণে ১২৩৩ বঙ্গাব্দে সমগ্র মহাভারত অনুলিপি করে পর্বগুলির একটি সুন্দর নির্ঘন্ট তিনি করে দিয়েছেন। ১৯শ শতকের গোড়ার দিকে ১৮১৭ খ্রীঃ অব্দে রামায়ণের অযোধ্যাকান্ড লেখার পর রামপ্রসাদ তাৎকালিক ইংরেজ সরকারের প্রসঙ্গও উল্লেখ করেছেন।

ঢাকার বাংলা একাডেমী ও বাংলা উন্নয়নবোর্ড সংগৃহীত পুঁথির মধ্যে এমন বহু পুঁথি আছে যেগুলি এক একজন লিপিকরের লেখা। যেমন পরগণা মেহেরকুলের (বাংলাদেশ) সাকিম জোলাই গ্রামের শ্রীদোকড়িনাথ (সঞ্জয় রচিত মহাভারত আদিপর্ব, বিরাটপর্ব, উদ্যোগপর্ব, ভীষ্মপর্ব, দ্রোণপর্ব, কর্ণপর্ব, সৌপ্তিকপর্ব, ঐষিকপর্ব, স্ত্রীপর্ব, শান্তিপর্ব, অনুশাসনপর্ব, জামুলপর্ব, অশ্বমেধপর্ব, মৌষলপর্ব ও স্বর্গারোহণপর্ব)[২]; শ্রীরামশঙ্কর দে দাস (সঞ্জয়ের মহাভারত[৩] সভাপর্ব, বিরাটপর্ব, উদ্যোগপর্ব, ভীষ্মপর্ব, দ্রোণপর্ব, কর্ণপর্ব, শল্যপর্ব, গদাপর্ব, সৌপ্তিকপর্ব, ঐষিকপর্ব, স্ত্রীপর্ব, শান্তিপর্ব, অনুশাসনপর্ব, অশ্বমেধপর্ব, স্বর্গারোহণ); জেলা কুমিল্লার মেহারকুল পরগণার সাকিম জোলাই সারোয়াতলির শ্রীদোকাড়ি দাস (১২২৩ ত্রিপুরাব্দে সঞ্জয় রচিত মহাভারত[৪] দ্রোণপর্ব, কর্ণপর্ব, শল্যপর্ব, সৌপ্তিকপর্ব ঐষিকপর্ব, স্ত্রীপর্ব, শান্তিপর্ব, অনুশাসনপর্ব, জামুলপর্ব, অশ্বমেধপর্ব, মুষলপর্ব, স্বর্গারোহণপর্ব ও অন্যান্য); শ্রীমহম্মদ মুনাইম, কুমিল্লাব (?) ব্রজমোহন দাস বৈরাগী (গুণরাজ খানের 'লক্ষ্মীগোবিন্দের সম্বাদ', ১২২৯. হি. পুঁ ৪৬৮; 'লক্ষ্মীরপাঁচালী', ১২২৯, হি. পুঁ. ৪৬৯; পন্ডিত কিত্তিবাসের 'মোহা রামায়ণ অরণ্যকাণ্ড', ১২২৭, হি. পুঁ. ৪৭২; অজ্ঞাতকবির 'শ্রীরামচন্দ্র স্বর্গ আরোহণ' ১২২৫, হি. পুঁ. ৪৭৫; 'মোহা রামায়ণ', ১২১২, হি. পুঁ. ৪৭৬; ঐ. ১২২৫, হি. পুঁ. ৪৭৭) প্রমুখগণ।

চট্টগ্রামের সাকিম ধলঘাটের কালিদাস নন্দী[৫] সৈয়দ নুরুদ্দিনের 'দাকায়েকুল হাকায়েক'

১২১৫, ঢা. বি. ৩৮৭); মোহম্মদ খানের 'মোহাম্মদ হানিফার লড়াই', (১৮৫৫ খ্রীঃ, ঢা. বি. ২০২, ২২০ ক)· আলাউলের "পদ্মাবতী' (ঢা. বি. ২৫২); শেখ সেরবাজ চৌধুরীর 'মল্লিকার হাজার সওয়াল বা ফক্করনামা', (ঢা. বি. ১৭২); মোহাম্মদ নসরুল্লাহ খোন্দকারের 'মুসার সওয়াল', (ঢা. বি. ৬৭); অজ্ঞাত কবির 'যোগকালন্দর', (ঢা. বি. ৮৬); চম্পাগাজী ইত্যাদির 'রাগনামা', (ঢা. বি. ৪৫৪); জায়নুদ্দিনের 'রসুল বিজয়', (ঢা. বি. ৫৯৪); সৈয়দ সুলতানের 'রসুল রচিত', (ঢা. বি. ৬৬৭); দৌলত উজীর বাহরাম খানের 'লায়লা মজনু', (১৮২৯ খ্রীঃ, ঢা. বি. ৪৬৩); দৌলত কাজীর 'সতীময়না-লোরচন্দ্রানী') (১৮৩৬ খ্রীঃ, ঢা. বি.৪৬৯, ৩০৯, ৪৭৭, ২৩০, ২৩৩; আলাউলের 'সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জমাল', (ঢা. বি. ৫৮৩, ৫০৪); আলাউলের 'সেকেন্দার নামা' (ঢা. বি. ৩২৭, ৫৩২, ২৭৫, ৬৯১); মোহাম্মদ কাসিমের 'হিতোপদেশ' (ঢা. বি. ১৪০); শ্রীবাচামিঞা, বাকর আলি, নাসিরউল্লা, চট্টগ্রামের চাকলে বাসখালির ইলসাহা সাকিমের শ্রীআচমত আলি (১৮৪২ খ্রীঃ), নোয়াখালির সাকিম চাথার পাইসের শ্রীসোনাউল্লা, মহম্মদ আলি, শ্রীরহমল্লা প্রমুখ লিপিকরের বহু পুঁথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথিশালায় আছে। রাজশাহীর বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামে" আছে বর্ধমান জেলার সাকিম খণ্ডঘোষের শ্রীব্রজমোহন পোতদার (১৮১৭ খ্রীঃ), পরগণা হাবেলি সাদিপুরের কনকপুর সাকিমের শ্রীরামমোহন দাস (১৭৯৮ খ্রীঃ) প্রমুখ লিপিকরদের নানা পুঁথি।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়' পুঁথি শালায় 'মোকাম হরিপুর-নাটচান্দপুর, পরগণা রাজনগর, থানা জগদলা, জেলা দিনাজপুরের দেবীপ্রসাদ সরকারের লিপিকৃত 'জগতজীবন' ঘোষালের 'মনসামঙ্গল' (১৮২৪ খ্রীঃ), কৃত্তিবাসের 'অঙ্গদ রায়বার' (১৮৪৬ খ্রীঃ), গর্গমুনির 'ইন্দ্রপুরাণ' (১৮৪৫ খ্রীঃ), গোবিন্দ দাসের 'স্মরণমঙ্গল', (১৮৩৫ খ্রীঃ) পুঁথিগুলি আছে। এক লিপিকর 'সাং মানুলি, পঃ আঝের, গাজল জেলা মালদহের' রঘুনাথ মণ্ডল 'জগাই মাধাই শব্দাবলী' (১৯০৫ খ্রীঃ), দ্বিজ পরশুরামের 'সুদাম চরিত্র' (১৯০০ খ্রীঃ) দুটি পুঁথি ও 'তুলসী বন্দনা' নকল করেন বোধ হয়, নিজের প্রয়োজনেই। এছাড়া ঐ সংগ্রহশালায় আরো যে সব লিপিকরের পুঁথি আছে তাঁরা হলেন সীতারাম উপাধ্যায় (যাদবদাসের 'লক্ষ্মী পাঁচালী', ১৭৪৪ খ্রীঃ), রামদয়াল দেবশর্মা (দ্বিজমাধবের 'চণ্ডীমঙ্গল', ১৮০৬ খ্রীঃ), আজানাগুরু ঠাকুর (মঘা খংমুজা রচিত 'মঘাধর্ম ইতিহাস', ১৮০৭ খ্রীঃ, উ. ব. ৪৪১), নন্দদুলাল শর্ম্মা (মানিকদত্তের 'চণ্ডীমঙ্গল', ১৭৮৬ খ্রীঃ), 'সাং সিমুয়া পরগণে রামগড় থানে বলরামপুর চাকলে মেদনিপুর সরকার গোওালপাড়ার গোবর্দ্ধন পাত্র (নরোত্তম দাসের 'বৈষ্ণবামৃত চরিত্র', ১৮০৪ খ্রীঃ), 'সাং জাহানাপুর মাহাপাল'এর শ্রীকৃষ্ণ রক্ষিত (নরোত্তম দাসের 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা', ১৮২০ খ্রীঃ), 'সাং বেল্যাপানার কানাইচরণ দেবশর্ম্মা (দ্বিজ কবিচন্দ্রের 'কর্ণপালা'), 'সাকিন ব্রাহ্মণকান্দা'র রাজচন্দ্র শর্ম্মা ('পদ্মপুরাণ', নারায়ণদেব, ১৮৫৩ খ্রীঃ), সাং চিলকির লোচনপাত্র (ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দরকাব্য', ১৮৫২ খ্রীঃ), সাং হরিপুর থানা বামনগোলা জেলা মালদহের কুলাল মণ্ডল (মানিক দত্তের 'চণ্ডীমঙ্গল'), 'সাং মানুলী পরগণে আঝর সরকার জুলুতাবাদের' লালবিহারী সরকার (মানভঞ্জন, ১৯০২ খ্রীঃ, উ. ব. ৬৬৬) প্রমুখ। এখানে এক সাঁওতাল লিপিকরের লেখা একটি 'চণ্ডীমঙ্গল' পুঁথি (উ. ব. ৬৪২) আছে। পুষ্পিকাটি এই রকম ঃ-

"মহামহিম শ্রীযুক্ত কৃষ্ট সুন্দরাএ পিতা রায় সুন্দরাএ লিখিতং মাঝি সাওতাল পিতা রাওয়াল সাঁওতাল জ্ঞাতি কুমার গো.....সাং রামকৃষ্টপুর থানা রামগোলা জাতি সাঁওতাল সাং সরডালা থানা বামনগোলা জেলা মালদহ ।"[৮]

কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার, আগরতলা সরকারী মিউজিয়াম, ঢাকা বাংলা একাডেমী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী সংগ্রহ, মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষৎ, বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর যোগেশ চন্দ্র পুরাকৃতি ভবন, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন ব্যক্তিগত সংগ্রহে রক্ষিত বাংলা পুঁথিতে লিপিকর হিসেবে যাঁদের নাম পাওয়া যায় তাঁদের একাংশ নিম্নরূপ (লিপিকর, পুঁথি ও লিপিকরের বাসস্থান উল্লিখিত) ঃ-

তিতারাম দেবশর্ম্মণঃ (ভবানীনাথের রাজ্যাভিষেক), অজধ্যারাম দেবশর্ম্মনঃ (রামচন্দ্রের স্বর্গারোহণ), কণ্ঠমণিনাথ শর্ম্মা (রাম স্বর্গারোহণ), বংশীধর মিস্ত্রী (সীতার বনবাস, জগন্নাথপুর), রামময় ভট্টাচার্য (সীতার বারমাসি), গোবিন্দরাজ সরকার (মহাভারত দ্রোণপর্ব, পাত্রসায়ের), শিবচন্দ্রদাস ঘোষ (মহাভারত কর্ণপর্ব ও অশ্বমেধপর্ব, আনওবপুর নলকুড়া) । আদিবাস....সাং সুতানুটী), লালমোহন দাস মিত্র (মহাভারত শান্তি পর্ব, বাহাদুরগঞ্জ, পং বিষ্ণুপুর) নফরচন্দ্র মিত্রমজুমদার (মহাভারত স্ত্রীপর্ব, সোনামুখী), কিশোরমোহন দাস সরকার (পাণ্ডববিজয় কথা, বুজারগত),যদুনগর ঠাকুর (হরিবংশ), ষষ্ঠীধর ঘোষ (দণ্ডীরাজার উপাখ্যান, তাজপুর, পং দৌলতপুর), রামশঙ্কর দেবশর্ম্মণঃ (দণ্ডীরাজার উপাখ্যান), শিবরাম দাস (পাণ্ডববিজয়, পরগণে ভাতিসীনা), বারাণসী ঘোষ (মহাভারত, দাতাকর্ণ, সাং খাতঘোষ), 'পঞ্চানন মজুমদারের পুত্র' (সৃষ্টিপুরাণ), লক্ষ্মীকান্ত দেবশর্ম্মণঃ (ক্রিয়াযোগসার), গোকুলমোহন দাস সিংহ (নারদ পুরাণ, বাবুই জগদ্বেড়, পং বর্দ্ধমান), মধুসূদন গঙ্গোপাধ্যায় (ভাগবত), রাধবল্লভ দাস (কালিকা পুরাণ, লক্ষ্মীপুর), রামচরণ বাড়ুই (যযাতির নরমেধযজ্ঞ), গঙ্গাধর দাসনন্দী (ধ্রুবচরিত্রপালা, ময়নাপুর),শ্যামসুন্দর মিত্রমজুমদার (প্রহ্লাদ চরিত্র, সোনামুখী), মুনিরাম দাস (যমকবলচরিত্র, বাহাদুরপুর), গুরুপ্রসাদ দাসদত্ত (মণিহরণ), খেণ্ডবারিকা (তুলসী মাহাত্ম্য, মানকর), বংশীদাস বাউল (শ্যামানন্দ প্রকাশ, সোনামুখী), গউরমোহন দাস বৈষ্ণব (চমৎকারচন্দ্রিকা, কাঞ্চননগর), রাধাগোবিন্দ দাস (নিগূঢ় তত্ত্বসার, বিক্রমপুর), পদ্মলোচন চৌধুরী (প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, জান্তা, পং বিষ্ণুপুর), মদনমোহন ধন্যস্য (প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, জামকুন্তী), রামকান্ত দাস (প্রেমভক্তিতরঙ্গিনী, সগুণে, পং মেহমানসাহি),সনাতন দাস (উপাসনা পট্টল, সাং মনোব্রজ), কার্ত্তিকরাম দেবশর্ম্মা (হংসদূত, বৃষ্টুপুর), পরাণ দত্ত (চৈতন্যমঙ্গল), পুরুষোত্তম দাস পাঠক (চৈতন্যমঙ্গল), পেলারাম দাস বিশ্বাস (সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়, কুশদ্বীপ, পর্গণে বিষ্ণুপুর মল্লপুরী), পরাণকৃষ্ণ দাস (চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী), বংশীধর দাস (ভৃঙ্গরত্নাবলী, সনামুখীর মধ্যে রঘুনাথপুর), কৃষ্ণচন্দ্রদাস (প্রেমবিলাস), মতিলাল দেবশর্ম্মা (ভক্তিতত্ত্বচিন্তামণি, রুপসা এর বাজার), রাসবিহারী বসু (তত্ত্ববিলাস, কুলীনগ্রাম, সম্প্রতি তোড়াকোণা মোকাম বাকুণ্ডা), রামলোচন দেবশর্ম্মণঃ (প্রকাশখণ্ড, চাকুলে বর্দ্ধমান পরগণে পাহুয়ামৌ পোটবাপটী, গোবিন্দনগর,নরসিংহ দাস (কৃষ্ণলীলামৃত, সা বর্দ্ধমান, মোকাম স্যাম ঘোষের বাগান), শ্রীরাম

দাস (গোপাল বিজয়, সাকিম গোপালগঞ্জ), হরিলাল সিংহ (গুরুদক্ষিণা, রাইপুর বাজার), বাগুতিরাম নামকা (গুরুদক্ষিণা, সাং দোবত), শ্রীরামসুন্দর শূর (গুরুদক্ষিণা, মধুবাটি), বিশ্বনাথ সেনগুপ্ত (হরিলীলা), কানাই দাস (স্মরণদর্পণ, ভগবানপুর), নীলমণি পান (হরিনামতরঙ্গিনী, সোনামুখী), সাধুচরণ দাস (কৃষ্ণকেলিচরিতামৃত, সাকিম পুরলিয়া), ভোলানাথ দাস (প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, হজরথপুর), অনন্ত নন্দী (জীতামঙ্গল, সাং হাতিক, চোকী বিষ্ণুপুর), মধুসূদন চট্টরাজ (ভক্তিউদ্দীপন গ্রন্থ, সাকিম বেলকুণ্ডি, শ্রীনিবাস দাস (জগন্নাথবল্লভ নাটক, সাং পাথোয়াতোড়ি), গুরুপ্রসাদ দত্ত (জগন্নাথবিজয়, বিষ্ণুপুর-পাঠকপাড়া), কালিপ্রসাদ মজুমদার (জগন্নাথ মঙ্গল, সাকারি, পং খন্ডঘোষ), জয়কৃষ্ণ দাস (আনন্দলতিকা, বীরসিংহপুর), অনন্ত নন্দী সরকার (কপিলামঙ্গল, সাং হেত্যা), সনাতন সিংহ (প্রসাদ চরিত্র), রাজচন্দ্র মিস্তরি (যোগাদ্যের বন্দনা, সাং দেওয়ানবাজার), রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় (জগন্নাথ বল্লভ নাটক), রামলোচন দাসঘোষ (ষিদ্যাসুন্দরমালিনী উপাখ্যান, সাং মল্লভূম, পাড়া আহেরি, পং বিষ্ণুপুর), বংশীধর দাস সরকার (গেড়ুচুরি, সাং শ্যামনগর), রামলোচন ঘোষ (তুলসী চরিত্র, সাং·মকরন্দপুর, পং বিষ্ণুপুর), শ্রীবামনারায়ণ ধূপী (রামায়ণ অযোধ্যাকান্ড, সাকিম চণ্ডিপুর, পং মেহারকুল), মুহননাত (শতস্কন্দ রাবণবধ, মৌজে তেঘবিয়া, পং জফরগড়), রামশরণ পাল (মহাভারত), হরিনারায়ণ দেব (চৈতন্যমঙ্গল, সাং বামুনপাড়া), ভগবান চন্দ্র কর (ভাগবতসার, সাং সান্তিপুর রামনগর), বাবুরাম দাস বৈরাগ্য (কৃষ্ণমঙ্গল, সাং বালিয়া), মদনগোপাল দাষ (ভক্তিচিন্তামণি, সাং মল্লভৌম জয়বালিয়া, সেনাপতি মহল ভাদুলি নামে গ্রাম), রামচন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ, শ্রীনাথ দেবশর্ম্মণঃ ও পরমানন্দ দেবশর্ম্মণঃ (কৃত্তিবাস রামায়ণ, সাং হরির পুষ্কন্নি), নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী (পঞ্চানন্দের গান, গঙ্গার চরিত্র, দক্ষিণরায়ের পালা, শুভচনির ব্রতকথা, সাগরপুর, পং চেতুয়া), ভগাবনচন্দ্র মাজি (সত্যনারায়ণ সাতভাই দুখীর পালা, সাং হাটগেছা, পং চেতুয়া), চৈতন্যচরণ জানা (রামেশ্বরের সত্যনারায়ণ পালা, সাং উদয়চক, পং চেতুয়া), মুচিরাম দাস সিংহ (মেলাইচণ্ডিকা কথা, চান্দপুর, পং চেতুয়া), হরিচরণ হড় (শীতলামঙ্গল, সাং কোননগর, পং বরদা), রামপ্রসাদ চৌধুরী (শীতলামঙ্গল, সাং জটাধরপুর), কিনু আদিকারি (শঙ্করের গঙ্গামঙ্গল, সাকিম পরগণে কুঞ্জপুর খাজুরিগ্রাম), রামলোচন সরকার (কৃষ্ণদাসের পাষগুদলন, সাং বালি), ভরথ বেরা (গঙ্গাচরিত্র, সাং মৌজে, কামালপুর, পং চেতুয়া, তরফ ঘাটাল, সরকার মান্দারণ), বংশীবদন দাস বৈরাগী (সনাতন বিদ্যাবাগীশের ভাগবত ১২শ স্কন্ধ সাং গোপালনগর, রামসুন্দর দেবশর্ম্মণঃ (মহাভারত সৈন্যপর্ব, সাং বলিহারপুর)।

একই পুঁথি একাধিক লিপিকর লিপি করেছেন। সে দৃষ্টান্তও অজস্র। পুঁথিতে অনেক সময় লিপিকরের নাম না থাকলেও ভিন্ন হস্তাক্ষর দেখেই তা বোঝা যায়। মৎসংগৃহীত বৃন্দাবন দাসের 'রিপুচরিত্র' পুঁথির পুষ্পিকাটি নিম্নরূপ ঃ-

'এ গ্রীন্থ লিখিতং শ্রীবিনোদমোহন মহন্তস্য ও শ্রী আনন্দমোহন গোস্বামী পাঠনাথ্যে শ্রীযুকময় দাস সাং ময়নাডাল পং কাসিযোড়া সরকার গোওালপাড়া সন ১২২৪ সাল তাং ২৩ কুম্ভ পুণ্যমাসি দীবস বেলা সাতঘড়ি সমএ সমাপ্তং ইতি।'

বিশ্বভারতী সংগ্রহের ৯৫০ সংখ্যক পুঁথি 'পদমেরুগ্রন্থে' চার রকমের হস্তাক্ষর আছে।

অনুমান, লিপিকর চারজন, যদিও কারো নাম এখানে নেই (পুঁথি পরিচয় ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৫৫)। 'মহাভারত দ্রোণপর্ব' (বি. ভা. ৪৮৩৮) ১২১৯ বঙ্গাব্দে লিপি করেছেন পাঁচজন লিপিকর - ভোলানাথ দাস, হারাধন সিংহ, অতৈচন্দ্র দাস, কানাইলাল মিত্র ও নফরচন্দ্র মিত্র। কাশীরামের 'মহাভারত বিরাটপর্ব' (ক. বি. ১৯২৩) পুঁথি ১১১০ বঙ্গাব্দে, ১ টাকা দক্ষিণার বিনিময়ে 'তিনভাগ লিখিলেন শ্রীমানিকরাম বিশ্বাস সিকিভাগ লিখিলেন রামলোচন ভট্টাচাজ্য সাং হামিরহাটি.....।' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহের (ক. বি. ৪) কৃত্তিবাস রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের পুঁথি ১২৬৫ বঙ্গাব্দে লিপি করেন তিনজন লিপিকর।

বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামে (রাজশাহী) সংগৃহীত কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের 'চণ্ডিকামঙ্গল' (ব. বি. ৪৩৪) পুঁথিটির পুষ্পিকাটি নিম্নরূপ ঃ-

'প্রথম আরম্ভ সন ১১৮৭ সাল চৈত্রমাস, সমাপ্ত হইল সন ১১৯০ নব্বই সাল জৈ্যষ্ঠ মাস তারিখ ৭ রোজ রবিবার তিথি প্রতিপদ সতের শত পাঁচ শকাব্দ ১৭০৫ সারা হইল। সাকিম কের্না পরগণে কিং ছোটপুরা। দরজায় বসিয়া ১ প্রহর মধ্যে সমাপ্ত হইল। লিখিতং শ্রীজগন্নাথ ও রামপ্রসাদ দুইজনে লিখিলাম ইতি।'

এ থেকে জানা গেল, পুঁথিখানি লিখতে কত সময় লেগেছে আর এটি দুজন লিপিকর মিলে লিখেছেন। একা লিখলে সময় লাগতো দ্বিগুণ। সঞ্জয়ের 'মহাভারত' (উ. ব. ৪৪০) পুঁথি গৌরচন্দ্র দাস, রামচন্দ্র দাস ও গোলকচন্দ্র দাস ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে লিপি করেন। 'আপদ উদ্ধার' পুঁথিটিতে (উ. ব. ৫২৯) ভিন্ন ভিন্ন হস্তাক্ষর দেখা যায়, অর্থাৎ একাধিক লিপিকর। কাশীরামের 'মহাভারত দ্রোণপর্ব' (উ. ব. ৫৫৬) পুঁথির লিপিকরও একাধিক বলে মনে হয়। দেবীপ্রসাদ ও শিবপ্রসাদ সরকার যৌথভাবে মহাভারতের বিরাটপর্ব' পুঁথিটি নকল করেন ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে। এঁরা ছিলেন দুই ভাই (উ. ব. ৫১০) এবং অনেকগুলি পুঁথির লিপিকর।*

এশিয়াটিক সোসাইটি সংগ্রহের যদুনন্দন দাসের 'শুকদেব চরিত' পুঁথির পুষ্পিকাটি (জি. ৫৬৬৯) নিম্নরূপ ঃ-

'লিখিতং শ্রীনিত্যানন্দ দত্ত, রুদ্র হইতে সোড়ষ পর্যন্ত সপ্তম পত্র কৈল লিখন। পূর্ব্বাঙ্গ লিখি লযে তার নাম কহি ইবে। জার নাম চৈতন্যচরণ।। এক সাকিম আছে যন আত্মাপুর নামে গ্রাম আর সাকিম নির্দ্ধারিতে নরি। যন যন সব্বলোক না লইবে মোর দোষ, তোমা সভার চরণে নমস্কারি।। মোকাম সান বাদ্য বেলা ছয় দন্ডভ্যান্তরে শনিবারে পূর্ব্বদূঃরি ঘরে তারিখ ৬ জ্যোষ্ঠে ইতি সন ১১১১ এগার শত এগার।'

কাশীদাসী মহাভারত অরণ্যপর্বের একটি পুঁথি (বি. ভা. ১৪৭৪) ১২০০ বঙ্গাব্দে অনুলিপি করেন বারবক সিংহ পরগণার রামলোচন দাস, ব্রজকিশোর দাস, গয়াচাঁদ ব্রাহ্মণ, বিজরাম দাস, সাকিম বিষ্ণুপুর ও সাকিম নানুরের যথাক্রমে আমীরচন্দ্র দাস ও অদ্বৈতচরণ দাস। হাসামদীন রচিত 'গোবিন্দচন্দ্র পোস্তক' ১২০৩ বঙ্গাব্দে লিপি করেন ভুরকুন্ডা পরগণার বড়হার গ্রামের চৌধুরী মল্লিক, নিমুমল্লিক ও হামিদমল্লিক। জগৎজীবনের 'মনসামঙ্গল' পুঁথি ১২৬৩ বঙ্গাব্দে একত্রে লিপি করেন সেখ ওসমান ও গফুর সরকার (হি. পুঁ. ৪৬৬)। কাশীরাম দাসের আদিপর্বের একটি পুঁথি (ক. বি. ১৩২৯) ১১১২ বঙ্গাব্দের ২২ চৈত্র লেখা শুরু করে শেষ হয়

১৬ আষাঢ়, লিপিকররা হলেন বাঞ্ছারাম চক্রবর্তী, মদনমোহন রায়, রামকান্ত দন্ত্য (দত্ত?), অখিলচন্দ্র সরকাব ও রামকানাই বিশ্বাস ।

পূর্বতন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাণ্ডুলিপি 'শ্রীমদ্ভাগবত' (এ. A. ৪১) 'হেনরি সারজেন্ট সাহেবেন ক্রিয়তে ।' মুসলীম লিপিকর 'শ্রীমাব্বিকা' ১৭৭৪ বঙ্গাব্দে 'মোকাম নতিপুরে 'নৈষধ চরিত' পুঁথিটি(এ. ৪০৪৬) নকল করেন । হিন্দু পুঁথির এহেন মুসলীম লিপিকরের সন্ধান এদেশে আরও পাওয়া গেছে । ওপার বাংলায় এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই । গুণরাজখানের (মালাধর বসু) 'গোবিন্দবিজয়' (হি. পুঁ. ৭১) ১২৪৬ বঙ্গাব্দে লিপি করেন পাহাড় বিশালগড় পরগণার ইসাগঞ্জের বাজার গ্রামের শ্রীসফরদ্দিন । লোকনাথ দত্ত রচিত 'দময়ন্তী' পুঁথি (হি. পুঁ. ৯৮) অনুলিপি করেন শ্রীশেখ আশরাখ । সুশীল মিশ্র রচিত 'রূপবান ও বিদর্ভরাজ কন্যার পুঁথি' (হি. পুঁ. ১৬২) লিপি করেন দুজন লিপিকর শ্রীশেখ মহতাব গাজী ও সোনাগাজী । সম্ভবতঃ কুমিল্লা জেলার সাকিম উত্তরপালপাড়ার শ্রীমাহাতাপ গাজী কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' (হি. পুঁ. ২০৬) পুঁথিটি অনুলিপি করেন । আর এক লিপিকর 'শ্রীসেখপারণ' ১২০৫ বঙ্গাব্দে কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' (বি. পুঁ. ২৯৩) পুঁথি অনুলিপি করেন । অজ্ঞাত রচয়িতার 'গুরুভক্তি' পুঁথি ও রতিরামের 'নারদীয় পুরাণ' (হি. পুঁ. ৩৫৯, ৩৬০) ১২১০ বঙ্গাব্দে অনুলিপি করেন পরগণা বাবুপুরের মুহম্মদমুনাইম। মুসলীম লিপিকর সংস্কৃত পুঁথিও নির্ব্বিবাদে লিপি করেছেন । শূলপাণি রচিত 'শ্রাদ্ধবিবেক' (স. পুঁ. ৫) ও 'ব্রতকালবিবেক' (স. পুঁ. ৬) পুঁথি অনুলিপি করেছেন শ্রীরুস্তম । হিন্দু লিপিকররা মুসলীম পুঁথি নকল করেছেন । যেমন, 'ইমাম চুরি' (মু. পুঁ. ১০), পুঁথি অনুলিপি করেছেন শ্রীদোকড়ি মিস্ত্রী । 'কন্তিল বা কন্দিলনামা' (মু. পুঁ. ৫৯) পুঁথিটি ১২৫১ ত্রিপুরাব্দে লিপি করেছেন দুজন লিপিকর - গোপালচন্দ্র রক্ষিত ও নেজামুদ্দিন । সৈয়দ সুলতানের 'নবীবংশ' পুঁথি (মু. পুঁ. ২১০) ১২০৭ বঙ্গাব্দের ২০ আষাঢ় লেখা শেষ করেছেন পরগণে কাদবার শ্রী রামনারায়ণ দেও । মুঃ কাসিম রচিত 'হিরাজল কুলুব' (মু. পুঁ. ৩৮৩) পরগণে পাটিকারার সাকিম সরাপতির শ্রীদোকড়ি আখন নকল করেছেন। পুঁথি লেখার কাজে হিন্দু মুসলীম মানসিকতা যে লিপিকরদের আদৌ প্রভাবিত করে নি, তার বহুবিধ প্রমাণের অন্যতম হল শেখ চান্দ রচিত 'হরগৌরী সংবাদ' পুঁথিখানি (ঢা. বি. ৫৫৯) । ১২৩৩ বঙ্গাব্দের ভাদ্রমাসের কোন এক বৃহস্পতিবার 'ফকির সিং' কর্তৃক অনুলিখিত এই পুঁথিতে যোগশাস্ত্র বিষয়ে শিব ও গৌরীর কথোপকথন বিবৃত । এ সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় আহমদ শরীফ বলেছেন 'এই পুঁথির বৈচিত্র্য এই যে, মুসলমান কবি হিন্দুদেবতার মুখ হইতে হিন্দু যোগের কথা শুনিয়া তাহা আমাদ্দিগকে শুনাইয়াছেন (পুঁথি পরিচিতি, ১৯৫৮, পৃঃ ৬২১) ।' রাগতালের বৃত্তান্ত বিষয়ক পুঁথি 'নুরনামা' (ঢা. বি. ৫৪৬) এর কবি দেবান আলি লিখেছেন -

> 'পণ্ডিত সবের পদে মাগি পরিহার ।
> ভঙ্গ দোস অপরাদ খেমিবা আমার ।।
> গুরুদেবের আঙ্গা মানি সিরেতে ।
> দিজ (হীন?) দেবান আলী কহে পরদেসির (?) সুতে ।।'

এইভাবে মুসলীম কবির নামের পূর্বে 'দ্বিজ' ব্যবহার বড় বিচিত্র । এই পুঁথির লিপিকরও শেষে

লিখেছেন, 'দ্বিজ দেবান আলি এ শুনিন জে ভাল । নিরঞ্জন হোতে নুর মোহাম্মদ হইল ।।'

দ্বিজ কবিচন্দ্রের 'অর্জুনের সাগর বাঁধা' পুঁথিটি (ব. রি. ৪০৮) পরগণা চাকুন্দানগরীর মীরপাড়া সাকিমের 'শ্রীসেখ জাদু সরকার' লাট রাধানগরের সাকিম জাজিয়ার শ্রীরামধন সালুইয়ের জন্যে লিপি করেন ১২৪২ বঙ্গাব্দের ৬ ভাদ্র শুক্রবার 'বেলা পউনে চারি প্রহরের সময় ।' শ্রীজীবগোস্বামীর 'স্মরণটীকা' (ব. রি. ৯৩১) লিখেছেন ফতেপুর গ্রামের সেখ হবু । আবার ১২০৮ বঙ্গাব্দে (১৮০২ খ্রীঃ) নিমাইচন্দ্র দাস কর্তৃক লিপিকৃত সেখ জাহিরের 'আদ্যপরিচয়' (ব. রি. ১০৭০) পুঁথির প্রথম পত্রে ধর্মীয় উদারতার অসাধারণ পরিচয়টি লক্ষ্য করা মতো : 'শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণাভ্যাম নমঃ । শ্রী ইলাহি আলামিন । শ্রীগণেশায় নমঃ । শ্রীশ্রীগুরুচরণে নমঃ । শ্রীশ্রীপিতামাতার চরণাভ্যাস নমঃ । দীক্ষাগুরু শিক্ষাগুরু নমঃ ।'

কাশীদাসী মহাভারতের বিভিন্ন পুঁথি নকল করেছেন রামগোপাল দাস, ব্রজকিশোর দাস, গয়াচাঁদ ব্রাহ্মণ, বিজরাম দাস, আমিরচন্দ্র দাস, অদ্বৈতচরণ দাস প্রমুখ । কৃষ্ণপুরের গদাধর নন্দী (জগৎমঙ্গল), আজিজর রহমন (দাকায়েকুল হাকায়েক), জগন্নাথপুরের সনাতন ঘোষ, দশগ্রামের আত্মারাম দাস, শচীনন্দন মিত্র, রামপ্রসাদ দত্তদাস, কাশীনাথ দত্ত, আবদুল নবী, শ্রীনবু বেবস্যা (বৃন্দাবনজ্ঞান), শ্রীআনন্দীরাম দাস (বৈষ্ণবমাহাত্ম্য), শ্রীবাঞ্ছারাম দাস (বৈষ্ণবামৃত), বালিগড়ি পরগণার নছিপুর গ্রামের রামনামপাল (মনসামঙ্গল), শ্যামসুন্দরপুরের শ্রীবংশীধর সরকার (দ্বিজ লক্ষ্মণের রামায়ণ), বিষ্ণুপুর পরগণার হামীরহাটি গ্রামের শ্রীহরেকৃষ্ণ বিশ্বাস মোকাম চিছড়িয়ার শ্রীকুঞ্জদাস ঘোষ, শ্রীরামকান্ত দেবনাথ, শ্রীশ্যামচরণ গোঁসাই (দ্বিজ কবিচন্দ্রের দাতাকর্ণের পালা), সিমলাপাল পরগণার ধুল্যাপুরের শ্রীকাশীনাথ মণ্ডল (শঙ্করের গুরুদক্ষিণা, লালবাজারের গোলকনাথ সেন (কবিচন্দ্রের রামায়ণ), বেলেতোড়ের লুইধর আষকান্ত (অঙ্গদের রায়বার), জামশনার গৌরচরণ দাস দত্ত (দাতাকর্ণ), পাত্রসায়েরের শ্রীরামকৃষ্ণ সরকার (কবিচন্দ্র রামায়ণ), রাধানগরের মধুসূদন ঠাকুর, শ্রীহরিহর সিংহ মহাপাত্র, শ্রীরামধন দাস, সোনামুখীর শ্রীজগন্নাথ দাস দে, চন্দ্রকোনার শ্রীরামধন রায়, সিলামপুরের শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর দাস কায়স্থ, গোপীনাথ দাসঘোষ প্রমুখ হাজার হাজার লিপিকরের নাম জানা যায় ।

পুঁথির পুষ্পিকায় পদ্যাকারে লিপিকর নিজের দীর্ঘপরিচিতি লিখেছেন অনেক ক্ষেত্রেই। যেমন দাস হরিদত্তের 'কালিকা পুরাণ' (এ. ৩৬০২) পুঁথিটি -

'নিশাপতি দক্ষিণেতে জলধি বিরাজে । তাহার দক্ষিণে দেখ খগপক্ষ সাজে ।।
তাহার দক্ষিণে সাজে গঙ্গার নন্দন । এই মাত্র জানিবেন শক নিরুপণ ।।
পত্রিকা প্রবেশ তিথি সিত পক্ষ জানি । ললিতার পর সখি নক্ষত্রেগণি ।।
যোগে তদুৎপতিকথা গরকরনেত দেবী । বরাহ সমাস জানিবা নিশ্চিত ।।
সপ্তম দিবস বার নিশাকর সুতে । সমাপ্ত পুস্তক হইল যামিনী প্রবক্তে ।।
ছাতিয়ালি গ্রামে বাস রামের নন্দন ।............ স্বাক্ষর জানে সর্ব্বজন ।।
ভুষা তাত ঈশ্বরমাত্র এই নাম জানি । লিখিলা পুস্তক তিনি জ্ঞানে মহাজ্ঞানী ।।
তাহার আদেশ দেখি বিপ্র রমাকান্ত । লিখিল পুস্তক যত্ন করিয়া নিতান্ত ।।
বুধজন চরণে এই নিবেদন । না করিহ বিচারু দোষ পর সেইজন ।।

দুইদিকে দুইচন্দ্র খগমধ্যে সাজে । তাহার দক্ষিণে শিবলোচন বিরাজে ।।
এই মাত্র মনের কথা কহিনু নিশ্চয় । সর্ব্বক্রম করি বুঝ যত মহাশয় ।।
ইঙ্কসাহি পরগণা ত ডিহি সাহাদপর হয় । লিলাম খরিদা জমিদার রতন ভট্টাচার্য মহাশয় ।।
তাহার মধ্যে জামিতাগ্রাম সেইগ্রামে রাজ । ব্যবসা কিতাব আমার আখ্যাত নাহি কাজ ।।
দুঃখেতে লিখিলাম পুস্তক যো হরেৎ পুস্তকময়া । মাতা চ শুকরী তস্য পিতা চ গর্দ্দভঃ ।।'
১৭২৮ শকাব্দ বা ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে লিপিকৃত পুঁথির এই দীর্ঘ বক্তব্যটি পাঠকের কাছে কতখানি সুখপাঠ্য হয়েছিল, কে জানে ।

দ্বিজ কবিরাজের 'মহাভারত গদাপর্ব্ব' পুঁথির (উ. ব. ৫৯) লিপিকর পুষ্পিকায় কয়েকটি পয়ার শ্লোকে জানিয়েছেন -'শুক্লপক্ষে বৈশাখের তিথি অষ্টমীত । পদের গম্ভীর দেখি মনত বিস্মিত ।। গুড়িয়াহাট গ্রামে থাকে মাহাধর্ম্মশিল । বিদ্যাত নিপুন শীতো ধর্ম্মত শুশীল ।।' কোচবিহারের গুড়িয়াহাটের এই লিপিকর এত বিনয়ী যে নিজের নামটি তিনি জানান নি ।

পুষ্পিকায় গদ্য-পদ্য মিশ্রিত বিচিত্র রচনাংশ দৃষ্ট হয় মানিক দত্তের 'চণ্ডীমঙ্গল' (উ. ব. ৫৫৬) পুঁথিতেঃ 'য়পকার খেমা করে তোমার দাসের দাস । তারে য়ন্ত দাস লিখিল পুস্তক ভবানি চরণ বন্দে বড় য়ভিলাস ।। গঙ্গারামপুরে তাহার নিবাস । পুস্তক পাঠে শ্রীরাম হরি তষ্ট বাওল শ্রীকালিচরণ দাষ সাং চেচর ।।'[১০] কাশীরামের 'মহাভারত আদিপর্ব' (উ. ব. ৫০৭, ১৮৩১ খ্রীঃ) পুঁথির লিপিকর পুষ্পিকায় নিজের দীর্ঘবংশ পরিচিতি দিয়ে জানিয়েছেন, তাঁর নিবাস দিনাজপুর জেলার জগদলা থানার নাটচান্দপুর পরগণা রাজনগরের হরিপুর গ্রাম । তিনি 'লেখিল যুগল বংশ শ্রীশ্বামানন্দ' (?) ।

মালদহ অঞ্চল থেকে সংগৃহীত হলেও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত দ্বিজ কবিচন্দ্রের 'নন্দবিদায়' (নং ৫৬৪) পুঁথির লিপিকর যে বাঁকুড়ার মল্লভূমের মানুষ ছিলেন তা তাঁর বিবৃতিতেই প্রকাশ ঃ 'আসাড়িয়া কৃষ্টপক্ষ্য শুভ বুধবার । অমাবস্যা ভরনি নক্ষত্র করি সার।।...সাল আব্দি পচার্ত্তোর । তারা চান্দ শর্ম্মা নাম লিপী কম্পী জোর ।। মল্ব অধিকারী বাস মকরন্দ গ্রাম ।'

দ্বিজ মাধবের 'চণ্ডীমঙ্গল' (উ. ব. ৪৩৯, ১৮০৫ খ্রীঃ) পুঁথির পুষ্পিকায় লিপিকর শ্রীরামজীবন দত্ত লিখেছেন, চট্টগ্রাম রাজের কর্মচারী শ্রীরামসুন্দর সেনের জন্যে পুঁথিখানি তিনি লেখেন । লিপিকরের বিবৃতিটি বেশ কৌতুককর —

'শ্রী রামজিবন দত্ত দিন হিন অতি । খ অক্ষরে লিখিলাম জাগরন পুঁথি ।। শ্রীরামসুন্দর সেন ধোরনাতে ধাম । তাহান গুনের কথা নাহিক উপাম ।। ধর্ম্মে যুধিষ্টির সম কর্ন্নসম দাতা । দুর্জধন সম মানি পার্থ সম প্রভা ।। বহুকাল ব্যাপি তেনি রাজকর্মেস্থিতি । চট্টগ্রামের ভৌমলিপির তেনি অধিপতি ।। মহাফেজ খ্যাতি তান ঘোসে সর্ব্বজন । তাহান গুনের কথা কি জানি বর্ন্নন ।। লিখিলপুস্তক এই তাহার কারণে । মঙ্গল চণ্ডিকা দেবী সদয় হউক তানে ।। সমুদ্রের অন্ত কেবা করিবারে নারি । এতাদৃস গুন তান কি বর্ন্নিতে পারি ।।'[১১]

মুজাম্মিল রচিত 'ছাহাতৎনামা' পুঁথির (ঢা. বি. ১২২) লিপিকর 'শ্রীলস্কর গাজী ওলদে য়ালাম গাজী মতপা প্রাগণে পাটিকারা মৌজে হুসনপুর জি (লা) ত্রিপুরা সাকিম বঞ্জাব্যজ' এর জন্য ঐ পুঁথিটি 'সন ১২ সত ৬২ মাহে য়াশ্বিন' মাসে অনুলিপি করে জানান -

'গুণিগুণের পদ্ধে মর এই নিবেদন । পুস্তকে পাইলে দোস করিবা খেমন ।।
দোস বিছারিতে হেতু সকলে জান এ । মোহাজন দোস ডাকি গুণ পর্চ্চারিত্র ।।......
জনক জননী সমান ধন বিচারি না পাই । কহে মহাম্মদ ছপি সুন নরগণ ।।
ওকারণে প্রভু মরে করিল স্রিজন । ওকারনে পিতা মরে ওরুসে ধরিল ।।
ওকারণে জননি এ গর্ব্বতু ধরিল ।..... বালক সম এ পীতা গেলেন ম্নরিয়া ।।
য়ামাকে পালিল মা এ কাটনি কাটিয়া ।..... কএ মহাম্মদ ছপি সুন গুণিগুণ ।।
মা বাপের দুক ছিও রাকে সর্ব্বজন । মা বাপ দুনিয়া ইরামও জানিব নির্চ্চএ ।।'[১২]

সেখ সেরবাজ চৌধুরী রচিত 'ফক্করনামা' (ঢা. বি. ৫৪৯) পুঁথির লিপিকর 'শ্রীরাহাতুল্লা পীং মুন্সী নেজামত আলীখান সাকিন ও কৈন্যারা থানে পটীআ জিলে চট্টগ্রাম' ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের (পুঁথিতে খ্রীষ্টাব্দ উল্লিখিত) ২৯ জুলাই একটি হেঁয়ালী লিখেছেন -

'এক অক্ষর হরিলে যুবতী যুবা হএ । দুই অক্ষর হরিলে যশোদা তনএ ।।
তিন অক্ষর হরিলে ঈশ্বর আসিবে মিলে'। উপকর হএ এই বস্ত্র দিলে ।।
এই বচন কেহএ কহিতে পারিলেক নাই ।'[১৩]

'ফক্করনামা' পুঁথির (ঢা. বি. ১২৬) আর এক লিপিকর আত্মপরিচয় দিয়ে লিখেছেন 'সোনাছরি পূর্ব্বকূলে ভাঙ্গা এক ঘর । সাকির মাহাম্মদ হিনে লেখিল অক্ষর ।।' মোহাম্মদ খানের 'মোহাম্মদ হানিফার লড়াই' (ঢা. বি. ৫৪৮) পুঁথির লিপিকরের পরিচিতি ঃ 'ডোমন আলি নাম মোর জগতে প্রচার । মোহাম্মদ রাজার দৈত্ত (দৌহিত্র) আ রপ (আরব আলি) কুমার ।। কুলসিল মোহা দাতা সভা তু অধিক । গোলাম হোছন তালুকদার পুস্তক মালিক ।। তান পিতা মাং হাছন সিকদার ।।' কাশীরাম দাসের মহাভারত 'আদিপর্ব' (ব. রি. ১৩৭) লিপিকর শ্রীরামপ্রসাদ রায় দীর্ঘ বিবৃতিতে আত্মপরিচয় দিয়ে শেষে জানিয়েছেন 'সন ১১৮৬ সালে'র ২৫ ফাল্গুন অমাবস্যার দিনে তাঁব লেখার কাজ শেষ হয় । শ্রীজীবগোস্বামীর 'স্মরণটীকার' (ব. রি. ৯৩১) লিপিকর সেখ হবু লিখেছেন "সাহেব সেলাম করি বলে তত্ত্ব একা । উজির সাহেব সদাকান্দে নাহি জানে ভেদ ।।.....পাটমিদ্যা সেখ হবুর বাড়ী ফতেপুর । হামেসা থাকে সেই পাতসার হুজুর ।"[১৪] কাশীরামের মহাভারত 'আদিপর্ব্বের' আর একটি পুঁথির (ব. রি. ১৪০) লিপিকর 'সাং কনকপুর পরগণে হাবেলি সাদপুরের নিকট একপোয়া হয় না হয়'এর শ্রীরামমোহন দাস ১৭২০ শকাব্দের ১৮ পৌষ মঙ্গলবার পুঁথি নকল করে পুষ্পিকায় একটি দীর্ঘ 'আত্মনিবেদন' লিখেছেন —[১৫]

"শকাব্দা বিধিমুখ নিন্দি তিন গুণ । রুক্মিনী নন্দন অঙ্কে জলনিধি গুণ ।। বৃষরাসী বাইভূত....শিচতে। ভাল দিন চন্দ্রহীন গগন বিদিতে । মৃগাঙ্গী উদিত পক্ষ মাস অঙ্ক তিথে । শশিসুত বাসরে দ্বিজের মনস্থিতে ।। কাশীদাস কৃত নাম বিচিত্র পাণ্ডব । সাধুজন উপাক্ষণ তরিবারে ভব ।। আদিপর্ব্ব ভারত কেবল সুধাসিন্ধু । এ ভব সংসার মধ্যে এইমাত্র বন্ধু ।। পুস্তক লিখিয়া মনে আনন্দ জন্মিল । যতন পূর্ব্বেতে তেই লিখিয়া রাখিল ।। কেহ যদি লয়্যা জায় পুস্তক লিখিতে। লিখিয়া সত্বরে আনি দিবে সুনিশ্চিতে ।। আমার পুস্তক যেইজন হরিবেক । তাহার বাপের মুখে বিষ্ঠা পড়িবেক ।। অনেক যতনে আমি লিখিলাম পুস্তক । শুনহ লিখিতে হৈল যতেক যে দুঃখ ।। কুড়িপাত সাগর যুগী লিখিতে দিয়াছিল । তারপর একপাত (ও) লিখিতে না দিল ।। পারুল্যাতে

লিখিলাম দেড়শত পাত। তাহাতে যতেক দুঃখ জগত বিখ্যাত।। আঙ্গুলহাড়া হয়া তিনমাস দুঃখ পাইনু। এতেক দুঃখ যে ভাই তোমারে কহিনু।। তেই পাকে বলি পুঁথি কেহ না হরিবে। হরিবেক যে জন সে নরকে পড়িবে।।" ('পুষ্পিকা' অংশে আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

পুঁথি লিখতে লিখতে লিপিকরের মধ্যেও কবিত্ব সৃষ্টি হয়ে যেতো (এ বিষয়ে পরে আরো উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য) যেমন কাশীদাসী মহাভারত 'দ্রোণপর্বের' (ব. রি. ২৩১) একটি পুঁথিতে লিপিকর লিখেছেন —

'শুন শুন অরে মন মিছা কেন কর ভ্রম ভেব্যা দেখ কেহ নহে কাহার।
অন্যত্র ছাড়িয়া আশ যে পিএ সদা কৃষ্ণরস, রবিসূতে কিবা ভয় তাহার।.
শ্রীকৃষ্ণ চরণে কহে দামুদর দিনে (?) মধুসদা পিয় মন ভমরা।।
লিখিতং শ্রীনিত্যানন্দ দাস, সাকিম সারুল পরগণে চম্পানগর।।'[১৬]

দ্বিজ কবিচন্দ্রের 'দাতাকর্ণপালা' (ব. বি. ৩১৯। পুঁথিটি মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহগ্রামে অনুলিখিত) পুঁথির লিপিকর লিখেছেন -[১৭]

'পালুয়ার কবিচন্দ্র করিল প্রকাশিত।
পুস্তক লিখিতে আমি সত্যনত্য (?) নাহি জানি।
যে জন পড়িবে পুস্তক কহিবে শুদ্ধ বাণী।।
পাঠক পোঠুয়া সেই প্রভু দিবে বর।।
শ্রীহারাধন কর সেই দেশড়াত ঘর।
বারসত পঞ্চাশ সাল শুন সর্ব্বজনে।
এই পুস্তক সারা হইল ফাগুনের ছয়দিনে।।'

দ্বিজ কবিচন্দ্রের 'রাসলীলা দিবারাম' পুঁথির লিপিকর-সংগ্রাহক[১৮] শ্রীরামমোহন নন্দী ১২৫৩ বঙ্গাব্দে পুঁথি নকল করে নিজের বাসস্থানের চৌহদ্দি বর্ণনা করেছেন -'পরগণে বিষ্ণুপুর চৌকি রাধানগর সামিল মৌজে বীরসিংহা শিবতলার পূর্ব্বাংশে নন্দী দিগের বাড়ীর উত্তর অংশে নবীর চক্রবর্ত্তীর বসতবাড়ীর দক্ষিণ রামমোহন নন্দীর বাড়ী জানিবে।'

সেকালে পল্লীবাংলার মেয়েরা যে সবাই নিরক্ষর ছিল না, বিভিন্ন পুঁথি পত্র আর দলিল—দস্তাবেজের জীর্ন পৃষ্ঠায় সেই সাক্ষ্য বর্তমান। বর্ধমান জেলার অম্বিকা নগর পরগণার বৃন্দাবনপুরের অধিবাসিনী শ্রীমতী লালমনি বৈষ্ণবী, 'সাকিম হাল সহর বাঁকুড়ায়', ১২৪২ বঙ্গাব্দের ২০ কার্ত্তিক রাত্রি দেড়প্রহরের সময় যদুনাথ দাসের 'ভ্রমর গীতা' পুঁথিটি (এ. ৩৯৬৭) নিজেই লেখা শেষ করেন। দুবছর পরে, ১২৪৪ বঙ্গাব্দের ৫ কার্তিক শনিবার 'সাকিম পুরুল্যাতে শ্রীভরত মণ্ডলের আদেশ লইয়া পূর্ববাস কুলীন গ্রামের (জেলা বর্ধমান) 'রাসবিহারী বসু' বাঁকুড়ার তোড়কোণা গ্রামে বসে 'শ্রীমতি লালমনি বৈষ্ণবীর' পড়ার জন্যে বৃন্দাবন দাসের 'তত্ত্ববিলাস' (এ. ৩৯৭০) ও 'রাগমইকণা' (এ. ৩৯৬৮ B) পুঁথি অনুলিপি করেন বোঝা যায়, লালমনি যথার্থই পুঁথি অনুরাগিনী ছিলেন। এছাড়াও মুক্তকেশী বসুজায়া প্রিয়ারী দাসী, রাসসুন্দরীদেবী, কৃষ্ণমনিদাসী, নবু বেউশ্যার মত নকলকারিনীর লেখা পুঁথির সন্ধান দিয়েছেন এ যুগের পুঁথিরসিক। দৌলত উজীর বাহারাম খানের 'লায়লীমজনু' নকল করে অনুলিপিকারিনী

রহিমুন্নিসা লিখেছেন —

'ছিরিমতি ক্ষুদ্র অতি রহিমনিষ্যা নাম । সুলুকবহর নামে গ্রাম অনুপাম ।।
পিতা অতি শুদ্ধমতি আবদুল কাদের। ছুপি খানদানে তাই আছিল সুধীর ।।
আপদকালেতে পিতা (গেলেন) স্বর্গগতি ।। পিতাসোকে ভাবিতে চিন্তিতে তনুক্ষতি।
তেকারণে শাস্ত্রপাঠ শিখিতে নারিলুম । হেলে খেলে অভাগিনী কাল্ল গোয়াইলুম ।।
মোর তিন ভ্রাতা আর মাতৃ গুণবতী । যৎকিঞ্চিত শাস্ত্রপাঠ শিখাইল নিতি ।।'

লিপিকরের সচরাচর বিনয়ী বক্তব্য তাঁরও —

'গুরুর চরণে স্মরি বিরচিলুম পদ । আশীর্ব্বাদ কর গুণি ত্বরিতে আপদ ।।
হীনক্ষীন অল্পজ্ঞান মুই কলঙ্কিনী । সতীত্ব থাকিতে আশীর্ব্বাদ কর গুণী ।।'

বিষ্ণুপুরের মল্লরাজ গোপাল সিংহদেবের রাণী পট্টমহাদেবী ধ্বজামণিদেবীর কথা জানা আছে। তাঁর অনুলিখিত পুঁথি আছে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে ('প্রেমবিলাস'-নিত্যানন্দ দাস) । বর্ধমানরাজ তেজচন্দ্র মহতাবের বিধবাপত্নী শ্রীমতী কমলকুমারী দেবীও বৈধব্যকালীন দুঃখ ভোলার জন্যে পুঁথি লিখেছেন । সুদূর গয়াতীর্থে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে পিন্ডদান করতে গিয়েছিলেন চেতুয়া পবগণার (বর্তমান পঃ মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানা) বলিহারপুর গ্রামের 'শ্রীমত্যা জজ্ঞেশ্বরী দেবী' । ১২৬৫ বঙ্গাব্দের ১২ চৈত্র, গয়াতীর্থে তাঁর স্বহস্তরচিত তমশুকপত্রটি বিদ্যাসাগরের জন্মভূমি বীরসিংহগ্রামের (ঘাটাল মহকুমা) কয়েক কি. মি. দক্ষিণ পূর্বের একটি নিস্তরঙ্গ পল্লীর সেকালীন নারীশিক্ষার প্রতি আলোকপাত করে (মৎসংগৃহীত) । ঐ স্থানের অক্ষরজ্ঞানসম্পন্না মহিলার লেখা কোন পুঁথির সন্ধান অবশ্য পাওয়া যায় নি ।

মধ্যযুগের উত্তরপূর্বাঞ্চলীয় ভারতের ত্রিপুরা, মণিপুর, কাছাড়, কোচবিহার প্রভৃতি অঞ্চলে বাংলা কাব্য-সাহিত্য চর্চা যে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেছিল তার প্রমাণ ঐ সময়কার প্রাপ্ত প্রাচীন পুঁথি-পাণ্ডুলিপি, কাব্য , সাহিত্য, ধর্মগ্রন্থ ইত্যাদি । ত্রিপুরার রাজপরিবারের অনুপ্রেরণা ছিল এ বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ত্রিপুরা রাজপ্রাসাদে নিয়মিত পুঁথি অনুলেখনের ব্যবস্থা ছিল নিতান্তই রাজপরিবারের প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণায় । ত্রিপুরার মহারাজ নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মা বাহাদুর রচিত অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি 'আবর্জনার ঝুড়ি' র উদ্ধৃতি নিম্নরূপ ঃ—

" রাজবাটীতে দুই একজন পুঁথিলেখক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিয়ত পুঁথি লেখিতেন, এবং তাঁহারা যন্ত্রেরই মত লেখার খাটুনি খাটিতেন । প্রাচীন নিয়মে তাঁহারা কর্ম পাইতেন চাকুরির মত না হইয়া উত্তরাধিকারের মত, অবশ্য লিপিকুশলতা তাহাতে ছাড় পড়িত না । বলা বাহুল্য যে, এই অবিরাম যুগান্তবাহী পুঁথি লেখার ফল দাঁড়াইয়াছিল একটা বৃহদাকার গ্রন্থভাণ্ডার ।পুঁথি লেখা এখন উঠিয়া গিয়াছে । লিপিকুশলতার আদর এখন ইতিহাসের সামিল হইয়া পড়িয়াছে ।"[১১]

গ্রন্থপঞ্জী ও সূত্রনির্দেশ

১. 'Corpus of Bengal Inscriptions Bearing on History and Civilization of Bengal', R Mukherjee and S K Maity, Calcutta, 1972
২. হি. পু ১১ (১-১৬) । দ্রঃ বাংলা একাডেমী পুঁথি পরিচয়, ঢাকা, বাংলাদেশ, পৃঃ ৯৪-৯৬।
৩ হি. পু ৭৭-৮৯, ৯১-৯৫ । প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৫-১০৮ ।

৪. হি. পু. ১১২ক -১১২ঠ । প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১০ -১১২ ।

৫. 'পুঁথি পরিচিতি', আহমদ শরীফ, ঢাকা, ১৯৫৮ ।

৬. 'বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামের বাংলা পুঁথির তালিকা ।' শ্রীমনীন্দ্রমোহন চৌধুরী কাব্যতীর্থ সংকলিত, রাজশাহী, ১৯৫৬ ।

৭. 'A Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts' Vol. I-V, by Sunil Kr. Ojha, North Bengal University, 1990-91. ৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৮১ ।

৯.দেবীপ্রসাদের পরিচিতি : 'পুথীওলা শ্রীদেবিপ্রসাদ সরকারস্য । ওাবিসাল (ওয়ারিসান ?) শ্রীমান মধুষুদন । শ্রীমান ষুর্যেস্বর । সাকীন হরিপুর । নাট চান্দপুর । রাজনগর পরগণা । থানা জগর্দলা জেলা মালদহ মিতি জমীদার শ্রীনীমাঞী চরণ বড়াল । দিনাজপুরবাসী ।......' (দ্রঃ A Descriptive Catalogue of Beng Manuscripts, Vol I, Sunil Kr.Ojha, N B University, 1990, P. 206)

১০. উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'Descriptive Catalogue'এ উদ্ধৃত পাঠ যথাযথ কীনা তা মূল পুঁথি নিবিড়ভাবে অনুসরণ করে পুনরায় দেখা দরকার ।

১১. 'A Descriptive Catalogue of Beng. Manuscripts, P. 94-95 '

১২. 'পুঁথি পরিচিতি' , আহমদ শরীফ, ঢাকা ১৯৫৮, পৃঃ ১৪৬ ।

১৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫৯ ।

১৪. 'বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামের বাংলা পুঁথির তালিকা', শ্রীমনীন্দ্রমোহন চৌধুরী কাব্যতীর্থ সংকলিত, রাজশাহী, ১৯৫৬, পৃঃ ৪৭ । ১৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১ । ১৬ প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭ ।

১৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯ । ১৮ প্রাগুক্ত, নং ৬২৬ ।

১৯. 'ত্রিপুরার পুঁথিপত্রের বর্ণনাত্মক তালিকা', ১ম খণ্ড, সং সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, আগরতলা, ১৯৭৭, পৃঃ ২ ।

নয়

পুষ্পিকা

'বঙ্গীয় শব্দকোষ' রচয়িতা হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে পুষ্পিকা হল 'গ্রন্থাধ্যায় সমাপ্তিতে তৎপ্রতিপাদ্যবিষয়ক গ্রন্থাংশ ।' প্রচলিত অভিধানকারের মতে এটি 'অধ্যায়াদির শেষে গ্রন্থকারের নিজ নামের উল্লেখ করিয়া যে কথা শেষ করা হয় ।' কিন্তু পুঁথি গবেষণার জগতে 'পুষ্পিকা' শব্দটি আরও ব্যাপক অর্থ প্রকাশ করে । শব্দটির সঙ্গে 'পুষ্পের' সম্পর্ক আছে । কারণ পুঁথিতে অধ্যায়ের শেষে পুষ্পপ্রতীক এঁকে ভণিতা দেওয়া হয়েছে । মূল রচনার শেষে আছে সারিবদ্ধ পুষ্প ।

বর্তমানকালে ছাপা বইতে দেখা যায়, প্রচ্ছদের পরেই থাকে 'টাইটেল পেজ'-লেখকের নাম ও প্রকাশক বা পরিবেশকের নাম ঠিকানা । পরের পৃষ্ঠায় থাকে প্রকাশক ও মুদ্রাকরের নাম ঠিকানা, প্রকাশকাল, গ্রন্থমূল্য, গ্রন্থস্বত্ব ইত্যাদি তথ্য । পরবর্তী পৃষ্ঠায় থাকে লেখক বা প্রকাশকের নিবেদন বা ভূমিকা 'Post Colophone Statement.' মুদ্রণযুগের আগে আমাদের দেশে বইপত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হোত হাতে লিখে । সেই হাতে লেখা বই বা পুঁথিতে, মূল বিষয়ের বর্ণনার শেষে, সর্বশেষ ভণিতার পর সংশ্লিষ্ট পুঁথির লিপিকর ও মালিকের নাম-ধাম, লেখার স্থানকাল, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, নানাবিধ ব্যক্তিগত অভিমত, সমাজ ও জীবনের নানা তথ্য ইত্যাদি বিষয়ক যে গদ্য বা পদ্যময় বিবরণ, তাকেই বলা হয় 'পুষ্পিকা'। শব্দটির প্রত্যয় বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায় পুষ্প + কন্ তুল্যার্থে + আপ্ । সুতরাং পুষ্পের সঙ্গে পুষ্পিকার সম্পর্ক হয়তো দেখানো হয়েছিল প্রথমে । পরে শব্দটির অর্থ সংশ্লেষ ঘটে যায় । পুঁথির পুষ্পিকা থেকে সেকাল বাংলার অজ্ঞাত ও বিস্মৃত অধ্যায়ের এক সুসংবদ্ধ ইতিহাসকে খুঁজে পাওয়া যায় । অধ্যাপক পঞ্চানন মন্ডল বলেছেন, 'সামাজিক ইতিহাসের টুকরা হিসেবে প্রত্যেক গ্রন্থের এই সকল পুষ্পিকা অংশের প্রতি প্রত্যেক গবেষকের আলোচনা নিবদ্ধ হওয়া একান্ত উচিত ('পুঁথি পরিচয়', ১ম, পৃঃ ভূঃ ৯) ।' কালের মহাপ্রান্তরে হারিয়ে গেছেন অজ্ঞাত অখ্যাত পুঁথিলেখকেরা । কিন্তু স্বহস্তলিখিত পুঁথির পুষ্পিকায় ব্যক্তিগত জীবনের নানা খুঁটিনাটি বিষয়গুলি বিনা দ্বিধায় লিপিবদ্ধ করে দিয়ে তাঁরা ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বের গবেষণায় প্রভূত কল্যাণ সাধন করে গেছেন । হারানো বাংলার নগরজীবনের ইতিহাস সহজলভ্য । কিন্তু পুঁথি অনুলেখনের স্থান, বাংলার প্রত্যন্ত পল্লী অঞ্চলের অজানা ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য উপকরণ 'পুষ্পিকা' গুলি ।

পুঁথির মূল বিষয়ের বর্ণনা পাঠককে স্বাভাবিক কারণেই আকর্ষণ করে। 'পুষ্পিকার' প্রতি মনোযোগ তিনি দিতে যাবেন কেন ? এমন কি পুঁথি সম্পাদকও কেবল লিপিকালটুকু সাগ্রহে অনুসরণ করেন অনুলিপিটির প্রাচীনত্ব নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে। এর বাইরে তিনি যেতে চান না। কিন্তু সামাজিক ইতিহাস রচয়িতা তো 'পুষ্পিকা' থেকেই তাঁর ইতিহাস রচনার টুকরো উপাদানগুলি এক এক করে সংগ্রহ করে নেবেন। বাংলা পুঁথির পুষ্পিকা থেকে সহজ সরল - অনাড়ম্বর বাঙালী মানুষের মনের যে অকৃত্রিম পরিচয় পাওয়া যায়, তা নিতান্তই অসাধারণ।

এই পুষ্পিকা কখনও গদ্য আবার কখনও কখনও পদ্যাকারেও লেখা হয়েছে - যা থেকে পুঁথির লিপিকরের কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীমণীন্দ্রমোহন চৌধুরী লিখেছেন, 'সে যুগে পুঁথি অনুলিখন একটি পবিত্র এবং পুণ্যকার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত এবং সমাপ্তিকালে লেখক ও পাঠকের তৃপ্তি ও আত্মপ্রসাদের আনুষঙ্গিক সমস্ত তথ্য সযত্নে সমাবেশ কৌতূহলোদ্দীপক অভিব্যক্তি লাভ করিত। কাব্য রচনার সময় যে ইতিহাসবোধ সুপ্ত থাকিত অথবা দুর্বোধ্য সঙ্কেতরহস্যে আত্মগোপনশীল ছিল, তাহা নকলেব সময় তীক্ষ্ণভাবে জাগ্রত হইত। আত্মপ্রকটনের এই প্রেরণার মূলে আছে পুণ্যকর্ম্ম সমাপ্তির আনন্দ - আনন্দোচ্ছ্বাসের ছোটখাটো তরঙ্গগুলিই লেখক তথ্যের শীকর বর্ষণে বিক্ষিপ্ত করিয়াছেন। যে দেশের লোক পরেব পুথি নকল করিয়া আনন্দ পায়, যে লোকশিক্ষায় এই আনন্দ সম্ভব, উভয়ই ধন্য ('ববেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামের বাংলা পুঁথির তালিকা', শ্রীমণীন্দ্রমোহন চৌধুরী কাব্যতীর্থ সংকলিত, রাজশাহী, ১৯৫৬)।

নবী ইউসুফের প্রতি জোলেখার প্রণয়াসক্তির সুপ্রসিদ্ধ কাহিনী অবলম্বনে রচিত, আবদুল হাকিমের 'ইউসুফ জোলেখা' (ঢা. বি. ৪১২) পুঁথির পুষ্পিকাটি প্রাথমিক দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে দেওয়া হল -

"ই (তি) সন ১২১০ মাঘ তারিখ ২৮ মাহে চৈত্র রোজ সমবার দিন গোদহে রাত্রি এক প্রহ (র) জাইতে লেখা সমাপ্ত হইল। বং শ্রী আকবর আলী পীং সেক মাহাং জোরাওর সাং হাওলা মোং খরন্দিপ পোস্তক লেখা মোকাম মৌং বারৈপারা এলেকাএ স্থানে পটিয়া জিলে ইছলাম আবাদ চট্টগ্রাম। দোছরা কোন জনে দাবি করে করাএ সে দাবি বাতিল।"[১]

পুঁথিব শেষে লিপিকরের ব্যক্তিগত অভিমতসমন্বিত লেখার স্থানকাল নির্দেশক 'পুষ্পিকা' লেখার রীতি প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত।

দুটি প্রাচীন পুঁথির পুষ্পিকা এখানে তুলে দেওয়া হল। মধ্যযুগের বাংলা পুঁথি লেখার ধরণ-ধারণ কীভাবে কোথা থেকে এসেছে এ থেকে তার কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে।[২]

১. ১ম মহীপালদেবের পঞ্চম রাজ্যাঙ্কে (৯৯৩ খ্রীষ্টাব্দ) অনুলিখিত একটি 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' পুঁথির পুষ্পিকা নিম্নরূপ ঃ

'পরমেশ্বরপরমভট্টারকপরমসৌগতশ্রীমন্মহীপালদেব-প্রবর্দ্ধমান বিজয়রাজ্যে সম্বৎ ৫ অশ্বিনি কৃষ্ণে।'.........

২. ঐ রাজারই ষষ্ঠ রাজ্যাঙ্কে (৯৯৪ খ্রীঃ) তাড়িবাড়ি মহাবিহারবাসী 'শাক্যাচার্য্য স্থবির সাধুগুপ্তে'র অর্থব্যয়ে নালন্দাগ্রামের অধিবাসী কল্যাণমিত্রচিন্তামণি ঐ পুঁথিরই আর একটি অনুলিপি করান।

এর পুষ্পিকাটি নিম্নরূপঃ

"পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজপরমেশ্বরপরমসৌগত শ্রীমদ্বিগ্রহপালদেবপাদানুধ্যাত পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বরপরমসৌগত শ্রীমন্মহীপালদেবপ্রবর্দ্ধমানকল্যাণবিজয়রাজ্যে ষষ্ঠ সম্বৎসরে অভিলিখ্যমানে যত্রাঙ্কে সম্বৎ ৬ কার্ত্তিককৃষ্ণত্রয়োদশ্যান্তিথৌ মঙ্গলবারেণ ভট্টারিকা নিষ্পাদিতমিতি শ্রীনালন্দাবস্থিত কল্যাণমিত্রচিন্তামণিকস্য লিখিত ইতি ।।"

তালপাতায় লেখা কবি বলরাম দাসের উৎকলীয় 'রামায়ণ আদিকাণ্ড' (এ. ৪০৮২) পুঁথির পুষ্পিকাটি নিম্নরূপঃ

'শ্রীশ্রীমুকুন্দ দেব মহারাজাঙ্ক বিজে শুভরাজ্যে সমস্ত ৩ অঙ্ক তুল ২০ দিন এ পুস্তক লেখা শেষ হইল ।' এই সঙ্গে দুখানি প্রাচীন অনুশাসনের শেষাংশে এখানে দেওয়া হল । এ থেকেই বোঝা যাবে শিলালিপি বা অনুশাসনের রচনাধারা পরবর্তী বা সমকালীন পুঁথিকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে।

> "অব্দে বিক্রম ভুভুজো গুণে শরে বাণে তথা রূপকে ।
> পৌষে মাসি তিথৌ চ সপ্তমকে পক্ষে চ বলক্ষেতরে ।।
> রুধিরোদগারি বৎসরে দিনে সুরগুরোর্ধর্ম্মান্তীরে ।
> সৃষ্টঃ শ্রীরাজধয়ঃ স-বিষ্টরঃ কীর্ত্তিমিমাংচ কারিতাম্ ।।"
>
> — পাটনা সংগ্রহশালায় রক্ষিত বাংলা বর্ণমালায় খোদিত লিপির সংশোধিত পাঠ ।

অর্থঃ 'ত্রিগুণ, পঞ্চশর, পঞ্চবাণ এবং একরূপ দ্বারা গণিত রাজা বিক্রমের সংবৎসরে (সংবৎ ১৫৫৩ = ১৪৯৬ খ্রীষ্টাব্দ)' এবং বৃহস্পতিচক্রের রুধিরোদ্গারি সংজ্ঞক বৎসরে, পৌষমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় সপ্তমীতিথি বৃহস্পতিবারে গঙ্গীতীরে পীঠসহ শ্রীরাজধর (অর্থাৎ রাজধর-সংজ্ঞক দেববিগ্রহ) নির্মিত হলেন এবং এই কীর্তি (অর্থাৎ কীর্তিখ্যাপক মন্দির) নির্মাণ করানো হোল ।[৩]

"অভিবর্দ্ধমান-বিজয়রাজ্যে/সম্বৎ মার্গ দিনানি ১২/শ্রীভোগটস্য পৌত্রেণ শ্রীমৎসুভটসূনুনা । শ্রীমতা তাতটেনেদং উৎকীর্ণং গুণশালিনা ।।"

—ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসন (৮ম শতাব্দী) ।

অর্থঃ (ধর্মপালের) ৩২তম বিজয়বর্ষে, অগ্রহায়ণের ১২ তারিখে এই অনুশাসন শ্রীমৎসুভটের পুত্র ও সৌভাগ্যশালী ভোগটের পৌত্র তাতট কর্তৃক খোদিত হল ।[৪]

পুঁথি লিখে কে কত 'দক্ষিণা' পেলেন, পুঁথির পাঠক বা মালিকের নাম ধাম, কোথায় কখন পুঁথি লেখা হল, পুঁথি চুরি করলে বা নিয়ে ফেরৎ না দিলে কার কি অপরাধ, লিপিকরের নানা আত্মকথা খ্যাতি-অখ্যাতি, দিব্যদান, পুঁথির 'কপিরাইট' রাখার জন্যে পুঁথি হরণকারীর 'বাপ-মা' বা চোদ্দপুরুষকে অশ্লীল গালাগালি বা অভিশাপের বর্ণনা থাকে পুষ্পিকা অংশে । তাই এটি যে মধ্যযুগের বাংলার বিস্মৃতপ্রায় ও অনালোচিত অধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপকরণ, তাতে সন্দেহ নেই ।

বাংলার সামাজিক ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কিত দুটি গুরুত্বপূর্ণ পুষ্পিকার সন্ধান দিয়েছেন অধ্যাপক পঞ্চানন মণ্ডল । বিশ্বভারতী সংগ্রহের অন্তর্গত সেই দুটি পুঁথির একটি হল 'সুদামার দারিদ্র্য ভঞ্জন' (বি. ভা. ৬২৩৯) । লিপিকাল ১২৩৫ বঙ্গাব্দ বা ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দ। পুষ্পিকাটি

নিম্নরূপঃ

'ইতি শ্রীশুদামার দারিদ্র্য ভঞ্জন সমাপ্ত পুস্তক শ্রীকেনারাম দেব (শ)ম্মার পাঠক শ্রীসনাতন দে সাং বোঙাগ্রি খণ্ডঘোষ চৌকি ইন্দাস জেলা বর্দ্ধমান । ইতি তারিখ ১৬ আশ্বিনি মঙ্গ(ল) বারে প্রায় বেলা তিন প্রহর জিতা গৌট সমাপ্ত হইল তিতি সষ্ঠী ।

সন ১২৩৫ সাল যুক বছ্যর দেবাতা বরিসিল না য়(ত) এব পুতি লিখিলাম কোন কম্ম নাই আর গ্রামের লোক গৈতন (পুর) জাইতে লাগিল য়তএব চেলে ভাউ চব্বি(শ)সের ২৪ সের হইল তাহ মেলে নাই আর গ্রামের য়দ্যেখান লোকে অন্য জোটে নাই আর গ্রামের লোক অনা গ্রাম দিয়া জাই(তি) লাগিল পেটের খাতিরে পলাইতে লাগিল অন্য গ্রামের লোক বলে বেলঙ্কে লোক এ লোকে রাখা হবে না জদি রাখ(া) হয় তবে আপনাদের জদি চাকর ছাড়িএ রাখ(া) জায় তবে ওই লোক মাহ কাতিক মাসে জদি দেবতা জল হৈলে ওই লোক বলিবে কি আমা(দর) দেসে জল হয়াছে বাড়ি জাই চলরে কপ্প বসাইতে হবে য়তএব রাখে না আর জে গ্রামের ধম্মকম্ম নাই আর গ্রামে মনুস্য নাই আর গ্রামে মণ্ডল খোসামুদে হয় আর বোঙাগ্রি গ্রামে য়নেক কুড়খেক মণ্ডল আছে ইতি সন ১২৩৫ সাল ১৬ আসার দেখ ভাই খপরদার আয়ছে তৈসিলদার তারাচাদ আর তালুক নারায়ণ পোদাররে আর কি কহিব পউস মাসে লাগ্যা জোড়ে ।

পউস মাসে নাগলি চাটুজ্যে ফ (জ্জ) দার গোমস্তা আর গোমস্তা রূপন নেউকি জোরে নাইরে নাই মানিক মণ্ডলের নাগীল সূয়া এতখানেই ।'

দ্বিতীয় পুষ্পিকাটি ১১৭৭ বঙ্গাব্দের ২৭ জ্যেষ্ঠ 'শ্রীনন্দলাল দেবশর্মা' কর্তৃক লিপিকৃত 'কবিকঙ্কণ চণ্ডীর' (বি. ভা. ৬২৪০) একটি পুঁথি । এতে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়ঃ- 'ইতি শ্রীশ্রীমঙ্গল চণ্ডীকার পুস্তক সমাপ্ত ।। জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষিক নাস্তি দোসক । ভিমস্বাপী রনে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রম ।। ভিম আদি করিয়া যে ভঙ্গ দেয় রনে । অবিষ্কক মতিভ্রম মহামুনিগণে । জদি বাটী বাড়ি হয় না লবে অপরাধ । দোষ ক্ষেমা করি সভে করিবে আসির্ব্বাদ ।। পুস্তক পড়িতে দিবে সুবুদ্ধির ঠাঁই । গবাগুণা গ্রন্থ জেন গোবরায় নাই ।। ০।। ইতি লিখিতং শ্রীনন্দদুলাল দেবশর্ম্মণষ্য । সন ১১৭৭ সালের ২৭ জ্যৈষ্টে বৃহস্পতিবারে অষ্টাহ পুস্তক সমাপ্ত হইল ।। নিজ বাটীতে নিজ ঘরে দক্ষিণ দ্বায়ারির ঘরে পিড়াতে বস্যা লিখ্যা হইল ।। শ্রীশ্রীমঙ্গলচণ্ডীকায়ৈ নমঃ শ্রীশ্রীসিবায় নমঃ শ্রীশ্রীজয় দুর্গায়ৈ নমঃ শ্রী শ্রী গুরবে নমঃ সাং খণ্ডঘোষ ।। সন ১১৭৬ সাল মহা মন্বন্তর হইল অনাবৃষ্টি হইল সস্বি হইল না কেবল দক্ষিণ তরফ হইয়াছিল আর কোথাও ২ জলাভুমে টাকায় বার সের চালু সাড়ে ছয় পোন চালু সের হইল তৈল ২।।০ আড়াই সের লবন ১৩ সের কলাই ১১ এগার সের তরিতরকারি নাস্তী সাক নাস্তী কিছু মাত্রেক নাস্তী এই কথা সর্ব্ব(র) বৎসরের মুন্বিসী বলেন আমরা কখন এমন যুনি নাই ইহাতে কত ২ মন্বিসী মরিল বড় ২ লোকের হাড়ী চাপে নাই নাং সং ১১৭৭ সালের মাহ ভাদ্রতক মহা প্রলয় হইল এই সন রহিল আর কীবা হয় ।

১৮২ একশত বিরাসি পাতে ৪৩৩০ চারিসত্ত তিরিস লেচাড়্যি সমাপ্ত হইল শ্রাবণ মাসে টাকায় ৪ চারি সের চালু হইল অনেক মনিস্বী নষ্ট হই (ল) মহা মন্বন্তর (পৃঃ ২০০) ।'

১২৩০ বঙ্গাব্দে লেখা (ওড়িশায় লিপি) মহাভারতের 'সভাপর্ব' পুঁথিটি থেকে জানা

যায়, সেবার পণ্ডিতী বিতর্কের ফেরে দুবাব দুর্গাপূজা হয়।

পাকুড়রাজের পদস্থ রাজকর্মচারী মহানন্দ চক্রবর্তীর লেখা (১২৬৬ বঙ্গাব্দের ৯ শ্রাবণ) 'স্যমন্তক মণিহরণ' পুঁথির শেষে লিপি -

'অবশেষ নাহি ভাষ কেমনে রচিব /অনাবৃষ্টি হৈল দেশ কিসে রক্ষা পাব ।।'

— (সা.প. পত্রিকা ৬৫ বর্ষ, ২য় সংখ্যা)।

১২৭৫ বঙ্গাব্দের শ্রাবণমাসে লিপিকৃত রামায়ণ - আদিকাণ্ডের শেষে তিনি লিখেছেন -

'ঘন না বরিষে ঘন এই (বড়)' খেদ ।।

অতি মন্দ বরিষণ অনাবৃষ্টি প্রায় । সবে চিন্তাকুল সে সময় বঞ্চয় ।।'

১২৮০ বঙ্গাব্দের কোজাগরী পূর্ণিমায় লেখা রামায়ণ 'উত্তরাকাণ্ড পুঁথিতেও দেখা যায় অনুরূপ বিবৃতি -

'বৃষ্টি বিনে সৃষ্টি নাশ লোকে কষ্টপায় । কোথা শস্য উপজিল কোথা কিছু নাই ।।
গ্রামে উপজিল শস্য জল বিনে মরে । কিঞ্চিৎ হইলে বারি রক্ষা পাইতে পারে ।।
গগনে মেঘের নাহি দেখিয়ে সঞ্চার । আরম্ভ হইল শীত বৃষ্টি হওয়া ভার ।।
যেছিল সম্বল তাহা হইল অবশেষ । এবি কি হইবে তাই ভাবিয়া অশেষ ।।'

পয়ার ছন্দে পুষ্পিকায় নিজের বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন (সা. প. ১৪১) রামায়ণ-উত্তরাকাণ্ডের পুঁথির লিপিকর -

'দীনহীন রাধামাধব দাসের নিবেদন । শতকাণ্ড রামায়ণ ভাষায় রচন ।।
বর্নিয়াছেন বহুকাল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাস । পৃথিবীর লোক শুনে পুরায়েছেন আশ ।।
বিরুদ্ধ ছন্দ রসাভাষ পয়ার লিখন । ভাবী হয়ে ভাব অর্থ করিলে গ্রহণ ।।
ভক্তিভাবে ব্যাঘাত হয় ভাবিলাম হৃদয় । পণ্ডিতের ভাব যাহা ভাবিলাম নিশ্চয় ।।
মতন্তর পয়ার আর করিয়ে রচন । গ্রন্থের আভাস লয়ে লিখিলাম এখন ।।
সব শ্রোতাগণে আমি করি নিবেদন । অন্য গ্রন্থের সহিত করিলে মিলন ।।
ভাবেতে বুঝিবেন ভাব কিরূপ হয়েছে । অধিক লিখনে আর কি গুণ আছে ।।'

বিশ্বভারতী সংগ্রহের (১৫৪৫) হাসান দীন রচিত 'গোবিন্দচন্দ্র পুস্তক' পুথির পুষ্পিকায় বাংলা লিপির নিচে তিনছত্র ফার্সী লিপি দৃষ্ট হয়।

পুঁথির পাতায় জন্মপত্রিকাও লেখা আছে। যেমন পরিষৎ সংগ্রহের 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা' (সা. প. ৪৯২)। ৭ম পত্রের ২য় পৃষ্ঠায় দুটি দুটি জন্মপত্রিকা লেখা। পুষ্পিকায় সাতপুরুষের নামোল্লেখের দৃষ্টান্ত রামায়ণের একটি পুঁথি (সা. প. সংগ্রহ)ঃ 'ইতি সন ১২০৫ তারিখ ১০ পোউস সহক্ষরং শ্রীমানিক্য দাস প্রগনে দক্ষিণ সাহাজপুর মোকাম ছান্দিয়া পুস্তক শ্রীমানিক্য দাস পিসরে শ্রীমুক্তারাম দাস তান পিসরে শ্রীতিতিরাম দাস তান পিসরে শ্রীভঙ্গদাস সাতপুরুষ কস্যব গোত্র। গদাধর পণ্ডিত গোসাঞিের পরিবার। কোন গদাধর। প্রিয় গদাধর ।।'

পুষ্পিকায় আছে সমকালীন বাজারদর। যেমন, ১২২৪ বঙ্গাব্দে লেখা কৃত্তিবাস রামায়ণের 'অরণ্যকাণ্ড' (ক. বি. ৪৯) - 'গতসন দেবতা সুখা করিয়াছে এক্ষেনে চাল্যের দর চর্ব্বিস পচিস পাই আর কী প্রকার হয়।' আছে নানা ঘরোয়া কথাবার্ত্ত। কবিকঙ্কণের 'চণ্ডীমঙ্গল' (বি. ভা.

২২৮৪) পুঁথিতে, বীরভূম জেলার কাচগড় পরগণার থুপসরা সাকিমের লিপিকর গিরিধর শর্মানায়েক ১২৩০ বঙ্গাব্দে লিখেছেন -
'মোদকের দরুন নয়া বাড়িতে বসিয়া ঘর তৈয়ার হয় নাঞী একখানি দোচালা হইয়াছে তাহাতে বসিয়া লিখিলাম লিখিবার আরম্ভ করিয়াছিলাম বারোসও ওনত্রিস সালে সাতরই পৌসে লেখা সমাপ্ত হইল সন বারসও ত্রিস সালের উনত্রিসা জৈষ্টে পুস্তক লিখিলাম আমি বহু জত্ন করি সার্ম্মক বিলাতি কাগজ দিয়াছে বেপারি দাম দিতে হয় নাঞী বেদামিতে পাওয়া কাগজে চিনিব পুঁথি যদি জায় খাওা এউ পুস্তক জদি কেহু চুরি করে মাতৃগমণ সুরাপান হবে এই দিব্য থাকিল পুস্তকে নিরোপন তিনসও আটচল্লিস পত্রে হল্য সমাপন ।' একই পুঁথির অপর একটি অনুলিপির পুষ্পিকায় দেখি (সা. প. ৫২০), 'এগার পালা গিত হইল তখন শ্রীযুক্ত পিতাঠাকুর মহাশয় তামাক খান শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ ঘোষ গোলায় কষ দেয় শ্রীমতি ঠাকুরাণ দিদি কুটনা কুটেন ।' এইসব বৃত্তান্ত পরগণা হাজিপারের সাকিম কুটীগোদার লিপিকর কালিকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের । 'কত লেখব আমার সাধ্য নয় আমি পারিব না । কিন্তু পুথি লেখা হল না পুথির এ অক্ষরে নয় তাহাও লিখিলাম' এই দুঃখনিবেদন বীরভূম জেলার 'সাং ডামরা তালুক মল্লারপুর থানা মৌড়েস্বর'এর লিপিকর ব্রজনার্থ শর্মা ঘোষালের ১২৩৬ বঙ্গাব্দে লেখা কৃত্তিবাস রামায়ণের 'অযোধ্যাকাণ্ড' পুঁথির পুষ্পিকায় (ক. বি. ৩৬) । 'শ্রীশীনাথ চন্দকে আশীর্ব্বাদ দিল ব্রাহ্মণগণের ছিল তাই পাদপর্দ্য পাইআ' পাঠক দীননাথ গোস্বামীর জন্যে ১২৬৩ বঙ্গাব্দে লিপিকর কাশীরামের মহাভারত পুঁথি (ক. বি. ১৩৮০) লেখেন । শ্রীব্রজলাল সাহু বাবুজী বিষ্ণুপুর পরগণার পাত্রসায়র গ্রামের শ্রীগোপাল সিহুর (সিংহ ?) জন্যে মহাভারত পুঁথি লিখে (ক. বি. ১৫৭৬) পুষ্পিকায় নিজের মনের কামনাটি জানিয়েছেন, 'আমাদের গামের জে চোরা থাকে তাহাকে ফাড়িতে তাহাতে জব্দ রাখিবে ।' পুঁথির পুষ্পিকায়, পুঁথি পাঠক যজ্ঞেশ্বর ঘোষালের উদ্দেশ্যে শঙ্করের 'গুরুদক্ষিণা' পুঁথির (বি. ভা. ১২২০) লিপিকর সিমলাপাল পরগণার ধুল্যাপুর গ্রামের কাশীনাথ মণ্ডল লিখেছেন ব্যক্তিগত চিঠি 'সেবক শ্রীজজ্ঞেশ্বর ঘোষাল প্রণামা নিবেদঅ য়াগে মহাসএর শ্রীচরণ য়াসিবাদে এ জনার প্রাণগোতিক সমপ্ত মঙ্গল হঅ বিসিষ্ঠ ।' তালপাতায় 'লেখাপড়া'র কথা বলা হয়েছে কৃষ্ণদাসের 'মোহমুদ্গার' পুঁথিতে (বি. ভা. ৩৫৫৭) । ১২৫৪ বঙ্গাব্দে লিপিকৃত পুঁথিটির পুষ্পিকার অংশ বিশেষ - 'লিখিতং শ্রীবেচুলাল শীহু মকাম বদীনাথপুরের নিজ পুবদারি দরজাঅ সমাপ্ত মহাসঅ শ্রীকুড়রাম মজুন্দারের পাঠক মহাসঅের বাটী সাকীম লাঙ্গুলিআ আমার বাটীতে থাকিআ পুস্তক সমাপ্ত হইল শ্রী আর এক পাঠক আমার কনেষ্ঠ ভ্রাতা খেত্রনাথ শীহুবাবু লিখাপড়া তালপত্রে করিতেছেন দুইচার মাসে পতি (পুঁথি)' লেখিবেন জ্ঞাতর্থে নিবেদন করিলাম।' 'আদ্যবেকত' পুঁথির লিপিকর (দ্রঃ 'বাংলা পুঁথির পুষ্পিকা', পৃঃ ৯৪) লিখেছেন, 'জেবা এই পুথি ভেদ বুঝিবে চারি অথ্যবাক আছে সরিয়ত তবিকত হকীকত মারফাত । বুঝিবে যে আদ্যের কথনং অথ্য । বুঝিবেক মুরসিদ চেতন কথা অথ্য যে আদ্যের পোথা । নতুবা বেড়াব ভাসিএগ্রা ভাসিএগ্রা ।। মোছলমান নর হএগ্রা আদ্যকথা না বুঝিবে যে । বৃথা জি(ব)ন তার দুনিএগ্রা ভিতরে আর কী লেখিব ইহা বুঝে কায্য করিবে লোকা ।' এইসব বৃত্তান্ত ছাড়াও প্রায় সব পুঁথিতেই ভীম ও মুনিদের দৃষ্টান্ত স্থাপন, প্রচলিত চাণক্যশ্লোক বা নানাবিধ নীতিশ্লোকের ক্রটিপূর্ণ উপস্থাপনা

ঘটেছে। 'এই পুস্তক যেবা পঠে শুনে গায়। অন্তকালে সেইজন কৃষ্ণপদ পায়।। যেইজন পুস্তক লিখি ঘরেতে রাখয়। কদাচিৎ সেই গৃহ লক্ষ্মী না ছাড়য়।।' এই ঘোষণাও লিপিকর কোন কোন পুঁথিতে (সা. প. ৪৭৮) মনের আনন্দেই করে গেছেন। ধর্মে মুসলীম হলেও 'শ্রীসাজাহান চৌধুরী লিপিকর গুরুদাস ঘোষকে দিয়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' পুঁথি (বি. ভা. ৩০২১) লিখিয়ে নেন। এমন পুঁথি পাঠক গ্রামে গঞ্জে কম ছিলেন না। আর একটি পুষ্পিকায় বাংলার ইতিহাসের বিস্মৃতপ্রায় তথ্য :- 'শকাব্দা ১৬৭১ সন ১১৫৭ সাল তারিখ ৫ই মাঘ রোজ বুধবার সপ্তম্যাস্তিথৌ রাত্রি এক প্রহরের কালে আমল মীর হবিবুল্লা খাঁ ও লালুজা পিসর রঘুজি মারহাট্টা মোকাম তাম্রলাপিতপুর আমলে পরগণে কাশীযোড়া সরকার গোয়ালপাড়া মজকে সুবে উড়িষ্যা বহঙ্গাম পলায়ন বাবুজান খাঁ তনখাদার (বা. পু. পু. পৃঃ ৩০১)।' এটি রামেশ্বরের 'শিবায়ন' পুঁথির পুষ্পিকা। কবীন্দ্র পরমেশ্বরের 'মহাভারত' পুঁথির পুষ্পিকায় নবাব সিরাজউদ্দৌলার মৃত্যুদিন নির্দেশিতঃ 'পুস্তক লিখিতং স্বহস্তাক্ষর শ্রীরামপ্রসাদ শর্ম্ম বাগছি সাং চন্দ্রপুরপরগণে সোনাবাজ তপ্পে চাপেলা সরকার বাজুহার তালুক শ্রীযুত ঁ বৃন্দাবনচন্দ্র দেবদ্দেবস্য শকাব্দা ১৬৭৯ ষোলশত উণআশি সুবেদারী সিরাজউদ্দৌলার ফৌতি তারিখ ১৮ই আষাঢ যেওজ মিরজাফর জমিদার শ্রীমতী রাণী ভবানী দেব্যা গোমস্তা দয়ারাম রায় সন ১১৬৪ পুস্তক সমাপ্ত তারিখ ১২ শ্রাবণ রোজ সোমবার দিবা ১ প্রহর........(প্রাগুক্ত পৃঃ ৩০১)।'

এছাড়া, মামাবাড়িতে পুঁথি লেখা (বি. ভা. ২০৬৯), পুঁথির মালিক হিসেবে সাহেবের নামোল্লেখ ('এই পুঁথিখানি শ্রীযুত মি. জানসেন সাহেব ইহার মুচ্ছদী শ্রীগোরানন্দ বসাখ ও শ্রীভিখারি পালিত', বা. পু. পু. পৃঃ ১৮৫), ভ্রাম্যমান লিপিকরদের প্রসঙ্গ (বি. ভা. সংগ্রহে রক্ষিত লিপিকর পঞ্চানন আসের বিভিন্ন পুঁথি দ্রষ্টব্য), সম্ভবতঃ লিপিকরের পুঁথি লেখার সঙ্গে সঙ্গে পটুয়া বা চিত্রকরের পুঁথি চিত্রণের বিবরণ ('দুর্গাচরণ বিষ্ণু মহাশএর দরজায় বশীয়া পোটুয়া লিখে'......., (বি. ভা. ৬১৯৩। বা.পু. পু. পৃঃ ১৯৯) ইত্যাদি পুষ্পিকাতে দ্রষ্টব্য। 'মহাভারত' - কর্ণপর্ব পুঁথির লেখক শিবচন্দ্র দাসের (এ. ৫০২৫) পরবর্তী বাসস্থান 'আওনবপুর নলকুড়া হলেও আদিবাস' 'সাং সুতানুটী।'

পুঁথি লেখার স্থান কাল

পুঁথি লেখার স্থান বা কাল নিয়ে বিচিত্র তথ্য পাওয়া যায় পুষ্পিকায়। রামপ্রসাদের 'সত্যপীর পাঁচালী' গোবরআড়া গ্রামের কাশীনাথ বসু নিজের জন্যেই নকল করেন ১১৯৫ সনের 'আখেরী' ২৯ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার। কৃষ্ণদাসের 'গোবিন্দমঙ্গল' সমরশাহী পরগণার রায়না থানার সেয়ারা সামিলে ১২৫৭ বঙ্গাব্দের ১৪ অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার বেলা দেড়প্রহরের সময়, হুগলীর জাহানাবাদ পরগণার মিনিকিরবেড় মৌজার সনাতন কুম্ভকারের জন্যে লিপি করেন শ্রীত্রিপুরাচরণ দাস মিত্র - দৌলাতপুরের 'শ্রীশ্রী' দেবের জাবতৃগায় বসিয়া।' আর একটি পুঁথি ১১৮৩ সনের ১ মাঘ রবিবার বেলা এক প্রহরের সময় সাকিম ছোট বুইনানের 'শ্রীবলাই পোতদারের দলিজে সমাপ্ত' হয়। বৃন্দাবনদাসের 'বৈষ্ণব মাহাত্ম্য' পুঁথির পুষ্পিকাটি এই রকম :-

'ইতি সন ১১৩৩ সাল মাঘ অগ্রহায়ন সোমবার দিবসে বিকালে পুস্ত(ক) লেখা সমাপ্ত মোকা(ম) শ্রীশ্রীমন্দির আদর শ্রীযুত লাল দাষ বৈষ্ণবঠাকুর লি(খি)তং শ্রীআনন্দীরাম দাস।।' কবিচন্দ্র

রামায়ণের 'শিবরামের যুদ্ধ' পুঁথির (বি. বা. ১১০৭) পুষ্পিকায় ভিন্ন ভাষার স্পর্শ আছে - 'শ্রীশিবরামের যুদ্ধ সমাপ্তা ইতিসর্ন ১২২৮ সাং তাং ২ ভাদ্র রোজ বৃহস্পতিবার সাং রামকৃষ্ণপুরঃ বেলা দুই প্রহর তিনটা বাজগিয়া ।' কাশীদাসী মহাভারতের 'অশ্বমেধপর্বের' একটি পুঁথি বেলা চারিদণ্ড আমলে সমাপ্ত হইল ।। শ্রীকোমলা কান্ত রায়ের পূর্বদ্বারি ঘরের দরজায় বসিয়া লিখিলং স্বয়ক্ষর শ্রীদ্বারিকনাথ রায় সাং চক পঞ্চানন পরগণে সমরশাহী সন ১২৫৫ সাল ইতি তারিখ ৬ কাত্তিক ।। অনন্তরাম দত্ত রচিত 'ক্রিয়াযোগসার' চৌদ্দ গাঁ পরগণার কিসমৎ নরহরিপুরে ১২০৬ সনের ২৯ ফাল্গুন 'রাত্রি এক প্রহরকালে মোকাম গকুলগঞ্জ শ্রীশ্রীকীষ্ণ সাহার গোলাতে সমাপ্ত' হয় । মহাভারতের 'বিরাটপর্বের' একটি পুঁথি বর্ধমানের রাণীহাটি পরগণার মেদগাছি মোকামে রাত্রি দুইপ্রহরের সময় লেখা শেষ হয় । রূপরামের ধর্মমঙ্গলের একটি পুঁথি 'বক্তার নগরের' চৌপাড়িতে (সাকিম কাজড়া) লেখা হয় । আবার সরকার মান্দারণের জাহানাবাদ পরগণার গড়বেতা থানার কৃষ্ণগঞ্জ গ্রামে কৃত্তিবাসের 'অঙ্গদ রায়বার' পুঁথি ১২৫৮ বঙ্গাব্দের ১০ আশ্বিন রাত্রি চারিদণ্ডে লেখা শেষ হয় । কবিকঙ্কণ চণ্ডীর অপর একটি পুঁথির পুষ্পিকা এই রকম ঃ-

"লিখিতং শ্রীমপস্বল পেষ্টা আর সদর পেষ্টার ওপর পূর্কতী শ্রীলক্ষ্মীপুর চন্দ্রকোনার দুর্গাপ্রসাদ চৌধুরী অবিতিত্থ লিখিলাম শদর পেষ্টা দুই পাচি শ্রীরাধাবমন রায় লিখিলেন সন ১২১৪ সাল ২৪ ফাল্গুন শবানন্দ দেবশম্মন ।" বৃন্দাবনদাসের 'ভক্তি চিন্তামনি' জাহানাবাদ পরগণার সলেমপুর সাকিমের 'শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর দাস কাত্রস্ত' ১১৩১ সনের ১৪ পৌষ সোমবার চন্দ্রকোনার 'কনকাবতী কনকপুর'এর শ্রীকৃষ্ণচরণ ভুইয়ের জন্য 'শ্রীতেঙ্গুরাম ভুইয়ের' বাড়িতে লেখা শেষ করেন । 'সময় ছয়দণ্ড রাত্রিতে' সামাএীদহের পঞ্চানন আস কৃষ্ণদাসের 'ভক্তিরসাল্লিকা' লেখা শেষ করেন ১১৮৪ বঙ্গাব্দে । মুড় পরগনার পাকুড়তলা মৌজার শ্রীধর কয়ালকে দ্বিজ দুর্গারামের 'শিশুজ্ঞান চরিত্র' লিখে দেন শ্রীষষ্টীচরণ মণ্ডল ১২৬৪ সালের ৯ ফাল্গুন শুক্রবার, স্থান 'শ্রীচিন্তামুরি মণ্ডলের দরজার পাটশাল ।' কবিচন্দ্র রামায়ণের একটি পুঁথি ১২৩৮ সালে ১ মাঘ ২৪ পরগণার

হাতিয়াঘর পরগণার 'খলদীয়া' গ্রামের মোঃ কাথা মহাশয় সাহেবের 'বাশায়' লেখা হয় । মহাভারত বিরাটপর্বের পুঁথি '১২৬৩ বঙ্গাব্দের ৭ কার্ত্তিক বুধবার বেলা দেড় প্রহর থাকিতে বাহের বাড়ির পূর্বের চৌকায় বশীআ সমাপ্ত করা গেল ।' সাহিত্য পরিষৎ সংগ্রহের অন্তর্গত মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের (নং ২৭৩) পুঁথির পুষ্পিকাটি লক্ষ্যণীয় ঃ-

"এহি পুস্তক সমাপ্ত করিলাম বেলা একদণ্ড থাকীতে শ্রীজুত রামধন বসু সাক্ষাৎ মাতুল মহাশয়ের বাহির বাটিতে মণ্ডপ......উপরেতে দক্ষিণমুখী হইয়া । ঘাড়ের মধ্যে সাল হইয়া বড় বেতা পাইয়া এহি পুস্তক সমাপ্ত করিলাম এহি পুস্তক আর কেহর এলাকা নাহি ইতি সন ১২৪০ সনের মাহে আশ্বীন তাং ৩ রোজবার কালে সমাপ্ত করিলাম ইতি ।"লোচনদাসের 'দেহ নিরূপণ' ১২৩৮ সনে ২৬ শনিবার মালিয়াড়া পরগণার চৈতন্যপুরের পাঠশালায় বেলিয়াতোড়ের শ্রীহারাধন দে লিপি শেষ করেন । কৃষ্ণদাসের 'আশ্রয় নির্ণয়' পুঁথি ১২১৯ সনের ৪ আষাঢ় সাকিম 'গামির্হায়' শ্রীমোহনলাল হরকরার পশ্চিমদ্বারী বৈঠকখানায় বেলা চারিদণ্ডে অনুলিপি করেন । শঙ্কর কবিচন্দ্রের

'প্রহ্লাদ চরিত্র' বেলিয়াতোড়ের শ্রীরাইচরণ নিয়োগী ১২২৮ সনের ২৪ বৈশাখ লিপি করে মন্তব্য করেন, 'সাংগোপীনাথপুরে গোকুল গরাঞ্রীর গুয়াল ঘরে উত্তর মোখে মাচাতে বসিয়া গুয়াল ঘরখানি উত্তর দুয়ারি ও পূর্ব্বদুয়ারি নিক্ষক দেখিয়া কেহ দোশ নাঞ্রী নবে । অষুর্দ্ধ হইলে শভে যুর্দ্ধ করি দীবে ।' মানিক দত্তের 'চণ্ডীমঙ্গল' পুথির (উ. ব. ৫৬০) লিপিকর লোহারাম দাস (পরগণে করদহা) সাকিম-জামালপুর, জানাচ্ছেন, 'মোকাম রাজগঞ্জে । ছোটবন্দরে । শ্রীফকির চন্দ্র শর্ম্মার বাশাতে । কাশারি পট্টির পছীম নিকট । দক্ষীন ঘরে । ডেড় প্রহর বেলা হৈতে পুস্তক সমাপ্ত হৈল।।' জগজ্জীবন ঘোষালের 'মনসামঙ্গল' (উ. ব. ৫২৪) পুঁথিটি 'বেলা ২ দুই প্রহরে..... সম্পূর্ন্ন হইল। বড় গোহালের দুয়ারে পুর্ব্বমুখে বসিয়া ।।'

একই পুঁথি একাধিক স্থানে লিপি হয়েছে । তাই স্বাভাবিক কারণে মনে হয়, কোন কোন লিপিকর ভ্রাম্যমাণ অবস্থায় পুঁথি নকলের কাজ করতেন । সাহিত্য পরিষদ সংগ্রহের রামায়ণ উত্তরাকাণ্ডের একটি পুঁথি (লিপি ১২৫৫ বঙ্গাব্দ) 'জিলে সুধারাম থানে মেঘগঞ্জের উত্তরে জৌহরগঞ্জের দাবাতে লেখা হয় । কীর্তন গাইতে গিয়েও পুঁথি লেখা হয়েছে ১১০৮ সালে । যেমন কাশীরামের মহাভারত 'আদিপর্ব' (ক. বি. ১৭৫৬) । গভীর রাত্রি পর্যন্ত পুঁথি নকলের কাজ হয়েছে । তার অন্যতম প্রমাণ সাহিত্য পরিষদ সংগ্রহের 'জগন্নাথ মাহাত্ম্য' (দ্বিজ মুকুন্দ বিরচিত) । মোকাম হাড়ঙ্গ পাড়া ও গোপালবাড়ির লিপিকর 'শ্রীমুকুন্দ, দেবসম্মণ' লিখেছেন 'রাত্রি দুই প্রহরকালে পুস্তক সোমাপ্ত ।' হরিদেবের 'দণ্ডীরাজার উপাখ্যান' (এ. ৩৭১৫) ১২০৭ বঙ্গাব্দের ২৭ মাঘ ষষ্ঠীবর ঘোষ দৌলতপুর পরগণার তাজপুর গ্রামের কেবলরাম ঘোষের বাইরে পূবদিকের 'বাঙ্গালা' ঘরে বসে বেলা ১ প্রহরে শেষ করে । কাশীরামের 'সৃষ্টিপুরাণ' (এ. ১০৭১০) ১২১৩ বঙ্গাব্দের ১২ পৌষ পঞ্চানন মজুমদারের পুত্র শ্রীতপস্যাকাম দেব নিজেই বাড়িতে বসে বেলা ছয় দণ্ডে লেখা শেষ করে । শঙ্কর দাসের 'যমসংহিতা' (এ. ৪৮৭২) ১২৩৩ সালের ১৬ মাঘ রবিবার সোনামুখী হাটের 'নয়ে পশ্চিম বাটির পরীক্ষিৎ পোদ্দার বেলা এক প্রহর থাকতে লেখা শেষ করে । সাকিম বাহাদুরপুরে ১২১৯ বঙ্গাব্দের ৭ কার্ত্তিক, বুধবার দ্বিতীয় প্রহরে, কৃষ্ণপক্ষে '১৭ দ্বিতিয়ান' তিথি '৫ মৃগশিরা নক্ষত্রে' মুনিরাম দাস 'বাইর বাড়ীর ঘরে' কালিদাসের 'যমকবলচরিত্র' (এ. ৪১৩১) লেখেন । গোরাচাঁদ দেবশর্ম্মার পিড়ায় বসে মতিলাল দেবশর্ম্মা ১০৯৬ সালে লিখেছেন বৃন্দাবন দাসের 'ভক্তিতত্ত্বচিন্তামণি' (এ. ৩৭২২) পুঁথিটি । 'বৰ্দ্ধমান মোকামে'র 'স্যাম ঘোষের বাগানে' ১০৮৩ বঙ্গাব্দের ১২ ভাদ্র নরসিংহ দাস বৈরাগী অকিঞ্চন দাসের 'কৃষ্ণলীলামৃত' (এ. ৪৯৮০) অনুলিপি করেন । সাকিম বিষ্ণুপুরের মধ্যে 'গঞ্জের পথে' লিপিকর বাগুতিরাম ইংরেজী ১৮১৭তে (বাং ১২২৪, ১৫ আশ্বিন) শঙ্করের 'গুরুদক্ষিণা' (এ. ৩৬২৬) নকল করেন । সেকালের বাঁকুড়া শহরের এক শিক্ষিতা মহিলা লালমণি বৈষ্ণবী তো ১২৪২ বঙ্গাব্দের ২০ কার্তিক রাত্রি দেড় প্রহরেব সময় যদুনাথ দ'সের 'ভ্রমরগীতা' (এ. ৩৯৬৭) লেখা শেষ করেছেন। 'শ্রীরাম কর্ম্মকারের সন্নিকট লৌতন চৌপাড়ীতে ১০৮৩ বঙ্গাব্দের ১৮ জ্যৈষ্ঠ বুধবার বেলা ১ প্রহরে কেতকাদাসের 'মনসামঙ্গল' (এ. ৫০০২) লেখা শেষ হয় । গৌরহরি পরামাণিকের মত নির্লোভ লিপিকর ১২৩৫ বঙ্গাব্দে নেতটানায় 'শ্রীশেখ আওয়জ'এর জন্যে' গরীব তৈয়বের 'মদন গুড়িয়া' পুঁথি (বি. ভা. ১৫৪৩) লিখে শেষে মন্তব্য

করেন, 'এ পুঁথি লিখিলাম আমি পাটশালায় বশি। জে যুনিবে শেই শিষ্যু হইবেক ক্ষুশি।।' কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যার্তত্ত্বসার' (সা. প. ৩৩০) পুঁথিটি ১২১৯ বঙ্গাব্দের ৪ আষাঢ় 'শ্রীযুত মোহনলাল হরকরারঃ বৈইটকখানায় পশ্চীম দ্যারি ঃ বসিএ বেলা চারি দণ্ডের ওক্তে সেস হইল।' এরপরে মন্তব্য ঃ জ্ঞান লাভের জন্যে এ বই চুরি করে রাখলে মহাপাপের ভাগীদার হবে।

এইভাবে 'পূর্ব্বদারি ঘরের দরজায়' বসে, 'সিবস্তানে পূর্ব্বমুখ' হয়ে, 'গকুলগঞ্জ শ্রী শ্রীকীষ্ণ সাহার গোলাতে' 'রাত্র এক প্রহরেব সমএ, শ্রীবল রায়ের বাটীতে' অনেক পুঁথিই লেখা হয়েছে। যদুনন্দন দাসের 'সুখদেবচরিত' (ব. বি. ২৩) লিপিকর রাঘবিন্দ্র দাস '১১৯৯ সাল আখেরী' শ্রাবণের ৪ তারিখে 'যুগল তিলির মাতার দুয়ারে' বেলা এক প্রহরে লেখেন। দ্বিজ ভগীরথের 'তুলসীচরিত' (ব. বি. ৪১) ১২১৬ সালের ২৪ মাঘ সোমবার বেলা দেড় প্রহরে বিষ্ণুপুর পরগণার মকরন্দপুরে শ্রীরামলোচন ঘোষ 'বৃন্দাবন পালের দলিজায়' অনুলিপি করেন। দীর্ঘসময় ধরে বিভিন্ন স্থানে একটি পুঁথি নকল করা হয়েছে। যেমন 'কৃত্তিবাস-রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডের পুঁথি (সা. প. ১২২)'- 'এই পুস্তক সন ১২৩৯ সনে ৫ আশ্বীন বৃহস্পতিবার বেলা দেড় প্রহরের সময় সমাপ্ত হইল। জিলে সুধারাম থানে মেঘমতগঞ্জের উত্তরে জৌহরগঞ্জের দাবাতে সমাপ্ত হইল তাহার পর সন ১২৫৫ সন মাহে মাঘ মোকাম মধুপুরা জিলে ভুলুয়া সমাপ্ত হইল।' 'সঞ্জয়-মহাভারত-বিরাটপর্ব' (সা. প ১৬৭) ১২৬৩ সনের ৭ কার্ত্তিক বেলা দেড় প্রহর থাকতে 'বাহের বাড়ির পুর্ব্বের চৌকায় বশীআ সমাপ্ত করা গেল।' রঘুনাথ দাসের 'নিমাইসন্ন্যাস' (সা. প. ২৬৮) ১২৫৪ বঙ্গাব্দের ২১ মাঘ 'বেলা ১ প্রহর উদন নিজ বাড়িতে বসিয়া' সমাপ্ত হল। এটি 'সাকীন রৌহা পরগণে ভাওাল হিশ্যে।।০ আনীর মোতালক জমীদার শ্রীযুত যুগলকিসোর রাএ চৌধুরী' নিজেই নিজের জন্যে নকল করে নেন। লোচনদাসের 'দেহনিরূপণ' (সা.প. ৩২৭) 'বেল্যাতোড়ি'র হারাধন সো ঐ গ্রামের 'হরিদাস বৈষ্টব' এর জন্যে পরগণা মালিয়াড়ার লেখেন। বাঁকুড়ার পাত্রসায়েরের রামকৃষ্ণ সরকার নিজ গ্রামে বসে, অগ্রহায়ণ মাসের এক শনিবারে 'আন্দাজী বেলা দুই প্রহরের সমত্র' ১১৩০ সালের ১৬ পৌষ রবিবারে পাঠক পাঁচু তাঁতির জন্যে দ্বিজ কবিচন্দ্রের 'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ' (সা প. ৩৮৭) পুঁথিটি অনুলিপি করেন। কিন্তু ১১০০ বঙ্গাব্দের ৫ ভাদ্র 'সোনামুখী লালবাজারে' কবিচন্দ্রের 'অক্রূর আগমন' অনুলিপি করেন সাকিম 'পলাসডাঙ্গার' 'শ্রীনীহাররঞ্জন দেবশর্ম্মা।' লিপি স্থানটি অনুল্লিখিত। মাধবচন্দ্র মহাপাত্রের জন্যে 'রঘুনাথ মিত্রীর পুত্র শ্রীজগন্নাথ মিত্র' খুনডাঙ্গা গ্রামে দ্বিজ শঙ্কর কবিচন্দ্রের 'প্রসাদচরিত' লিপি করেন ১২১৪ এর ২৮ আষাঢ় রবিবার 'বেলা ছয় দণ্ড ওক্তে।' কবিচন্দ্রের 'প্রসাদ চরিত্রে'র (ব. রি. ১০০০) আর একটি পুঁথি ১১১৫ বঙ্গাব্দের ২ ফাল্গুন লিপি করে লিপিকর বলেন, 'এ পুস্তক সাঙ্গ হয় রবিবার দিবসে, বেলা দুই প্রহর ওক্তে। শ্রীগোসাঞি দাস। নূতন উত্তর দরজার বরেতে চৌদিত্তার দেওার (চৌদিকে দেওয়াল) হইয়াছে এবং কাষ্ঠ চড়েছে। আসন কম্বলেতে বসিএগ্র উত্তর মুখে সাঙ্গ।' নিজের বস্ত্রবিপণিতে বসেও সাকিম পূর্বচন্দ্রপুরের 'সাধরাম দাস'ও 'শ্রীসামসোন্দর দাসের' জন্যে শ্রীরূপ গোস্বামীর 'প্রেমবিলাস' পুঁথি (ব. রি. ২১৪) ১২৪৮ বঙ্গাব্দের ২২ কার্ত্তিক নকল করেন 'সাকিম সাহাপুর ও দক্ষিণ

বাবুপুরেব 'শ্রীরাম নাথ ভু ইআ' । পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রসিক তরঙ্গিনী' পুঁথির (ব. রি. ২৫৬) শেষের বক্তব্য ঃ

'রসিক তরঙ্গিনী গ্রন্থ সমাপ্ত হইল ।।
কলিকাতা মধ্যে ক্ষাত শ্যাম সরবর ।
তৈথায় নিবাস পঞ্চানন কবিবর ।।
দুঃখেন লিখিতং গ্রন্থ চৌরেণ নিয়তে যদি ।
শূকরী তস্য মাতা চ পিতা তস্য গর্ধবঃ ।।'

দ্বিজ কবিচন্দ্রের 'যযাতির উপাখ্যান' পুঁথির (ব. রি. ১০৭) লিপিকর সাকিম খণ্ডঘোষের (বর্ধমান জেলা) শ্রীব্রজমোহন পোতদারের মন্তব্য 'সন ১২২৩ সাল তারিখ ৫ চৈত্রি রোজ সোমবার.....এই পুস্তক পঠনার্থে শ্রীনবীনমোহন বসো সাকিম দিগলগ্রাম এখানে পাত্রসাএর পাঠশালায় বসিয়া লিখি দিলাম চৌপাড়ি শ্রী জগন্নাথ ধোবার উঠানে ।' কৃষ্ণদাসের 'বৃন্দাবনবর্ণনা' (বি. ভা. ১৬৮৪) 'বৃন্দাবন হইতে দেশে আইসার কালে নৌকারপর পাটনার ওজান গঙ্গা জিও মদ্ধে লিখা জাএ ।' বর্ধমানের শ্যামঘোষের বাগানে লেখা হয়েছে আকিঞ্চন দাসের 'কৃষ্ণলীলামৃত' (এ. ৪৯৮০) । 'সাং মহিষডাঙ্গী পরগণে রানিহাটি মোং কলিকাতা লেন কপালি টোলায় শ্রীযুত বেচারাম সরকারের দালানে বসিয়া' কৃত্তিবাস রামায়ণের 'সুন্দরাকাণ্ড' (ক. বি. ৮৫) লেখা হয। 'উত্তরাকাণ্ড' লেখা হয়েছে সাকিম জামকুণ্ডীর 'শ্রীশ্রীদুর্গামেলাতে' বসে (ক. বি. ২২৯) । 'সাং আগৈবনি পরগণে বগডিহি তরফ আগরা সরকার গোওালপাড়ায়' সার্থকরাম সেনের 'নৌতুন বাখুলের দরজাতে' লেখা হয় কাশীরামের মহাভারত আদিপর্ব (ক. বি. ৪১০৪) । এইভাবে 'রামগোপাল অধিকারীর দক্ষিণ ধারের মেলায়' (ক. বি. ১৮৪৪), 'শদারাম শর্ম্মার বাড়ীতে তাহান ডেঅরি ঘরের বারিন্দাতে বৈকালি বেলায় পূর্ব্বমুখে বসিয়া ' (সা. প. ২৫৪), 'সাঃ তিলপাড়া মৌঃ কড়িধ্যা বেলা আন্দাজী দণ্ড দষ কার্ত্তিকচন্দ্রর দরজ্যাতে বষ্যা খোটীর গোড়াতে' (বি. ভা. ৪০৯৮), 'পূর্ব্বদুয়ারি দোকানশালে' (বি. ভা. ৪৭৬১), 'নারায়ণপুরের কাছারি পশ্চিম চালায়' 'শ্রীযুত রামদাস বৈরাগীর আদেশে' (বি. ভা. ৬১৭২, 'নয়া বাড়িতে ঘর তৈয়ার হয় নাই নাঞী একখানি দোচালা হইয়াছে তাহাতে বসিয়া (বি. ভা. ২২৮৪)', বিভিন্ন পুঁথি লেখা হয়েছে । দ্বিজবংশীদাসের 'পদ্মপুরাণ' (সা. প. ৫২৮) পুঁথির লিপিকর 'যুগলকিসোর রায়' ১২৩৮ বঙ্গাব্দে মহাসপ্তমীর দিন তিন প্রহরের পর লেখা শেষ করেন মনের আনন্দে ।' কাশীরাম-মহাভারত-আদিপর্ব পুঁথি ১২৪১ বঙ্গাব্দে 'আপন মেলায় পুব্বমুক্ষে' (সা. প. ৬১৫) লেখেন রামজীবন গোস্বামী । 'সেই দীনে নিহাল বাড়ুজ্জার মাএর সাঙ্গ ।। সেই দীনে নিরঞ্জন গোস্বামীর মরাই বাদে মোস গোচে ।' এছাড়া 'খড়ের খটি', 'মধুসূদন পালের মুদিখানা', 'নিজ বাড়ির আঙ্গিনা', 'দরয়াজার উপর', 'বৈঠকখানার বারহাণ্ডা', 'নিজ বাড়ির দলিজ', 'বান্ধবের সদর দুয়ারে' 'নিরিবিলিতে' বসে হয়েছে পুঁথি লেখার কাজ ।

লিপিকরের দুঃখ ও বিনয়প্রকাশ

পুষ্পিকায় লিপিকরের দুঃখ ও বিনয় প্রকাশের অন্ত নেই । বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই লেখা হয়েছে 'যথাদৃষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো দোষ নাস্তিকং । হস্তী টলতি পাদেন জিহ্বা টলতি পণ্ডিত ।

ভীমস্বাপি রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম ।।' এছাড়াও বলা হচ্ছে 'লেখনিতে যে দোষাদোষ আছে তাহা কেহ জ্ঞান করিবেন না শুর্দ্ধ'করিবেন', 'পুস্তক পড়িতে দীবে পণ্ডিতের ঠাঁই । গোরা গুণা গ্রন্থ জেন গোবরায় নাঞিঃ' ইত্যাদি । পাঠশালার নামমাত্র প্রাথমিক বিদ্যানির্ভর লিপিকরদের নকল করা পুঁথিতে যে ভুল ত্রুটি যথেষ্টই আছে এবং সে বিষয়ে তাঁরা নিজেরাও যে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন, তাঁদের অজস্র বিনম্র স্বীকারোক্তিই তার প্রমাণ । কোথাও কোথাও তাদের দীর্ঘ বিবৃতি পাঠকের কাছে বিরক্তির কারণ হোত তাতে সন্দেহ নেই ।

নিজের পরিবারের বিশদ পরিচয় দিয়ে পুঁথিলেখার লিপিসাল নির্দেশ করে লিপিকর সদাশিব দাস বিনয়ের সঙ্গেই নিবেদন করেছেন, 'শোধন করিবে লিপি দোষ থাকে জদি ।।' ২৪ পরগণার হাতীয়াঘর পরগণার খলদীয়া গ্রামের গৌরমোহন দাস বসু ১২৩৮ বঙ্গাব্দে কবিচন্দ্র রামায়ণের পুঁথি নকল করে জানান, 'কেহ পড়িবার তরে লইআ জান শুর্দ্ধ-অশুর্দ্ধ বড়বোধ করিবে না ।' অনন্তদাসের 'ভজনতত্ত্ব' (এ. ৪৯০১) সাকিম কানপুরের গদাধর মিত্রের জন্য নকল করে নিমাইচরণ দাস বলেন, 'লিখকের দোষ ন লবে লিপি দোষ থাকিলে শুদ্ধ করি পড়িবে। পাঠকে আমার নমস্কার । অক্ষর বর্ণের দোষ করিবে না । আপনি শুদ্ধ করি করিবে পঠন। লিখকের অপরাধ করিবে মার্জন ।।' নরোত্তম দাসের 'ভজননির্দেশ' ১২২৯ বঙ্গাব্দের ১২ মাঘ নকল করে সাং জলসরা গ্রামের শ্রীহিবাচাঁদ দেব লেখেন, 'বাত্তেরণে লিপি আমি বুঝিতে জে নারি । শুর্দ্ধ অশুর্দ্ধ ইহা করেন হরি ।।' কাশীরাম দাসের 'মহাভারত-জ্ঞানপর্ব' (বি. ভা. ১৩৪৩) পুঁথির লিপিকর সরকার গোহালপাড়ার সাং কলাগ্রামের অধিবাসী লিখেছেন (নাম নেই), 'অতএব মহাশয়দির্গে বলা জায় জে এহার দোশ জেন না লহ আমী অতি মুর্খু কীছুই জানা নাই আর বিষেস জানা নাই আর পাচটি জানা নাইঃ অতএব কেহ দোশ দিবে নাই ।।' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহের পুঁথিতে (ঢা. বি. ৬২৪) লিপিকরের দীর্ঘবক্তব্য নিম্নরূপ ঃ-

'লেখে হীন আজিজর রহমানে মনে ভাবি সার । হাওলা গেরামে জান কধুরখীল মাঝার ।।
আবদুল্লার পুত্র আমি সবা হস্তে হীন । হাওলা গেরাম জান উদ্দেশিয়া চিন ।।
মাতাপিতা পীর মুরসিদ জান এই চাইর । আর বহু আছে জান ওস্তাদ যে সার ।।
হীনবুদ্ধি আজিজর রহমান মোর নাম । ওস্তাদ সবার চরণে মোর সহস্র প্রণাম ।।
িতাহীন শিশু আমি নাহি মোর বুদ্ধি । শাস্ত্রহীন অজ্ঞান না বুঝি এ সিদ্ধি ।।
পুস্তক লেখিতে আমি দিলে করি এই । তালাইস করিয়া মুই না পাইলুম ছহি ।।
যেইমত দেখি আমি সেইমত লেখি । অপরাধ ক্ষেম মোর গুণিগুণে দেখি ।।
হরফের ভুচুক যদি পাও আর । গুণিগণে চাহি তবে করি দিবা সার ।।
সার না করি যদি গালি দেও মোরে । পাইবা বহুল দুঃখ গোরের ভিতরে ।।'

— ('পুঁথি পরিচয়', আহমদ শরীফ, পৃঃ ২২৭-২৮) ।

যদুনন্দন দাসের 'শুকদেবচরিত' (এ. G. ৫৬৬৯) পুঁথির শেষে লিপিকরের বিনীত ভাষণ নিম্নরূপ ঃ-

'লিখিতং শ্রীনিত্যানন্দ দত্ত, রুদ্র হইতে সোড়ষ পর্যন্ত সষ্টম কৈল লিখন । পূর্ব্বাঙ্গ লিখিলয়ে তার নাম কহি হবে । জার নাম চৈতন্যচরণ ।। এক সাকিম আছে যুন আতমাপুর নামে গ্রাম

আর সাকিম নিদ্ধারিতে নরি । যণ যণ সর্ব্বলোক না লইবে মোর দোষ, তোমা সভার চরণে নমস্করি।। মোকাম সানবাদ্য বেলা ছয় দন্ডভ্যন্তরে শনিবারে পূব্বদুঃরি ঘরে তাবিখ ৬ জ্যৈষ্ঠ- ইতি সন ১১১১ এগার শত এগার ।।' সৈয়দ সুলতানের 'ওফাৎ ই রসুল' পুঁথির (ঢা. বি. ৮৯) লিপিকর শ্রীদেবান আলি ১২০১ মঘী সনের ১ অগ্রহায়ণ শনিবার লিখেছেন, 'আছলেত জেমত আচিল সেমত দী লেখীলু । জেমত আচিল পদ সেমত লেখীলু সেমত । অসুদ্ধ পাইলে মোরে না বলীঅ বত ।' মোহাম্মদ খানের, 'দজ্জালনামা' (ঢা বি. ২২২) পুঁথির থানা 'ফটীকছরি'র মাইজভান্ডার সাকিনের 'শ্রীমাহাং সাম' এর জন্যে ১২০৩ মঘী সনে লিপি করে 'দেবান আলী লিখেছেন 'হিন্যতি খীন ওতি সঙ্গে নিদ্রিদোষ (নিদ্রাদোষ ?) । নবিন লীখন হীন জানিয় বিশেষ।। পণ্ডিতে পাইলে দোষে ঢাকিয়া রাখএ । মুরুক্ষএ পাইলে দোষ সভাতে কহএ ।।' চট্টগ্রামের পটীয়া থানার আকুপদন্ডি মৌজার শ্রীইছপ আলির জন্য 'দজ্জালনামা' (ঢা. বি. ৫৭৭) পুঁথি লিপি করে (পুঁথিটিতে ইংরেজী সাল ১৮৫০ ও মঘীসন ১২১২ উল্লিখিত) লিপিকর বলে দিয়েছেন, 'অশুদ্ধ অক্ষ্যর গালি না দিবা আমাকে ।' শ্রীচুন্নু মিএগ্র লিখেছেন (ঢা. বি. ৭০৯), 'সাঙ্গ করিলাম লেখী এই পুথিখানি । আসীর্ব্বাদ কর মোকে বিদ্যাহিন জানি । লেখীবার যুদ্ধ যুদ্ধ পাইবে জখন । যুদ্ধ করি নিজগুণ দর্শাও তখন ।' লিপিকর 'শ্রীহিন মহম্মদ ফাজীল লিখেছেন (ঢা. বি. ৪৩০)' 'ন বুঝি লেখিআছি বুদ্ধি নহি ভাবি । অসুদ্ধ লেখিলে সুদ্ধ করিঅ পঞ্চালি ।। নিরবধি ব্যাস সনে মজনু চরিত । মিচকিন ফাজীল আর খুদ্র পাপ অতুলিত ।। মোর সম পাপি নাহি সংসার ভিতরে। মনি মুক্তা ছর্দ্দা করিব পাপ (ডবে ?) ।। দযালে কবিলে দয়া সেই মোব আসা । সরিরে নাহিক মোর পুন্যেব ভবসা ।।' 'সতীময়না-লোরচন্দ্রানী' পুঁথিব লিপিকর (ঢা. বি. ২৩৫) জানাচ্ছেন 'হীন অতি ভোর মতি ঔক্ষর লিখক । হিন কলা নুরুজ্জমা ভাবক ।। সেই মতে সৈত্যা সৈত্য অপছয় লাব ।।' সৈয়দ সুলতানেব 'সবে মে'রাজ' পুঁথির (ঢা. বি. ২৯৭) লিপিকরের বিনয়ের অন্ত নেই। পুষ্পিকাটি নিম্নরূপ ঃ-

'ইতি সবে মেহেরাজ পুস্তক সমাপ্ত । ভিমস্যাপি মতিভ্রম মোনিনাপি মতিভ্রম জথা দ্রিষ্টি তথা লিখীতং....শ্রী নানোবর পুত্র জান মাহাম্মদ ছগীর তাহান ঐরসে জন্ম হইলুম অস্তির । মোঞি হিন অল্প বোদ্ধি সেবক জানিআ । শ্রীতোনা আলি বালকে লিখি পুস্তক করিআ । মোঢমতি অল্পবুদ্ধি সেবক জানআ ।। মোহাজনে দোস ঢাকি গোন (গুণ) প্রচারিআ । অসুদ্ধ হইলে পদ গালি নহি দিবা । হিন তোনা আলির দোস সকলে খেমিবা ।। গোরজন (গুরু) সবেরে প্রণামি বারে বার । গালি না দিবারে মাগি জুরি দুই কর ।। সাক সুল সত ১৬৮২ মঘি ১১২২ মঘি তারিখ ৫ আশ্বিন রোজ সুক্রবার শ্রী এই পুস্তকের মালি তোনা আলি ।।"

কালিদাস দত্ত সংগৃহীত ও বিশ্বভারতী সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত (নং ১৩১৪) ত্রিলোচন দাসের 'শরীর নির্ণয়' পুঁথির পুষ্পিকায় (লিপিসাল ১২৭০ বঙ্গাব্দ) লিপিকর বড় বেদনাবহ সংবাদটি দিয়ে লিখছেন ঃ 'জতংদীষ্ট ততং লিখিতং সা অক্ষর শ্রীঅভিরাম হালদাব সাং চাণ্ডীবাড়ীর এই পুস্তক আমী লিখিলাম আমার শ্বশুর মহাশয়েরদীগার ঘরের ভিতরে বসিয়া লিখিলাম কেননা আমার একটি পুত্রসন্তান মরিয়াছিলেন তাথে করিই বড়ই মনস্তাপ হইয়াছিলেন তা অথেব আমার সাশুড়ি মাতাঠাকুরাণী আমারদীগের আনিয়াছিলেন তাথিই করে কহিলে জে নিতান্ত বসিয়া থাক একখান

পুস্তক লিখ । বসে বসে ।।'

'মোহাম্মদ হানিফার লড়াই' পুঁথির লিপিকর 'ছদর আলী' (ঢা.বি. ৬৮৬) লিখেছেন 'হীন ছদর আলী কহে শুন গুনিগণ । মিছা এক বাক্য আমি লেখিলাম এখন ।। আছল আছিল দুই শুন মহাজন । এক আছল হেরিয়া মুই করিলাম লেখন ।। অর্দ্ধেক আছিল পুস্তক আর অর্দ্ধ নাই । অর্দ্ধেক লেখিয়া দেখি পুস্তক পুরা নাই ।। আর এক আছল দেখি করিলাম লেখন । এক পুস্তক দুই আছল হৈল তে কারণ ।। গুনিগণ সঙ্গে মুই মাগম পরিহার । মুই এতিমেরে প্রভু করিতে উদ্ধার।।' তিনি বিনয়ের সঙ্গেই লিখেছেন, 'হীন ছদর আলী লেখি/অশুদ্ধ আছিল দেখি/গুণিগণে না বলিবা বদ । মোহম্মদ কামিল জান /আরতি পাইয়া তান/ লেখি আছি হরসিত মন ।।' ('পুঁথি পরিচিতি', পৃঃ ৪১৩) । মহাভারত 'বিরাটপর্ব' (বি. ভা. ৪৮২১১) পুঁথির শেষাংশে 'সাকিম ভুতড়া পরগণে খটঙ্গা থানা সিহুড়ি মতালকে জেলা বিরভোম' এর লিপিকর গোরাচাঁদ মিত্র 'সাকিন ডামরা পরগণে মল্লারপুর আওঁটপুষ্ট গনপুর মতালকে জেলা বিরভোম'এর 'শ্রীমধুশোদন মণ্ডল'এর জন্যে পুঁথিটি লিখে বিনয়ের সঙ্গে জানিয়েছেন -

> 'বিজ্ঞ মহাশয় জত পড়িবেন ষুদ্ধমত অষুদ্ধ হইলে শুদ্ধ করিবেন ।
> মোর এই নিবেদন শুন শুন সর্বজন অজ্ঞান বলিয়ে ক্ষেমিবেন ।।
> আমি অতি মুড়মতি কি জানি শুতি মিনতি জ্ঞান অনুসারে কৈল এত ।
> যুবুদ্ধি ষুধির জন মোর প্রিতি দয়াবান হইবেন বলা মাত্র এত ।।'

এই ধরণের বিচিত্র বিনয়ের উপস্থাপনা বাংলা পুঁথিতে ঃ

'পিতৃ আজ্ঞায় গ্রন্থ লিখিলাম আমি । ছন্দভঙ্গে দোষ আমার না নিয় ভ্রমু যুনে ।।'

-কৃত্তিবাস রামায়ণ, বি. ভা. ২২২১ ।

'সুর্দ্ধ অষুর্দ্ধের দোষ না লবে আমার । সর্ব্বরসিকের পদে করি পরিহার ।। অধমের দোষ জত উর্ত্তমে না লয় । নিবেদন এই মোর সুন সব ভক্ত মহাসয় ।। এক এক ভক্ত প্রভুর এক অবতার। আমি হিন কি জানিব মহিমা সভার ।। পদরেনু দেহ মোরে সর্ব্ব ভক্তগণ । দিন হিন কৈলাস চন্দ্রের এই নিবেদন ।।'

— (প্রেমতত্ত্বসার - নরোত্তম দাস, বি. ভা ৬২২৯) ।

'জিনি পড়িবেন তেহোঁ ভুল ধরিবেন না । জদি বল কীতদর্থে । মিস্যাপি....।।' (কাশীরামের মহাভারত আদিপর্ব, সা. প. ৬১৪) ।'এই পর্ব্ব জেকেহ পাঠ করিবেন ভুলভ্রান্ত দোষ লইবেন না কারণ আরষ গলচি এবং সিক্ষ্যানবিসের লেখা বটে ইহা জানিয়া ষুধরে পড়িবেন ।।' (মহাভারত-কাশীরাম, বি. ভা. ৩৫৫৩) ; 'এহাতে কোন ২ মহাজেনে লোক কেহ কখন দীষ্টী করেন তবে জশ্যাপীস্বাৎ সোদ্ধসোদ্ধ মজ্জেদা করিবেন নাই আমী২ ২াসব দীগের দায মাত্র দায ।' (গুরুদক্ষিণা-কাবভূষণ; বি. ভা. ৫৫৮০); 'আমি অতি মূর্খু মতি কি জানি লিখিতে । কৃপা করি দোশ গুণ না কহিবে সভার অর্গেতে ।। এই গেনর্থ লিখিতে আনিলাম রায়ের্দর ঘরে । আপনার জর্মের (?) আমি লিখিলাম সত্তরে ।। নাম মোর সিব দাশ বশতি না খরিয়া গ্রামেতে । আপনার পরিচয় দিলাম সভাথর্গেতে । আমি জে বই লিখিলাম কেহ না লইবে দোস। এই জেন লিখিলাম আমি অনেক পাইয়া খ্যাস ।'- প্রার্থনা-নরোত্তম দাশ, বি. ভা. ৪৮৫৬ ।

পুঁথি লেখার পারিশ্রমিক / দক্ষিণা

পুঁথির লিপিকররা পারিশ্রমিক বাবদ যা পেতেন তাতে তাঁরা কোন দিক থেকেই খুশী ছিলেন বলে মনে হয় না। কেউ কেউ এ ব্যাপারে ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে অতিরিক্ত 'কাগুজে বিনয়' প্রকাশ করলেও সুখের মুখ দেখার মতো জীবিকা ছিল না এটি। নিজেদের দুঃখ-হতাশার কথা তাঁরা পুঁথিতেই লিখে রেখে গেছেন। মুড়াগাছার শ্রীরামহরি ঘোষ শিবায়ন-মহাভারতের মত বৃহদায়তন পুঁথি নকল করেন, পুঁথি মালিকের অনেক প্রশংসাও করেন। কিন্তু তবু বলতে ছাড়লেন না, 'সর্বসুখে নৈরাশ এই মোর ললাট লিখন।' ১২৩৫ বঙ্গাব্দে 'গুরুদক্ষিণা' নকল করে (বি. ভা.) কাচামনি গ্রামের গৌরহরি পরামাণিক জানান, 'এক খুকার ধান্য দিয়াছিল আমী সন্তুষ্ট আছি।' সত্যি কি তাই?

তাৎকালিক সরকার মান্দারণের চেতুয়া পরগণার রামকৃষ্ণপুর সাকিমের নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী ১২৯০ বঙ্গাব্দের ২ অগ্রহায়ণ কবিবল্লভের 'দক্ষিণ রায়ের পালা' নকল করে পুঁথির শেষে লিখেছেন, (মৎসংগৃহীত) "বিরাটপর্ব্ব জে লিখিয়া দিয়াছিলাম তাহার দাম ।।০ আট আনা পাঠাইয়া দিবেন এই জে পুস্তক লিখিয়া দিয়াছি এহার দাম তিন আনা পাঠাইয়া দিবেন শ্রীচরণে নিবেদন কোরিলাম কি জানাইব।" বোঝা গেল বিরাটপর্বের অতবড় পুঁথি লেখার মজুরি ছিল মাত্র আট আনা। আজ থেকে একশো বছর আগেও পারিশ্রমিকটিকে বড় কম বলেই মনে হয়। এছাড়াও বিভিন্ন উৎস থেকে জানা যাচ্ছে, উমাকান্ত চৌধুরী লিখিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড দুটাকা, দর্পনারায়ণ দাস লিখিত রামায়ণের চারটি কাণ্ড সাত টাকা, মানিকরাম বিশ্বাস ও রামলোচন ভট্টাচার্য লিখিত বিরাটপর্ব একটাকা, জগন্নাথ মিত্রের 'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ' দু আনা পাঁচ পাই, নিমু কলুর 'ইছাইয়ের পালা' দু আনা, গরিবদাস মণ্ডলের 'দাতাকর্ণ' সাড়ে পাঁচপণ কড়ি, গৌরহরি পরামাণিকের 'মদনগুড়িয়া পালা' দশসের ধান, আত্মারাম ঘোষের লেখা 'কালিকামঙ্গল' একজোড়া কাপড় ও দুটি নগদ টাকার বিনিময়ে হস্তান্তরিত হয়েছে। এইসব ঘটনাই ঘটেছে ১১১০ থেকে ১২৭৪ বঙ্গাব্দের মধ্যে। রামেশ্বরের শিবায়ন মৎস্যধরা পালার পুষ্পিকায় মেদিনীপুর জেলার চেতুয়া পরগণার রামকৃষ্ণপুর গ্রামের লিপিকর শ্রীমনমোহন পণ্ডিতের স্পষ্ট ঘোষণা, 'দক্ষিণা দুই টাকা ২ টাকা একজড়া কাপড় গামছা ১।' কোন কোন ক্ষেত্রে নিজের প্রভাব প্রতিপত্তিতে কৌশলে ভাল দক্ষিণা আদায় করেছেন লিপিকর।

পুঁথি নকলের পারিশ্রমিক, দেখা যাচ্ছে, টাকা ছাড়াও ধান, কাপড়, গামছা দিয়েও শোধ করা হয়েছে। আবার ১৮ পর্ব মহাভারত লিখে লিপিকর লিখেছেন, "অষ্টাদশ ভারত পুস্তক শ্রীগোবিন্দবাম রায়ের একোয়ান পত্র অঙ্ক সাত শত উনানব্বই পাতে সমাপ্ত হইয়াছে। সাক্ষরমিদং শ্রীঅনন্ত রাম শর্ম্মা। এহার দক্ষিণা জন্মাবধি সমানাতক্রমে অন্নসূত্রে রায়পাল্য হইয়া সশ্রদ্ধ পুস্তক লিখিয়া দিলাম নগদে দক্ষিণা পাইলাম তারপরে রোজকারহ বৎসর ব্যাপিয়া পাইবার আজ্ঞা হইল সন ১১২৪ সাল।" পঞ্চানন আস দাসের মত লিপিকর পরের জন্মেও পুঁথির লিপিকর হওয়ার বাঞ্ছা পুঁথিতেই প্রকাশ করেছেন। বিনামূল্যেও পুঁথি লিখে দেওয়া হয়েছে। যেমন কবি বল্লভের 'চন্দ্রকেতু পালা' ১২৮৫ বঙ্গাব্দে লিখে দিয়ে লিপিকর শেষে লিখেছেন "এ পুস্তক শ্রীনবীনচন্দ্র মিস্তরী সাং সাগরপুর পরগণে চেতুয়া জেলা মেদিনীপুর তরফে থানা দাশপুর

দিশ্টকোট মোং ঘাটাল মেজেষ্টেরী ও শ্বব রেজেষ্টরী ।। সঅক্ষর শ্রীমধুসূদন মিস্ত্রী শ্বয়ং বাটীতে লিখিয়া দেওয়া জায় এহার মম্ব্য নাঞ্জী অমম্ব্য ইতী ।।"

১২৩৯ বঙ্গাব্দের ২০ বৈশাখ সীতারাম বারিকের জন্যে সেবকবাম সরকার কবিচন্দ্রের 'কপিলা মঙ্গল' পুঁথি (বি. ভা. ১৪২৪) নকল করে লিখেছেন, 'এ পুস্তকেব দাম দুই আনা ইতি'। ১২৪৪ বঙ্গাব্দের ১৭ অগ্রহায়ণ 'সাকিম ঘোসপুরের' 'পতিতপাবন দেবসর্ম্মা'হাল সাং কয়াপাটের মদনমোহন পড়্যার জন্যে মাহেন্দ্র রচিত 'দণ্ডীপর্ব্ব' লিপি করে (বি. ভা. ৮৪৭) মূল্য নির্ধারণ করেন 'এহার দক্ষিণা ।।০ ।' কলিকাতা সূতানুটি চড়কডাঙ্গার আত্মারাম ঘোষ কায়স্থ কৃষ্ণরামের 'কালিকামঙ্গল' (এ. ৩৯২৮) অনুলিপি করে ১১৫৯ বঙ্গাব্দে দক্ষিণা পেয়েছেন '১ জোড় কাপড় আর ২ তঙ্কা আড়কাট ।' ১২৭৪ বঙ্গাব্দে নটবর পাল 'গুপিনাথ দের' কাছ থেকে 'গোপিকার বস্ত্রহরণ' পুঁথি (সা. প. ৪৫৫) '২ দুই আনায় খোরদি' করেন । ১২৫৬ বঙ্গাব্দের ৯ই ফাল্গুন শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র, মণ্ডলঘাট পরগণার ('তরপ বইনান') সুলতানপুর গ্রামের প্রাণকিষ্ট হালদারের জন্যে কবিচন্দ্রের 'ভৈম একাদশীর পালা' লিখে মন্তব্য করেছেন ঃ 'এই পুস্তক তোমায় লিখিয়া দিলাম । এহার জন্যের তরে তোমায় লিখিয়া জাতেছি জে আমায় একখ্যান গামচা আমায় দিবে আমি গা পুছিব অতেব জানাতেছি লিখিয়া ইতি ।' জাহানাবাদ পরগণার সাকিম গোবিন্দপুরের রাজচন্দ্রঘোষ কাশীরামের মহাভারত 'উদ্যোগপর্ব' (ক. বি. ৩২৮৩) লেখক কৃষ্ণপ্রসাদ দাসের নিকট থেকে এক টাকায় কেনেন । বিরাটপর্বের একটি পুঁথি (ক. বি. ৩৭৬৭) দেড়টাকায় বিক্রি হয়েছে । অপর একটি পুঁথি (ক. বি. ১৯২৩, যৌথভাবে মানিক বিশ্বাস ও রামলোচন ভট্টাচার্য ১১১০ বঙ্গাব্দে অনুলিপি কবে ১ টাকা দক্ষিণা পান । এছাড়াও, আলাউলের 'সপ্তপয়কর' (ঢা.বি. ২১৪) 'সারে তিন রূপাইআ সীক্কামাত্র', সৈয়দ মর্ত্তুজার 'যোগ উপাখ্যান' আটআনা (বি. ভা. ৮৪৭), কবিভূষণের 'গুরুদক্ষিণা'র 'দক্ষিণা বস্ত্রদান দিতে হয়' (বি. ভা. ১৮৭৯) ইত্যাদি তথ্য প্রাসঙ্গিক ভাবে উল্লেখযোগ্য ।

১২৭৪ বঙ্গাব্দে লেখা পুঁথি 'গোপিকার বস্ত্রহরণ' নটবর পাল দু'আনায় কিনে নেন । ১২৩৬ বঙ্গাব্দে রামায়ণের চারটি কাণ্ড গুরুচরণ দাসের জন্যে নকল করে লিপিকর দর্পনারায়ণ দাসমজুমদার লিখেছেন -

'সেই মত আনন্দেতে রাখ গুরুচরণ দাসে । কোন প্রকারে পুস্তক লইয়া আমার পাশে।।
দাসবাবু আমারে দিলেন সাতটাকা । সেইমত দাসের পাপ খণ্ডাহ প্রভু একা ।।
পুস্তক লেখাইয়া আমার কৈলেন উপগার । অনেক জঞ্জালে ত্রাণ করিলেন বাবু কর্মকাব ।।
কর্মকারবাবুরে রাম তুমি কর দয়া । পুস্তক সাঙ্গতে বাবু দিবেন বস্ত্র যোয়া ।।
আমাকে গামছা দিবেন বহুবাদ ঘুবি । অতএব রাম দয়া কর সগোষ্ঠি পরিবারে আসি ।।'

এছাড়া 'কুলার্ণবতন্ত্র' দেড় টাকা, 'পরাশর সংহিতা' এক টাকা, ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গল' এক টাকায় লেখা হয়েছে । আবার 'চণ্ডীমঙ্গলের' মত বড় পুঁথি লিখে রামমোহন চক্রবর্তী 'চারি সিক্কা' পেয়েছিলেন। 'মুগ্ধবোধ' তিন টাকা ও 'অমরকোষ' তিনটাকায় বিক্রি হয়েছে । দুহাজার শ্লোকের 'কাব্যাদর্শ' পুঁথি এক টাকা চার আনায় পাওয়া গেলেও 'রসমঞ্জরী'পাওয়া গেছে আট আনায় । ওপার বাংলার 'হাজার মছল্লা' ছ' আনা, সত্যপীর পুঁথি আড়াই আনা হলেও কোন

কোন মুসলীম পুঁথি তিন-চার টাকাতেও বিক্রি হয়েছে। কাশীরাম দাসের 'গদাপর্ব' পুঁথি লেখার পারিশ্রমিক হিসেবে লিপিকর লিখেছেন 'এই পুঁথি লিখিতে ধান্য লইয়াছি (ব. বি. ১৩৬।' মহাভারত উদ্যোগপর্ব লিখে জাহানাবাদ পরগণার সাকিম গোবিন্দপুরের শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ দাস ১ টাকা দক্ষিণা পেয়েছেন (ক. বি. ৩২৮৩)। খান্দার পরগণার সাকিম মানপাড়বাটীর লিপিকর পিতাপুত্র পঞ্চানন ও তারাপ্রসাদ জানা (ক. বি. ৩৭৬৭) দেড় টাকা নিয়েছেন বিরাটপর্ব লিখে। মহাভারত বিরাটপর্ব (ক. বি. ১৯২৩) দুজন লিপিকর লিখে ১ টাকা দক্ষিণা পেয়েছেন ১১১০ বঙ্গাব্দে।

পুঁথির কপিরাইট/কটুদিব্য প্রয়োগ

রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গ এর গ্রন্থাগার থেকে, ১৬৮৭ খ্রীঃ প্রকাশিত নিউটনের 'প্রিন্সিপিয়া ম্যাথেমেটিকা' বই এর কপি ২০০২ এর নভেম্বরে চুরি গেছে। অক্সফোর্ডের বোদলিয়ান লাইব্রেরীতে দুষ্প্রাপ্য পুঁথি তাকের সঙ্গে শিকল দিয়ে বেঁধে তালাবন্ধ করা থাকে। তবুও পুঁথি চুরি যায়। প্রবাদ আছে, 'লেখনী, পুস্তিকা, জায়া পরহস্তংগতা গতা। যদি সা পুনরায়তি ভ্রষ্টা নষ্টা চ মর্দিতা।।' সুতরাং পুঁথিকে রক্ষা করতেই হবে। তবে, একালে মুদ্রিত গ্রন্থের কপিরাইট রাখার বেশ শক্তপোক্ত আইন আছে, যদিও জনপ্রিয় বই বিশ্বের নানাস্থানে বিভিন্ন সময়ে জাল করে বিক্রির খবর মাঝে মাঝেই শোনা যায়। পুঁথির ক্ষেত্রে সেই ধরণের কোন আইন না থাকলেও পুঁথির শেষাংশে লিপিকর এমন সব হুঁশিয়ারী ও দিব্য দিয়েছেন, যাঁর মাধ্যমে মানুষের নীতিবোধ বা ধর্মবোধকেই নাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রাচীন লিপিনির্মাণের ধারাকে অনুসরণ করেই এটি ঘটেছে বলে মনে হয়। বিভিন্ন প্রাচীন শিলালিপি ও তাম্রশাসনের শেষাংশে খোদিত থাকে, সেকালের বিখ্যাত এমন শ্লোক, যা থেকে বোঝা যায়, অনুশাসনের নির্দেশ অমান্যকারী ব্যক্তির উদ্দেশ্যে তা নিতান্তই হুঁশিয়ারী বা অভিশাপ (The idea of imprecation is to hinder the wrong doing by the 'Successors'. Text Book of Indian Epigraphy. K. S Murty, 1992, P. 8.)। যেমন-

'স্বদত্তাং পরদত্তাম্বা যো হরেৎ বসুন্ধরাং।
স বিষ্ঠায়াং ক্রিমির্ভূত্বা পিত্রিভিঃ সহ পচ্যতে।।'

অর্থাৎ, 'স্বদত্ত বা পরদত্ত ভূমি যে প্রত্যাহরণ করে (বা বিনষ্ট করে)', পূর্বপুরুষগণসহ সে পশুবিষ্ঠার ক্রিমিকীটরূপে বিনষ্ট হয়। কোন কোন লিপিতে দেখা যায় -

'বিন্ধ্যাটবীম্বণন্তস্তু শুষ্ক-কোটর-বাসিনঃ।
কৃষ্ণাহিনো হিজায়ন্তে দেব দায়ং হরন্তি যে।।'

অর্থাৎ, 'ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দান যে বিনষ্ট করে বা হরণ করে, সে সর্পরূপ ধারণ করে, জলশূন্য বিন্ধ্যারণ্যের শুষ্ক বৃক্ষকোটরে বাস করে।'

খ্রীষ্টীয় ৫ম/৬ষ্ঠ শতাব্দীতে খোদিত হরিরাজের বারাণসী তাম্রশাসনের ৩য় ফলকের শেষাংশে প্রচলিত শ্লোক ছাড়াও (পূর্বোক্ত 'স্বদত্তাং পরদত্তাম্বা.....।' এটি বহু অনুশাসনে দেখা যায়।), একটি নূতন শ্লোক দেখা যায় -

'গবাঙশতসহস্রস্য হন্তু প্রাপ্নোতি কিল্বিষং।। ইতি (।।)

[গোঘ্নঃ পিতৃঘ্নো] ব্রহ্ম-হা (স্তেয়ী) সুরাপো গুরু (তল্প) গঃ (।)
এতা নু (উ)দ্ধবিষ্যতি ৭।'

অর্থাৎ, -ভূমি প্রত্যাহরণকারী ব্যক্তির লক্ষ গোহত্যাকারীর পাপ হয়। গোহত্যাকারী, পিতৃঘাতী, ব্রহ্মহন্তা, চোর, সুরাপায়ী এবং গুরুদারগামীর যে পাপ হয়, সেরূপ ভূমি প্রত্যাহরণকারী ব্যক্তিরও হয়ে থাকে। 'ষষ্ঠীরবর্ষ সহস্রাণি বিষ্ঠায়াং জায়তে ক্রিমি'-এমন হুঁশিয়ারী প্রায়শই দেখা যায়।

পুঁথি নিয়ে গিয়ে ফেরৎ না দেওয়া বা অপহরণ করার মত হুঁশিয়ারী মন্দিরলিপিতেও, কিছুটা ভিন্ন উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে করা হয়েছে। বীরভূম জেলার রাজনগর থানার কবিলাশপুর গ্রামের বিগ্রহশূন্য পাথরের শিখর দেউলের প্রবেশপথের ওপরে দুটি প্রস্তরলিপি আছে।[৮] একটি লিপি থেকে জানা যায়, রূপদাস নামে জনৈক করণ (কায়স্থ বিশেষ) এই মন্দির নির্মাণ করেন। এই মন্দির মানুষের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবে, ভগবৎ পদলাভের অভীষ্ট সিদ্ধিলাভ হবে। অন্য একটি লিপি রীতিমত কৌতূহলোদ্দীপক-

"শুভমস্তু শকাব্দঃ ১৫৬৫ ।। পূর্বয়া যস্য নিবাসভূর্মির তুলাসা
মাসনা বিশ্রুতা যস্য খ্যাতরতীর দানজনিতা যস্যাভিভূপা
দরঃ। যস্যদ্বারিচ দান-মানমহিতাঃ সন্তঃ শুভাশংসিনঃ কীর্ত্তিঃ
শ্রীযুতরূপদাস সুধিয় স্তস্যাস্ত কল্পাবধি ।। এনাংকীর্ত্তিমপা
করোতি যদি কোপ্যঙ্গ (জ্ঞা)নতা লো (সং) বৃতোবর্ন্নস্ত স্যয়া নিবারণায় শপ
নং গোভ (স)ক (ক্ষ)নং বর্ততাম। ধর্ম্মাস্ত স যবনোভবেদান যুগং ভূপৌ
পি সম্ভাব্যতে তত্রায়ং বিনা পাপহাংশ্চ সপনঞ্চা অষ্টাং বরাহা শনম ।।
মেহতরি শ্রীহরিদাস ।। ৎ ।।"

আলোচ্য লিপিটিতে মন্দির প্রতিষ্ঠাতা রূপদাসের দানধ্যানের নানা প্রশংসা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, সামাসনা থেকে আগত এই ব্যক্তি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন এবং দেশের শাসনকর্তার নিকট সমাদৃত হন। তাঁর দ্বারে যে সব পুণ্যার্থী সমবেত হতেন এবং তাঁর শুভকামনা করতেন, তিনি তাঁদের নানা উপঢৌকন প্রদান করতেন। আরো বলা হয়েছে, কোন অবর্ণভুক্ত ব্যক্তি এই মন্দিরের ক্ষতিসাধন করলে তিনি গোমাংস ভক্ষণের পাপে বিনষ্ট হবেন। জনৈক ধার্মিক যবন (মুসলমান) যিনি এই অঞ্চলে শ্রদ্ধা লাভ করে থাকেন, তিনি ভবিষ্যতে এই অঞ্চলের শাসনকর্তা হবেন। মন্দির ধ্বংসকারী ব্যক্তিরা শূকরমাংস আহারজনিত পাপে জড়িত হবেন। অর্থাৎ, এই সাবধানবাণী যে হিন্দু ও মুসলমান উভয়শ্রেণীর মানুষের উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে, তা বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না।

পুঁথির পুষ্পিকায় যে 'দিব্য'গুলি লিখে দেওয়া হয়েছে সেগুলি যেমন কোন কোন ক্ষেত্রে অশ্লীল, তেমনি কৌতূহলোদ্দীপক আর বিচিত্র। যেমন ১২৩১ বঙ্গাব্দে লিপিকৃত 'দক্ষিণরায়ের পালা'র লিপিকর লিখেছেন, 'এ পুস্তক যে চুরি করিবেক কিম্বা মাগিয়া লয়্যা জায় যদ্যপি নাই দেই তাহাকে গো হর্ত্তা ব্রহ্মহর্ত্তার পাপ লাগে এবং মাত্রিহরণ করে এই মত তাম্বাক।' সাকিম কয়াপাটের শ্রীরাধামোহন স ও তৎপুত্র ১২৪২ সনে 'রামায়ণ' আদিকাণ্ড নকল করে শেষে লিখেন "জদ্যপি লিখিল পুঁথি চুরি করে জে। মহাপাপে ভুক্তমান করে তবে সে। পরকালে,

রৌরব নরকে হয় স্থিতি। জেইজন হরিবেক আদিকাণ্ড পুঁথি।" একটি কবিরাজী পুঁথির পাতায় লেখা হয়েছে 'জতনে লিখিলাম পুঁথি চুরি করে জে সুকর তাহার পিতা গাধা হঅ সে।' এমনও বলা হয়েছে এই 'পুস্তক যে ছাপিবেন সে ব্যক্তি হিন্দু হইয়া মুছলমান হইবেক....আর সুরা পান করিবেক।' দ্বিজ রামপ্রসাদের সত্যপীর পাঁচালীর পুঁথির লিপিকর ১১৯৫ সালে লিখেছেন, 'যে চুরি করিবেক সে সাষুড়্যা হইবেক'। ১২৩৯ সনে বলহাটি গ্রামের লিপিকর শ্রীপরাণ সরকার বলে দিয়েছেন, 'বাড়ি বসেই জে পড়িবেন সে সাসুড়্যা হইবেক।' কৃত্তিবাসের রামায়ণ সুন্দরকাণ্ড ১২৭০ সনে নকল করে পরগণা বগড়ির পাথরবেড়িয়া সাকিমের শ্রীনাথচন্দ্র গোস্বামী লিখেছেন, 'যতনে লেখিলাম পুঁথি চুরি করে যে শোকর তাহার পিতা গাধা হয় সে।' কাশীদাসী মহাভারতের লিপিকর চাকলে মেদিনীপুরের কুতুবপুর পরগণার ভবানীপুর সাকিমের শ্রীগোপাল রায় লিখেছেন, 'এ পুস্তক যে চুরি করিবেক তাহাকে ব্রহ্মবধ পাতকের দোষ হইবেক।' সভাপর্বের লিপিকর মেদিনীপুরের সাকিম কলাগ্রামের শ্রীমৃত্যুঞ্জয় দেবশর্ম্মা ১২৩৫ সনের ৭ চৈত্র রবিবারে লেখেন, 'এ পুস্তক জে চুরি করে তাহার মা এর উপর তিন সর্ত্ত গর্দ্ধব চড়ে এবং যেখানে যে পায় সেখানে সে করে এবং সে মাত্রিরি হরণ করে।' অধম বালক রচিত সত্যপীর পালার একটি পুঁথিতে দিব্যদানের পদ্ধতিটি বেশ নরম সুরের, 'এ পোস্তক ভিখু মল্লিক আর কেহ দাওা করে সে দাওা বাতিল।' দিননাথ রায়েব 'বাহির বাটির' পূর্বদুয়ারি ঘরের 'পিরায়' বসে পুঁথি লিখে লিপিকর লিখলেন, 'এই পুস্তক জে ব্যক্তি চুরি করিবে সে সাসুরে হইবেক আর পুত্রবধুকে হরন করিবেক।' পরশুরামের 'মাধবসঙ্গীত' ১১৯৩ সনের ১৬ ভাদ্র বীরভূমের রাধারমণ ঘোষ ও রাধাকৃষ্ণ ঘোষ লিখে দিব্য দিলেন, 'যশ্চোরয়তি পুস্তকঃ শূকরঃ তস্য মাতা চ পিতা চ ভব গর্দ্দভঃ।' পুঁথি চোরের মাতাপিতা যথাক্রমে গাধা ও শূকর হবেন জন্মে জন্মে, এমন দিব্য কবীন্দ্রপরমেশ্বরের 'মহাভারত' লেখক রামশরণ পাল দিয়েছেন। 'আশ্রয়নির্ণয়' পুঁথির লিপিকর মৃদুভাবে লিখেছেন, 'এই গ্রন্থ জে জানিবার স্বরূপ চুরি করিআ রাখিবেক সেই মহাপাতকের পাতকী......।' পুঁথি 'নিজশিষ্য' ছাড়া অন্যকে দেওয়া চলবে না। তাকে 'প্রাণের সমান' করে রক্ষা করতে বলা হয়েছে (নরোত্তম দাসেব 'নবধারাতত্ত্ব নিরূপণ'; এ. ৪৮৭৮)। 'এ পুস্তক অনেক মিহনতে লিখিলাম জে ইহা চুরি করিবেক তাহার সত্যনাষ হইবেক'-লিখেছেন মহাভারত পুঁথি লেখক (এ. ৫৮১)। 'পুস্তক জে চুরি করিবেক সে সুদর্ষন চক্রে পড়িবেক' (এ. ৬১৩)-এটিকে অভিশাপ না বলে আশীর্বাদই বলা ভাল। পুঁথি ফেরৎ না দিলে 'সে বেক্তি শ্রীরামদ্রোহী হঅ এবং মহাপাতকের ভাগী হইবেক' (ক. বি. ৩২৪৬)। 'এই পুস্তক যে চুরি করিবেক এবং করাইবেক সে আপনার ভগ্নীকে হরণ কবিবেক'-এই ভয়ঙ্কর উক্তি দুর্গাপ্রসাদের 'গঙ্গামঙ্গল' (বি. ভা. ২৪০৪) পুঁথি লেখক ক্ষুদিরাম মজুমদারের (১২৩৮ ব.)। দ্বিজ কবিচন্দ্রের 'অক্রূরাগমন' পুঁথির লেখক (এ. ৪২২) রাইচরণ নিয়োগী লিখেছেন, 'এ পুস্তক শ্রীগোপাল গোরাএী শর্ব্বসাং বেল্যাতোড় শমাপ্ত হইল চারি দণ্ড বেলার যোক্তে এ পুস্তক জে চুরি করিবেক শে আপনার ঘরের মেয়া শম্পকর্কে জত থাকীবেক শে বেটা গোপাল গোরাএীকে দিবেক।' 'জে এই পুথি চুরি করিবে সে বোবা হইবে'-এমন হুশিয়ারী লেখা আছে রামায়ণ পুঁথিতে (ক. বি. ৩০)। ১২৬২ বঙ্গাব্দে লেখা কাশীরামের 'অশ্বমেধপর্ব' পুঁথিতে (ক. বি. ১৩৫১) লিপিকর শ্রীনাথ চন্দের মন্তব্য 'এই পুস্তক

জে চুরি করিবেক আর জে চুরি কোরে না দিবেক শে মাতৃ হরণ করিবেক আর পুথী পড়িতে আর জে লিখীতে নিএ জে দিবেক নাই সে গুরু পত্নী করিবেক ইহাতে ভেদ নাই ।' একটি কৌতুককর মন্তব্য দ্বিজ নিধিরামের 'গঙ্গাবন্দনা' পুঁথির (বি. ভা. ৩৮৬) লেখক সমরশাহী পরগণার সাকিম গোপালপুরের 'সুধারাম শর্ম্মার'- 'চুরি করি জিনি নিবেন তাহার এই বেবথা......তিনি মসাএর স্থানে যেত খাবে-আর আমিহ্ কান মলিএ দিব আর এবং তাহার মাতা ধরে কিল হাড়িতে মারিবে এবং ইতি ।' অশ্লীল মন্তব্যের একটি 'এই পুস্তক জেনি চুরি করিবেক তেনি মা এর মারিবেক' (বি. ভা. ৪৭৭৮) । অন্যটিঃ 'এ গ্রন্থ যে চুরি করিবেক শে আপনার সাশুড়িকে লইবেক' (বি. ভা. ৪৮৫৯) । নিজের শাশুড়ীর সঙ্গে সহবাস করে, অপরাধ করে মহাভারত 'অশ্বমেধপর্ব' পুঁথির (ক. বি. ১৫২১) লিপিকর স্বলিখিত পুঁথিতে তা স্বীকার করেছেন এইভাবে -'ইহা জ্ঞাতো করিলাম য়ামি সাসুড়্যা হই মাহে পৌষ ।' কিন্তু পুঁথিতে হুঁশিয়ারী দিয়েছেন 'এ পুথি যে হরিবেক সে সাসুড়্যা হইবেক ।' এ বড় বিচিত্র কৌশল ।

কৃষ্ণদাসের 'চৈতন্যচরিতামৃত' পুঁথির একটি অনুলিপি (বি. ভা. ২৮৪১) পুষ্পিকায় বিচিত্র বিবরণঃ 'ইতি সক ১৭২০ সতর সর্ত্ত কুড়ি সন ১২০৫ সাল তারিখ ১৬ আঘন রোজ শুক্রবার ভাগবস্তু মিদং পঠনাথে শ্রীসিবরাম দাষ কয়াল ।। শাকিম কুলটীকরী ।। পরগণে মণ্ডলঘাট ইহার নিয়ম ।। অশ্বান্ত হবেক নাই নির্ব্বিঘ্ন স্থানে রাখিবে ।। গ্রন্থ পাটের স্থানে তবাক (তামাক) খাবা নাস্তী অন্য কথা নাস্তী দীর্ব্বাসনে বারাম দীবে গ্রন্থ পাট করিতে ২ পায় হাথ না দীবে পায়ে কাপড় ঢাকা দীয়া বসিবে সাধুসঙ্গ করিয়া বুঝিবে অন্য হৈতে নয় বিনা সাধুসঙ্গে গোচর নহে । এসব নিয়ম না করিলে উচ্ছন্ন তব ভাল হবেক নাই ইহা সত্য সত্য সত্য ।'

পুঁথির পুষ্পিকায় দেওয়া 'পুঁথি অপহরণ সংক্রান্ত' দিব্য বা হুশিয়ারিগুলি দেখে, আমাদের কিশোরবয়সে পাঠশালায় পাঠকালে একটি বাংলা ছড়ার বহুল ব্যবহারের কথা মনে পড়ে - 'আমার এই বই যে করিবে হরণ । পণ্ডিতের হাতে তার অবশ্য মরণ ।। যদি বল কার বই । নীচে দেখ নাম সই ।' পুঁথি হরণের প্রাসঙ্গিক দিব্যদানের আধুনিক এবং শেষতম সংস্করণ ছিল বোধ হয় এটি ।

মহাভারত 'আদিপর্ব' পুঁথির লেখক (ব. রি. ১৪০) 'শ্রীরামমোহন দাস সাং কনকপুর পরগণে হাবেলী সাদিপুরের নিকট একপোয়া হয় না হয়' একটি দীর্ঘ আত্মনিবেদনের মধ্যেই দিব্য দিয়েছেন -

'তেই পাকে বলি পুথি কেহ না হরিবে । হরিবেক যে জন সে নরকে পড়িবে ।।' ১৭২০ শকাব্দের (১৭৯৮ খ্রীঃ) '১৮ই পৌষ রোজ মঙ্গলবার দুইপ্রহরের সময়' লেখা পুঁথির এই শেষাংশ সম্পর্কে মণীন্দ্রমোহন চৌধুরী লিখেছেন, 'এই কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনার মধ্যে সরল, ভক্তিপ্রবণ আনন্দোচ্ছল মনের কি স্বচ্ছ অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে । দেখা যাইতেছে দেড়শত বৎসর পূর্ব্বেও পুস্তক অপহরণ ভীতি - চাহিয়া ফেরৎ না দেওয়ার রীতি বর্ত্তমান সময়ের মতই প্রবল ছিল । বিশেষতঃ তখন পুথির মায়া ও মূল্য এখনকার চেয়ে অনেক বেশী ছিল । এই মমতাধিক্যের জন্যই অভিশাপ শালীনতার সীমা অতিক্রম করিয়াছে । গ্রন্থ লিখনের দুরূহতার কথাও সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে-দাতার কার্পণ্যহেতু কাগজের অভাব, কাগজ সংগ্রহে দুঃখ,

অত্যধিক অঙ্গুলি চালনায় ক্ষতের উদ্ভব ইত্যাদি কোন খুঁটিনাটিই লেখক বাদ দেন নাই। যে সাগর যুগী কুড়িপাতা কাগজ যোগাইয়া লিখনের প্রেরণা দিয়াছিল, অথচ সেই প্রেরণা সার্থক করিবার সুযোগ দেয় নাই অর্থাৎ সে গাছে চড়াইয়া মই সরাইয়া লইয়াছিল, সে আশীর্ব্বাদ অথবা অভিশাপের পাত্র তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। লেখক তাহার প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াও তাহাকে স্মরণীয়তার বর দান করিয়াছেন। কিন্তু এই সমস্ত মুখরতার, আত্মপ্রকটনের এই প্রেরণার মূলে আছে পুণ্যকর্ম্ম সমাপ্তির আনন্দ ('বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামের বাংলা পুথির তালিকা', শ্রীমণীন্দ্রমোহন চৌধুরী সংকলিত, রাজশাহী, ১৯৫৬, ভূমিকা, পৃঃ ৪-৫)।'

একই পুঁথির অপর একটি অনুলিপিতে (ব. রি. ১৩৭, লিপিসাল ১১৮৬ বঙ্গাব্দ বা ১৭৮০ খ্রীঃ, ২৫ ফাল্গুন) লিপিকর রামপ্রসাদ রায় নিজের পূর্বপুরুষদের পরিচয় দিয়েছেন, 'শ্রীযুত শচীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় গুণের নিধন। তারপুত্র বলরাম বড় গুণবান।। তস্য পুত্র কৃষ্ণরাম বড় ভাগ্যবান। তারপুত্র হাড়োরাম দেশেতে বাখান।। তস্য পুত্র শ্রীপরীক্ষিত তিন সহোদর। তার পুত্র রামপ্রসাদ তিনের পেয়ার (?)।। শিবপ্রসাদরাএ কৃষ্ণ তুমি দিয় আয়ুদান। কাশীরাম দাস কহে শুনে পুর্ণবান।।' এরপর তিনি লিখেছেন, 'আদিপর্ব্ব আরম্ভ করিলাম লিখিতে। প্রথমে লিখিলাম পুথি পঁচাশী পৌষেতে।। পূর্ণ হৈলে ছআশি ফাল্গুনের শেষে। সমাপ্ত করিনু পুথি সপ্তদশ মাসে।। শকাব্দা সতের সত্ত এক মাসের কুম্ভরাশি। পূর্ণ হৈল পুথি দিবস পঁচিশি।। সন এগার ছেয়াশি সাল অমাবস্যা তিথি। এতদিনে আদিপর্ব্ব করিলাম ইতি।। সমাপ্ত হইল সেই দিনে রস খণ্ড সেইদিনে আছিল চতুর্দ্দশী দশদণ্ড।। এই পুথি প্রবেশ হইল যেখনে। হেনকালে পুস্তক হইল সমাপনে।। এই পুথি শ্রীরাম প্রসাদ রাযের লিখন এবং তার পুথি। কেল্লাতে (কেল্লা ?) বসিয়া লিখিলাম। এই পুথি যে চুরি করিবেক সেই অধম দুরাচার পাপিষ্ট নরাধাম তাকে কৃষ্ণের দোহাই (প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০)'। কাশীরামের 'মহাভারত-শান্তিপর্ব্ব' (এ. ৩৬২০) ১০৮৯ সালের ৮ কার্ত্তিক নকল করার পর দিব্য দেওয়া হয়েছে 'এ পুস্তক জে চুরি করে সে শাশুড়ির শৃঙ্গার করে।........গোবধ ব্রহ্মবধ স্ত্রীবধ করেন।' এই হুমকি, বিষ্ণুপুর পরগণার বাহাদুরগঞ্জের লিপিকর লালমোহন দাসের। নিমাইচরণ ঘোষ মল্লিকের 'মহাভারত শান্তিপর্ব' পুঁথির (লিপি ৯ ফাগুন সোমবার ১১৯৯ সাল। নং এ. ৪৯৭৯) লেখকের বক্তব্য, 'এ পুস্তক যে চুরি করিবে তাহার হাত কাটা যাবে।' দীর্ঘকবিতায় পরিচয় দিয়ে 'কালিকাপুরাণ' (এ. ৩৬০২) পুঁথি অনুলিপি করে লিপিকর লিখেছেন, 'দুঃখেতে লিখিলাম পুস্তক যোহরেৎপুস্তকময়া। মাতা চ শূকরী তস্য পিতা চ গর্দ্দভঃ।।' বাঁকুড়া-সোনামুখীর বংশীদাস বাউল ১২৪১ সালের ২৩ জ্যৈষ্ঠ নরোত্তম দাসের 'নবরাধাতত্ত্ব নিরূপণ' পুঁথির শেষে লিখেছেন, 'এই গ্রন্থ নিজশিষ্য বিনে অন্যোরে না দিবে। প্রাণের সমান করি গোপনেতে থোবে।।' সাকিম 'পান্দডলা বসৎবাটি'র 'শ্রীসষ্টিচরণ মণ্ডল' সাকিম মহাদেবপুরের রাধামোহন মণ্ডলকে 'চাণক্যশ্লোক' (বি. ভা. ১৫৭৫) ১২৩৫ এর ২ জ্যৈষ্ঠ বুধবার লিখে দিয়ে পুঁথির শেষে লেখেন 'এহাতে কাহার দাও নাই কেও কখন দাওআ করে সে বাতিল ঔ ঝুঠা এই স্বোল(ক) লেখা হইল বেলা দুই প্রহরের সময়।' 'রাগানুগাবোধক তত্ত্ব জিজ্ঞাসাপত্র' পুঁথির (বি. ভা. ১২৭৬) শেষাংশে সাবধানবাণী ঃ 'ইহাতে অন্যতম হইলে নরকগমন হয় ঃ এহোঁ নিত্যবস্তু হণ ঃ জেন অফরাধ না হয় ঃ সাবধান সাবধান

সাবধান ঃ সাধক এ তত্ত্ব জানাবেন ঃ শ্রীগুরুমুখাৎ শ্রবণ করিবেন ঃ ।' 'দর্জ্জালনামা' পুঁথির (ঢা. বি. ২১৯) লিপিকর (১২২৫ মঘী বা ১৮৫৩ খ্রীঃ) 'শ্রীহিন্য বমজান আলী' লিখেছেন 'কেহ জদি ছড়ি (চুরি) করে এই পুস্তকখানি । জাহার গর্ব্বে জর্ম্ম হএ সে তার রমনি ।'

সেকালে মূলপুঁথি (অর্থাৎ 'আদর্শ পুঁথি', যা থেকে অনুলিপি হয়), নানা কারণে হারিয়ে যেত, পুঁথির রচনাংশও অনেক সময় হাতের সামনে পাওয়া যেতো না । দু একটি দৃষ্টান্ত দিই । ১২৫৬ বঙ্গাব্দে (১৮৫০ খ্রীঃ) পঃ মেদিনীপুর জেলার তাৎকালিক চেতুয়া পবগণার সাগরপুর গ্রামের শ্রীধনকৃষ্ণ মিশ্রির জন্যে কবি শঙ্করের 'শীতলামঙ্গল লঙ্কাপূজা' পালা পুঁথি অনুলিপি করেন বরদা পরগণার কোন্নগরের (ঘাটাল পৌর এলাকা) শ্রীহরিচরণ হড় । এই পুঁথিতে কবি শঙ্করের একটি দুঃখময় উক্তি -

'কহেন শঙ্কব কবি শুন সর্ব্বজনা । এই পালা দুইমত হইল রচনা ।।
প্রথমের পুঁথিখানি রচিলাম যতনে । লিখিতে লইয়া তারে গেল কোন জনে ।।
অনেক করিল্যাম চেষ্টা না হল্য উদ্দেশ । দু নেচাড়ি গীত তার রয়ে গেল শেষ ।।'

সতের শতকের শেষ থেকে আঠারো শতকের প্রথম দশকের মধ্যে ভাগবতের বারোটি স্কন্ধ অনুবাদের কাজ শেষ করেন কলকাতাব ঘোষাল বংশের সন্তান, কটকের অধিবাসী সনাতন চক্রবর্তী বিদ্যাবাগীশ । ভাগবতের মূলানুসারী অনুবাদের জন্যেই সনাতনেব ভাগবতের খ্যাতি। বিশ্বভারতী সংগ্রহে কবির প্রথম ন'টি স্কন্ধের অনুবাদ এবং বর্তমান গ্রন্থকারেরসংগ্রহে শেষ তিনটি স্কন্ধ আছে । ভুবনেশ্বরে 'ওড়িশা রাজ্য সংগ্রহশালায়' সনাতনের ভাগবতের উৎকলীয় হরফে লেখা একাধিক পুঁথি থাকলেও তার অংশবিশেষ অসম্পূর্ণ । যেমন ১০ম স্কন্ধের ৮৬তম অধ্যায়ের কিয়দংশ এবং ১১শ স্কন্ধের ৩য় অধ্যায়ের শেষাংশ থেকে ৪র্থ অধ্যায়ের ৫ম শ্লোকেব অনুবাদ সম্বলিত অংশগুলি পাওযা যায় নি । লিপিকব সদনানন্দ শর্মা লিখেছেন 'দশমের শেষ ষষ্ঠ ভাষা না পাইনু । অনেক তপাশি গ্রামে গ্রামে বেড়াইনু ।।'*

রাজশাহীব 'বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামে' রক্ষিত দ্বিজ কবিচন্দ্রের 'প্রহ্লাদ চরিত্র' (ব. রি. ৯৮৭) পুঁথির অনুলিপিতে নানাবিধ ভ্রান্তি সম্পর্কে লিপিকর লিখেছেন, 'প্রহ্লাদ চরিত্র পুস্তক সপ্তদশ পাত লেখা গেল আর আদর্শ না পাওয়া প্রযুক্ত সমাধান হইল না ।' ১২৬১ বঙ্গাব্দের ১০ চৈত্র লিপিকৃত নরোত্তম দাসের 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা' পুঁথিতে (সা. প. ৪৮৫) লিপিকরের বক্তব্যঃ 'লিখিতং শ্রীতাবাচাঁদ সরকার সাং কালবেড়্যা ওরফে গোবিন্দপুব পরগণে বিষ্টুপুব চৌকী বড়জোড়া থানা সিতল্যা সামীল ইতি এই পুস্তক জাহার পাট ও শ্রবণ করা আবিস্ক (আবশ্যক) হইবেক তেহ উক্ত সরকারের বাটী হইতে লইয়া জাইয়া পাট ও শ্রবন করিয়া এই পুস্তক এ আপষ ফিরিয়া দীবেন ইতি ।'

চট্টগ্রামের 'ইছিলামাবাদ' সাকিমের লিপিকর 'শ্রীতিতলসারাঙ্গ হিন কমতরিক' এর

---

*ভুবনেশ্বব রিজিওনাল কলেজ অব এডুকেশনেব অধ্যাপক, বিশিষ্ট পুঁথিবিদ প্রয়াত বিষ্ণুপদ পাণ্ডা বর্তমান গ্রন্থকারেব অনুরোধে 'কথাসাহিত্য' পত্রিকার আষাঢ় ১৩৯৫ সংখ্যায় 'সনাতনেব ভাষাবন্ধ ভাগবত' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। 'কলেজ স্ট্রীট' পত্রিকাব জুলাই ১৯৮৮ সংখ্যায় প্রকাশিত বর্তমান গ্রন্থকারের 'ভাগবত অনুবাদের বৃত্তে সনাতনের ভাগবত' প্রবন্ধ পাঠ করে তিনি 'কলেজ স্ট্রীট' পত্রিকাব ডিসেঃ ১৯৮৮ সংখ্যায় একটি তথ্য বহুল পত্র লেখেন ।

সামান্য দাবি - 'এহি পুস্তক কেহ দাবি করে দাবি করাএ বাতিল হইব ।' 'লায়লী মজনু' পুঁথির লিপিকরের (ঢা. বি. ২২৭) বক্তব্য, 'মালীক অত্র কিস্তা লায়ল মজনুন শ্রীমোশরফ আলী পীছরে মুনসী হোছন আলী সাকীন চান্দগাঁও । এই যে জদি বিক্তিএ এহার পারমীতা দাবি করিলে অধিনের লিপি হরফ দৃষ্টে নাদোরস্ত হইবেক ।' দ্বিজ কবিচন্দ্রের 'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ' (ব. রি. ৩৭০, ১২১২ বঙ্গাব্দ) পুঁথির লিপিকর শ্রীগয়ারাম সরকার পুঁথি অপহরণের বিরুদ্ধে দিব্য দিয়ে লিখেছেন, 'যত্ন করি এই পুঁথি করিলাম লিখন । ইহা যদি চুরি করি লয় কোন জন ।। মাতা তার শূকরী হয় জনক শূকর । ব্রহ্মহত্যা আদি পাপ তাহার উপর ।।' কৃত্তিবাস রামায়ণ পুঁথির (ব. রি. ৬৮) শেষে দেবনাগরী অক্ষরে বইচুরি বিষয়ে অভিশাপ লেখা আছে । দ্বিজ লক্ষ্মণের ' শিবরামের যুদ্ধ' (ব. রি. ১১৮, ১২৫৭ বঙ্গাব্দ) পুঁথিতে হুশিয়ারী, 'এই পুস্তক যিনি চুরি করিবেক তিনি মাতৃহরণ করিবেক ।' এই ধরণের বহুবিচিত্র দিব্য, 'আমার পুস্তক যেই জনে হরিবেক তাহার বাপের মুখে বিষ্ঠা পড়িবেক (ব. রি. ১৪০)', 'এই পুথী যে চুরী করিবেক সেই অধম দুরাচার পাপিষ্ঠ, নরাধাম তাকে কৃষ্ণের দোহাই (ব. রি. ১৩৭)' ইত্যাদি ।

অনেক ক্ষেত্রে, পুঁথির প্রথম পর্বেই লিপিকরের 'বক্তব্য বিষয়ক বর্ণনা দৃষ্ট হয়, যেমন, দৌলত কাজীর 'সতীময়না' পুঁথি । ১২৪৩ মঘী বা ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে লিপিকৃত এই পুথিটির (ঢা. বি. ৪৯৬) প্রথমেই লেখা হয়েছে - 'এই পুস্তক সতি মএনার বারমাস । শ্রীয়াবদুল রহেমান সেখ পীং সেখ মহব্বত য়ালি তাংসাং করুলডাঙ্গা মোং রত্তনপুর থানা এ পটিয়া য়ন্তপাতী লেখীখ শ্রীমাহাং হোছন সাং রাঙ্গনিয়া (মরিয়ামনগর) । সন ১২৪৩ তেয়ালিশ মঘি ১০ ফাল্গুন সুরু লেখিতে ।' এখানে অবশ্য কোন দিব্য দেওয়া হয় নি ।

অবশ্য, এতসব 'সাতসতেরো' দিব্য দিয়ে পুঁথির নিরাপত্তা কতখানি রক্ষিত হতো, দিব্যদাতারাই তা জানতেন ।

কয়েকটি পুষ্পিকা

❑ সত্যনারায়ণের পাঁচালী (এ. G 3340)

'পুস্তক সমাপ্ত হইল বল হরি হরি । ইতি সত্যনারায়ণের পাঁচালী সমাপ্ত হইল । মাহে চৈত্র ৯ তাবিখ শনিবার বেল অদ্য প্রহরকালে মোকাম নিজবাড়ি কামডএ্যার চণ্ডিমণ্ডবে দক্ষিণ দরজাতে পশ্চিমমুখে বসিয়া সত্যনারায়ণ পাঁচালী সমাপ্ত হইল স্বকীয় পুস্তক শ্রীরামমোহন শর্ম্মা তিন পাত্র শ্রীপৃতদেও শঙ্কর জোযারদার মহাশয় লিখিয়াছেন সন ১২৭৮ ।'

❑ কালিদাসের 'যমকবলচরিত্র' (এ. ৪১৩১) ।

'ইতি শ্রীজমকবলচরিত্রে পুস্তক সোমাপ্ত জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিখকং দোষকং নাস্তী । হস্তিবিচলিতং জিভ্যা চালিতং সরেস্বতীপদে ভিমস্বাপি মণিনাং চ মতিভ্রমঃ । লিখিতং শ্রীমুনিরাম দাসষ্য সাকিম বাহাদুরপুর শকাব্দা ১৭৩৪ সন ১২১৯ তারিখ ৭ই কার্ত্তিক রোজ ভুদ্ধবার দ্বিতিয় প্রহর সমএে কৃষ্ণপক্ষে ১৭ দ্বিতিয়ান তিথুঃ ৫ মৃগশিরা নক্ষত্রে বাইর বাড়ীর ঘরেতে পুস্তক লেখা সমাধা হইল ।'

❑ কৃষ্ণদাসের 'নিগূঢ়তত্ত্বসার' (এ. ৫৪৩০) ।

'ইতি সন ১০৮২ সালেব তারিখ ২৫শে পৌষ মোকাম বিক্রমপুর লিখিতং শ্রীরাধাগোবিন্দ

দাস। নিজ গায় ধান্য মাপাইতে জখন জাইছিলাম তখন এ পুস্তক সম্পূর্ণ হইল ।'

❒ সত্যাশ্রয় (এ. ৩৭৪৮, ১৯শ শতাব্দী) ।

'ইস্তাহার ।। যে মহাশয়রা এই পুস্তক পাঠ করিয়া তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ করিয়াছেন কিম্বা সকল কথার তাৎপর্য বুঝিতে পারেন নাই ইহারা পশ্চাৎ লিখিত সহার নিবাসি পাদরি সাহেবের নিকটে গমন করিলে পাদরি সাহেবগণ আহ্লাদ পূর্ব্বক সন্দেহ ভঞ্জন করিবেন ও কথার ভাব কহিয়া দিবেন । এবং ঈশ্বরের শাস্ত্রোক্ত ত্রাণে পথ দেখাইবেন । সত্য আশ্রয় । লিখিতং শ্রীরামকমল ভট্টাচার্য ।.........শ্রীশ্রীসীতারাম শরণং শ্রীশ্রীরাম শরণং শ্রীরাধাকৃষ্ণ শরণং।......... .'

❒ কৃষ্ণরামের 'কালিকামঙ্গল' (এ. ৩৯২৮) ।

'ইতি সমাপ্ত । এই পুস্তক শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভবাবুজীর ইহা জানিবা । স্বাক্ষর শ্রীআত্মারাম ঘোষ কায়স্থ সাং কলিকাতা সুতানটী চড়কডাঙ্গার পশ্চিমে । ইতি সন ১১৫৯ সাল মহা শ্রাবণ ২৭ রোজ শুক্রবার দিবসে সাঙ্গ হইল । ইহার দক্ষিণা ১ জোড় কাপড় আর ২ তঙ্কা । আত্মা ।'

❒ কবি কর্ণের 'মনোহরফাসিয়ারা পালা' (এ. ১৮৫৫, উৎকলীয় পুঁথি) ।

'শুভমস্তু । ইতি শ্রীমনোহর পালা সম্পূর্ণ হইলা । শ্রী সত্যনারায়ণ মহাপ্রভু রক্ষা করিবে অধম অরক্ষিত লেখনকারকু । বীরকিশোরীদেব মহারাজঙ্ক ২ অঙ্ক সন ১২৬২ সাল মীন ২৯ দিন মঙ্গলবার, এই পুস্তক সম্পূর্ণ হইল । শ্রীনারায়ণ শরণ ।'

❒ কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' সুন্দরাকাণ্ড, (অক্ষয়কুমার কয়াল সংগ্রহ) ।

'বিধু রস গ্রহ বাণ করহ গনন । নির্ণয় করিয়া বুঝ সক নিরূপণ ।। তৃতীয় তিথিয়ে পুস্তক সমাপ্ত হইল ।। বেলা তিন প্রহরের সময় পরগণে ঘড় তা লু (ক) শ্রীযুক্ত (?) কুম্পানি ইঙ্গরেজ সাহেব জমিদার............শ্রীযুক্ত তারিনিচরণ চৌধুরী মহাশয়ে সঅক্ষর শ্রীঅভিরাম মণ্ডল ।। নিবাস মৌজে মহাদেবপুর । পরগণে ঘড় তারিখ ২০ ভাদ্র রোজ রবিবার সন ১২১০ সাল ।'

❒ কাশীরাম দাসের 'মহাভারত' বিরাটপর্ব (ক. বি. ১৯২৩) ।

'ইতি মহাভারত বিরাট পর্ব্ব সমাপ্ত সাং (.....) সন ১১১০ সাল তারিখ ২৮ ফাল্গুন রোজ রবিবার তিথি সুক্লপক্ষ । অপরাহ্ন বেলায় সাঙ্গ হইল পাঠ সালে । দুজজোধন সম্ভাষণ কৃষ্ণস্য তুতমাগতে সমং রূপং তেনং মুর্খ বাবু কৌরবা ।।

অর্জ্জুনের দসনাম । অর্জ্জুন ১ ফাল্গুনী ১ সব্যসাচী ১ ধনঞ্জয় ১ কিরিটি ১ বিবচ্ছ ১ সেতবাহন ১ বিজয় ১ জিষ্ণু ১ বিষ্ণু ১ এ দসনাম ।। তিনভাগ লিখিলেন শ্রীমানিকরাম বিশাম্ম । সিকিভাগ লিখিলেন শ্রীরামলোচন ভট্টাচার্য সাং হামিরহাটি পটনাথ্যে শ্রীগুসাই দাস পাল সাং হরিনগর । ৮৪ পৃঃ লেখা এ পুস্তকের দক্ষিণা টং ১ টকা হইল ।'

❒ কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' গয়াপালা (ক. বি. ৪৯)।

'লিখিতং শ্রীগুরুচরণ দর্ত্ত সাং পাত্রসাএর এ পুস্তক শ্রীনন্দলাল করতম্ভবা (য়) সাং নিজগ্রাম করপাড়া সন ১২২৪ সাল । তারিখ ১৮ বৈসাখ রোজ মোঙ্গলবার নিজবাটী মোকামে সমাপ্ত করিলাম । গত সন দেবতা সুখা করিয়াছে এক্ষেনে চাল্যের দর চর্ব্বিস পচিশ পাই আর কী প্রকার হয় ।'

❐ কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' লবকুশের যুদ্ধ (ক. বি. ২৩৩)।
'হস্তাক্ষরি লিখ্যতে লবকুশের জুর্দ্দশ্য শ্রীজুত প্রেমচাঁদ ঘোষ সাকিম ঝাএগ্রা পাঠ্যনাথে শ্রীজুক্ত জীবনচন্দ্র ঘোষ সাকিম ব্যাএগ্রা। ইতি সন ১২৭১ সাল তারিখ ১৫ স্বার্বন রোজ মঙ্গলবার বেলা এক পোহর। ই বৎসর আবাদ অল্প হইয়াছে। ভাল রকমে হইল ইক্ষু। পোস্যাদা হয় নাই। কাপাস টাকায ৩।। চোর্দ্দ পুয়া তাই পায় নাই।।'
❐ কাশীরাম দাসের 'মহাভারত' আদিপর্ব (ক. বি. ৪১০১)।
'লিখিতং শ্রীবনমালী দাষ বোসু সাং বোড় পাঠনার্থে সোরূপচন্দ্র দাস বোসু ইতি ১২১৫ বার সও পনের ষাল তাবিখ ৩ ফাল্গুন বেলা সুক্রুবারে বেলা ২।। আড়াই প্রহবের মোদ্ধে শ্রীযুত সার্থক রাম যেনের নৌতন বাখুলের দবজাতে ....হই। ইতি যথাদৃষ্ট ইত্যাদি এই পুস্তক শ্রীমথুর সরদার খরিদ করিলেন। সাং আঁগেবনি পরগণে বগডিহি, তরফ আগরা সরকার গোওালপাড়া ইতি সন ১২৩১ বারসর্ত্ত একুত্রিষ সাল এই লোকের পাসখোরিদ কোরিলেক শ্রীগোপাল নাই সাং বাকাদহ।'
❐ ভারতচন্দ্রেব 'অন্নদামঙ্গল-বিদ্যাসুন্দর' (এ. জি. ৫৬৬৭)।
'ইতি বিদ্যাসুন্দর সমাপ্তং। তিথি দসমি বার গুরু নক্ষত্র আদ্রা রাস মৈথুন। পঞ্চঘটি বেলা হইয়াছিল মাচার উপব সমাধান কবিল। লিখতং শ্রীবামসরণ ঝা। সাকীম বাঙ্গি চোলা। ইতি সন ১১৯৪ নর্ব্বে সালে। তারিখ ১১ শ্রাবণ ইতি।'
❐ প্রাণচন্দ্রের 'দেহতত্ত্ব প্রকাশ' (ব. বি. ১। ১২৪৬ বঙ্গাব্দ)।
'লিখিল শ্রীবিশ্বনাথ সীংহ সাক্ষরেতে। নিজালয় যার হয পাহাড়পুরেতে। রাজধানী বর্দ্ধমান ইন্দ্রকাষ্টে যার। লাখড্ডি পাহাড়পুর বিদিত সংসার।।'
❐ দ্বিজ কবিচন্দ্রের 'রামায়ণ' আদিকাণ্ড (ক বি. ২৬)।
'ইতি যথাদৃষ্ট মিত্যাদি শ্রীরামতনুজষ পুস্তক শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল সাকিম আঙ্গরোল গ্রামে বসিয়া লিখিয়াছিলাম। ছেয়াসি সালে ইজারা করিযাছিলাম সে গ্রামে টোটা পড়ীয়াছিল সেই টোটার দায়ে পালাতক হইয়া আঙ্গরোল গ্রামে গিয়াছিলাম তাহাতে এই পুথি বসিয়া লেখিয়াছিলাম ইতি ভরথের পৃতৃশ্রাদ্ধ সমাপ্ত।।'
❐ কাশীরাম দাসের 'মহাভারত' যানপর্ব (ক. বি. ১৫৭৬)।
'ইতি জ্ঞানপর্ব সমাপ্ত.......লিখিতং শ্রীব্রজলাল সীংহ বাবুজী সা পাত্র সাএরেব শ্রীগোপাল সিংহ পরগনে বিষ্ণুপুর চৌকী পাত্রসাএর। আমাদের গামের যে চোবা থাকে তাহাকে ফাড়ীতে সুআইয়া তাহাকে জব্দ রাখিবে। ইতি তাঃ ২৬ অগ্রাহণ।'
❐ কাশীরাম দাসের 'মহাভাবত' আদিপর্ব (রাজনারায়ণ পাঠাগার, পঃ মেদিনীপুর)।
'সকাব্দা ১৭৬১ সন ১২৪৬ সাল মাহ শ্রাবণ। রোজ সোমবাব। তিথি একাদসি। রাত্রি সপ্তঘটিকা সময়ে সমাপ্ত। সাক্ষরমিদং শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ দাস বৈষ্ণব। সাকিন কবিরপুর। থানে নাবায়ণগড়। জিলে মেদিনীপুর। ইতি সন ১২৪৬ সাল তারিখ ২২ শ্রাবণ।'
❐ কবিবল্লভের শীতলামঙ্গল 'চন্দ্রকেতুপালা' (ব্য. সং)।
'শ্বরকার মান্দারণ সন ১২৮৬.....তাং ১২ ভাদ্র রোজ বুধবার তিথি একাদশী মূলা নক্ষত্র

চোদ্দ ঘন্টা পনর নিমীট মোর্দ্ধে এই পুস্তকখানি সংপুর্ন্ন হইলমিতি । এ পুস্তক শ্রীনবিন চন্দ্র মিস্ত্র সাং সাগরপুর পরগণে চেতুয়া জেলা মেদ্নীপুর তরফে দাশপুর দিষ্টকোট মোং ঘাটাল মেজেস্টেরি ও শ্ববরেজেশ্টরি । শ্বওক্ষর শ্রীমোধুশুদন মিস্ত্র স্বয়ং বাটীতে লিখিয়া দেওয়া জায় এহার মুন্ব্য নাঞ্জী অমুল্য ইতী ।।'

❒ কাশীরামের মহাভারত 'বিরাটপর্ব্ব' (ব্য. সং) ।

'পঠনার্থে শ্রীবামকুমার দেবশর্ম্মা সাকীম পুরুষোত্তমপুর স্বঅক্ষর নরাধাম শ্রীঅবনিমোহনদাষ ঘোষ মোকাম রাধাকৃষ্ণপুর । এ পুস্তক আমী লিখিলাম আমী লিখনের কী জানি যে ইহাতে যেমন বলিয়া শুর্দ্ধাশুর্দ্ধ বিচার করে তাহাকে কটুদির্ব্ব আছে শ্রীযুত মহারাজাধিরাজ মহারাজা তেজচন্দ্র রাঁয়বাহাদুর বরাবরেষু নায়েব বাজা শ্রীযুতনন্দকুমার রায় নায়েব দেও(য়া)ন শ্রীযুত ভগবতি চরণ রায় মহাশয় কারকুন শ্রীযুত জগনারায়ণ মিত্রজা মহাশয় ইতি শকান্দা ১৭০৪ সতর সত চারি সন ১১৮৯ এগার শত উননর্ব্বি সাল তারিখ ২৯ ফাল্গুন রোজ সোমবার বেলা চারিদণ্ডের মধ্যে সমাধা করিলাম ।।'

❒ রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়ন 'মৎস্যধরা পালা' (ব্য. স.) ।

'সরকার মান্দারণ সন ১২২১ সাল তারিখ ৩০ শক্রান্দী মাহোচৈত্রী বোজ মঙ্গলবার তিথি ২ দুতিয়া ।। নিরপিয়ং সাক্ষর শ্রীমথুরা মহোন দাস অধিন ।। সাং ঘনেশ্যামবাটী ।। পুস্তক পঠনার্থে শ্রীমনপণ্ডিত ।। সাং রামকৃষ্ণপুর পরগণে চেতুয়া ।। বেলা সাতঘড়িয়ে সমাপ্ত হইল ।। দক্ষিণা ২ দুই টাকা এক জোড় কাপড় ।।'

❒ কাশীরামের মহাভারত 'বিরাট পর্ব' (উ. ব. ৫১০) ।

'পঠিতাং শ্রীদেবিপ্রসাদ সরকারস্য সাক্ষর তস্য ভ্রাতা শ্রীসিবপ্রসাদ সরকারস্য নিবাস হরিপুর নাটচান্দপুর পরগণে রাজনগর । সরকার জন্নতাবাদ থানা জগদল্লা জিলা দিনাজপুর । কচহরির উত্তর ঘরের পিড়াতে পূর্ব্বমুখে বসিয়া লিখিল । তারিখ ৭ সাতহি চৈত্রী রোজ সমবার ডেড় প্রহর সময় তিথি কৃষ্ণা সপ্তি । জৈষ্ঠা নক্ষত্র । বনিজো করণ মিতি সন ১২৩৩ সাল সকান্দ ১৭৪৮ সোতরসো আটচল্লিস ।'

❒ মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' (সা. প. ২৭৩) ।

'ইতি সাক্ষর শ্রীকৃষ্ণকান্ত ঃ সাকিম রাজেন্দ্র......নে হুসেনসাহি । .....এহি পুস্তক সমাপ্ত করিলাম বেলা একদণ্ড থাকিতে শ্রীজুত রামধন বসু সাক্ষ্যাৎ মাতুল হিসয়ের বাহির বাটিতে মণ্ডপ....উপরেতে দক্ষিনমুখী হইয়া । ঘাড়ের মধ্যে সাল হইয়া বড় বেতা পাইয়া এহি পুস্তক সমাপ্ত করিলাম ...এহি পুস্তক আর কেহর এলাকা নাহি ইতি সন ১২৪০ সনের মাহে আশ্বীন তাং ৩ বোদবার কালে সমাপ্ত করিলাম ইতি' ।

❒ কাশীরাম দাসের 'মহাভারত' আদিপর্ব (ব্য. সং) ।

'শ্রীমধুসূদন সামন্ত নি...নিবাস মামুদপুর চেতুয়া পরগণে । রামধন বেবা লিখাইল পুত্রের কারণে ।। নাম শ্রীগঙ্গানারাণ বেরা নলদহে স্তিতি । পড়িবার....ইতি সন ১২৫৯ বারসর্ত্ত উনসাটী সাল তারিখ ৪ আসাড় রোজ বুধবার বেলা ১ দণ্ড.....।'

❒ কাশীরাম দাসের 'মহাভারত' গদাপর্ব (ক. বি. ২২১৪) ।

'ইতি গদাপর্ব্ব সমাপ্ত । এমন অপূর্ব্ব কথা সদা কর মন ।। শ্রীজগন্নাথ ঘোষ করিল লিখন ।। একরাটি গ্রামে বাস ঘোষ কুলদ্ভব । শ্রবণ কারণ ইহা লিখিলাম সব ।। সঙ্কর ঘোষ গোপ পুস্তক এ হয় । জত্ন করি লেখাইল কড়ি করি ব্যয় ।। চৌদ্দে পত্রেতে পুস্তক হইল সারা । জত্নেতে রাখিবে জেন, না হয় হারা ।। যথাদৃষ্ট মিতাদি ইতি সন ১১৮০ সাল ২০ আসাড় রোজ ।।'

❒ কাশীরাম দাসের 'মহাভারত' মৌষলপর্ব (ব্য. সং) ।

'নমস্তে পণ্ডিতাসর্ব্বে নমস্তে গুণিনজন জদ্রিষ্টং লিখিতং গৃষ্থ মমদোস নদিয়তে ।। ১ ।। ইতি শ্রীশ্রীমহাভারথ মৌসলপর্ব্ব সমাপ্ত ।। স্যাক্ষর শ্রীরাসবেহারী দাস পাল । পঠনাথঃ ।। শ্রীসির্দ্ধেস্বর মাইতি পরগণে চেতুয়া মৌজে জোত কানুরাম সরকার মন্দারন সন ১২১৬ তারিখ ১২ কার্ত্তিক রোজ সুক্রুবার দিবা প্রায় সন্ধার সময়ে সাঙ্গ হইল তিথি কৃষ্ণপক্ষ পঞ্চমি ইত্যাদি ।।'

❒ কাশীরাম দাসের 'মহাভারত' বিরাটপর্ব (ক. বি. ৩৭৬৭) ।

'ভিমস্বাপী রনে ভঙ্গ ইত্যাদি শ্রী পঞ্চানন জানা তাহার পুত্র শ্রীতারাপদ জানা সাং মানপাড় বাটি চৌকি প্রগণে খান্দার...নিজ মের্দনিপুর ইহার দাম দেড়টাকা লইলাম ।'

❒ কাশীরাম দাসের 'মহাভারত' উদ্যোগপর্ব (ক. বি. ৩২৮৩) ।

'জথাদৃষ্টী ইত্যাদি — লিখিতং শ্রীরামকৃষ্ণপ্রসাদ দাস ভঞ্জ সাঃ গোবিন্দপুর পরগণে জাহানাবাদ পাঠক শ্রীরাজচন্দ্র ঘোষ মঙ্গলবার তিথি সপ্তমি কৃষ্ণপক্ষ্য বেলা এক প্রহর আন্দাজিতে সম্পূর্ণ হইল । ইহার দক্ষিণ্যা সর্বসুর্দ্ধ ১ এক টাকা পাইলাম ইতি-'

❒ আলাউলের 'পদ্মাবতী' (ঢা. বি. ২৬০) ।

'এই পুস্তক মালিক শ্রীডোমর মহুরী । সাং খিতাপচর । বকলম হিং হিন শ্রীকোন খা সাং হুলাইন আমলে শ্রীযুত মেস্তর (মিষ্টার) ভানসিং সাহেব । মোতালুকে সরকারে ইচলাম আবাদ চাকলে চক্রশালা । কমিসীনরী আদালত কাচারি শ্রীযুত মুলুবী স্যাবদ্দীন । ইপতিজাএ... সন ১১৫৬ ঘং ইতি সন ১১৫৮ মং তারীখ ১৬ আগ্রান ।'

❒ দ্বিজ কবিচন্দ্রের 'অর্জুনের সাগরবাঁধা' (ব. রি. ৪০৮) ।

'ইতি সাগর বন্ধন সমাপ্ত হইল ।....লিখিতং শ্রীশেখ জাদু সরকার সাং মীরপাড়া পরগণা চাকুন্দানগরী । পাঠক শ্রীরামধন সালুই সাকিম জামিয়া তরফ বনামি লাট রাধানগর । ইতি সন ১২৪২ সাল তারিখ ৬ ভাদ্র, রোজ শুক্রবার বেলা ৩ দণ্ড পউনে চারি প্রহরের সময় সমাপ্ত হইল।'

❒ কাশীরাম দাসের 'মহাভারত' অশ্বমেধপর্ব (ক. বি. ৪০৪৬) ।'

'সমাপ্ত পুস্তক ভাদ্র পদ মাসে ত্রিংসতি দিবস বোধনবমী দির্বশে ।। বারসও চৌত্রিষ সাল । সতবার জানি । কৃষ্ণার দশমী তিথি এ অনুমানি । লিখিত পুস্তক তিন জনে কৈলশার । কমলাকান্ত গোপীনাথ গোপাল মযুমদার ।'

❒ বৃন্দাবন দাসের 'রিপুচরিত্র' (ব্য. সং) ।

'ইতি শ্রীরিপুচরিত্র গ্রীন্থ সংপুণ্য ।। জথাদীষ্টং তথালিখিতং লিক্ষকো দোস নাস্তিক ভিমস্যাপিরণেভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রম এ গ্রীন্থ লিখিতং শ্রীবিনোদমোহন মহন্তস্য ও শ্রীআনন্দমোহন গোস্বামী পঠনার্থে শ্রীসুকময় দাস সাং ময়নাডাল পং কাসিযোড়া সরকার গোওাল পাড়া সন ১২২৪ সাল ২৩ কুম্ভ

পুণ্যমাসি দীবস বেলা সাত ঘড়ি সমএ সমাপ্তং ইতি ।।'

❒ বলরাম দাসের 'চৈতন্যগণোদ্দেশদীপিকা' (ব্য. সং)।

'মুনিজন ভম হয় ভিমরণে ভঙ্গ । আমি মূঢ় ইহা কি জানিব ইহার প্রসঙ্গ ।। চেতর্ন্যগণের্দ্দেশ সকল জ্ঞাতা হবে । যত্ন করি আস্বাদিয়া গোপনে রাখিবে ।। ইত্যাদি ।। তি সন ১২০৯ সাল তাং ২ কার্ত্তিক ।। এই গ্রন্থ হইল শ্রীগৌরহরি সামন্তের সাং কুলহাড়া মৌজে মণ্ডলঘাট (পরগণে) সরকার মান্দারণ । আমি অতি মূড়মতি দিতে নারি সিমা । কি জানিব আমি গ্রন্থে(র) মহীমা ।। অতি গুড়কথা চৈতন্যভাগবত । চৈতর্ন্যভাগবত কথা জানেন বৈষ্ণব জত ।। ইতি সন ১২০৯ সাল ।।'

❒ কৃষ্ণদাসের 'নারদসংবাদ' (ব্য. সং)।

'স্বাক্ষর শ্রীবিপ্রদাষ চক্রবর্তী সাং বেল্যাঘাট নাট চাঞ্চীপাট জেলা মেদিনীপুর পরগণে চেতুয়া ।। পঠনার্থে শ্রীরামজয়.......(কীটদষ্ট) সাং কাটান জেলা হুগুলী পরগণা বরদা সন ১২৭৮ সাল তারিখ ৭ সনিবার বেল(া) ৫ ঘন্টা সমাপ্ত ।।'

❒ কিঙ্করের 'সত্যনারায়ণ সাতভাই দুখির পালা' (ব্য. সং)।

'ইতি শত্যনারায়ণের পালা সমাপ্তঃ ।। লিখিতং শ্রীরামকান্তঘোষ সাকিম ফাসদেবপুর পঠনাথে শ্রীভগবানচন্দ্র মাজি সাং হাটগেছ্যা পং চেতুয়া সন ১২৬৮ সাল তাং ২৬ জেষ্ঠ ।।'

❒ কবিবল্লভের 'দক্ষিণরায়ের পালা' (ব্য. সং)।

'ইতি দক্ষিণরাএর পালা শমাপ্ত ।। ইতি শন ১২৯০ সাল তাং অগ্রাহন মাষ লিখিতং নোবিনচন্দ্র চক্রবর্ত্তি ।। শাশুড়ী হইআছে তাহার শাক্ষি শ্রীমোধুষুদন চক্রবত্তি পুস্তক শমাপ্তং ।। পঠনাথে শ্রীনিলকমল পণ্ডিত । শাং রামকৃষ্ণপুর পং চেতুয়া শরকার মন্দারণ শন ১২৯০ শাল তাং ২ অগ্রাহান মাষ সমাপ্তং ।। বিরাট পর্ব্ব জে লিখিয়া দিয়াছিলাম তাহার দাম আট ।।০ আনা পাঠাইয়া দিবেন এই জে পুস্তক লিখিয়া দিয়াছি এহার দাম তিন আনা পাঠাইয়া দিবেন শ্রীচরণে নিবেদন কোরিলাম আর কি জানাইব ।।'

❒ নিত্যানন্দ চক্রবর্তীর 'শীতলামঙ্গল বিরাটপালা' (ব্য. সং)।

'ইতি শ্রী ' শ্রীসিতলাব বিরাট জাগরণ সংপুর্ণ্যঃ সন ১২৫৯ সাল তাং ৩ জোষ্ঠী সমবাব ীধনকৃষ্ণমীশ্রী সাং সাগরপুর পরগণে চেতুয়া এ পুস্তক যে চুরি করিবেক তাহার মাকে হ(র)ণ করিবে ।।'

❒ শঙ্করের 'শীতলামঙ্গল লঙ্কাপূজা পালা' (ব্য. সং.)।

'ইতি শীতলার লঙ্কারপূজা সমাপ্তং সন ১২৫৬ সাল তাং ১০ চৈত্রী ।। লিখিতং শ্রীহরিচরণ হড় সাং কোননগর পঃ বরদা পঠনাথে শ্রীধনকৃষ্ণমিশ্রি সাং সাগরপুর পরগণে চেতুয়া ।। লিখিতং বহু জত্নেন জো চোরেন পুস্তকং মাতা তস্য ব্যেবশ্যা চ পিতা তস্য গর্দ্দবঃ । হরি বোল ।।'

❒ দুঃখী শ্যামদাসের 'গোবিন্দমঙ্গল' (ব্য. সং)।

'ইতি গোবিন্দমঙ্গল সমাপ্ত পঠনাথে শ্রীরামলোচন সন্নীগ্রাহী সাং সোয়ার পরগণে চেতুয়া সরকার মন্দারণ সন ১২৮০ বারশত আশী সাল তাং ৫ জৈষ্ঠী রোজ শনিবার বেলা তিন ঘড়িতে সমাপ্ত হইল লিখিতং শ্রীবিষ্ট হরিদাস দে সরকার সাং চাঁন্দপুর পরগণে চেতুয়া সরকার মন্দারণ সন

১২৮০ সাল তাং ৫ জৈষ্ঠী রোজ শনীবার এই পুস্তক যে ব্যক্তি চুরি করিবে তাহার মায়ের উপর গাধা চড়িবেক ইতি ।'

❒ কাশীরাম দাসের 'মহাভারত' স্ত্রীপর্ব (বা সং.) ।

'ইতি শ্রীমহাভারতে কাসিরাম দাষ বিরচীতং পয়ার স্ত্রীপর্ব্ব সংপুর্ণ্যোহং লিক্ষতে শ্রীবন্দিরাম দাস চন্দস্য সাঃ ডিঃ হাজিপুর মৌজে গোসাঞীবাজার পরগণে জাহানাবাদ সরকার মান্দারণ পুস্তকমিদং শ্রীযুত কৃপারাম দাষ সেন তাম্বোলী সাঃ মৌজে রামজীবনপুর পরগণে চন্দ্রকোনা সন ১১৬৯ সাল তাঃ ১৯ চৈত্র রোজ বুধবার কৃষ্ণপক্ষ প্রতিপদ মোকাম সেহড় মল্লভোম শ্রীযুৎ মেলাতে ।। ইতি শ্রীশ্রীহরি ২ গুরুজী জয় ২ ।। যথাদৃঃষ্ট ... ..।।'

পুষ্পিকাগুলি থেকে অনিসন্ধিৎসু গবেষক তাঁর প্রয়োজনীয় নানা তথ্য হাতে পাবেন আশা করি । অবশ্য অনেক পুঁথির পুষ্পিকা নিতান্তই সাদামাটা, কেবল সাল-তারিখ যুক্ত । বহু পুঁথির শেষাংশ পাওয়া যায় নি । যেমন চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথি । তবুও, যা পাওয়া গেছে, তার ঐতিহাসিক ও সামাজিক মূল্য নেহাৎ কম নয় ।

গ্রন্থপঞ্জী ও সূত্রনির্দেশ

১ 'আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সংকলিত পুথি পরিচিতি', সং আহমদ শরীফ, ঢাকা, ১৯৫৮, পৃঃ ১৯ ।

২ 'বাঙ্গালার ইতিহাস' ১ম খণ্ড, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭১, পৃঃ ১৯১ ৯২ ।

৩ 'শিলালেখ তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ', ড দীনেশচন্দ্র সরকার, পৃঃ ১৫ ৫ ৫৬ ।

৪ 'Corpus of Bengal Inscription', R Mukherjee and S K Maity, 1967, P 95

৫ 'পুঁথি পরিচয়' ৪র্থ খণ্ড, শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল, ১৯৮০ । লেখক কর্তৃক উপহাররূপে বর্তমান গ্রন্থকারকে প্রদত্ত এই বইখানির পত্রাঙ্কে ত্রুটি আছে (দ্রঃ পৃঃ ১৭৮-১৮৩) ।

৬. 'Inscriptions from Kabilaspur Temple, Saka 1565', Indian Museum Bulletin, January to July, 1968 'বীরভূম জেলার পুরাকীর্তি', দেবকুমার চক্রবর্তী, ১৯৭২, পৃঃ ২২ ২৩ ।

৭ 'বাংলা পুথির পুষ্পিকা', যূথিকা বসু ভৌমিক, কলকাতা, ১৯৯৯ ।

দশ

পাঠনির্ণয় ও সম্পাদনা

পুরোনো পুঁথি বা পাণ্ডুলিপি চেষ্টা করলেই সংগ্রহ করা যায় । কিন্তু এর পাঠনির্ণয় বা সম্পাদনার কাজটি যথেষ্ট ধৈর্য্য, নিষ্ঠা ও অনুশীলন সাপেক্ষ । মূলবাধা, লিপিতে ব্যবহৃত বর্ণমালার বহুবিচিত্র রূপ । অথচ যাঁরা লিখে গেছেন, সে পুঁথিই হোক বা দলিল-দস্তাবেজই হোক, তাঁরা কিন্তু একটি নির্দিষ্ট কথাই লিখেছেন । সেখানে, কোন বর্ণ পাঠ করতে না পেরে বা কোন শব্দকে শনাক্ত করতে ব্যর্থ হয়ে পাঠক-সম্পাদক যদি নিজের মনোমত রূপে তাকে পরিবেশন করেন, সেখানেই কাজটি হয়ে গেল ত্রুটিপূর্ণ । সুতরাং পুঁথি বা পাণ্ডুলিপির পাঠনির্ণয়কালে প্রথমেই প্রয়োজন, প্রাপ্ত লিপিটির রচয়িতা বা লেখক সম্পর্কে শ্রদ্ধাবোধ, আর কাজ করার জন্যে নিষ্ঠা ও ধৈর্য্য । 'এটাও হতে পারে, ওটাও হতে পারে' এভাবে দ্বিধাপূর্ণ মানসিকতা নিয়ে পুরোনো পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার বিঘ্নিত হয় । দুঃখের বিষয়, আজ পর্যন্ত বিশিষ্ট পুঁথিসম্পাদকগণ অনেক ক্ষেত্রেই পুঁথির পাঠ এমনভাবে নির্ণয় করে গেছেন, তাতে ত্রুটি বিচ্যুতিও থেকে গেছে । পাঠ উদ্ধারে অযথা কালব্যয় না করে তাঁরা কোন কোন ক্ষেত্রে নিজেদেব সৃষ্ট পাঠটিকে তুলে ধরেছেন। ফলে পুঁথির প্রকৃত পাঠের সঙ্গে পরবর্তী পাঠক-প্রজন্মের ব্যবধান থেকে গেছে । অথচ, পুঁথিসম্পাদকের দায়িত্ব, 'রচয়িতার' অভিপ্রেত (বা দুর্বোধ্যতার কারণে তার যতটা সম্ভব কাছাকাছি) পাঠটির সঙ্গে বৃহত্তর পাঠক সমাজের পরিচয় ঘটানো ।

প্রাচীন বাংলা পাণ্ডুলিপির জগৎ বড় বিচিত্র, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ । শিক্ষিত, অশিক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিত বা নিতান্ত আক্ষরিক জ্ঞানসম্পন্ন লিপিকররা যে সব পুঁথি ও পাণ্ডুলিপি লিখে গেছেন, তাঁরা সকলেই সুন্দর হস্তাক্ষরেব অধিকাবী ছিলেন না । বাংলা লিপিতে যাঁরা সংস্কৃত পুঁথি লিখেছেন, তাঁদের বানান বা শব্দজ্ঞান ছিল, হস্তাক্ষরও ভাল ছিল । কিন্তু বাংলা পাণ্ডুলিপি বা পুঁথির লেখকরা সকলে তা ছিলেন না।

১৯শ শতকের শুরু থেকেই এদেশে প্রাচীন পুঁথির সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কাজ শুরু হলেও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে পুঁথির পাঠনির্ণয়ের কাজ হয়েছে অনেক পরে । কালের বিবর্তনের সাথে সাথে এক শতাব্দীর অক্ষর, ভাষা, লেখার ধরণ (Art of Writing) স্বাভাবিক ভাবেই অন্য শতাব্দীতে পরিবর্তিত হয়ে গেছে । তাই যত বেশী সংখ্যক এবং বিভিন্ন সময়কালের পুঁথি পাঠ করা হবে, নানা ধরণের বর্ণমালা বা লেখনরীতির সঙ্গে অপরিচয়ের দূরত্ব ততই অপসারিত হবে। এদেশে ছাপাখানা চালু হবার পরও হাজারে হাজারে পুঁথির অনুলিপি হয়েছে । পুরোহিত,

ওঝা, গায়েন, বাদক, টোল-চতুষ্পাঠীর পণ্ডিতমশায়, হাকিম-বৈদ্যরা 'সাহেবদের কলে পা দিয়ে ছাপা পুঁথি' হাতে নিতে চাইতেন না । দেখা গেছে 'অধিক যত্ন' ও 'অকারণ উৎকট ভক্তি' শেষ পর্যন্ত 'অযত্নে' পর্যবসিত । এইসব বিষয় মাথায় রেখে জীর্ণ পুঁথি-পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার ও সম্পাদনার কাজে অগ্রসর হতে হবে নিম্নরূপ পথ অনুসরণ করে ঃ-

পুঁথি বা পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে সম্যক ধারণা

যে পুঁথি-পাণ্ডুলিপির পাঠনির্ণয় করা হবে, প্রথমেই তার ঐতিহাসিক, সামাজিক, ভাষাতাত্ত্বিক দিকগুলি সম্পর্কে সম্যক ধারণা সৃষ্টি করতে হবে । ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত, পদাবলী, মঙ্গলকাব্য, চরিতসাহিত্য বিষয়গুলি ছাড়াও শাস্ত্র সম্পর্কিত প্রাথমিক জ্ঞান দরকার । সকলকে গ্রামে গ্রামে ঘুরে পুঁথি খুঁজতে হবে না । সংগৃহীত পুঁথিকেই অবলম্বন করতে হবে । প. বঙ্গের কোন বিশ্ববিদ্যালয়েই 'পুঁথিপাঠ' পাঠ্য বিষয় নয় । তাই প্রথাগতভাবে পুঁথি পাঠ সম্পর্কিত জ্ঞানার্জনের পথ এখানে রুদ্ধ । যদি অভিজ্ঞ পুঁথিপাঠক বা প্রাজ্ঞ সম্পাদককে পাওয়া যায়, তাহলে তো কোন কথাই নেই (অক্ষয় কুমার কয়ালের মত পুঁথি পাঠক বাংলায় আর কেউ আছেন বলে মনে করি না)। না হলে নিজেকেই মুদ্রিত বই, পাণ্ডুলিপি, পাণ্ডুলিপিপাঠ বিষয়ক বইপত্র, একই বিষয়ক একাধিক পুঁথি সামনে রেখে কাজ করতে হবে । তবে সর্বাগ্রে স্থির করতে হবে (ক) পুঁথিটির নাম, (খ) কবির নাম ।

লিপিবিজ্ঞান সম্পর্কে ধারণা

পুঁথির পাঠনির্ণয়ের সময় হস্তলিপিবিজ্ঞান সম্পর্কে পণ্ডিত না হলেও অন্তত এ বিষয়ে কিছুটা ধারণা থাকা দরকার । ব্রাহ্মী থেকে বাংলা বর্ণমালার বিবর্তন কীভাবে হয়েছে, তাম্রলিপি, অনুশাসন, মন্দিরলিপি, মুদ্রালিপি, দলিল-দস্তাবেজ, পুরোনো যে কোন লিপিতে বাংলা বর্ণমালার আকার কেমন, তা কিছুটা জানা দরকার । যুগে যুগে বর্ণমালার বিবর্তনের ধরণটি অনুসরণ করা চাই। এই বিষয়টিতেও পণ্ডিত হতে হবে না । প্রাথমিক জ্ঞানই যথেষ্ট ।

নিরীক্ষণ (Observation)

পুঁথি বা পাণ্ডুলিপিকে নিষ্ঠার সঙ্গে পাঠ ও অনুসরণ করাকে বলা যেতে পারে নিরীক্ষণ (observation)। একে অবশ্য Bird's eye view বলা যায় না । এটিকে দুভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে ।

(ক) অণুনিরীক্ষণ (Microscopic Observation)

পুঁথির পাঠ নির্ণয়েব জন্যে প্রতিটি বর্ণ, যুক্তব্যঞ্জন, চিহ্ন, ছেদ, বিরামচিহ্ন, ছন্দ, শব্দ, বাক্য বা বাক্যাংশ প্রতিটিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা দরকার । চর্যাপদ-শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকে শুরু করে ১৮শ-১৯শ শতক পর্যন্ত সময়কালে লেখা পুঁথির বর্ণমালায় কী ধরণের রূপবদল ঘটেছে, প্রতিটি অক্ষরের টান ও অঙ্গবিন্যাসে কী ধরণের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম লিপিকৌশল অনুসৃত হয়েছে তা জানতে হবে । প্রতিটি বর্ণকে যত্নসহকারে অনুসরণ করতে হবে ।

(খ) সার্বিক নিরীক্ষণ (Macroscopic Observation)

অণুনিরীক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যে বর্ণগুলির সঙ্গে পরিচিত হওয়া গেলেও একটি সম্পূর্ণ অংশের

অর্থ উদ্ধারের জন্য প্রয়োজন 'সার্বিক নিরীক্ষণে'র । একটি বিষয়ের একাধিক পাণ্ডুলিপি এবং ঐ সংক্রান্ত মুদ্রিত গ্রন্থের সাহায্যও নিতে হবে । তবে প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপিকেই আদর্শ করতে হবে। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে লেখা রামেশ্বরেব 'শিবায়ন' পুঁথি তে আছে (লেখক সংগৃহীত) —

'পর্য্যাটন প্রিথিবী করিয়া সে ষকালে ।
রামেশ্বর ভক্তি দিয়া গুপ্তলীলা চলে ।।' ....

এখানে 'ষকালে' (সকালে) শব্দটি গ্রাহ্য নয় । এটি হবে 'সেষকালে' । ঐ পৃষ্ঠাতেই 'বলিলা চৈতন্য তির্থ' হবে না, হবে 'চলিলা চৈতন্য তির্থ' ।'গর্ভ কর্য্যা গৌরীর নন্দনগণ সাথে' অংশে গর্ভ-এর পরিবর্তে 'গর্ত' হবে না, হবে না 'গড়' (প্রণাম) । 'সোভষমা ত্রিকাসভা নন সষ্ঠী দেবী' ভ্রান্তপাঠ। এটি হবে 'ষোড়ষ মাত্রিকা ষড়ানন সষ্ঠী দেবী' (পৃঃ ৪ খ) । ১২৭১ বঙ্গাব্দের (১৮৬৫ খ্রীঃ) লিপিকৃত কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গল' (লেখক সংগৃহীত) পুঁথির 'ভূমে মুড়ি পাতি করে গনন পঠন (পৃঃ ৯)' অংশটিকে পড়তে হবে 'ভূমে খড়ি পাতি ....।' কবিকঙ্কণ চণ্ডীর একটি পুঁথির 'সাধরে বাদিতে পাবে' হবে 'সাধুরে বধিতে পারে ।' ঐ পুঁথির শেষ পত্রের 'আনন্দিত গিতনাটে ঃ কেহবাছাগল কাটেঃ'অংশের 'কেহ বাছা গল (।) কাটে' নিতান্তই ভ্রান্ত পাঠ । উৎসব অনুষ্ঠানে প্রাণাধিক সন্তানের 'গলাকাটা' অবাস্তব বিষয় । এটি হবে 'কেহ বা ছাগল কাটে ।'

শব্দ সম্পর্কে ধারণা

বাংলা শব্দভাণ্ডারে আছে তৎসম. তদ্ভব, অর্ধতৎসম, দেশী আর অজস্র বিদেশী শব্দ । বাংলা পুঁথির সাম্রাজ্যে বহুবিচিত্র শব্দের ভিড় । সেই শব্দগুলিকে তাদের নিজস্বরূপে চিনতে হবে । ড. এনামুল হক তাঁর 'মণীষা মঞ্জুষা' গ্রন্থের ২য় খণ্ডে লিখেছেন 'Textual criticism' বা পাঠ-সমালোচনাশাস্ত্রে যাকে Composit text বা সমন্বিত পাঠ বলে, অতীত হস্তলিপির বিভিন্ন পাঠ থেকে বেছে এক একটা পুস্তকের সমন্বিত পাঠ তৈরি করে সর্বসাধারণের জন্য তা ছাপিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা । এতে জনসাধারণের সাথে তাঁদের পূর্বপুরুষের মনের পরিচয় নিকটতর হবে । ..... লিপিগত দূরত্বও নিকটতম হবে (পৃঃ ১৫)' । এই লিপিগত বাধা অতিক্রম করার জন্যে তিনি কেবল তৎসম শব্দের বানানটি শুদ্ধ করতে বলেছেন, অন্য শব্দগুলিকে হস্তক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন । এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে রাখতে হবে । লোকাচার, লোকজীবন, প্রবাদ প্রবচন সম্পর্কেও পরিচিতি থাকতে হবে । তা না হলে প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রচলিত শব্দবিশেষবে চেনা কষ্টকর হবে ।

কালনির্ণয়

একটি পুঁথি বা পাণ্ডুলিপির সময়কাল নির্ণয় জরুরী বিষয় । পুষ্পিকায় সাল তারিখ নির্দেশ করা থাকলে এই কালনির্ণয় কঠিন নয় । কিন্তু অনেক পুঁথিতে সাল তারিখ থাকে না । বহু পুঁথি খণ্ডিত বা অসম্পূর্ণ অবস্থায় পাওয়া গেছে । চর্যাপদ বা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথির কথাই ধরা যাক । লিপি, ভাষা, কবির আত্মবিবরণী, বক্তব্যবিষয়, কাগজ, কালি ইত্যাদি দেখে সেখানে পুঁথির সময় নির্ধারণ করতে হয় । অনেক 'জাল' পুঁথিও পাওয়া যায় । পুরোনো পুঁথি বা দলিল-দস্তাবেজের তাড়ার

মধ্যে অনেক সাদা তুলট কাগজ বা তালপাতা পাওয়া যায় (শতাধিক বর্ষের পুরোনো) । চতুর গবেষক তাতে কালো কালি দিয়ে কিছু লিখে তাকে 'নবাবিষ্কৃত' পুঁথি বলে চালাতে চান । কিন্তু লেখনরীতি, কালি, ভাষা ইত্যাদির মধ্যে, তাঁর অজান্তে সে অর্বাচীণ প্রভাব পড়ে থাকে, তাতেই প্রমাণিত হয় পুঁথিটি জাল । শিলালিপি বা তাম্রশাসনও জাল করে বাজারে চালানোর চেষ্টার অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে । অশোকের অনুশাসনও জাল করা হয়েছে । এইসব জালিয়াতির মধ্যে দিয়ে খ্যাতিলাভের ঘৃণ্য বাসনার পরিচয় পাওয়া যায় । সুতরাং, পুঁথির ক্ষেত্রেও সচেতন হতে হবে ।

স্বরধ্বনির মাত্রাজ্ঞান

আ-কার, ই ও ঈ কার, উ ও ঊকার, একার, ঐকার ও ঔকার এর মাত্রা কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তা দেখতে হবে ।

যুক্তব্যঞ্জন-পরিচিতি

পাণ্ডুলিপির পাঠনির্ণয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা সৃষ্টি হয় যুক্তব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে । লিপিকররা যুক্তব্যঞ্জন লিখতে গিয়ে এত স্বাধীন হয়েছেন যে তাঁদের নির্দিষ্টভাবে শ্রেণীকরণও দুরূহ হয়ে দাঁড়ায় । য-ফলা, ন-ফলা, ণ-ফলা, ব-ফলা, ম-ফলা বর্ণদ্বিত্বের বিচিত্র উপস্থাপনা উল্লেখযোগ্য । 'ও' আকৃতিবিশিষ্ট ণ-ফলা পুরোনো বাংলা পাণ্ডুলিপিতে বড় সমস্যার সৃষ্টি করে । ণ + ণ = ণ্ণ (ন্তু) এবং ন্ + ত্ + উ = ন্তু, এ দুটির পার্থক্য নির্ণয় কোথাও কোথাও বেশ দুরূহ । আবার ন্তু (ণ্ণ) কোথাও 'ন্তু' হয়েছে 'বর্ন্তুণ' অর্থাৎ ণ-ফলার 'ও' রূপটি 'ত' হয়েছে । আবার 'শান্ত' শব্দটি নিশ্চয়ই 'শাণ্ণ' নয় । এসব দিকে সচেতন থাকতে হবে । হৃ (হ্ + ঋ) অনেক সময় 'দ্রি' হয়েছে। হৃ, হু ও দ্র কে ঠিকভাবে চিহ্নিত করা চাই । তা না হলে 'হৃদয়' হয়ে যাবে 'দ্রিদয়' । এছাড়াও কিছু কিছু অক্ষর একই আকারে লেখা হয়েছে । যেমন, (ক) ন, ণ, ল, (খ) ক ও ফ (গ) উ ও ঊ (ঘ) য় ও য (ঙ)ত্ত, তু, ও (চ) ঝ, খ, ঘ ও য (ছ) উ, শু, ন্ত, (জ) ঠ ও চ । এগুলিকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করতে হবে । তেমনি ম্ন ও ম্ল, দু ও দ্ব, ন্দ ও ন্ধ, ম্ব ও নু, ঈ ও ঈ', সনাক্ত করাও এক এক সময় কঠিন হয়ে পড়ে । যেমন ব, র, ও পেটকাটা ব একইবাক্যে লেখা হয়েছে। ম্ন, ত্ম, ন্দ, ম্ল, ঞ্জ, ঞ্চ, ঙ্গ, স্ক, দ্দ, ন্ন, ঙ্গ, জ্ঞ, ন্দ, দ্ধ অক্ষরগুলির নিচে একটি '^' চিহ্ন দেখা যায়।

লিপিকরের ত্রুটি নির্ণয়

পুঁথি বা পাণ্ডুলিপির লেখক বা লিপিকর (Copiest) নানাধরণের ত্রুটি ঘটিয়েছেন নিজের লেখা পুঁথিতে । যত্রতত্র রেফ্ এর ব্যবহার, বর্ণের শীর্ষে বা নিচে বক্ররেখা সংযোগ, মাত্রায় সরলরেখার পরিবর্তে বক্ররেখার ব্যবহার ইত্যাদি দেখা যায় । হস্তলিপি বিশেষজ্ঞদের মতে এগুলি লিপিকরের কৌশল । লিখতে লিখতে কাগজ বা পত্র থেকে কলম না তুলে লেখার ফলে এইসব ঘটেছে । কিন্তু সাধারণ ত্রুটিগুলি মনে রাখতে হবে । মূল পাণ্ডুলিপি থেকে বার বার অনুলিপি হতে হতে এমন ভুলগুলি ঘটে গিয়েছে ।

(ক) স্বেচ্ছাকৃত ভুল ঃ- লেখার সময় লিপিকর স্বেচ্ছায় ভুল লিখেছেন । যেমন 'চন্দনের চন্দনের

সৌগন্ধ ছড়াল্য চৌদিগে' বাক্যে লিপিকর আরো বেশী করে 'চন্দনের' গন্ধ ছড়াতে গিয়ে যে ছন্দ পতন ঘটিয়েছেন, সে দিকে তাঁর দৃষ্টি নেই । এখানে একবার 'চন্দনের' শব্দ থাকবে । অন্যটি বাদ দিতে হবে ।

(খ) অনিচ্ছাকৃত ভুল ঃ- অন্যের পাঠ শুনে বা আদর্শ পুঁথি দেখে নকল করার সময় কখনও কখনও (i) একই শব্দ দুবার (ii) কোন শব্দ বা বর্ণ বাদ দেওয়া (iii) অর্থহীন শব্দ লেখা ইত্যাদি ঘটেছে। 'আর কারে কহিবব সেই কথা' বাক্যে 'ব' দুবার হয়েছে । 'হেনকালে শীতলার কাঁপে পুরী দহে' বাক্যে 'কাঁপে'র পরিবর্তে হবে 'কোপে' । 'কনকাগুলী দিলা জননী অস্থলে'তে 'অস্থলের' স্থানে হবে 'অঞ্চলে' ।

(গ) দুর্বোধ্যতা বা অস্পষ্টতাবশতঃ ভুলঃ - আদর্শ পুঁথিব কোন অংশ দুর্বোধ্য বা অস্পষ্ট থাকলে লিপিকর সেখানে নিজেব মনোমত শব্দ বসিয়ে বাক্যটিকে অর্থহীন করে তোলেন । যেমন 'পণ্ডিতে বুঝয় মাত্র অন্যে না বুঝয' হয়ে গেছে 'ষন্ডেতে বুঝয় মাত্র' অর্থাৎ ষাঁড়ই কেবল বোঝে। 'কবাঙ্গুলি চম্পকসমান' বাক্যে 'কবতালি চম্পক সমান' অর্থহীন । 'মিষ্টি পাএ চিনি ফেনি খায় পেট ভবি'কে লেখা হল 'মিষ্টি পাত্র চিনি ফেলি খায পেট ভরি ।' এখানে পাএ = পেয়ে ; ফেনি = বাতাসা । 'দম্ভকবি বিষহরি পূজে কোন জন' হয়ে গেছে 'দন্ত ধরি বিষহরি' । 'দেবতাদুল্বভ দ্রব্ব দিবা উচিত নয' হয়ে গেছে 'দেবাসু (র) লভ্য দ্রব্ব' । 'কালসর্পে মোব পতি খাইল আচম্বিতে'কে লিপিকব লিখলেন 'কালসর্পে মাবি পতি যাইল আশাম্বিতে' । 'বৈষ্ণবী সন্ন্যাসী এহোঁ বিচারে জানিল'কে কখনই 'বৈষ্ণ বস ন্যাসী এবেঁ বিচারে জানিল' লেখা চলে না । কিন্তু 'চৈতন্যচরিতামৃত' পুঁথিব একটি লিপিতে তাই ঘটে গেছে । 'শ্রীসনাতন দাষ বৈষ্ণব'কে 'শ্রীহলাহল দাষ বৈষ্ণব' লেখাও হয়েছে ।

অন্যান্য ভুল

বর্ণের সাদৃশ্য বশতঃ 'স্ত' লিখতে 'নু', 'ও' লিখতে 'ত্ত' 'র' লিখতে 'ব', 'শবরপতি' লিখতে 'শব বপতি' তো হয়েছেই । আবার এক পুঁথিতে অন্য পুঁথির শ্লোকও বসে গেছে । বিশেষ করে লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গলে' যদি লেখা হয় 'শত ২ ছাগমেষ বলিদান করে', তাহলে নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব সে পুঁথিতে কি হাত দেবেন আদৌ ? এছাড়াও আছে 'ভ্রান্তসংযোজন' অর্থাৎ ভুল সংশোধন করতে গিয়ে অর্থহীন শব্দ বা বর্ণ বাক্যের মধ্যে সংযোজিত করা ।

পাঠপুনর্গঠন (Recension)

পুঁথির বিশুদ্ধপাঠ নির্ণয়েব জন্যে 'পাঠপুনর্গঠন' একটি বিশেষ প্রক্রিয়া । লিপিকব লিখতে লিখতে বচনার যে সব শব্দ বা বর্ণ ছেড়ে গেছেন, সেই শব্দ বা বর্ণগুলিকে সম্পাদনার সময় বসিয়ে নিতে হবে । এজন্যে সেখানে বন্ধনীর ব্যবহার দরকার । তবেই পরবর্তী পাঠক পাঠপুনর্গঠনের রহস্যটি অনুধাবন করতে পারবেন । দৃষ্টান্ত স্বরূপ, 'বিশ্বভারতী' সংগ্রহেব ধর্মদাস বৈদ্যের 'ধর্মের জাগরণ পালা' (নং ৪১৩০) পুঁথির কথায় আসা যাক । মূল পুঁথির অসম্পূর্ণ অংশ তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে লিখে সম্পাদক ড. পঞ্চানন মণ্ডল তাঁর 'সাহিত্য প্রকাশিকা ৫ম খণ্ডে'

পাঠপুনর্গঠন করেছেন এইভাবে -

'বার দিয়া বসিল পঞ্চম গৌড়ে (শ্বর)। (এক) ত্র বসি (এ আছে ভাট গঙ্গাধ) র ।।
ভট্টাচার্য চক্রবর্ত্তি রাজার সভাতে। বিচারে অনল (সম সভাকার) সাথে ।।
রাজার সভায় জত পণ্ডিতের ঘটা। শুক্লধুতি পরিধান ভালে (শোভে ফোটা) ।।
বসিল রাজার আগে সঙ্গে নানা পুথি। বুদ্ধে বৃহস্পতি (সম জে) জ্যেষ্ঠ জৌতি (ষি)।।'

পুঁথির পাঠটি ছিল -

'বার দিয়া বসিল পঞ্চম গৌড়ে। এ বিস র ।।
ভট্টাচার্য চক্রবর্ত্তি রাজার সভাতে। বিচারে অনল সাথে ।। ....
বসিল রাজার আগে সঙ্গে নানা পুথি। বুদ্দে বৃহস্পতি জ্যেষ্ঠ জৌতি ।।'

পাঠপুনর্গঠন কত বিশুদ্ধ এবং অর্থবহ হওয়া দরকার, ওপরের উদ্ধৃতিটিই তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। কিন্তু বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে ১৩২৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত তাঁর সম্পাদিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুঁথির প্রথমাংশে (জন্মখণ্ড পৃঃ ৩/১) কোন পাঠপুনর্গঠন করেন নি -

'........................... বস শঙ্ক ।। ৬ ।।
সভাপতি আর সব সভাসদ জন।
আলপমতীঞ তোহ্মাতে শরণ ।।
.... ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ।। ৮ ।।'

প্রাচীন পুঁথির মূলরূপটির সঙ্গেই বোধ হয় তিনি পাঠকের পরিচয় ঘটাতে চেয়েছেন। কিন্তু অন্যত্র তিনি উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে পাঠ পুনর্গঠন করেছেন। যেমন দানখণ্ডে ৩১/২, ৫৯/১, ৫৯/২, নৌকাখণ্ডে ৮৩/২, ভারখণ্ডে ৮৯/২, ৯৩/২ পৃষ্ঠাগুলিতে।

পাঠবিশোধন (Emendation)

পাঠবিশোধন বলতে বোঝায় প্রাপ্ত পুঁথির বিকৃত বা অশুদ্ধ পাঠকে শুদ্ধ করে তোলা। এক্ষেত্রে সাধারণতঃ একই পুঁথির প্রাচীনতর পাঠটিকেই গ্রহণ করতে হবে। কেন না, সেখানে 'প্রক্ষেপ' (interpolation) প্রায় থাকে না।[8] 'প্রক্ষিপ্ত' রচনাগুলি বাংলা পুঁথিতে 'অনিবার্য কন্টকের অসহ্য যন্ত্রণা'। লিপিকররা পুঁথি লিখতে লিখতে অনেক সময় কিছুটা কবিত্বের অধিকার অর্জন করতেন। ফলে কৃত্তিবাস-কাশীরাম-মুকুন্দরাম-নারাযণদেব-ক্ষেমানন্দের মতো কালজয়ী কবিদের ভণিতাযুক্ত পুঁথিতে, কবিদের রচনার মধ্যে নির্বিবাদে লিপিকরদের নিজস্ব রচনাও স্থান পেয়েছে। মহতের আশ্রয়ে থেকে 'বৈতরণী' পার হবার এই বিচিত্র বাসনাবশতঃ লিপিকররা 'প্রক্ষেপ' নামক অপকর্মটি করে পুঁথির মৌলিকতাকে কতকাংশে ক্ষতিগ্রস্ত করে গেছেন। এইসব কারণে একই পুঁথির বিভিন্ন অনুলিপি এবং মুদ্রিত সংস্করণের মধ্যে' নানা ধরণের অমিল লক্ষ্য করা যায়।

কিন্তু যেহেতু 'প্রক্ষিপ্ত' অংশ পুঁথির কবির রচনা নয়, তাকে পরিত্যাগ বা বর্জন করাই যথাযথ পথ। এরপরও যদি কোন পাঠটি যথাযথ তা নির্ণয়ে সমস্যা দেখা দেয়, তখন একই পুঁথির একাধিক অনুলিপি (যদি পাওয়া যায়) সামনে রেখে কাজ করতে হবে। এছাড়াও

আছে অশুদ্ধ বানানের মাত্রাতিরিক্ত দৌরাত্ম্য । দেখা গেছে, বাংলা বর্ণমালায় লেখা সংস্কৃত পুঁথি, চৈতন্যজীবনীকাব্য, ভাগবত বা অন্যান্য বৈষ্ণব পুঁথিতে অশুদ্ধ বানান তুলনামূলকভাবে কম । কারণ, এইসব পুঁথির লিপিকররা অনেকেই ছিলেন ভাষা ও সাহিত্যে পণ্ডিত বা বলা যায় অনেকাংশে দক্ষ । কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে পুঁথির লিপিকরদের সেই ধরণের দক্ষতা ছিল না । মোটামুটি টোল বা পাঠশালায় কিছু লেখাপড়া শিখেই তাঁরা পুঁথি লিখতেন, দলিলপত্র লিখতেন। ফলে সামনে আদর্শ বানান থাকলেও নিজেদের পছন্দমত বানান লিখতেই তাঁরা অভ্যস্ত ছিলেন। বহু বাংলা পুঁথিতেই লিপিকরদের এই বক্তব্য উল্লেখ্য -(ক) 'বানান শিখিলে কিছু নাই অগোচর /অবোহেলে চালাইবে পুঁথির অক্ষর' ('পুঁথি পরিচয়', ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৬৪) । (খ) আদরসে করিয়া দৃষ্ট লিখিলাঙ পুঁথি/ শোধন করিবে লিপি দোষ থাকে যদি । ভিম হেন ক্ষেত্রি তার রণে ভঙ্গ হয় । মুনির মনে ভ্রম হয় শাস্ত্রে হেন কয় ।। ('সাহিত্য প্রকাশিকা', ৪র্থ, ভূমিকা, পৃঃ ৪) । (গ) 'পৃষ্ঠভঙ্গ কটি ভঙ্গ তুল্য দৃষ্টি অধোমুখ । দুঃখেন লিখিতং গ্রন্থং পুত্রবৎ পরিপালয়েৎ ।। ইতি সমাপ্তাশায়ং গ্রন্থং লোকানাং শোকহারকং । যথাদৃষ্টং তথালিখিতং লিখ্যকো দোষ নাস্তিক ।। হস্তী টলতি পাদেন জিহ্বা টলতি পণ্ডিতঃ । ভীমস্যাপি রণে ভঙ্গ মুনিনাথ মতিভ্রমঃ ।।' (সনাতনের ভাগবত, বি. ভা.) ।

পুঁথির বানান সংশোধনের বিষয়ে ড. এনামুল হক বলেছেন, কেবল তৎসম শব্দের বানানগুলি সংশোধন করতে হবে । অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশী, বিদেশী শব্দের বানান বা দুর্বোধ্য শব্দে হস্তক্ষেপ কবতে তিনি নিষেধ করেছেন । কারণ এতে ভাষার প্রকৃতি বদলে যেতে পারে । এছাড়াও তিনি আধুনিক গদ্যে পুরোনো সাহিত্যের নতুনরূপ দেবার চেষ্টার কথা বলেছেন - যোগসূত্র রাখাব জন্যে ('মণীষা মঞ্জুষা' পৃঃ ১৫) । কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন, ' প্রাচীন গ্রন্থ সকলের যে সমস্ত মুদ্রিত সংস্করণ আজকাল বাহির হয় তাহাতেও বানান সংশোধকগণ কালাপাহাড়ের বৃত্তি অবলম্বন কবিয়াছেন । তাঁহারা সংস্কৃত বানানকে বাংলা বানানের আদর্শ কল্পনা করিয়া বাংলা বানান নির্বিচারে নষ্ট করিয়াছেন ('বাংলা শব্দতত্ত্ব') ।'

তাঁর আরও কয়েকটি সিদ্ধান্ত ঃ

*'বাংলাব ভাষাতত্ত্ব-সন্ধানের একটি ব্যাঘাত, প্রাচীন পুঁথির দুষ্প্রাপ্যতা । কবিকঙ্কণ চণ্ডী, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন কাব্যগুলি জনসাধারণের সমাদৃত হওয়াতে কালে কালে অল্পে অল্পে পরিবর্তিত ও সংশোধিত হইয়া আসিয়াছে । প্রাচীন আদর্শ পুঁথি কোন এক পুস্তকালয়ে যথাসম্ভব সংগৃহীত থাকিলে অনুসন্ধিৎসুর পক্ষে সুবিধার বিষয় হয় (প্রাগুক্ত) ।' ....

*'বাংলা শব্দ বাংলাই । সেখানেও সংস্কৃতের শাসন যদি টানিয়া আনি, তবে রাস্তায় যে পুলিস আছে ঘরের ব্যবস্থার জন্যও তাহার গুঁতা ডাকিয়া আনার মতো হয় (প্রাগুক্ত) ।' সুতরাং এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যটুকু সহজেই বোঝা গেল ।

পণ্ডিত নলিনীকান্ত ভট্টশালী 'লিপিকরের স্পষ্ট ভুলগুলি মুদ্রিত' করে 'প্রাচীন সাহিত্যকে ভারাক্রান্ত' করার বিরোধী ছিলেন । তিনি অনুলিখিত পুঁথিটির নিষ্ঠপাঠ শেষে স্থির করতে চান, পুঁথিটি 'শিক্ষিত' , 'অল্প শিক্ষিত' বা 'অশিক্ষিত' - কোন লিপিকরের লেখা । শিক্ষিত হলে পরিবর্তন না করা, অল্পশিক্ষিত হলে সংস্কৃতনির্ভর অংশের পরিশোধন এবং অশিক্ষিত হলে

তার লেখা পুঁথির সম্পূর্ণ শোধন দরকার ('অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ রচনাবলী', ১ম খন্ড, ১৯৮২।

দীনেশ চন্দ্র সেন একস্থানে বলেছেন, 'প্রাচীন প্রচলিত শব্দবহুল একখানি পুঁথি উদ্ধার করিয়া চালাইতে চেষ্টা করিলে দেশীয় আপামর জনসাধারণ পড়িবে কি' ? ('বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', ১ম খন্ড, ৯ম সং, ১৯৮৬, পৃঃ ১৩৮) । আবার অন্যস্থানে বলেছেন, 'প্রাকৃতের সঙ্গে বঙ্গভাষার নৈকট্য' দেখানোর জন্যে 'আমরা উদ্ধৃত অংশের অনেক স্থলেই বর্ণাশুদ্ধি সংশোধন করিব না ।.....যাহা আমরা ভ্রম বিবেচনা করিয়া সংশোধন করিতে প্রয়াসী, তাহাই হয়তো ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কার করিবার একমাত্র পন্থা - শুদ্ধ করিতে গেলে সেই পথ রুদ্ধ হয় (প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৩)।' সুতরাং এ বিষয়ে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত । যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি দীনেশ চন্দ্রের শেষোক্ত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে বলেছেন, কোনটি ঐতিহাসিক সত্য, তা নির্ধারণ করার যোগ্যতা যদি না থাকে তবে সেই ব্যক্তির পুঁথি-সংস্করণে হাত দেওয়ার দরকার নেই ।

সম্প্রতিকালে, অধ্যাপক বিষ্ণুপদ পাণ্ডা 'দ্বারিকা দাসের মনসামঙ্গল' সম্পাদনকালে মন্তব্য করেছেন, তৎসম শব্দগুলির শুদ্ধরূপ দেওয়া জরুরী । আবার অন্যদিকে ঐ গ্রন্থেই তিনি বেশ কিছু ভুল বানানকেই রেখে দিয়েছেন - যদিও সেগুলি সবই তৎসম শব্দ ।

অনুরূপ ঘটনা দেখতে পাওয়া যায় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পুঁথির ক্যাটালগে। ২য়-৩য় খণ্ডের ভূমিকায় সংকলক ড. সুনীল কুমার ওঝা লিখেছেন, 'মূল পুঁথি থেকে নকল করার সময় প্রথম খণ্ডের ন্যায় পুঁথিগুলির বানান, শব্দ, পদ, ছন্দ বা কোন কিছুরই সংশোধন না ঘটিয়ে পুরোনো দিনের লেখার যথাযথ চিত্রটিকে বজায় রাখার চেষ্টা নিয়েছি ভবিষ্যৎকালে এই সবকে পুরনো দিনের দলিল হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে ভেবে ('A Descriptive Catalogue of Bengali Mns. Vol II & III, 1991')।' ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য পুঁথির সব ধরণের ভুল বানান সংশোধনের পক্ষপাতী । 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুঁথির সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় বলেই দিয়েছেন, 'ভাষাবিজ্ঞানের অনুশীলন সৌকর্যার্থে প্রাচীন বানান - পুঁথির বানান যথাযথ রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে ।' ড. পঞ্চানন মণ্ডল পুঁথি সম্পাদন কালে, সেকালে প্রচলিত তৎসম শব্দের নিয়মিত ভুল বানান সংশোধন করেন নি । অর্থান্তর ঘটার সম্ভাবনা যে সব ভুল বানানের ক্ষেত্রে, সেখানে তিনি সম্পাদকীয় লেখনী প্রয়োগ করেছেন । এইসব বিষয়ে তাঁর বক্তব্য, ন, ল, তু, ও, মু, ঘ ইত্যাদি 'অক্ষর পরিচয়ের প্রাথমিক জ্ঞান লইয়াই পুঁথি পড়ায় হাত দিতে হয় । এইগুলিকে আলোচয়িতব্যরূপে অবতারিত করিয়া ভিজে কম্বল ভারি করার সার্থকতা দেখি না ।. ...দুঃখের বিষয়, এখন পর্যন্ত পুরাতন বাঙ্গালা পাঠ-সম্পাদনের বিজ্ঞানসম্মত কোনও রীতি নির্দিষ্ট হয় নাই । সেই কারণ আমাদের অবলম্বিত এই পদ্ধতি উপযোগী বিবেচিত হইলে এই বিষয়ে নিয়ম-নির্ণয়ের মূল সূত্র পাওয়া যাইতে পারে, আশা করি (সাহিত্য প্রকাশিকা - ৪, ১৯৬০, বিশ্বভারতী, পৃঃ ভূমিকা ৬) ।'

বাংলা পুঁথির অদ্বিতীয় 'পাঠক-সম্পাদক' অক্ষয়কুমার কয়ালের মত, 'যে শব্দটির পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হইতেছে না বা যাহার কোন অর্থবোধ করা যাইতেছে না, তাহা যেমন আছে, তেমনই রাখা উচিত বরং পাশে একটি প্রশ্নসূচক চিহ্ন দেওয়া যাইতে পারে ।.....নূতন অর্থবহ শব্দ আমদানী করিয়া মূল শব্দের উচ্ছেদ কদাপি উচিত নয় । ইহাতে ব্যবসায় বুদ্ধির

পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু প্রাচীন কবি ও কাব্যের প্রতি শ্রদ্ধা সূচিত করে না ('পুঁথি পাঠ সহজ নয়' সমকালীন, বৈশাখ ১৩৭৯)।' ময়ূর ভট্টের 'ধর্মমঙ্গল' সম্পাদনকালে তিনি সেই সিদ্ধান্তে বহাল। তিনখানি পুঁথি অবলম্বনে সম্পাদিত তাঁর 'প্রাণরাম কবিবল্লভের কালিকামঙ্গল' গ্রন্থটিকে পুঁথিসম্পাদনার এক আদর্শ দৃষ্টান্ত বলে উল্লেখ করা যেতে পারে (কলকাতা, নভেম্বর ১৯৯১)। এখানে তিনি অপ্রচলিত শব্দ, তদ্ভব শব্দ ও আঞ্চলিক শব্দের পাঠোদ্ধারে একাধিক পুঁথির সাহায্য পেয়েছেন। এই বিষয়ে আমাদেরও সিদ্ধান্ত অনুরূপ। তাতে কবির রচনার ওপর হস্তক্ষেপ ঘটে না। পুঁথির সব বানানকে যদি আধুনিক বানান করে নেওয়া হয়, তাহলে প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় বাংলা শব্দের সঙ্গে আধুনিককালের পাঠকের অপরিচয়ের দূরত্ব তো থেকেই গেল শেষ পর্যন্ত। প্রতিটি সম্পাদিত পুঁথির শেষাংশে পুঁথিতে ব্যবহৃত শব্দমালার একটি বর্ণানুক্রমিক তালিকা, তাদের টীকা এবং সম্পাদকীয় মতামত প্রদান করা দরকার।

তবে, পাঠবিশোধনের সময়, কোন শব্দ সংশোধনের আগে শব্দের আদিতে, মধ্যে বা অন্তে অনুপস্থিত বর্ণটিকে মনে মনে ভেবে নিয়ে, সম্ভাব্য স্থানে বসিয়ে, অর্থ উদ্ধারের শেষ চেষ্টা কবা চাই। যেমন 'ষ্ণুপ্রিয়া'র আদিতে বি বসানো (= বিষ্ণুপ্রিয়া), 'কলস্য' শব্দের মধ্যে 'হা' বসানো (= কলহাস্য), 'কমসনে'র মধ্যে 'লা' (= কমলাসনে) বা 'অমরভুব' এর শেষে 'নে' (= অমরভুবনে) বসানো দরকার।। তাই বলে 'স্তুতিবা' শব্দটি চরণ বা স্তবকের শেষে থাকলে তার পূর্ববর্তী (বা পরবর্তী) শব্দটিকে এমনভাবে দেখতে হবে - যাতে অন্ত্যমিল রক্ষিত হয়। যেমন

'জতেক দেবতাগণ হইয়া বড় হৃষ্ট মন রায়েরে করেন স্তুতিবাণী।'

তোমার মহিমা জত কহি জদি বত্রশত

তবগুণ কহিতে না জানি।।'

-হরিদেবের রায়মঙ্গল (সাহিত্য-প্রকাশিকা-৪, পৃঃ ৬২)।

এখানে 'স্তুতিবা'র শেষে 'দ' দিয়ে যদি অসম্পূর্ণ শব্দ সম্পূর্ণ করা হোত তাহলে স্তবকের শেষের 'জানি'র সঙ্গে অন্ত্যমিল রক্ষিত হোত না। আবার অন্যত্র 'করাঙ্গুলি' শব্দের অসম্পূর্ণ রূপ 'কঙ্গুলি'কে 'কাটাঙ্গুলি' করলেও পাঠে বিশুদ্ধতা রক্ষা হয় না আদৌ।

বাংলা-পুঁথি আলোচনার প্রথম যুগে, উদ্ধারকৃত পুঁথির পাঠ যে সবসময় বিশুদ্ধ হয়েছ, একথা জোর করে বলা যায় না। এমন বেশ কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাবে যেখানে খ্যাতনামা পুঁথি-গবেষকদের পাঠোদ্ধারে যথেষ্ট ভুলক্রটি ঘটে গেছে। এর প্রধান কারণ, তখন তুলনামূলক আলোচনার সুযোগ গবেষকদের হাতের সামনে ছিল না। দু'একটি দৃষ্টান্ত দিই।

এশিয়াটিক সোসাইটির ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গল' (এ. ৩৫৩১) পুঁথির ৮ ক সংখ্যক পত্রের উদ্ধারকৃত পাঠ সোসাইটির ক্যাটালগে (নবম খণ্ড, ১৯৪১, পৃঃ ৩২৫) যে, শুদ্ধ হয় নি, উদ্ধৃতাংশটিই তার দৃষ্টান্ত। লিপিকরপ্রমাদ সত্ত্বেও এখানে কিঞ্চিৎ ত্রুটি আছেঃ-

'শুনহে মণ্ডল তুমি উপদেশ বলি আমি গ্রাম ছাড় রাত্রের ভিতর।
প্রসাদ তাহার পাত্র ইঙ্গিত পাইবা মাত্র পলাইল সঙ্কর মণ্ডল।।
প্রসাদ হরিস হইয়া ছত্তিদিন আশ্বাসিয়া ধান্য কিছু না দিল সহমন।
নিজ গ্রাম ছাড়ি যাই জগন্নাথপুর পাই প্রাতঃকালে নিশি অবসান।।

তথা যেতে নীলাক্ষর	উত্তরিতে দিল ঘর	হাঁড়ি চালু সিদা গুয়া পান ।।
রাজা বিষ্ণুদাসের ভাই	তাহারে ভেটিতে যাই	নাম তা'র ভারামল্ল ।
তিনি দিলেন ফুল পান	আর তিনখানা গ্রাম	লেখাপড়া বসতির স্থান ।।
এইমত কতকদিন	আমার পালনহীন	কপালে কি লিখিল বিধাতা।'

কোন প্রতিভাবান কবির লেখনী থেকে এমন অসংলগ্ন রচনাংশের সৃষ্টি অসম্ভব । লিপিকরও কি এমন বিচিত্র ভুল করবেন পুঁথি লিখতে গিয়ে ?

উক্ত গ্রন্থের ৩৪৬ পৃষ্ঠায় দ্বিজ রামেশ্বরের 'শিবের কীর্ত্তন' (এ. ৫৪১২) পুঁথির পরিচয়ে লেখা হয়েছে -

'আজিতো অস্থির তাত যশোমন্ত্র নরনাথ রাজারাম সিংহের নন্দন ।

শুদ্ধবিদ্যা রাজা ঋষি তাহার সভায় বসি রচে রাম শিবের কীর্ত্তন ।।'

এটি হওয়া উচিত -

'অজিত সিংহের তাত যশোবন্ত নরনাথ রাজা রামসিংহের নন্দন ।'

তালপাতায় লেখা, ওড়িয়া ভাষার বঙ্গাক্ষরের পুঁথি 'মনোহরফাসিয়ারা পালাকে' সোসাইটির উক্ত গ্রন্থে (এ. ৪০৮৪ বি পৃঃ ৪০৬) 'মনোহরকাসিয়ারা' বলা হয়েছে ।

পুঁথির বিশিষ্ট গবেষক ও তালিকা রচয়িতা প্রফুল্লচন্দ্র পাল এশিয়াটিক সোসাইটির 'সাপ্লিমেন্টারী' তালিকার (কলকাতা ১৯৫১) ৩০ পৃষ্ঠায় গোবিন্দদাসের 'নিগম' পুঁথির (আই. এম. ৯৭১৩) পুষ্পিকার 'সংবত ১৮৪৮ আশ্বিন মহিলা শুক্লপক্ষে' পাঠনির্ণয় করেছেন । অথচ হবে, 'আশ্বিন মাহিনা' (মাস) । যদুনন্দনের 'শুকদেব চরিত' পুঁথির (জি. ৫৬৬৯) পুষ্পিকার পাঠনির্ণয় তিনি 'যুন' (শুন) শব্দটিকে লেখেছেন 'যন' ।

'এক সাকিম আছে যন আত্মাপুর নামে গ্রাম আর সাকিম নির্দ্ধারিতে নরি । যন যন সর্ব্বলোক না লইবে মোর দোষ.....।'

বিশ্বভারতী সংগ্রহের 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী'র (বি. ভা. ১৩৫৩) 'গ্রন্থোৎপত্তির কারণ' অংশের পাঠনির্ণয় 'তেউটা'কে কেন যে 'ভেঙট্যা' করলেন প্রাজ্ঞ পুঁথি বিশারদ পঞ্চানন মণ্ডল, তা অজ্ঞাত। সাহিত্য পরিষৎ সংগ্রহের লোচনদাসের 'দেহনিরূপণ' পুঁথির পুষ্পিকার (সা. প. ৩২৮, বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ ১ম, ১৩৬৭, পৃঃ ১৮৩) 'পঃ মালিখাড়া' আসলে যে মালিয়াড়া, তাতে সন্দেহ নেই ।

এমন ছোটখাটো ত্রুটি পুঁথির পাঠোদ্ধারের জগতে বহু আছে । এগুলি উল্লেখ করা হোল কেবল ভবিষ্যতের কথা ভেবে ।

আরো একটি কথা পাঠবিশোধনের সময় লিপিকর 'তোলাপাঠে' (adscript) যে সব চিহ্ন ব্যবহার করে লিপিতে সংশোধন-বর্জন ঘটিয়েছেন, সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে কঠোরভাবে ('চিহ্ন ব্যবহার, সংশোধন', অংশ দ্রষ্টব্য) । কোন কোন ক্ষেত্রে লিপিকর কোন চিহ্ন ব্যবহার না করেই সংশোধন ঘটিয়েছেন । সমস্যাটা সেখানেই । সেজন্যে দরকার শব্দজ্ঞান, মধ্যযুগের কাব্যপাঠে দক্ষতা । তাড়াহুড়ো করে কাজ চলবে না । প্রয়াত ড. পঞ্চানন মণ্ডল একসময় বর্তমান লেখককে 'হাতি চলার মতো' পুঁথির কাজ করতে বলেছিলেন অর্থাৎ ধীরে ধীরে অথচ

বলিষ্ঠ-দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে । প্রতিটি অস্পষ্ট বা দুর্বোধ্য বর্ণ-অক্ষরের যথাযথ পাঠ নির্ণয় করে জীর্ণ পাণ্ডুলিপির বিশুদ্ধ পাঠ আধুনিক কালের পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার মধ্যে দিয়েই পুঁথি সম্পাদকের বিশ্বস্ততা এবং সামর্থ্যের যথাযথ পরিচয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে ।

পাঠভেদ

একই পুঁথির বিভিন্ন অনুলিপির নানা অংশের মধ্যে শব্দ, বাক্যাংশ বা সম্পূর্ণ বাক্যে পাঠভেদ দেখা যায়। যে পুঁথি যতবেশী জনপ্রিয় হয়েছে, তার অনুলিপি হয়েছে অজস্র । ফলে সেক্ষেত্রে পাঠভেদের ঘটনাও ঘটেছে বহুল পরিমাণে । রামায়ণ-মহাভারতের পুঁথিতে পাঠভেদের সীমা-পরিসীমা নেই । আজকের মুদ্রিত কৃত্তিবাস-কাশীরামের কাব্য যে আদিতে কেমন ছিল, তা জানার কোন উপায় নেই । অন্যান্য বহুল প্রচারিত পুঁথিতেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে অজস্র । কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নরূপঃ-

ধাইল কাঁসাই মহানদী বিসাই খরসোতা বামণের খানা ।
চারিদিকে জল হইল ধবল মগরা জুড়িয়া ফেনা ।।
বাজাইয়া দণ্ডি কনাই চণ্ডি নড়িলা সত্বর হয়্যা ।
সঙ্গে কালাঘাই চলিলা মুহামাই ষুবর্ণরেখা লয়্যা ।।
পার্বত প্রমাণ উঠিল ঢেউখান মগরা জুড়িয়া ফেনা ।
জলের কলরব শুনিতে উতকট কেহ জেন বাজায় বাজনা ।।
কৌতুক অভয়া নদীসম দেখিয়া রহিলা কেসরি জানে ।
ললিত প্রবন্ধ দ্বিজবর মুকুন্দ শ্রীকবিকঙ্কণ ভনে ।।

-মৎসংগৃহীত ১৫০ বৎসরের পুরোনো পুঁথি (কবিকঙ্কণ চণ্ডী) ।

ধাইল কাঁসাই মহানন্দা বড়াই খরস্রোতে বামুণের খানা ।
চারিদিকে জল ধাইল ধবল মগরা জুড়িয়া ফেনা ।।
বাজায়ে ডিঙ্গি কহই চণ্ডী নামিলা সত্বর হয়ে ।
সঙ্গে কালাঘাই টলয়া সাতভাই সুবর্নরেখা সঙ্গে লয়ে ।।
দ্বিজ অবতংশে পালধি বংশে নৃপতি রঘুরাম ।
শ্রীকবিকঙ্কণ করয়ে নিবেদন অভয়া পুর তার কাম ।।

-মুদ্রিত বসুমতী সংস্করণ, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ, (প্রাগুক্ত) ।

'কবিকঙ্কণ চণ্ডীর' আত্মপরিচিতি মূলক পদ 'গ্রন্থোৎপত্তির কারণ' অংশটির পাঠভেদ বহুবিচিত্র । একটি দৃষ্টান্ত ঃ-

'জান্দার দেয় অতিগাছে প্রজারা পালায় পাছে দুয়ার চাপিয়া দেয়থানা ।
প্রজা হৈল ব্যাকুলি বিচিত্র খরগারি টাকাবস্তু হয় দশ আনা ।।
সহায় শ্রীমন্ত খান চণ্ডিবাটী জার গাঁন যুক্তি করিল ভিমখার সনে ।
দামিন্যা ছাড়িয়া যাই সঙ্গে রমানাথ ভাই পথে চণ্ডী দিলা দরশনে ।।

ভাজ্ঞনায়ে উপনীত রূপরাম হৈল মিত জদু কুণ্ডু তিলি কৈল রক্ষা ।।
দিয়া আপনার ঘর নিবারণ কৈল ডর দিল তিন দিবসের ভিক্ষা ।
এড়াইয়া দুই নদি সদাই স্মরি বিধি দেউলে হইলাঙ উপনিতা ।।
দারুকে সহায় করি পাইল চাণ্ডাল পুরি গঙ্গাদাস বড় কৈলা হিতা ।
স্মরিয়া দামোদর পার হৈলাম দামোদর উপনিত গড়িঠা নগরে ।
তৈল বিনা কৈল স্নান করিল উদক পান শিশু কান্দে উদকের তরে ।।'

-ওড়িশায় লিপিকৃত (১২২৪ বঙ্গাব্দ) বিশ্বভারতী পুঁথি (বি. ভা. ৯১৩) ।

'............ ....গদাই খাঁ তার সঙ্গে করিল যুকতি ।
যুন হে পণ্ডিতবর জতলাগে দিবকর বিদেষে না জাত্যে কর মতি ।।
শ্বহায় (শ্রী) মন্ত খাঁ কৃষ্ণবাটী জার গাঁ যুক্তি কৈল গম্ভির খাঁ সনে ।
দামিন্যা ছাড়িয়া জাই সঙ্গে রমানাথ ভাই পথে চণ্ডি দিল দবসনে ।।
ভাল্যায়েতে উপনীত রূপরাম নিল বিত্ত জদুকুণ্ডু তেলি কৈল রক্ষা ।
দিয়া আপনার ঘর নিবারণ কৈল ডর তিন দিবসের দিল বিক্ষা ।।
বহিয়া মুড়াই নদি সদাই সঙরি বিধি তেঙট্যায় হৈলাম উপনিত ।
দারিকেশ্বর তরি পাইল পাতুলপুরি গঙ্গাদাস বহু কৈল হিত ।।
নৌকা বাহে পরাসর পার হল্যাম আমুদর উপনিত গুচড়্যা নগরে ।
তৈল বিনে কৈল স্নান কবিল উদক পান সিষু কান্দে উদনের তরে ।।'

-বিশ্বভারতী পুঁথি (১৩৫০) ।

'পেয়াদা সবার নাছে প্রজারা পালায় পাছে দুয়ার জুড়িয়া দেয় থানা ।
প্রজারা ব্যাকুল চিত্ত বেচে ধান্য গরু নিত্য টাকার দ্রব্য হয় দশ আনা ।।
সহায় শ্রীমন্ত খাঁ চন্ডীবাটী যার গাঁ যুক্তি কৈল গরিব খাঁর সনে ।
দামুন্যা ছাড়িয়া যাই সঙ্গে রামানন্দ ভাই পথে চণ্ডী দিলে দরশনে।
ভাই নহে উপযুক্ত রূপরায় নিল বিত্ত যদুকুন্ডু তিলি কৈল রক্ষা ।।
দিয়া আপনার ঘর নিবারণ কৈল ডর তিন দিবসের দিল ভিক্ষা ।
বহিয়া গোড়াই নদী সর্বদা স্মরিয়া বিধি তেউট্যায় হলু উপনীত ।
দারুকেশ্বর তরি পাইল বাতন গিরি গঙ্গাদাস বহু কৈল হিত ।।
নারায়ণ পরাসর ছাড়িলাম দামোদর উপনীত কচুট নগরে ।
তৈল বিনা করি স্নান উদক করিনু পান শিশুকান্দে ওদনের তরে ।।'

-বসুমতী সংস্করণ, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ ।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গল' নিয়ে ইদানীং বিতর্কের শেষ নেই । কারো কারো মতে এ কাব্য দুজন পৃথক কবির রচনা । আবার কেউ কেউ বলেন, 'কেতকা ' বা মনসার দাস রূপে কবি ক্ষেমানন্দ নিজেকে নির্দেশ করেছেন । তাই 'কেতকাদাস' তাঁর উপাধি । এঁর 'মনসামঙ্গলের' অংশবিশেষের পাঠভেদ এখানে লক্ষ্যণীয় -

'চাঁদ সদাগর সপ্ত ডিঙ্গার ঈশ্বর / কালিদহে গেল বেলা হল্য দ্বইপর ।
মনসার বিসম্বাদ চাঁদ বেন্যার সনে /চাঁদ বেন্যা কালিদহে জানিল ধেয়ানে ।
সখি সঙ্গে যুক্তি করি জয় বিসহবি /আমার সঙ্গে বিবাদ করি চাঁদ অধিকারি ।।
ওবিরত বলে মোরে কানি চেঙমুড়ি /বিপাকে উহাব আজি করিব ভবাবুড়ি ।।
তবে জদি মোর পুজা করে সদাকর /ডাক দিয়া আনে দেবি যত জলধর ।
হনুমান পরমান পরাসর বির/কালিদহে কব গিয়া প্রলয় স্বরির ।।
পুষ্প পান দিয়া দেবি তার পৃতি বলে /চাঁদবেন্যার সাত ডিঙ্গা ডুবাইয়া জলে।।
দেবির আদেশে ধায় জত কাদম্বিনি /খেমানন্দ বলে চাঁদ খাইল চুবানি ।।'

-১২৭১ বঙ্গাব্দে পঃ মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার সাগরপুর গ্রামে লিপিকৃত পুঁথি।

'হাঁথে দাড় করূআলে বসিল (সদা) গর । কালিদহে গেল ডিঙ্গা বেলা দ্বইপ্রহর ।।
সাধুর অনিত বাদ মনসার সনে । চাঁদবেন্যা কালিদহে জানিল ধেয়ানে ।।
সখির সহিত দেবি অন্বমান করি । আমা সনে বাদ কবে চাঁদ অধিকারী ।।
অবিরত বলে মোরে কানি চেঙমুড়ি । বিপাকে তাহাবে আজি কবিব ভরাবুড়ি ।।
তবে জানি মোব পুজা করিব সদাকর । ডাক দিয়া আনিল জতেক জলধব ।।
হনুমান পরমান পবাপর বির । কালিদহে দেখ গিয়া প্রশস্ত সমির ।।
পুস্পপান দিআ দেবি তার তবে বলে । চান্ধবেন্যার সাতডিঙ্গা বুবাইব জলে ।।
দেবিব আদেশ পায়ে জত কাদম্বিনি । গগনমণ্ডলে কৈল হুড ২ সনি ।।
হনুমান মহাবির কালিদহে গেলা । মহাঝড়বৃষ্টি হৈল দ্বইপ্রহর বেলা ।।
সঘনে চিকুর পড়ে ঘোর অন্ধকার । চান্ধবেন্যা বলে আজি নাহিক নিস্তাব ।।
সঘনে পাষান পড়ে ঢেয়ের হিল্লোল । নৌকার বাঙ্গাল কান্দে মহা গর্ন্ডগোল ।।
লাফ দিআ বুহিতে উঠিল হন্বমান । চক্রবর্ত্তে ফিরে ডিঙ্গা সাধু কর্ম্পমান ।।
ত্রাস পায়্যে চান্ধবেন্যা লম্ফ দিআ পড়ে । মনসার হটে তার সাত ডিঙ্গা বুড়ে ।।
নাকে মুখে জল খায় না জানে সাঁতার । সদাকব বলে শিব করহ নিস্তাব ।।
চক্ষুবাঙ্গা বড় পেট খাইয়া চুবানি । চান্ধ বলে দ্বঃখ দিল চেঙ্গমুড়িকানি ।।
শুনিআ হাসেন রথে জয় বিসহরি । ঝলকে ২ জল খায় চান্ধ অধিকাবি ।।
সাধুর দ্বর্গতি দেখি জগতি কমলা । রামকলা কাটিয়া করিআদিল ভেলা ।।
ভেলায় চাপীযা সাধু উঠে গিয়া তটে । ভরাবুড়ি হৈল তার মনসার হটে ।।
ক্ষেমানন্দ বলে জত মনসার মায়া । করগো করুণাময়ি নায়েকের দয়া ।।'

-১২৫৭ বঙ্গাব্দের লিপি, মৎসংগৃহীত ।

ওপরেব দুটি উদ্ধৃত অংশের সঙ্গে সম্প্রতি প্রকাশিত কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলেব পাঠেও ('কেতকাদাসের মনসামঙ্গল', সং বিজন বিহারী ভট্টাচার্য, সাহিত্য একাডেমী সং ১৯৭৭, পৃঃ ১-৫) পার্থক্য আছে । সুতরাং কোন অংশটি যে কবির নিজস্ব রচনা তা নির্ণয় করা দুষ্কর । রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'শিবায়ন' কাব্যের অংশবিশেষ -

'সঙ্কর হইল রাম আমি হৈনু সিতা । পরিত্যাগ দিআ প্রভু রহিলেন কোথা ।।

একতিল আমারে ছাড়িয়া নাহি কভু । সে আমি এখন কোথা ২ মোর প্রভু ।।
কতদিনে কান্তসনে হবে দরসন । হরমুখে হরিকথা করিব স্মরণ ।।
হাদ্যাইল দুটি ছেল্যা হারাইয়া হরে । কান্তবিনে কৈলাসকানন হৈল্য মোরে ।
উগে নাঞি কিছু পদ্মা উগে নাঞি কিছু । বল বুধ সব গেল সঙ্করের পাছু ।।'

-'মৎস্যধরা পালা', ১২৩৭ বঙ্গাব্দের লিপি, মৎসংগৃহীত।

'সঙ্কর হল্য রাম আমী হৈলাম সীতা । পোরিত্যাগ দিয়া প্রভু রহিলেন কথা ।।
একদিন বল্যাছীলাম চাশ করিবার তরে । শেই হৈতে গেছে প্রভু নাই আইসে ঘরে ।।
হারইল্যাম ছেল্যা দুটি হারাইল্যাম হরে । কান্তবিনে কৈলাশ কানন হৈল্য মোরে ।।
উগে নাই কিছু পদ্মা উগে নাই কিছু । বলবুদ্ধি গেল সব শঙ্করের পাছু ।।'

-১২৭৭ বঙ্গাব্দের লিপি, প্রাগুক্ত ।

১৯৫৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'কবি কৃষ্ণবামদাসের গ্রন্থাবলী' প্রকাশিত হয়েছে । এতে পুঁথিসম্পাদকের ব্যবহৃত পুঁথির সঙ্গে অন্যান্য অনুলিপির বহুবিধ বৈসাদৃশ্য (দ্রঃ 'কৃষ্ণরামের শীতলামঙ্গল', শ্রীঅক্ষয়কুমাব কযাল, 'কৌশিকী' পৌষ '৭৯-বৈশাখ '৭৯) । সম্পাদক ব্যবহার করেছেন এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি (গ. ৫৬৭৫) । পাঠভেদ নিম্নরূপ ঃ-

'প্রমান পরমেশ্বর দুইজন বটে । অন্যায় হবেক কেন ধর্মসভা বটে ।।
পাত্রমিত্রগণ হাসে অপরূপ এই । এখনি জাইবে জানা কতদূর সেই ।। ....
পাত্রমিত্র বসিল ভূদেব বুধজাল । অনেক লইয়া ঠাট চলিল কোটাল ।।'

- বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পুঁথি (২২৬৫), কৃষ্ণরামের শীতলা-মঙ্গল।

'প্রমান পরমেশ্বর দুইজন হটে । অন্যায় হবেক কেন ধন্যসভা বটে ।।
পাত্রমিত্র বসিল ভূদেব বুধজাল । অনেক অনিক লএ চলিল কোটাল ।।'

-মুদ্রিত গ্রন্থ, ক বি. ।

'কর তুমি তেরিমেরি কিছুই বুঝিতে নারি বদল বেচিএ লবে কেন ।
আপনারে বাস বীর কি লাগিবে কাটিবে শির কোন দেশে নাহি শুনি হেন।।'

-পরিষৎ পুঁথি ।

'আর কর তুমি তরী (মোর) কিছুই বুঝিতে নারি বলদ বেচিত্র লবে কেনো ।
আপনারা সবের কি লাগি লবে শির কোন দেশে (হেন) নাহি শুনি।।'

-মুদ্রিত গ্রন্থ ।

১২৮৬ বঙ্গাব্দে লিপিকৃত কবিবল্লভের 'শীতলামঙ্গল' পুঁথিতে কবির আত্মপরিচিতি নিম্নরূপ ঃ-

'পিতামহ পুরুশর্ত্তম জগৎ দ্বঃম্বভ নাম শ্রীলোচন তাহার কুঙর ।
তশ্ব শুত প্রিয়শ্যাম সকল গুণের ধাম চিরকাল চেতুয়া ভিতর ।।
তশ্ব শুত শ্রীগোপাল মান্দারণে কত্তকাল নিবাস কোরিল বোন্দিপুরে ।
শ্রীবল্বব তশ্ব্য শুত গোবিন্দচরণে রত হরিবল পাপ জাক দ্বরে ।।'

-মৎসংগৃহীত পুঁথি ।

'পিতামহ পুরর্ত্তম জগতদুল্লভ নাম শ্রীলয়্যাষুতার রঙ্গ তার ।

তর্শাষুত শ্যাম	সকল গুণের ধাম	বাস তার চেতোর ভিতর ।।
তর্শাষুত শ্রীগোপাল	মান্দারনে কতকাল	নিবাস করিল বন্দিপুরে ।
শ্রীবল্লভ তর্স্য ষুত	গোবিন্দপদেতেরত	হরিবল পাপ জাবে দুর ।।

-বিশ্বভারতী পুঁথি ।

'পিতামহ পুরুষোত্তম	জগতে ঈশ্বর নাম	শ্রীচৈতন্য তাহার কুমারে ।।
তস্য সুত শ্রীশ্যাম	সকলগুনের ধাম	কতকাল হস্তিনানগরে ।।
তস্য সুত শ্রীগোপাল	মান্দারনে কতকাল	নিবাস কবিল বৈদ্যপুরে ।।
শ্রীবল্লভ তাহারসুত	গোবিন্দ পদেতে রত	হরিবল পাপ গেল দূরে ।।'

-বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, বর্ষ ৫, সংখ্যা ১, ব্যোমকেশ মুস্তফীর প্রবন্ধ ।

পুঁথিতে পুথিতে এই ধরণের পাঠভেদের সমস্যাজালের মধ্যে দাঁড়িয়ে, কোন অংশটি যথার্থই কবির রচনা বা কোনটি প্রক্ষিপ্ত, তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য । এই ধরণের শব্দ বা বাক্যাংশের হেরফের ঘটায় কবি পরিচিতি উদ্ধার করাও কষ্টকর । পুঁথিসম্পাদক এই সমস্যাগুলি থেকে প্রকৃতসত্য উদ্ধার করতে হিমসিম খেয়ে যান ।

পুঁথির 'বহুল পাঠভেদের' মধ্যে একধরণের ভাবাবেগ-নির্ভর জালিয়াতিও লক্ষ্য কবা যায়। পুঁথি পরিচায়ক প্রয়াত পঞ্চানন মণ্ডল মহাশয়ের উদ্ধৃতি এখানে প্রাসঙ্গিক ঃ "লিপিকর, বিশেষ করে গায়েন-লিপিকরের মধ্যে অনেকে থাকেন স্বভাবকবি । তাঁরা যখন কোন মূলগ্রন্থ নকল করেন, বিধিবদ্ধ গ্রন্থস্বত্ব না থাকায়, স্বভাবতঃই মূল গ্রন্থকারেব মূল রচনার মধ্যে তাঁর নিজেব রচনা তিনি প্রক্ষেপ করে থাকেন । এমনকি লিপিকরের রচিত গোটা বইখানি বা পদ পদাবলী তো বটেই, মূল প্রখ্যাত গ্রন্থকারের ভণিতায় চালিয়ে দিয়ে থাকেন ('বাংলা পুঁথি' ঃ রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতীর পুঁথি বিভাগ, ব. সা. প. বর্ষ ৭৫, সংখ্যা ১, পৃঃ ১৮)" । এইভাবে বাংলা সাহিত্যে চণ্ডীদাস-সমস্যার মত কত না সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে, যেগুলি প্রায় সবই সমাধানরহিত ।

শুদ্ধপাঠ নির্ণয়ের বিষয়ে সবশেষে বক্তব্য 'রচিত লিপি'কে বিশুদ্ধ করার উদ্যোগ তো অশোক অনুশাসনেই দেখা গেছে । শিলাপটে লিপি খোদিত হবার পর তাকে সংশোধন করতে গিয়ে যেমন অতিরিক্ত বর্ণ ঘষে মোছা হয়েছে, তেমনি বাদ পড়ে যাওয়া বর্ণ বা বর্ণমালাকে সংস্থাপিত করা হয়েছে ('Indian Epigraphy', Dani, P. 48) । অনেকক্ষেত্রে তাম্রফলকের ভুল পাঠকে পিটিয়ে পাঠসংশোধন করা হয়েছে । সেই রীতি আজকের মুদ্রণালয়েও তো ঘটছে। এ কাজটি প্রুফ রীডারের ।

গ্রন্থপঞ্জী ও সূত্রনির্দেশ ঃ

১ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সংগ্রহশালায় বা গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুঁথি দেখতে গিয়ে বর্তমান লেখকের বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে । 'ভবিষ্যত প্রয়োজন' এবং 'শত্রুবৃদ্ধি আশঙ্কা' এই দুটি কারণে কোন সংস্থার নামোল্লেখ করছি না । সকলেই বই নিয়ে আগ্রহী । পুঁথির প্রতি গুরুত্ব প্রায়ই কারো নেই । দু'একটি সংস্থা কেবল ব্যতিক্রম । ফলে অনালোচিত পুঁথি বোধ হয় আর কোনদিনই আলোচনার আলোয় আসার সুযোগ পাবে না ।

২ এশিয়াটিক সোসাইটি ('Manuscriptology') পাঠক্রম শুরু করেছিল। মেদিনীপুর বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা অনার্সের 'স্পেশাল পেপারে' 'বাংলা লিপির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ' এর কথা শোনা গিয়েছিল। সব ক্ষেত্রেই এখনকার পরিস্থিতি জানা নেই।

৩ 'জাল শিলালেখ ও তাম্রশাসন', দ্রঃ 'শিলালেখ ও তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ', ড দীনেশচন্দ্র সরকার, ১৯৮২, পৃঃ ২০২-২০৬।

৪ পুঁথি বার বার লিপি হতে হতে তার মধ্যে বিভিন্ন কবি বা লিপিকরের নিজস্ব রচনাংশের অনুপ্রবেশ ঘটে। ফলে মূল পুঁথি বা রচনা অশুদ্ধ হয়ে পড়ে। এমন 'প্রক্ষেপের' দৃষ্টান্ত বাংলা পুঁথিতে ভূরি ভূরি।

৫ মুদ্রণযোগ্য সংস্করণ রচনার উদ্দেশ্যে, পুঁথি সম্পাদনাকালে সম্পাদকরাও অস্পষ্ট বা দুর্বোধ্য বর্ণ, শব্দ বা বাক্যাংশের আংশিক/সামগ্রিক পরিবর্তন ঘটিয়ে মূল পুঁথির সঙ্গে পরবর্তীকালের পাঠকের দূরত্ব সৃষ্টি করেছেন।

এগারো

'রেফ্' (´), 'একাক্ষর' ও 'অনুস্বার' (ং)।

রেফ্ এর ব্যবহার

আধুনিক বাংলা বর্ণমালায় 'রেফ্' এর ব্যবহার যে স্বাভাবিক রূপ লাভ করেছে, পুরোনো বাংলা পাণ্ডুলিপিতে তা ছিল না। তখন (১) শুদ্ধ শব্দ গঠনে এবং (২) বিকৃতভাবে রেফ ব্যবহৃত হয়েছে।

(১) শুদ্ধশব্দ গঠন ঃ-

অর্ক, মূর্খ, স্বর্গ, অর্থ, বর্ধন, হর্ষ, যথার্থ, বিধর্ম্ম, কর্ণ, শর্ত, অর্থ।

(২) বিকৃত প্রয়োগ ঃ-

বিকৃতভাবে রেফ্ ব্যবহৃত হওয়ায় পাণ্ডুলিপির পাঠনির্ণয়ে অনেক সময়ই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এগুলি নিম্নলিখিতভাবে বিচার্য ঃ-

অ. দ্বিত্বব্যঞ্জনে ঃ— কর্ম্ম, অর্ন্ন, উর্চ্ছিষ্ট, ধর্ন্ন, ইর্চ্ছা, রার্জ্জ্য, অর্ন্নথা, যুর্দ্ধ, শুর্দ্ধ, শিসর্স, উর্ত্তম, রহর্শ্ব, আর্হ্বান, অর্শ্ব, তুর্ম্ম, আর্ম্মা, সর্ত্তর, আধির্ক্ক, তর্ত্ত্ব, ভার্গ্য, যর্জ্ঞ, মৃর্ত্তু, কর্ণ্ব।

আ. অনুনাসিক ধ্বনিতে ঃ— প্রসর্ন্ন, পুর্ন্ন, বর্ত্ত, আলির্ঙ্গন, জির্জ্ঞাসা, জর্ন্মেজয়, গর্ঙ্গা, মার্ন্দসি, বর্ন্দিয়া, ভীর্ষ্ম, বৈসর্ম্পায়ন।

ই. আদিব্যঞ্জন ঋ বা র-ফলা থাকলে পরের ব্যঞ্জনে ঃ— বৃর্ক্ষ, বৃর্ষ, বৃর্দ্ধ, দ্রর্ব্য, ব্রর্ম্মা, প্রর্বেশিল, ক্রুর্দ্ধ, প্রর্ণাম।

ঈ. প্রস্বর সৃষ্টিতে - মৌলিক ব্যঞ্জনে রেফ্ এর ব্যবহার ঘটেছে প্রস্বর সৃষ্টিতে (accent বা stress)। যেমন, কর্ত (কত), বর্নে (বনে), বর্চন (বচন), অতির্থ (অতিথি)।

তবে যত্রতত্র 'রেফ্' ব্যবহারের জন্যে লিপিকরকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর আগে আমাদের দুটি বিষয় মনে রাখতে হবে ঃ

এক) মধ্যযুগেব পুঁথিলেখা অনেকাংশেই শ্রুতিনির্ভর। একজনের পাঠ শুনে শুনে লেখার সময় অল্পশিক্ষিত, বানানে প্রায়ই অদক্ষ লিপিকর ব্যঞ্জন, যুক্তব্যঞ্জন বা অনুনাসিক ধ্বনিকে আরো গুরুগম্ভীর, শ্রুতিমধুর এবং ছন্দোময় করে তোলার জন্যে 'রেফ্' এর ব্যবহার ঘটিয়েছে। অল্পশিক্ষিত, ধ্বনিমুগ্ধ লিপিকর ধ্বনির আভ্যন্তরীন গাম্ভীর্য উপলব্ধি করেছিলেন। হয়তো তাদের ধারণা হয়েছিল, 'রেফ্' ছাড়া শব্দ গাম্ভীর্য ঠিকমতো রক্ষা করা যাবে না।

দুই) পুঁথি লিপিকর তার মনের সৌন্দর্যচেতনার প্রকাশ ঘটাতে গিয়ে পুঁথির পাতার চারদিকে

নানা চিহ্ন এঁকেছে, নক্‌শা করেছে, লেখার মধ্যেই শূন্যস্থানে এঁকেছে তারকাচিহ্ন বা পুষ্পপ্রতীক। লিখতে লিখতে, লেখনীর টানে শব্দের কোন কোন বর্ণের ওপরে তাই টানা হয়েছে রেফ এর মতো সরলরেখা, কখনও কখনও বক্ররেখা । লিপিকরের শিল্পীমনের প্রকাশ ঘটেছে এই রেফ্‌চিহ্নের মাধ্যমে । তাই একে 'হস্তলিপিবিদ্যা'র (Caligraphy) একটি বৈশিষ্ট্য ধরে নেওয়াই যথাযথ। অশোকের অনুশাসনেও বর্ণের উপরিভাগে কখনও কখনও ইংরেজী 'এস' বর্ণের মত চিহ্ন দেখা যায়, যা রেফ্ এরই আদিতম রূপ হতে পারে ।

একাক্ষর বা 'মনোসিলেবল্'

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে কয়েকটি বাংলা বর্ণ তার নিজস্ব আকার ধাবণ করে ফেলে । বিজয়সেনের দেওপাড়া অনুশাসন তার দৃষ্টান্ত । চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ বা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই বাংলা বর্ণমালার আধুনিক রূপলাভ অনেকাংশে সম্পূর্ণ হয়ে যায় । অবশ্য তাম্রলিপি, শিলালিপি, মন্দিরলিপি, তালপাতা ও তুলটের পুঁথি ইত্যাদি লেখার সময় লিপিকররা বর্ণমালার সাধারণ আকার বা রূপটিকে গ্রহণ করলেও লেখনপ্রক্রিয়ার ওপর আঞ্চলিক লেখনরীতির নানাবিধ প্রভাবে তাঁরা প্রভাবিত হয়েছেন (অশোক অনুশাসনের ব্রাহ্মীলিপির মধ্যেও সেই ধরণের আঞ্চলিকতার প্রভাব লিপিবিজ্ঞানীরা দেখেছেন । পরবর্তীকালের মৌর্য, গুপ্ত, কুষাণ, পাল ও সেনযুগের শিলালিপি তাম্রশাসনেও তা ঘটেছে ।)। ফলে পুরোনো বাংলা পাণ্ডুলিপিতে এসে গেছে নানা চিহ্ন, মাত্রা ইত্যাদি । একটি বিচিত্র বিষয় 'একাক্ষর' বা 'মনোসিলেবল্' । এটিকে ঠিক যুক্তাক্ষর বলা হয় না । এটি একাধিক অক্ষরের মিলিত রূপ । লেখার সময় কাগজ থেকে কলম না তুলে একটানা লিখে যাবাব সময় একটি শব্দের পাশাপাশি দুটি অক্ষর ক্রমশঃ নৈকট্য লাভ করে একটি অক্ষরে পরিণত হয়ে যায় । লিখতে লিখতে মধ্যে এসে যায় দ্রুততা, সোজাপথ খুঁজে বের করাব মানসিকতা । সেভাবেই 'একাক্ষরের' সৃষ্টি । তবে এই একাক্ষরগুলিকে নিবিড়ভাবে লক্ষ্য করলে এদের ভেতর থেকে দুটি পৃথক অক্ষরকে বের করা কঠিন নয় । বাংলায় অন্ততঃ দুটি একাক্ষরের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে বহু পুঁথিতে । এ দুটি হল 'কৃষ্ণ' ও 'প্রভু' । এই অক্ষর সৃষ্টিতে 'এ' লেখার প্রবণতা সক্রিয় থেকেছে । মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া লিখেছেন "ভাষার প্রতিটি শব্দের জন্য একটি করে চিহ্নের ব্যবহার 'শব্দলিপির' বৈশিষ্ট্য । পরবর্তীকালের 'অক্ষরলিপি' (Syllabogram)তে বিভিন্ন চিহ্ন শব্দের সমগ্র ধ্বনিসমষ্টিকে না বুঝিয়ে বিভিন্ন 'অক্ষর' (Syllable) কে নির্দেশ করত । একীভূত শব্দগুলিও যে কালক্রমে গঠনগত দিক থেকে (physiological) 'অক্ষর' (Syllable) এর মর্যাদা লাভ করেছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়; তবে সেক্ষেত্রেও তা শ্রুতিগত (acoustic) দিক থেকে সংশ্লিষ্ট শব্দের সমগ্র ধ্বনিসমষ্টিকেই নির্দেশ করেছে ।" সিন্ধুসভ্যতার লিপি, দাক্ষিণাত্যের তামিললিপি, চীনালিপি, বালুচিস্তানের 'ব্রাহুই' সবই চিত্রলিপি । 'একাক্ষর' এর মধ্যেও সেই চিত্রধর্মিতা লক্ষ্য করা যায় । তবে মাত্র কয়েকটি শব্দই একাক্ষর হয়ে উঠল কেন, সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া দুরূহ । হয়তো একসময় এগুলি লিপিকরদের আর সেভাবে আকৃষ্ট করতে পারে নি । একসময় তাদের পরবর্তী প্রজন্ম এগুলিকে নিতান্তই বাড়াবাড়ি বা ভড়ং মনে করে সেগুলিকে পরিত্যাগ করে । এইভাবেই

'আকৃতিতে' একটিমাত্র যুক্তবর্ণ অথচ 'প্রকৃতিতে একাধিকযুক্তবর্ণসমন্বিত' এই একাক্ষর গুলি (মুহম্মদ শাহজাহান মিঞার মতে 'একীভূত শব্দ') লিপিকররা পরিত্যাগ করে।

'অনুস্বার 'এর রূপবদল

অশোক ব্রাহ্মী থেকে ভারতীয় বর্ণমালায় 'অনুস্বারের' (ং) আবির্ভাব। অশোক অনুশাসনে এটি সাধারণতঃ বর্ণের ডানদিকের শীর্ষভাগে, কখনও কখনও মধ্যভাগে, বিরলক্ষেত্রে স্বর বা ব্যঞ্জনবর্ণের ডানদিকের নিম্নভাগেও বসেছে। আবার দিল্লি তোপরা স্তম্ভলিপিতে ঘং অক্ষরে 'ঘ' বর্ণের মাঝের ক্ষুদ্র দণ্ডের ওপরে এটি বিন্দুর আকারে দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে স্বরচিহ্নযুক্ত বর্ণের শীর্ষভাগে, স্বরচিহ্নের কোণে বিন্দুর আকারে এটি দেখা যায়। কুষাণযুগীয় মথুরা লিপিতে (খ্রীঃ ১ম শতক) বিন্দুর জায়গায় একটি ক্ষুদ্ররেখার আকার ধারণ করে। সিন্ধু অঞ্চলের কুষাণ-স্তূপের ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাপ্ত খোলামকুচিতে কালি দিয়ে লেখা বর্ণের মধ্যে ক্ষুদ্ররেখার আকারে অনুস্বার দেখা যায় (১ম-৪র্থ শতক)। অশোকের শাহবাজগঢ়ী ও মানসেহরা অনুশাসনের খরোষ্ঠী বর্ণমালায় এটি বর্ণের নীচের অংশে হুকের মতো দেখা যায়। ৫ম-৬ষ্ঠ শতকের পূর্বভারতীয় লিপিমালায় এটি বর্ণশীর্ষে কোথাও বিন্দুর আকারে, কোথাও ক্ষুদ্রবৃত্তের আকারে বসেছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথিতে এটি বর্ণের ওপরে ক্ষুদ্র বৃত্তাকারে দেখা যায়। ষোল শতক থেকে এটি বর্ণের সঙ্গে জুড়ে যায়- কিছুটা ডানদিকে সরে গিয়ে। পরবর্তী পর্যায়ে এর অবস্থানগত পরিবর্তন ঘটলো। বর্ণের শীর্ষদেশ ছেড়ে মাত্রারেখার কিছুটা নিচে নেমে এল-সেই ক্ষুদ্রবৃত্তের আকারে। অবশ্য আঠারো শতকের বাংলা পুঁথিতে আধুনিক অনুস্বারের আবির্ভাব ঘটলেও ক্ষুদ্র বৃত্তাকার অনুস্বারও বহু ক্ষেত্রে দেখা যায়। বর্ণের মাত্রার সঙ্গে যুক্ত ক্ষুদ্রাকার অর্ধবৃত্তরূপ অনুস্বারও বহু পুঁথি ও দলিল দস্তাবেজে দেখা যায়।

যুক্তাক্ষর

অশোক লিপি থেকেই দেখা যাচ্ছে, মূলবর্ণের সঙ্গে অপর বর্ণের ক্ষুদ্ররূপ, বর্ণাংশ বা কোন বিশেষ চিহ্ন যুক্ত হয়ে যুক্তাক্ষর গঠিত হয়েছে। পরবর্তীকালের বিভিন্ন লিপিমালায় এই রীতিই অনুসৃত হয়ে এসেছে। তবে কখনও কখনও যে বিচিত্ররীতির অনুসরণ ঘটে নি, তা নয়। পুঁথির ক্ষেত্রে ঘটেছে নানা কৌশলের অনুসরণ।

বারো

পুঁথি-পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও তালিকা প্রণয়ন

পুঁথি সংগ্রহের কাজটি মুখে বলা যত সহজ, বাস্তবে তেমনি দুরূহ । আমাদের দেশের পুঁথি-মালিকবা (যাঁরা পূর্বপুরুষদের রেখে যাওয়া পুঁথির অধিকারী) অধিকাংশক্ষেত্রেই সাধারণ গৃহস্থ মাত্র । অনেকেরই আর্থিক অবস্থা আগের মত সচ্ছল নয় । খুব কম ক্ষেত্রেই শিক্ষিত-মার্জিত পুঁথি-মালিকের সন্ধান মেলে । সকলেই পূর্বপুরুষের সযত্নলালিত প্রাচীন পুঁথির রাশিকে আশ্রয় দিয়েছেন গোয়ালঘরের মাচা, জ্বালানী বা ঘুঁটের মাচা, কোঠাবাড়ির তেতলায় ভাঙ্গা তোরঙ্গে পরিত্যক্ত দ্রব্যাদির সঙ্গে, ঠাকুরবাড়ির কুলুঙ্গী, পুরোনো পাকাবাড়ির ধুলিমলিন কক্ষে পুরাতন কাগজপত্র বা ভাঙা আসবাবপত্রের সঙ্গে । অল্প কিছু ক্ষেত্রে পুঁথিকে ভক্তিভরে পূজো করা হলেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পুঁথি ও পাণ্ডুলিপি আবর্জনার সামিল । চরম অবজ্ঞার শিকার । অবহেলা অনাদরে পড়ে থাকা এইসব পুঁথি ভিক্ষা চাইতে গেলেই নানা আপত্তি । ধারণা, এসব পুঁথি বিক্রি করে বা গোপনে বিদেশে পাচার করে সংগ্রাহক প্রচুর অর্থ উপার্জন করে থাকেন ।

সংস্কৃত সাহিত্যের এক প্রবীণ অধ্যাপকের বাড়ির ঘুঁটের মাচায় পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা অর্ধশতাধিক বাংলা-সংস্কৃত-তুলট ও তালপাতার পুঁথি তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতার উদারতায় হস্তগত করেও পরে ঐ অধ্যাপকের 'অভিশাপ' আর 'রক্তচক্ষুর' তাড়নায় নিরূপায় হয়ে আবার তা ফেরৎ দিয়ে আসতে হয় । ১৯৭৮ এর বন্যায় পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাব কোন এক গ্রামে সেই অধ্যাপক মহোদয়ের পুরোনো মাটির বাড়িটি ভেঙে যায়, বিনষ্ট হয় সেই সব অমূল্য পুঁথি । ঐ জেলারই ঘাটাল মহকুমার এক একদা জমিদার বাড়ির ঠাকুরঘরের কুলুঙ্গীতে রক্ষিত বিশাল পুঁথির স্তূপ একবার দেখতে চেয়েও পাওয়া যায় নি । সেগুলি বন্যায় বিনষ্ট হয়। এ ধরণের অভিজ্ঞতা হয়েছে বহুস্থানে (আবার বাড়ি এসেও কেউ কেউ পুঁথি দিয়ে গেছেন।)

নিজেদের বিষয়সম্পত্তি বা গুপ্তধনেব খোঁজ বাইরের লোক জেনে ফেলবে, এজনোও পুঁথি বা দলিলদস্তাবেজ কাউকে দেখানো হয় না । বর্ধমান জেলার উখড়ার কোন এক স্থানে নাগরী লিপির অজস্র পুঁথি আর পুরোনো দলিল দস্তাবেজ নেড়ে চেড়ে দেখার সময় কর্তৃপক্ষ কড়ানজর রাখেন, কোন 'নোট্' নেওয়া হচ্ছে কীনা তা দেখতে ।

পুঁথিকে নিয়ে এদেশের মানুষের নানা লোকবিশ্বাসের অন্ত নেই । বহু পুঁথি তাই নদীতে, পুকুরে বা জ্বলন্ত আগুনে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে । উৎকট ভক্তিবশতঃ নিয়মিত ফুল জল দিয়ে পুজো করে বহু পুঁথিকে নষ্ট করা হয়েছে । ৭৮ এর বন্যায় মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলী

জেলার নানা স্থানের হাজার হাজার পুঁথি ভেসে গেছে। সময়মত এসব পুঁথি সংগ্রহশালায় দান করলে বা আগ্রহী গবেষকের হাতে তুলে দিলে সেগুলি রক্ষা পেতো। অবশ্য কিছু উদার হৃদয় মানুষের করুণায় বহু পুঁথিই সময়মত রক্ষা পেয়েছে। পুরোনো ছাপা বই, হাতে লেখা যে কোন পুরোনো কাগজ সবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা পুঁথির গবেষকের কাছে সংস্কৃত পুঁথি 'অতি প্রয়োজনীয়' না হলেও অবশ্যই সংগ্রহ ও সংরক্ষণযোগ্য।

পুঁথির সন্ধান পাওয়া গেলেই তা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা জাতীয় কর্তব্য-যদি তা অনাদৃত অবস্থায় থাকে। মূল্য দিয়ে, উপহার দিয়ে, ছাপা বই দিয়ে পুঁথি পাওয়া যাবে। অনেক সময় ছলনার আশ্রয় নিয়েও পুঁথিকে রক্ষা করতে হবে। এদেশে মিশনারীরাই প্রথম হাতে লেখা পুঁথি সংগহ করে তা ছেপে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করে। যদিও উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। তবে রবীন্দ্রনাথই প্রথম পুঁথি সংগ্রহেব প্রতি আমাদের দৃষ্টি গভীরভাবে আকৃষ্ট করেন। তাঁর সংগৃহীত বেশ কিছু পুঁথি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে দেখেছি। বাংলা পুঁথি যে সব স্থানে আছে তাদের একটি নমুনা তালিকা নিম্নরূপ ঃ-

পশ্চিমবঙ্গ ঃ আনন্দ নিকেতন, নবাসন, হাওড়া। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম, কলকাতা। উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরী। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা। কোচবিহার সরকারী গ্রন্থাগার। কোচবিহার সাহিত্যসভা। জাতীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা। নবদ্বীপ টাউন লাইব্রেরী। পল্লীশ্রী গ্রন্থাগার, রাঢ় গবেষণা পর্ষদ, শান্তিনিকেতন। বরাহনগর পাঠবাড়ি শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দির। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। বর্ধমান সাহিত্যসভা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন। বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষৎ, বাঁকুড়া। মাহিয়াড়ি সাধারণ পাঠাগার, আঁদুল-মৌরী, হাওড়া। রতন লাইব্রেরী, সিউড়ি, বীবভূম (এখানকার সমস্ত পুঁথিই বিশ্বভারতীতে প্রদত্ত)। রাজনারায়ণ পাঠাগার, মেদিনীপুর। সাহিত্য পরিষৎ ও ঝাড়গ্রাম লাইব্রেরী, বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দিব, মেদিনীপুব। ববীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা। শরৎস্মৃতি মিউজিয়াম, পানিত্রাস (সামতাবেড়), হাওড়া। শিলিগুড়ি সাহিত্য পরিষৎ, শিলিগুড়ি। শ্রীরামপুর কলেজ কেরী লাইব্রেরী। সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা। সংস্কৃত কলেজ গ্রন্থাগার, কলকাতা। হেতমপুর রাজ লাইব্রেরী, হেতমপুর, বীরভূম ইত্যাদি।

ওড়িশা ঃ ওড়িশা মিউজিয়াম, ভুবনেশ্বর।

আসাম ঃ গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, গৌহাটি, আসাম।

ত্রিপুরা ঃ ত্রিপুরা সরকারী সংগ্রহশালা, আগরতলা।

বিহার ঃ পাটনা শ্রীচেতন্যপুস্তকালয়, গুলজারবাগ। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরপ্রদেশ ঃ কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, বেনারস।

বাংলাদেশ ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বাংলা একাডেমী। ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ। ঢাকা মিউজিয়াম। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। দৌলতপুর হিন্দু একাডেমী সংগ্রহ। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। রংপুর সাহিত্য পরিষৎ। রামমালা গ্রন্থাগার, কুমিল্লা।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, ব্যোমকেশ মুস্তাফী, দীনেশচন্দ্র সেন, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়,

সরসীকুমার সরস্বতী, নগেন্দ্রনাথ বসু, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মহম্মদ শহীদুল্লাহ, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, রমেশচন্দ্র মজুমদার, সুকুমার সেন, যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, পঞ্চানন মণ্ডল, হেমেন্দ্রনাথ পালিত, মানিকলাল সিংহ থেকে শুরু করে তারাপদ সাঁতরা, বিষ্ণুপদ পাণ্ডা, মালীবুড়ো এবং অক্ষয়কুমার কয়ালের চেষ্টায় এদেশের হাজার হাজার পুঁথি ও পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং আলোচনার আলোয় এসেছে। বাংলা সাহিত্যের বিশাল ক্ষেত্র জুড়ে ছড়িয়ে আছে মুসলীম-পুঁথিগুলি। মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রথম চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ত্রিপুরা ও তৎসন্নিহিত এলাকা থেকে হিন্দু-ইসলাম নির্বিশেষে সব ধরণের পুঁথি সংগ্রহ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথিশালায় রক্ষিত অজস্র মুসলীম পুঁথি প্রায় সবই তাঁরই সংগ্রহ। দেশের বাইরে লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী, ব্রিটিশ মিউজিয়াম, স্কুল অব ওরিয়েন্টাল এণ্ড আফ্রিকান স্টাডিস্ সংগ্রহে আছে বাংলা পুঁথি।

সংগৃহীত পুঁথির রক্ষণের বিষয়ে নিম্নরূপ কাজগুলি করণীয়

১. পত্রসংখ্যা অনুযায়ী প্রতিটি পুঁথি সাজানো (সমস্যা দেখা দেবে ফারসী ও আরবী হরফে লেখা পুঁথির ক্ষেত্রে। সেখানে অনেক পুঁথিতেই পত্রসংখ্যা নেই।)। আরবী-ফারসী হরফে লেখা বাংলা পুঁথি শেষ দিক থেকে পড়তে হয়। এসব মনে রেখে পুঁথি সাজাতে হবে।

২. শ্রেণী অনুযায়ী পৃথকীকরণ (Classification)

(ক) রামায়ণ, মহাভারত, মঙ্গলকাব্য, পাঁচালী, চরিতকথা, পদাবলী, ইসলামী কাব্য, রোমান্টিক কাব্য, তন্ত্রমন্ত্র ইত্যাদি।

(খ) লিপিসাল যুক্ত সম্পূর্ণ পুঁথি/অসম্পূর্ণ পুঁথি।

(গ) লিপিসালবিহীন সম্পূর্ণ পুঁথি/অসম্পূর্ণ পুঁথি।

(ঘ) খণ্ডিত/অখণ্ডিত পুঁথি।

(ঙ) পাটা ও পাতা চিত্রিত /অলঙ্কৃত কিনা।

৩. কীটনাশক দিয়ে শক্তকাগজে মুড়ে পুঁথি বেঁধে রাখা।

৪. প্রতিটি পুঁথির মোড়কের ওপর ও ভেতর নিম্নরূপ বিবরণ সমন্বিত কার্ড রাখতে হবে।

(ক) পুঁথির ক্রমিক সংখ্যা; (খ) পুঁথির নাম, ভাষা ও কবির নাম; (গ) পত্র সংখ্যা (Folio); (ঘ) খণ্ডিত/ অখণ্ডিত; (ঙ) আধার (Substance), অর্থাৎ তুলট পত্র তালপাতা বা অন্যকিছু। (চ) আকার; (ছ) লিপিসাল (খ্রীষ্টাব্দ অবশ্যই উল্লেখ), উল্লেখ না থাকলে আনুমানিক; (জ) প্রথম ও শেষ অংশ (Beginning and colophon); (ঝ) পুষ্পিকা (Post colophon Statement), (ঞ) সংগ্রাহক, প্রাপ্তিস্থান, প্রাপ্তিকাল, ক্রীত / প্রাপ্ত। (ট) বর্তমান অবস্থা (Appearance)।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাংলা পুঁথি সংগ্রহের পথপ্রদর্শক। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিংশবার্ষিক অধিবেশনে তিনি (৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১) সভাপতির ভাষণে বলেন —

'ভট্টাচার্য মহাশয় পুঁথি পড়িয়া পণ্ডিত হইয়াছিলেন, পৈতৃক পুঁথিগুলিকে প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় দেখিতেন, সর্বদা সেগুলিকে ঝাড়াঝুড়া করিতেন, পুরু কাপড়ে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া রাখিতেন।....তাঁহার ছেলে ইংরাজী স্কুলে পড়িতে গেল, ক্রমে চাকরি করিতে গেল, বাবার বড়ো আদরের জিনিষ পুঁথিগুলিকে রক্ষা করিল, ফেলিয়া দিল না। ভট্টাচার্য মহাশয়ের পৌত্র

অল্প ইংবাজী লেখাপড়া শিখিল, তার পরে চাকরি করিতে গেল; পুথি পাঁজির কোনো ধারও ধারিল না। পৌত্রবধূ বাড়ি আসিয়া দেখিলেন এক জায়গায় কত আবর্জনা রহিয়াছে। ছেঁড়া ময়লা কালো ন্যাকড়ায় জড়ানো কতকগুলা কাগজ রহিয়াছে, তিনি সেইগুলিকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিলেন। হয়তো রাঁধিবার সময় কাঁচা কাঠে ফুঁ দিতে দিতে সেই ধোঁয়ায় চোখ জ্বলিতে লাগিল, তখন পুথি অথবা তাহার পাটার কথা মনে পড়িল। সুবিধা পাইলেন তো একখানা পুথি উনানে দিয়া ফেলিলেন অথবা পুথির পাতাগুলি ফেলিয়া দিয়া বহুকালের শুষ্ক কাঠের পাটা দুখানি উনানে দিয়া সেদিনকার রান্না সারিয়া লইলেন। ১৯০৪ সালে একবার নবদ্বীপ গিয়াছিলাম; দেখিলাম একজনের বাড়ির পিছনে রাস্তার ধারে রাশীকৃত পুথির পাতা পচিতেছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, পাটাগুলি পোড়ানো হইয়াছে। বাড়ির গিন্নিমা সরস্বতীকে পোড়াতে চান না, তাই পুথিগুলি বাড়ির বাহিরে ফেলিয়া দিয়াছেন। যে বাড়ির গিন্নির মা সরস্বতীর উপর এতটুকু কৃপা নাই, তাঁহারা পুথির পাতা লইয়া কী করেন, অনায়াসে বুঝা যায়।'—ব. সা. প. প. ১ম সংখ্যা, ১৩২১।

এই প্রসঙ্গে তিনি এদেশে পুঁথি সংগ্রহের ইতিহাসে পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের পুরোহিত মধুসূদনের পুত্র রাধাকিষেণের ভারতীয় পুঁথি রক্ষা বিষয়ক উদ্যোগের কথাও বলেছেন। রাধাকিষেণের আবেদনে সাড়া দিয়ে তাৎকালিক ব্রিটিশ সরকার বিভিন্ন রাজ্যসরকারকে পুঁথি সংগ্রহের কাজের জন্য অর্থবরাদ্দ করেন এবং নির্দেশ দেন। বাংলার অর্থ এশিয়াটিক সোসাইটিকে দেওয়া হয়। দায়িত্ব গ্রহণ করেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র। ১৮৯১ তে তাঁর মৃত্যুর পর হরপ্রসাদ এই দায়িত্ব নেন। এর আগে, ১৮৮৬তে তিনি বেঙ্গল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক হয়েছেন। পুঁথি সংগ্রহ ও আলোচনায় তিনি সে সময় পরিচিত ব্যক্তিত্ব। রামাইভট্টের 'শূন্যপুরাণ', ময়ূরভট্টের 'ধর্মমঙ্গলের' মতো গুরুত্বপূর্ণ পুঁথি তিনি একসময় সংগ্রহ করেন। সে সময় নগেন্দ্রনাথ বসুও বাংলা পুঁথি সংগ্রহে রত। কুমিল্লা স্কুলের প্রধান শিক্ষক দীনেশচন্দ্র সেনকে সহায়করূপে পেলেন হরপ্রসাদ। ঐ সময় তিনি প্রথমবার নেপালে যান। ফিরে এসে লেখেন বিখ্যাত বই 'Discovery of living Buddhism in Bengal (1897 খ্রীঃ)।' কয়েকবার নেপাল গিয়ে তিনি 'চর্যাগীতিকোষ', 'ডাকার্ণব', 'সুভাষিত সংগ্রহ', 'দোহাকোষ পঞ্জিকা' সরোরুহবজ্রের 'দোহাকোষ', কৃষ্ণাচার্যের 'দোহাকোষ' ইত্যাদি পুঁথিগুলি সংগ্রহ করে আনেন (চর্যাপদের পুঁথিটির অনুলিপি করে আনেন তিনি। মূল পুঁথিটি নেপালের জাতীয় সংগ্রহশালায় আছে।)। শাস্ত্রী মহাশয়ের পূর্বোক্ত ভাষণের শেষ ছিলঃ-'পরিশ্রমকে পরিশ্রম মনে করিলে চলিবে না, অর্থকে অর্থ মনে করিলে চলিবে না। কায় মন চিত্ত লাগাইয়া পুথি খুঁজিতে হইবে ও পুথি পড়িতে হইবে।'

সেই সময় বা কিছু পর থেকেই বাংলার পুঁথি সংগ্রহের কাজ সীমিতভাবে হলেও চলেছিল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ দেশের তরুণ শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে ('ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ'- ১৩১২ বঙ্গাব্দ) বলেন 'দেশের কাব্যে, গানে ছড়ায়, প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষে, কীটদষ্ট পুঁথির জীর্ণপত্রে, গ্রাম্যপার্বণে, ব্রতকথায়, পল্লীর কৃষিকুটিরে.....দিনের পর দিন বিনা বেতনে বিনা পুরস্কারে খ্যাতিবিহীন কর্মে স্বদেশপ্রেমকে সার্থক করো।' বস্তুতপক্ষে পুঁথি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও

তার বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার কাজে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগ অবিস্মরণীয় । আদি ব্রাহ্মসমাজের নিতান্ত তরুনবয়সী সম্পাদকরূপেই বোধ হয় প্রাচীন পুঁথি ও পাণ্ডুলিপির সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় হয় । জমিদারী পরিচালনার কাজে উত্তরবঙ্গে অবস্থানকালে তিনি কিছু কিছু পুঁথি সংগ্রহ করেন । বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ স্থাপিত হলে তাঁরই প্রচেষ্টায় ঈশানচন্দ্র বসু পরিষদের জন্য বেতনভুক পুঁথি সংগ্রাহক নিযুক্ত হন এবং পরিষদের পুঁথিশালা স্থাপনে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী উদ্যোগী হন । তত্ত্ববোধিনী সভার পুঁথিগুলি নিজেই তিনি পরিষৎকে দান করেন । হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও বসন্তরঞ্জন রায়ের মত দুই বিশিষ্ট পণ্ডিত রবীন্দ্র অনুপ্রেরণাতেই প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ ও গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন । নিজের মানসকন্যা বিশ্বভারতীকে প্রাচ্যবিদ্যার উৎকৃষ্ট কেন্দ্ররূপে গড়ে তুলতে গিয়ে তিনি সেখানেও পুঁথি-পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ সংরক্ষণ ও গবেষণার পরিবেশ গড়ে তুলতে চাইলেন । ১৯২৩ এ বিশ্বভারতীতে 'পুঁথিবিভাগ' গড়ে তোলা হয় । আনন্দবাজার পত্রিকার ১৯২৩ সালের ৭ ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশিত সংবাদটি প্রাসঙ্গিকভাবেই স্মরণ করতে হয় ঃ- 'বিশ্বভারতী ও লুপ্তপ্রায় পুস্তক ঃ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের সংস্কৃত ও তত্তৎদেশীয় ভাষার প্রাচীন পুস্তকাবলীর সংরক্ষণের নিমিত্ত ডাঃ রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীতে উহা সংগ্রহ করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন । বরোদা লাইব্রেরীর মিঃ আর. এ. শাস্ত্রী সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া ওই প্রকার গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিতে স্বীকার করিয়াছেন। যাঁহাদের নিকট প্রাচীন লুপ্তপ্রায় পুস্তকের পাণ্ডুলিপি আছে, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতীতে ডাঃ রবীন্দ্রনাথের নিকট পাঠাইয়া দিলে সাদরে গ্রহণ করা হইবে ।' আচার্য বিধুশেখর শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন সেন, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাড়াও বেশ কয়েকজন অবাঙালী ব্যক্তিত্ব এই পুঁথি বিষয়ক রবীন্দ্র উদ্যোগের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েন । এমনকী সিলভ্যাঁ লেভি, মরিজ উইন্টারনিৎজ, মার্ক কলিন্স প্রমুখ বিদেশী পণ্ডিতরাও একাজে যোগ দেন। দক্ষিণ ভারতীয় পণ্ডিত অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী ছিলেন পুঁথি সংগ্রহে দক্ষ ব্যক্তিত্ব । 'Letter to the Editor in quest of rare Manuscript' শিরোনামে রবীন্দ্রনাথের একটি আবেদন প্রকাশিত হতে দেখা যায় 'বিহার হেরাল্ড' পত্রিকার ১৯.২ ১৯২৩ সংখ্যায় । এটির অংশবিশেষ নিম্নরূপঃ-

"Realising the urgent necessity of preserving old manuscripts of Sanskrit and Vernacular literature from destruction and disappearance from India, Viswa Bharati has undertaken to edit and utilise them for public benefit... .it is needless to say that any old manuscripts sent to us that have a literary or historical importance, will be gratefully received by our institution and preserved in Viswa Bharati."

কবিগুরুর এই আবেদনে কাজ হয়েছিল অনেকটাই । নানাজনের দান ও প্রচেষ্টায় কবির স্বপ্ন বিশ্বভারতীতে পুঁথি শালাটি দিনে দিনে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে । প্রাচীনপুঁথি নিয়ে গবেষণার একটি সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল বলেই সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, সুকুমার সেন, মনোমোহন ঘোষ, রামস্বামী আয়েঙ্গার প্রমুখ পণ্ডিতগণ এখানে গবেষণার কাজ করার সুযোগ পান । দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দ্বীপময় বহির্ভারত ও পারস্য থেকেও কবি নিজে বেশকিছু পুঁথি

সংগ্রহ করেন। পরবর্তীকালে পুঁথি সংগ্রহে আসেন নিত্যানন্দ বিনোদ গোস্বামী, সুখময় ভট্টাচার্য, শিল্পী নন্দলাল বসু এবং প্রবোধচন্দ্র বাগচী, বিশেষ করে পুঁথিপ্রাণ পঞ্চানন মণ্ডল। বিশ্বভারতীর পুঁথিশালায় যে সাত হাজারের মতো বাংলা পুঁথি আছে, তাব বেশীব ভাগই পঞ্চানন মণ্ডলের সংগ্রহ। রবীন্দ্র অনুপ্রেরণায় নিতান্ত তরুণ বয়সেই তিনি পুঁথির প্রতি আগ্রহী হন। তাঁর দীর্ঘকালীন পুঁথিগবেষণার ফসলস্বরূপ আমরা পেয়েছি চারখণ্ড ডেসক্রিপটিভ ক্যাটালগ 'পুঁথি পরিচয়', 'সাহিত্য প্রকাশিকা' গ্রন্থ, 'গোর্খবিজয়', 'চিঠিপত্রে সমাজচিত্র' দুখণ্ড ইত্যাদি পুঁথি ও পাণ্ডুলিপি বিষয়ক অসাধারণ মূল্যবান গ্রন্থাবলী।

একটি বেদনাময় অনুভূতি এদেশের পুঁথিপ্রেমীদের বোধ হয় যন্ত্রণা দিয়ে চলে এই কারণেঃ এদেশের লক্ষ লক্ষ পুঁথি তো দেশ ছেড়ে বিদেশে চলে গেছে। চীনা পরিব্রাজকদের সময় থেকে শুরু করে আজও পর্যন্ত তো ভারতীয় পুঁথির বিদেশযাত্রা অব্যাহত আছে। প্রাচীন কালের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। মধ্যযুগও তাই। আধুনিককালে সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতি হয়ে এসে (১৭৮৩ খ্রীঃ) এদেশে প্রচুর পুঁথি সংগ্রহকরেন স্যর উইলিয়াম জোন্স। সব না হলেও কিছুই কি তিনি নিজের দেশে নিয়ে যান নি? মার্ক অরেল স্টাইন, কর্নেল বাওয়ার, ম্যাক্সমুলার, এদেশের হাজার হাজার পুঁথি সংগ্রহ করেছেন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে। সেইসব পুঁথি ইউরোপ, আমেরিকা, রাশিয়ার সংগ্রহশালায় আছে। মহারাষ্ট্র সরকারে চাকরী করতে এসে ব্যুলার (১৮৬৩ খ্রীঃ) এদেশের হাজার হাজার পুঁথি সংগ্রহ করে নিয়ে গেছেন। এইসব বিদেশগত লক্ষাধিক পুঁথির মধ্যে বাংলা পুঁথি কি আদৌ ছিল না? ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর বাংলা পুঁথিগুলিতো এদেশ থেকেই নিয়ে যাওয়া।

পুঁথির তালিকা প্রকাশন সম্পর্কিত একটি বৃত্তান্ত এখানে তুলে ধরা হোল। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দেশের বই বিদেশে' (দেশ, ৪.৮.২০০২, পৃঃ ৩৩-৩৮) রচনা সূত্রে জানা যাচ্ছে, ড. পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ফ্রান্সের জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত বাংলা পুঁথিপত্রের একটি তালিকা প্রস্তুত কবেছেন (এই রচনা থেকেই জানা যাচ্ছে, আজো এদেশের মূল্যবান গ্রন্থসংগ্রহ কীভাবে বিদেশে চলে যাচ্ছে)। লণ্ডন থেকে ১২৪৫ বঙ্গাব্দে স্যর রবার্ট চেম্বার্স যে সংস্কৃত পুঁথিতালিকাটি প্রকাশ করেন, তাতে একটি বাংলা পুঁথির কথাও আছে। তবে১৩০৭ বঙ্গাব্দে (১৯০১) এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে বই ও সংস্কৃত পুঁথির যে তালিকাটি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রকাশ করেন, তাতে ৩৭টি বাংলা পুঁথির তালিকা দেখা যায়। বলা যেতে পারে, বোধহয় এটিই প্রথম বাংলা পুঁথির মুদ্রিত তালিকা। ১৩১০ বঙ্গাব্দে (১৯০৪ খ্রীঃ) এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে পণ্ডিত কুঞ্জবিহারী পণ্ডিতের সম্পাদনায়, হরপ্রসাদের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয় যে গ্রন্থ ও পুঁথির তালিকা তাতে ১০টি বাংলা পুঁথির পরিচয় স্থান পেয়েছিল। ১৩১১ বঙ্গাব্দে (১৯০৫ খ্রীঃ) জে. এফ. ব্লুমহার্ড সংকলিত, লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় লেখা পুঁথির তালিকা প্রকাশ করেন। এতে ২২টি বাংলা পুঁথির বিবরণ আছে। ক্রমিক সংখ্যা ২-৩, ৫-১৬, ১৮-২০, ৩৫-৩৯। ১৩২০ বঙ্গাব্দে (১৯১৪ খ্রীঃ) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে মুনশী শ্রীআবদুল করিম সঙ্কলিত পরিষৎ পুঁথিশালার 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ' ১ম খণ্ড ২য় সংখ্যা প্রকাশিত হয। এতে ভূমিকা লেখেন ব্যোমকেশ মুস্তফী। পরের বছর প্রকাশিত হয় মুনশী শ্রীআবদুল

করিমের সঙ্কলন, ঐ তালিকার ১ম খণ্ড ১ম সংখ্যা- ৪৩৩টি বাংলা পুঁথির বিবরণ সম্বলিত। সিউড়ী রতন লাইব্রেরীতে সংগৃহীত ২০১টি পুঁথির পরিচয় সম্বলিত 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ', ২য় খণ্ড ১ম সংখ্যা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে ১৩২৬ বঙ্গাব্দে (১৯২০ খ্রীঃ) শিবরতন মিত্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ঐ 'বিবরণের' ৩য় খণ্ড ১ম সংখ্যা ১৩৩০ বঙ্গাব্দে (১৯২৪ খ্রীঃ) প্রকাশিত হয় বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ও অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায়। ঐ বছরই লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর বাংলা ও অসমীয়া পুঁথির তালিকা প্রকাশ করেন ব্লুমহার্ট। এটি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে হামফ্রি মিলবেফার্ড কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এতে ২৭টি বাংলা পুঁথির পরিচয় দেওয়া আছে। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে (১৯২৬ খ্রীঃএর অক্টোবর) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুঁথি শালার ৪১৯টি রামায়ণ পুঁথির পরিচয় প্রকাশ করেন বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ও বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। ঐ বৎসরই 'পরিষৎ পুঁথিশালায় সংগৃহীত বাঙ্গলা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ' তৃতীয় খণ্ড দ্বিতীয় সংখ্যা বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ও তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য কর্তৃক সংকলিত ও অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়। এতে ১০০খানি পুঁথির পরিচয়ের সঙ্গে প্রাচীন পুঁথির বানান সম্পর্কে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের অভিমত এবং অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হয়। এই বিষয়টি বাংলা পুঁথির গবেষকদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে (১৯২৮ খ্রীঃ জানুয়ারী) বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, মনীন্দ্রমোহন বসু ও বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সংকলন The Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts, Vol II প্রকাশিত হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথিশালায় রক্ষিত 'বৈষ্ণব পদাবলী', 'চৈতন্যচরিতামৃত', 'চৈতন্যভাগবত', লোচনদাস ও জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল', পুঁথির পরিচয় মুদ্রিত হয়। এতে দীনেশচন্দ্র সেনের লেখা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও প্রকাশিত হয়- যা বাংলা পুঁথিসংগ্রহ বিষয়ক একটি প্রয়োজনীয় নিবন্ধ। ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে (১৯৩০, মে) ঐ গ্রন্থের ৩য় খণ্ড প্রকাশিত হয়। এটি মনীন্দ্রমোহন বসু কর্তৃক সংকলিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত ৫৩৯টি মহাভারত পুঁথির পরিচয় গ্রন্থ। ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে (১৯৩২ খ্রীঃ) 'পরিষৎ পুঁথিশালায় সংগৃহীত বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ' ৩য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা প্রকাশ করেন রামকমল সিংহ (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ)। এতে তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য সংকলিত, পরিষৎ পুঁথি শালার ২০০ টি বাংলা পুঁথির পরিচয় এবং চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও প্রকাশিত হয়। ১৩৪০ বঙ্গাব্দে কোচবিহার সাহিত্য সভা 'পুস্তকের তালিকা' প্রকাশ করে। ৪০টি বাংলা পুঁথির নাম ও গ্রন্থকারের নাম এতে তালিকাভুক্ত হয়। উত্তর আমেরিকার কনেক্‌টিকাটের নিউ হেভেন 'আমেরিকান ওরিয়েন্টাল সোসাইটি' থেকে ১৯৩৮ এ (১৩৪৪ বঙ্গাব্দে) এইচ. এল. পোলমেন কর্তৃক সংকলিত যে, 'A Census of Indic Manuscripts' প্রকাশিত হয়। তাতে ৬টি বাংলা পুঁথির পরিচয় দেওয়া হয়। ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে (১৯৪০ আগষ্ট) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথিশালার ২১১১টি পুঁথির তালিকা মনীন্দ্রমোহন বসু কর্তৃক সংকলিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয় (A general Catalogue of Bengali Manuscripts in the liabrary of University of Calcutta, Vol. I)। ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে (১৯৪১ খ্রীঃ, ডিসেম্বর) এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয় মহামহোপাধ্যায়

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক সংকলিত এবং যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত ৩৬৭টি বাংলা পুঁথির পরিচয় 'A Descriptive catalogue of Vernacular Manuscripts in the collections of the Royal Asiatic Society of Bengal'. এই গ্রন্থের 'Introduction' অংশে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের ভূমিকায় এদেশে পুঁথি সংগ্রহ, ক্রয় ও সংরক্ষণ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি বিবৃত। তিনি হরপ্রসাদের রচনাংশ উদ্ধৃত করে লিখেছেন "Formerly no care was taken of these Mss , and in consequence, several of them were either lost or destroyed. This neglect gave rise to a feeling of discontent. Moharaja Ranjit Singha, the Lion of the Punjab, had a priest named Madhusudan who had a rich collection. His son Radhakisan, who was on terms of great internacy with Sir John Lawrence, wrote to him in 1868, impressing upon him the necessity of preserving these literary materials throughout India. Sir Jhon Lawrence took up the idea and made arrangements with Provincial Governments for their collection and preservation " এতে হিন্দি, মারাঠী, ওড়িয়া, গুজরাটী ইত্যাদি ভাষার পুঁথির তালিকাও প্রকাশিত হয়।

১৩৫১ বঙ্গাব্দে (১৯৪৫) চিন্তাহরণ চক্রবর্তী সংকলিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পুঁথিশালায় রক্ষিত মহাভারত, রামায়ণ ও ভাগবত পুঁথির তালিকা 'বাঙ্গালা পুঁথির বিবরণ' প্রথমভাগ প্রকাশিত হয়। ১৩৫২ বঙ্গাব্দে (১৯৪৬) শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারে রক্ষিত ৪৭৯টি বাংলা পুঁথি ও একটি অসমীয়া পুঁথির পরিচিতি 'শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থমালা-২, বাঙ্গালা পুঁথির তালিকা প্রথম খণ্ড' প্রকাশিত হয়। তালিকাটি যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য কর্তৃক সংকলিত। ১৩৫৪ বঙ্গাব্দে (১৯৪৮) মৌলবী আলী আহমদের সংগৃহীত ৩৫৬টি পুঁথির তালিকা 'বাংলা কলমী পুঁথির বিবরণ ১ম ভাগ' প্রকাশিত হয়। এটি মৌলবী সাহেবেরই সংকলন। কোচবিহার স্টেট লাইব্রেরীতে রক্ষিত ১০২টি বাংলা পুঁথির তালিকা (A Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts Preserved in the State Liabrary of Cooch Behar) প্রকাশিত হয় শশীভূষণ দাশগুপ্তের সম্পাদনায়, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দে (১৯৪৮)।

১৩৫৮ বঙ্গাব্দে বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত হয় বিশ্বভারতী পুঁথিশালার ১৮১টি পুঁথির পরিচিতি মূলক অভিনব সংকলন 'পুঁথি পরিচয়' ১ম খণ্ড। সংকলক পঞ্চানন মণ্ডল।

এই অভিনব প্রচেষ্টার সুফলস্বরূপ, প্রকাশিত গ্রন্থের প্রথমেই পুঁথি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অভিমত এবং মুখবন্ধে প্রবোধচন্দ্র বাগচীর বক্তব্য মুদ্রিত হয়েছে। এরপর আছে বাংলা পুঁথিতে নিবেদিতপ্রাণ পঞ্চানন মণ্ডলের 'ভূমিকা', তত্ত্বে ও তথ্যে যা এক অসাধারণ রচনা। বাংলা পুঁথি নিয়ে যাঁরাই কাজ করতে যাবেন, তাঁদের প্রথমেই এই 'ভূমিকা', অংশটি পড়ে নিতে অনুরোধ জানাই। ওড়িশায় প্রচলিত সত্যনারায়ণ পাঁচালী 'কবি কর্ণের ষোলপালা' সম্পর্কে অধ্যাপক মণ্ডলের অভিমত বিষয়ে সকলে একমত হবেন না- হয়তো। কিন্তু বাংলা পুঁথির এমন প্রাঞ্জল পরিচিতি পাঠকের সামনে এই প্রথম যেভাবে তুলে ধরা হোল, তাতে বাংলা পুঁথিপ্রেমীর নিকট তিনি চিরনমস্য। বাংলা পুঁথির এই তালিকায় শ্রীরূপ, তুলসী ও কবীরের ভণিতায় লেখা তিনখানি হিন্দি দোহা (বি. ভা ৪৯৬) কেন স্থান পেয়েছে, সেই প্রশ্ন অবশ্য থেকে যায়।

১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয় সোসাইটিতে রক্ষিত বাংলা ও

অসমীয়া পুঁথির তালিকা 'A descriptive catalogue of the Vernacular Manuscripts in the collection of the Asiatic Society of Bengal.' এটির প্রচ্ছদপত্রের সঙ্গে টাইটেল পেজের গ্রন্থনাম ও প্রকাশকাল-নির্দেশ বিষয়ে গরমিল লক্ষ্যণীয় । এটির সংকলক প্রফুল্ল চন্দ্র পাল । এতে ৯৬টি বাংলা পুঁথি ও ১২টি অসমীয়া পুঁথির পরিচয় দেওয়া আছে ।

বর্তমান বাংলাদেশের রাজশাহী 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি ও যাদুঘর' থেকে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় মণীন্দ্রমোহন চৌধুরী কাব্যতীর্থ সংকলিত 'বাংলা পুথির তালিকা ।' এতে মিউজিয়ামের কিউরেটর মুহম্মদ মীরজাহানের নিবেদনাংশ ঃ-'খৃঃ অব্দ ১৯১০ সাল হইতে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত মোট ১৫৫৩ খানি পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত হইয়াছে । ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন, এই সমস্ত পাণ্ডুলিপির অধিকাংশই বহু সাহিত্যসেবীর নিকট অজ্ঞাত । ইহাতে অনুসন্ধান বিশারদ ও অনুসন্ধানের উপকরণের মধ্যে যে ব্যবধানের সৃষ্টি হয়, এই ব্যবধানের পরিসর যৎকিঞ্চিৎ হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যেই এই তালিকা প্রস্তুতির প্রয়াস ।' সমিতির এই সব পুঁথির সংগ্রাহক কুমার শরৎকুমার রায়, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, আহমদ শরীফ, ড. মুহম্মদ এনামুল হক প্রমুখের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়েছে । 'ভূমিকা' অংশে সংকলক মণীন্দ্রমোহনের অভিমত চিরস্মরণীয় । বাংলা পুঁথি বিষয়ে তাঁর বক্তব্য পুঁথিপ্রেমীদের নিকট 'বেদবাক্য' স্বরূপ

বাংলা পুঁথির বিশিষ্ট পরিচায়ক পঞ্চানন মণ্ডলের সংকলন 'পুঁথি পরিচয়' ২য় খণ্ড বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ তে । এতে আছে বিশ্বভারতী সংগ্রহের ২৫৩ খানি পুঁথির পরিচয় । এর ভূমিকাটিও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যে পরিপূর্ণ ।

১৩৬৫র ভাদ্রমাসে (সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে প্রকাশিত হয় 'আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সংকলিত পুঁথি পরিচিতি ।' সম্পাদক আহমদ শরীফ এই গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, 'বিগত শতকের শেষার্ধ থেকেই প্রাচীন সাহিত্য উদ্ধার-অভিযান চলছে । তার কিছুটা সরকারী, কিছুটা প্রাতিষ্ঠানিক আর কিছুটা ব্যক্তিগত । দুঃখের বিষয়, হিন্দুঘরের পুঁথিগুলো সংগৃহীত হল, কিন্তু মুসলমান ঘরে কেউ উঁকি মেরেও দেখলেন না । অথচ সর্বত্রই হিন্দু মুসলমানের একই গাঁয়ে বাস । এমন কি অনেকক্ষেত্রে তারা শুধু পাশাপাশি বাড়িতে নয়, ঘেঁষাঘেষি ঘরেও বাস করে । আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদই প্রথম অকৃত্রিম সাহিত্যানুরাগ ও স্বদেশপ্রাণতা নিয়ে হিন্দু-মুসলমান অবিশেষে সবার পুঁথি সংগ্রহে ব্রতী হন ।' এই গ্রন্থে ৫৮৫টি মুসলীম বাংলা পুঁথির পরিচিতি, পরিশিষ্টে 'অদ্যাবধি প্রকাশিত বাংলা পুঁথির বিবরণ ও তালিকা-গ্রন্থপঞ্জী' এবং বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের বিভিন্ন পুঁথিশালা ও পুঁথি সংগ্রহের তালিকা মুদ্রিত হয় ।

১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব্ পাকিস্তান' প্রকাশ করে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সংগৃহীত পুথির তালিকার ইংরেজী তর্জমা । ঢাকা থেকে প্রকাশিত এই তালিকায় ৫৮৪খানি পুঁথির পরিচয় লিপিবদ্ধ । ১৩৬৭ বঙ্গাব্দে (১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ও তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য সংকলিত 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ' ১ম খণ্ড প্রকাশিত হয় । এতে ৪০০টি পুঁথির পরিচয় প্রকাশিত হয় । ১৩৬৯ বঙ্গাব্দে (১৯৬৩ খ্রীঃ) প্রকাশিত হয় উক্ত বিবরণের ২য় খণ্ড, তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য সংকলিত । এতে ৩২৫টি পুঁথির

বিবরণ ও পরিচয় মুদ্রিত হয়। ১৩৬৯ বঙ্গাব্দে (১৯৬৩ খ্রীঃ) বিশ্বভারতী থেকে সেখানকার পুঁথিশালার ২৫১টি পুঁথির পরিচয় এবং 'নির্ঘন্ট' অংশে ৫০০টি পুঁথির নাম, রচয়িতা ইত্যাদি বিষয়ক তালিকা প্রকাশিত হয়।

১৩৭০ বঙ্গাব্দে (১৯৬৪ খ্রীঃ) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মণীন্দ্রমোহন বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র পালের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা পুঁথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুঁথির পরিচয়' ২য় খণ্ড। ২১১২ থেকে ৬৯২৭ ক্রমিক পর্যন্ত অর্থাৎ মোট ৪৮১৬টি পুঁথির নাম, রচয়িতা, পৃষ্ঠাসংখ্যা, কিছুসংখ্যক পুঁথির লিপিসাল এবং সম্পূর্ণ/অসম্পূর্ণ তথ্যগুলি বাংলা ও ইংরেজীতে তালিকাভুক্ত হয়ে প্রকাশিত। গ্রন্থের ভূমিকায় সম্পাদক শ্রীযুক্ত পাল পুঁথিশালার ইতিহাস এবং পুঁথি বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি পরিবেশন করলেও অনুসন্ধিৎসু পুঁথি গবেষকদের কাছে গ্রন্থখানি অনেকদিক থেকেই অসম্পূর্ণ মনে হয়েছে। কোন পুঁথিরই পুষ্পিকা বা বিশদ পরিচিতি এতে নেই। কোন বর্ণক্রমও এতে অনুসরণ করা হয় নি।

১৩৭৪ বঙ্গাব্দে (১৯৬৭ খ্রীঃ) বরানগর পাঠবাড়ি 'শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দির' থেকে শ্রীবৈষ্ণবচরণ দাস পঞ্চতীর্থ সম্পাদিত 'Descriptive Catalogue of Old Manuscripts in the Sree Sree Gouranga Grantha Mandir, Pathbari, Baranagar' প্রকাশিত হয়। ১১০০টি বাংলা এবং কিছুসংখ্যক মারাঠী, ওড়িয়া, হিন্দি ও ব্রজভাষার পুঁথির তালিকা এতে মুদ্রিত হয়। ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে কোচবিহার সাহিত্য সভা একটি সংগৃহীত পুঁথির তালিকা প্রকাশ করে। ১৯৭৪এ গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয় অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'মোক্ষদা সংগ্রহের বাঙলা পুথির তালিকা।' ১৫০০ পুঁথির বিশদ বিবরণ এতে মুদ্রিত হয়। ১৩৮৩ বঙ্গাব্দে (১৯৭৭ খ্রীঃ) ত্রিপুরা শিক্ষা অধিকার প্রকাশ করে সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'ত্রিপুবার পুথিপত্রের বর্ণনাত্মক তালিকা' ১ম খণ্ড। এই পুস্তিকাটির অন্যতম আকর্ষণ কয়েকটি পুঁথির পৃষ্ঠার চিত্র ও পুঁথিচিত্র হলেও তালিকাভুক্ত পুঁথিগুলির যথাযথ পরিচিতি এ থেকে লাভ করা যায় না। ঐ বছরই কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ১৬৪খানি পুঁথির বিশদ পরিচিতি মূলক 'A Descriptive Catalogue of the Bengali Manuscripts In the Collections of the Asiatic Society 'Part-I প্রকাশিত হয়। ১৯৭৮ এ এশিয়াটিক-সোসাইটিক থেকেই প্রকাশিত হয় দেশ বিদেশের বাংলা পুঁথির তালিকা 'Catalogus Catalogorum of Bengali Manuscripts' Vol I. অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত এই গ্রন্থখানি বাংলা পুঁথি গবেষকমাত্রের নিকটেই মূল্যবান। এই অসাধারণ গ্রন্থখানির ('বাংলা পুঁথির তালিকা সমন্বয়' নামেও গ্রন্থটি পরিচিত।) ভূমিকাটি ছাড়াও 'বাংলা পুঁথির লিপিকাল' নিবন্ধটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষৎ-এর বার্ষিক মুখপত্র 'মাধবী'তে একসময় সেখানকার পুঁথিশালায় সংগৃহীত পুঁথির একটি তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল। করে দিয়েছিলেন অধ্যাপক ভট্টাচার্য।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিতালিকা 'বাংলা পুথি' রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ও স্বাতীদাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ১৯৮৯ তে। ১০০টি পুঁথির পরিচয় সমন্বিত এই তালিকাটির প্রথম এবং প্রধান ত্রুটি, পুষ্পিকার হুবহু উদ্ধৃতি এতে নেই। তাছাড়া পুঁথির পাঠোদ্ধারেও ত্রুটি আছে।

৮ ও ৯ নং পুঁথি হওয়া উচিৎ ছিল 'বিদগ্ধমাধব'। এটি বৈষ্ণবকবি ও সাধক, বিভিন্ন বৈষ্ণবীয় পুঁথিলেখক যদুনন্দন দাসের এক বিখ্যাত গ্রন্থ। এই পুঁথির বিভিন্ন অনুলিপির শুরু হয়েছে এইভাবে : 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ।।' অথচ 'বাংলা পুঁথি' গ্রন্থে (পৃঃ ১১,১২) 'বিদগ্ধমাধবের' নামকরণ করা হয়েছে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায়নম্' এইভাবে। সম্ভবতঃ পুঁথির পাঠোদ্ধারেও ত্রুটি আছে। যেমন 'রাধাদি প্রণয় যাতেঃ ঘনসারসুবাসিতে'কে লেখা হয়েছে 'রাধাদি প্রলয় তাথে মনসার সুভাসিতে।' সম্পাদকদ্বয় মূলতসংস্কৃত শ্লোকাংশটি ('দধানারাধাদিপ্রণয়ঘনসারৈঃ সুরভিতাং') দেখলেই বিষয়টি বুঝতে পারতেন।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথিশালায় সংগৃহীত পুঁথির তালিকা 'A Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts', Vol I, (1990), Vol. II, III (1991), Vol. IV, V, (1991).। সম্পাদনা করেছেন ড. সুনীলকুমার ওঝা। এগুলিতে মোট ২০০টি পুঁথির পরিচিতি এবং বচনার বিশেষের উদ্ধৃতি আছে। কিন্তু এখানেও প্রাপ্ত পুঁথির পুষ্পিকাগুলি হুবহু তুলে দেওয়া হয নি, যদিও তার প্রয়োজন ছিল। এইসব প্রাজ্ঞ পুঁথিবিদ পুঁথির পুষ্পিকার ঐতিহাসিক, সামাজিক গুরুত্বের কথা কেন যে এড়িয়ে গেলেন, কে জানে। শোনা গেছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার কোন একটি বিভাগের মাধ্যমে জেলাভিত্তিক ব্যক্তিগত সংগ্রহের পুঁথির তালিকা প্রকাশ করতে উদ্যোগী হয়েছে। তরুন প্রত্নরসিক গবেষক শ্যামল বেরা এই ধরণের একটি তালিকাকবণের কাজ করছেন বলে শ্রুত। আশা করছি, এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে। যাই হোকনা কেন, এই সব নমস্য পুঁথিতাত্ত্বিকদের কৃত তালিকাগুলির গুরুত্ব চিরন্তন।

প্রসঙ্গক্রমে, কয়েকটি প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠানের মুদ্রিত পুঁথিতালিকার এক একটি পুঁথিব পরিচায়ক নমুনা অংশ এখানে তুলে দেওয়া হল :-

১. ক্রমিক ৩৬৫ ।। পুথি ৬৮৬ ।। মোহাম্মদ হানিফার লড়াই। রচয়িতা আবদুল হাকিম (রজ্জাক নন্দন ?)। রসুলের জীবৎ-কালীন দিগ্বিজয় কাহিনী। আরবী হরফে লেখা। আদ্যন্ত খণ্ডিত। পত্রাঙ্কনা থাকায় আরম্ভে কত পাতা নাই বলা যায় না। মোট ৪৭টি পত্র বিদ্যমান। ১১" × ৬½" পরিমিত কাগজের বহি। শতেক বৎসরের প্রাচীন। কবির নাম আবদুল হাকিম।

পুঁথির এই নাম দিলাম বটে কিন্তু ইহা ঠিক কোন পুঁথি.. ..নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না।......আবদুল হাকিমের 'রসুল বিজয়' এর অংশ হওয়ারই সম্ভাবনা।

প্রথম পত্রের আরম্ভ -'সবে মিলি খর্গধরি যুদ্ধে প্রবেসিল..........

শেষ পত্রে - 'লক্ষ লক্ষ চর্ম্ম মোর ফুটি আছে ঢাকি.......

ক্ষীন অঙ্গে ক্ষেপি মারে নির্ঘাৎ ।।'

ভণিতা - 'আবদুল হাকিম কহে পঞ্চালী পয়ার.......।'

-'আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সংকলিত পুঁথি পরিচিতি', সম্পাদক আহমদ শরীফ, বাঙলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮, পৃঃ ৪১২-৪১৩।

২. "২৩৬

Krisna Das

4958 নারদ সম্বাদ । Substance, countrymade paper, 13½ ×5 inches, Folio 23, Lines, 9 on a page. Extent in Slokas, 500 Chapter, Bengali, Date, B. S. 1231 (e. 1824 A. D.). Appearance, old and discoloured. Complete. Beginning :- শ্রীশ্রী কৃষ্ণ etc./ যথা নারদ সংবাদ লিখ্যতে । নমো নমো প্রভুমোর আদি সনাতন । ক্ষীরোদসাগরে বটপত্রেতে শয়ন । It ends thus :- শ্রীকৃষ্ণচরণপাদপদ্য করি আস । পুরাণ প্রমাণ রচিলেন কৃষ্ণদাস । Post colophon statement : জথাদৃষ্টমিত্যাদি । ইতি নারদ সম্বাদ সমাপ্ত । ইতি তারিখ সন ১২৩১ সাল তারিখ ২৯শে ফাল্গুন ।

See our number 4911. The present manuscript does not give the family account of the author.

'A Descriptive Catalogue of the Vernacular Manuscripts in the collections of The Royal Asiatic Society of Bengal' by Mahamohopadhyaya Haraprasad Shastri, C. I. E M. A. D L.ITT, F. A. S B Revised and edited by Jogendranath Gupta, Vol. IX, Calcutta, 1941, P, 233

৩. "২৫৮. চৈতন্যচরিতামৃত - মধ্যখণ্ড কৃষ্ণদাস কবিরাজ, ১ - ১০৫, ১০৭ - ১১৩, ১১৬-১৩৬, ১৪০, ১৫০-১৫৯, ১৮১, ১৮৩-২১৫, অসম্পূর্ণ, তুলোট ১৩-১৪ পঙক্তি, ১০।।× ৫।০ ইঞ্চি ।"

শেষ-'শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে জার আস । চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ।।

ইতি শ্রী চৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে আত্মারামেশ্চেতি

শ্লোকব্যাখান সনাতনানুগ্রহো নাম চতুর্বিংশতি পরিচ্ছেদ ।।' ২৪।।

-'বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ', ১ম খণ্ড, বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ও শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য সংকলিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কলিকাতা, ২য় সং পৌষ ১৩৬৭, পৃঃ ১৪৯ ।

৪. ২২০ মহাভারত (জানপর্ব), কাশীরাম দাস (১৩৪৩), পত্র ২৬ (১-২৬), আকার ১৬"× ৫"

(২৬ ক) কমলাকান্তের যুত হেতু যুজনার প্রিত বিরচিল কাশীরাম দাশ ।।

পুস্তকেষু নিএব্রা কথা লিখে মিত্তঞ্জঅ । শ্রীকৃষ্ণ ভজিলে শব পাপ হব ক্ষএ ।।

বাম্মণ কুলেতে জন্ম চক্রবর্ত্তী প্রধান। নিবাশ করি আছি আমী নাম কলাগ্রাম ।।

বাঙ্গালাতে জানি আমী কাগজ করিতে । পুস্তকের দোস কেহ না লইবে চিৰ্ত্তে ।।

ব্রাম্মণ চরণে শদা আমী-মাগী ঠাএগ্রী । জাহা হৈতে তরিলেন প্রভু গোবিন্দাই ।।

অশুদ্ধ আছএ জদি যুদ্ধ কর‍্যা দিবে। পুনপুন কহিনু তার উপায় লেখিবে ।।

জতনে লিখিলাম পুস্তক জে করিবে চুরি । বাপ হয় গৰ্দ্ধা তার মা হয় কুকুরি ।। জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো দোশ নাস্তীকং ভিমস্বামী রণে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রম ।। অতএব মহাশয়দিগে বলা যায় জে এহার দোশ জেন না লহ আমী অতী মুর্খু কিছুই জানা নাই আর বিশেষ জানা নাই আর পাঁচটি জানা নাইঃ অতএব কেহো দোশ দিবে নাই ।। সরকার গোহালপাড়া শাং কলাগ্রাম ইতী তাং ২০ আশ্বীন বেলা দুই ঘন্টা (২৬ ক) (২৬ খ) ৭ ' শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ স্বহায় এহা পুস্তক যে চুরি করে তাহাকে ঐ ঠাকুরজির দিৰ্ব্ব ।' - 'পুঁথি পরিচয়' ২য় খণ্ড, শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল সংকলিত বিশ্বভারতী, মাঘ ১৩৬৯, ফেব্রু, ১৯৬৩, পৃঃ ৩৯৯ ।

৫. 'বা. বো. মু. পুঁ. (কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ সংগৃহীত মুসলীম পুঁথি) নং ১৬৭। পুঁথির নামঃ রছুল বিজয় । রচয়িতা ঃ সেখ চান্দ । পত্রসংখ্যা ঃ ৭৪-৭৯, ১০৬-১০৭, ১২৮-১২৯, ১৩২-১৩৭, ১৫৫, ১৬১-১৬৩, ১৬৯-১৭৭ পাতা । খণ্ডিত। লিপিকাল ঃ ১২৫২-৫৩-৫৪ ত্রিপুরাব্দ । লিপিকরের নাম ঃ শ্রীমোহাম্মদ রৌওসন, সাং শ্রীবল্লভপুর । প্রাপ্তিস্থানঃ কুমিল্লা। মন্তব্য ঃ ১৬৭নং পুঁথিঃ ১০৬/খ পৃষ্ঠায় লেখকের নাম আছে । ৭৪/ক, ৭৬/ক, ১৭৫/ব পাতায় পুঁথির তারিখ আছে । হস্তাক্ষর সুন্দর । এই পুঁথিখানা চা দোকানের বেড়ায় লাগান ছিল। তাহা হইতে কতকগুলি পাতা উদ্ধার করা হইয়াছে । কতকগুলি পাতা বেড়া হইতে উঠানো সম্ভব হয় নাই ।'

-'বাংলা একাডেমী পুঁথি পরিচয়-১' সংকলন ও সম্পাদনা সুকুমার বিশ্বাস । বাংলা একাডেমী, ঢাকা । এপ্রিল ১৯৯৫, পৃঃ ২৬ ।

৬. ৬২ । সাবিত্রীচরিত্র । কবি কাশীরাম দাস । পুঁথি-সম্পূর্ণ । পত্র সংখ্যা ১-১২, প্রতিপৃষ্ঠা ৮. ৯, ১১ পঙক্তিতে লেখা । রচনাকাল ('লিপিকাল' হবে) ১২৫৬ সাল (বঙ্গাব্দ হবে) । তারিখ ১৯ মাঘ । লিপিকর-শ্রীরামসুন্দর সবকার । সাং মাঝিয়াগ্রাম, মৌজা খিলকানালি । পাঠক-শ্রীনন্দকুমার বণিক সদাগর । সাকিম খিলকানালি । তুলট কাগজ । মাপ ৩৪ × ১২ সেঃ মিঃ । পুঁথির আরম্ভ 'শ্রীগদাধর গৌরাঙ্গ', এরপব ৩০ ছত্র এবং পুঁথির শেষের ৯ ছত্রের উদ্ধৃতি প্রদত্ত ।

-'বাংলা পুঁথি' রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ও স্বাতীদাস সম্পাদিত, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৯, পৃঃ ৮১-৮৩ ।

৭. 'জগৎমঙ্গল' - গদাধর দাস খ/সা. প. প. ১৩০৬/১ম, ২৬০ (১১৬৫); বিশ্ব ১৩৯ (১২৬৬)। ঘ/ব. সা. ২৭৪ ; বরেন্দ্র. শ. ৪৪৮; বিশ্ব. ১৫৪, ৩৭২৪; মে. সা. ১০৩; শরৎ ২৯ ।' (স. প. প = সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা । বিশ্ব = বিশ্বভারতী । এরপব পুঁথির ক্রমিক ও লিপিসাল। ব. সা. = বর্ধমান সাহিত্যসভা সংগ্রহ । এরপর ক্রমিক । বরেন্দ্র. স. = বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি, রাজশাহী । এরপর পুঁথির ক্রমিক । মে. সা. = মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষৎ । শরৎ = শরৎ স্মৃতি সংগ্রহালয়, পানিত্রাস, হাওড়া ।

—'বাংলা পুঁথির তালিকা সমন্বয়' ১ম খণ্ড । শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য এম. এ. তত্ত্বরত্নাকর।' এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৭৮ । পৃঃ ৮০ ।)

৮. '২৩১২/১৫ 'গোবিন্দমঙ্গল উদ্ধব সংবাদ', দ্বিজ কবিচন্দ্র-পত্রসংখ্যা ১-১৬-১৩" × ৪১/৫" লিপিকাল ১২৩৮ বঙ্গাব্দ (১৮৩১ খ্রীঃ) সম্পূর্ণ । 'আরম্ভঃ বৃন্দাবন পাসরিল শুনহে উদ্ধব । সে লাল বিনদ কুঞ্জ বৃন্দাবন ভাব ।। নিভৃতে বসিয়া কৃষ্ণ উদ্ধব সহিত । ভাবিতে লাগিলা কৃষ্ণ গোপী সভার হিত ।।'

-'বরাহনগর শ্রীশ্রীপাঠবাড়ী শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দিরে সংরক্ষিত প্রাচীন পুঁথির বিবরণ ও তালিকা', সং শ্রীবৈষ্ণব চরণ দাস পঞ্চতীর্থ, ১৩৭৪, পৃঃ ১৯৪ ।

অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের অনেক সংগ্রহশালা এবং ব্যক্তিগত সংগ্রহে রক্ষিত পুঁথি বিজ্ঞানসম্মতভাবে তালিকাভুক্ত হয় নি । যেমন. একটি দৃষ্টান্ত মেদিনীপুর শহরের শতাব্দী প্রাচীন গ্রন্থাগার 'রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার' এবং মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষৎ সংগ্রহ (বিদ্যাসাগর

হল) । প্রথমোক্ত গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে ১২৫০, ১২৪৯, ১২৪৬ বঙ্গাব্দে লিপিকৃত কাশীরাম দাসের মহাভারতের বিভিন্ন পর্ব ; তমলুক রাজবাটীতে ১২০২ বঙ্গাব্দে লিপিকৃত গীতগোবিন্দ; আয়ুর্বেদচিকিৎসা, লক্ষ্মীচরিত্র, রামায়ণ, কয়েকটি ফার্সী কাব্যসহ তেইশটি পুঁথি । উপযুক্তভাবে তালিকাকরণ না হয়ে থাকার ফলে (যে তালিকা আছে তা যথাযথ নয়) গবেষকদের পক্ষে কাজে অসুবিধে দেখা যায় । এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলে রাখতে হবে । গ্রন্থাগারের কর্মীদের প্রাচীন পুঁথি বা পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে ভাল ধারণা থাকা দরকার । অনেক গ্রন্থাগারে, পুঁথি দেখতে গিয়ে দেখা গেছে, সেখানকার কর্মীরা পুঁথি বিষয়ে এতই স্পর্শকাতর হয়ে পড়েন যে পুঁথিতে হাতও দিতে দেন না, দূর থেকে দেখিয়ে দেন । এই ধরণের অসহযোগিতা কলকাতার বিভিন্ন বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান থেকেও পাওয়া গেছে বিভিন্ন সময়ে । নামোল্লেখ নিষ্প্রয়োজন । অথচ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পাঠক্রমে এই বিষয়টি তালিকাভুক্ত আছে বোধ হয় ।

যদিও বাংলা পুঁথির বিষয় নয়, তবুও যেহেতু ভারতীয় পুঁথি সংগ্রহের বিষয়, তাই বৃত্তান্ত কিঞ্চিৎ উল্লেখ্য । দাক্ষিণাত্যের মহীশূর রাজ্যের অধিপতি হায়দার আলির ব্যক্তিগত পুঁথি সংগ্রহ ছিল বিপুল । পরবর্তীকালে তাঁর পুত্র টিপু সুলতান মহীশূরের অধিপতি হলে তিনি পিতার পুস্তক সংগ্রহকে আরো বাড়িয়ে তোলেন । ১৭৯৯এর মে মাসে লর্ড ওয়েলেসলির নেতৃত্বে শ্রীরঙ্গপত্তম দুর্গ দখল করে ইংরেজরা যেমন প্রায় সাড়ে নশো কামান, লক্ষাধিক ছোট বড়ো বন্দুক, একশোর মতো বারুদখানা এবং টিপুর অজস্র ধনরত্ন দখল করে নিয়ে যায়, তেমনি নিয়ে যায় প্রায় দু'হাজার আরবী-ফারসী পুঁথি । এগুলি প্রথমে আনা হয় ফোর্ট উইলিয়ামে, তারপর সেই পুঁথি সংগ্রহের কিছু পাঠানো হয় ইংল্যাণ্ডে-যা নিয়ে পরে গড়ে ওঠে 'ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী'। কিছু পুঁথি এশিয়াটিক সোসাইটিকে দেওয়া হয় । বেশীরভাগ থাকে ফোর্ট উইলিয়ামে । সোসাইটির পুঁথিগুলির মধ্যে ছিল 'গুলিস্তান', শাহজাহানের স্বাক্ষরিত 'পদশানামা', কোরানের বিভিন্ন অংশ। প্রত্যেকটি পুঁথিই সুঅলঙ্কৃত । আরবী ও ফারসী পুঁথি ছাড়া, টিপুর সংগ্রহে ছিল হিন্দি ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার পুঁথি , গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব এবং কয়েকখানি অভিধান গ্রন্থের পুঁথি । পারস্যের কবি শেখ সাদির সতেরটি কাব্যের পুঁথিও ছিল টিপুর সংগ্রহে। আর ছিল বাবরের আত্মজীবনী 'তুজুক-ই-বাবরী'র ফারসী অনুবাদ এবং শাহজাহান পুত্র দারাসিকো কর্তৃক অনূদিত সংস্কৃত উপনিষদের ফারসী অনুবাদ 'শিরি আসারার ।'

পশ্চিমবঙ্গের আর একটি বিশিষ্ট পুঁথি-পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারি প্রাসাদের অন্তর্গত প্রায় দেড়শো বছরের প্রাচীন 'নিজামত গ্রন্থাগার' । এখানে আছে কয়েক হাজার দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সঙ্গে প্রায় দুহাজার হাতে লেখা পুঁথি । ১৮৬৪ সালে নবাব ফেরাদুন জা এর সময়ে এই গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠিত হয় । এইসব পুঁথি আরবী ও ফারসী বর্ণমালায় লেখা । এখানে আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী'র মূল পাণ্ডুলিপি, ইয়াকুত মুস্তারমের 'দেওয়ান-ই-লকিৎ' ছাড়াও আছে সুদৃশ্য অলঙ্করণে সমৃদ্ধ কুড়িটি কোরানের পুঁথি ।

পুঁথি হল 'সাহিত্যিক' পাণ্ডুলিপি । এর সংগ্রহ ও সংরক্ষণ নিয়ে এ পর্যন্ত এদেশে যেসব গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ দেখা গেছে, তদনুরূপ অবহেলা ঘটেছে 'অসাহিত্যিক' শ্রেণীভুক্ত দলিল, চিঠিপত্র, নথি, জমিদারী কাগজপত্র ইত্যাদি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও আলোচনার ক্ষেত্রে । অথচ

বাংলার অজ্ঞাত অনাদৃত সামাজিক ইতিহাসের উপকরণরূপে এইসব জীর্ণ কাগজপত্রের ঐতিহাসিক মূল্য অনেক আগেই স্বীকৃত। ১৯২২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত শিবরতন মিত্রের 'Types of Early Bengali prose' এই ধরণের পথপ্রদর্শক কর্ম। পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত এবং 'বিশ্বভারতী' থেকে প্রকাশিত 'চিঠিপত্রে সমাজচিত্র' দুখণ্ড (১৯৬৮, ১৯৫৩) গ্রন্থ অসাহিত্যিক পাণ্ডুলিপি সংক্রান্ত বিশিষ্ট, বিজ্ঞানসম্মত গ্রন্থ। ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ২৫০ বৎসর সময়কালের ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীরবর্তী কয়েকটি জেলায় প্রাপ্ত ৬৩২টি প্রাচীন চিঠিপত্র, তাদের পরিচিতি এবং তথ্যবিশ্লেষণ করা হয়েছে বই দুটিতে। এই গ্রন্থের 'মুখবন্ধে' আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন : "এইসব চিঠির মধ্যে পুরাতন কালের মানুষকে তাহার স্বরূপে ঠিকমতো এবং অতি নিবিড়ভাবে পাওয়া যায় বলিয়াই এগুলির প্রতি আমাদের আকর্ষণ হইয়া থাকে। পুরাতনের সম্বন্ধে আমাদের একটা স্বাভাবিক মোহ আছে এবং যে দিন চলিয়া গিয়াছে, সেদিনের ছোটখাটো খুঁটিনাটি কথা আমাদের কাছে বিস্ময়ের বস্তু হইয়া উঠে।......ইহার মধ্যে সাহিত্যরস আস্বাদন করা যায়, তাহা জীবনেরই প্রতিফলন বলিয়া উপন্যাস হইতে প্রাপ্ত রসের অনুরূপ (শান্তিনিকেতন, ২৮ জুলাই, ১৯৫৩)।"

কিছুদিন আগে মোহিত রায়ের 'নদীয়ার সমাজচিত্র' পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়েছে (মার্চ ১৯৯০। এতে আত্মবিক্রয়, বাগালি, বন্দক, কর্জ, গুরুগৃহ, বিবাহ ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের কয়েকটি প্রাচীন চিঠিপত্র এবং সেগুলির আলোচনা দেখা যায়। কাজটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। শ্যামল বেরার এ ধরণের একটি পুস্তিকা 'নথিপত্রে লোকজীবন' সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। নথিপত্রের ছবিসহ। কিন্তু এরপর ? বর্তমান লেখকের সংগ্রহে আছে সহস্রাধিক প্রাচীন অসাহিত্যিক লেখন। আরো নানাস্থানেও আছে। অথচ এইসব চিঠিপত্রের সংকলন করা বেশ জরুরী। কিন্তু উদ্যোগ তো দেখা যায় না। ঐতিহাসিক উপকরণের প্রতি এমন অবজ্ঞা বোধ হয় পৃথিবীর কোন দেশেই নেই।

তেরো

'সুবচনীর পালা'

সম্পাদিত রূপ

পুঁথির বিবরণ

'সুবচনীর পালা,' দ্বিজ শ্রীরামজীবন রচিত। পত্রসংখ্যা ১২, পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৪। তুলটপত্র। সম্পূর্ণ পুঁথি। আকার ৩০ সে.মি. × ১১ সে.মি.। লিপিসাল ১২৬৯ বঙ্গাব্দ (১৮৬২ খ্রীঃ)। লিপিকরের নামবিহীন পুঁথি। প্রতিটি পৃষ্ঠায় দশ ছত্র করে লিপি আছে। প্রতিপত্রের বামদিকের মার্জিনে লিপি 'সুবচনির পালা।' পুঁথির পুষ্পিকা সূত্রে জানা যায়, পুঁথিটি পঃ মেদিনীপুর জেলার তাৎকালিক চেতুয়া পরগণার (বর্তমানে ঘাটাল মহকুমার দাসপুর থানা) হাটগেছিয়া গ্রামের* জনৈক 'ময়েশচন্দ্র মাজী'র (মহেশ) পঠনার্থে লিখিত। ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বর্তমান গ্রন্থকার পুঁথিখানি হাটগেছিয়ার পার্শ্ববর্তী গ্রাম সাগরপুরের এক পাঁচালী গায়ক প্রয়াত হরনারায়ণ চক্রবর্তীর নিকট থেকে সংগ্রহ করেন। পুঁথির পুষ্পিকাসূত্রে একটি নতুন তথ্য অবগত হওয়া যায়। বর্তমানে কোশ্মীজোড় পঃ মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানান্তর্গত (জে. এল. নং ৬৫) কাঁকী নদী তীরবর্তী একটি গ্রাম। 'সাহেবী' যুগের একটি খোড়ো বাংলো আজো এখানে আছে। দাসপুরে থানা তৈরীর আগে কোশ্মীজোড়েই থানা তৈরী হয়ে থাকবে।

পুঁথির লিপি

লিপি দুর্বোধ্য নয়। তবে বিচিত্র বানানরীতির অনুসরণবশতঃ এতে বানান ভুলের অন্ত নেই। কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়ঃ

১. একটি ক্ষুদ্রবৃত্ত বর্ণের বামপাশে ওপরের অংশে অনুস্বারের ভূমিকা পালন করেছে।
২. 'ঊ' এর ব্যবহার নেই। সর্বত্রই 'উ'। যেমন 'উত্তর'।
৩. ড় বোঝাতে ড এবং ব ও র বোঝাতে 'ব' এর ব্যবহার।
৪. 'উ' কার বর্ণের নীচে 'ব'রূপে যুক্ত। যেমন কালু = কাল্ব।
৫. কয়েকটি বানানে একাধিক রীতি অনুসৃত। যেমন অতঃর্পর; অতর্পর; স্বার্দ্ধ; শ্রার্দ্ধ; স্যার্দ্ধ;
৬. 'শ' এর ব্যবহার নেই।

---

* বিপ্লবী শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর দিদি অপরূপাদেবীর (ভগিনীপতি অমৃতলাল রায়) শ্বশুরালয়। একাধিকবার ক্ষুদিরাম গ্রামে এসেছেন। অমৃতলালের বংশধরেরা আজো এ গ্রামে বসবাস করেন।

পরিচ্ছেদ

পুঁথির সর্বমোট পরিচ্ছেদ দশ। প্রতিটি পরিচ্ছেদের কাহিনীসূত্র নিম্নরূপ ঃ—

১. দেবদেবীর বন্দনা।
২. পুত্রহীন ব্রাহ্মণ রামভদ্রের গৃহত্যাগ ও পুত্রবর প্রার্থনা।
৩. দেবী সুবচনী কর্তৃক রামভদ্রকে বর দান।
৪. গৃহে ফিরে দেবীর পূজার আয়োজন বিষয়ে দেবী কর্তৃক ব্রাহ্মণকে নির্দেশ দানান্তে দেবীর অন্তর্ধ্যান।
৫. রামভদ্রের গৃহে প্রত্যাবর্তন, পূজানুষ্ঠান ও পুত্রলাভ।
৬. রামভদ্রের অকালমৃত্যু ও ব্রাহ্মণীর শোক।
৭. প্রতাপচন্দ্র মহারাজার পিতৃশ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণীর পুত্র অভিলাষকে প্রেরণ ও ভোজ্য গ্রহণ।
৮. অভিলাষ কর্তৃক রাজার হংস অপহরণ ও গৃহে রন্ধনান্তে মাংসভক্ষণ।
৯. কোটাল কর্তৃক ধৃত অভিলাষের রাজসমীপে আনয়ন ও বন্দীদশা।
১০. দেবী কর্তৃক রাজাকে স্বপ্নদান, অভিলাষের সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ ও গৃহে আগমনান্তে ব্রাহ্মণী কর্তৃক সুবচনীর পূজা আয়োজন।

কাব্য পরিচিতি

হিন্দু গৃহস্থের অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ, বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা ইত্যাদি শুভকার্য সম্পন্ন হবার পূর্বে বা পরে পরিবারের নিত্য শুভকামনায় দেবী সুবচনীর পূজা করা হয়। গোবরে নিকানো পরিচ্ছন্ন গৃহাঙ্গনে একটি ছোট্ট গর্ত খুঁড়ে তাতে দুধ ঢালা হয়। তাতে বসানো হয় পাথরের তৈরী সিঁদুর চর্চিত নোড়া। কলা দিয়ে ২১টি হাঁস করা হয় দেবীর বাহন। তার মধ্যে একটিকে খোঁড়া হাস করা হয়। পাঁচজন অথবা সাতজন সধবা স্ত্রীলোককে ('এয়ো') আহ্বান করে তাদের রীতিমত আপ্যায়ন ও ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়। ব্রাহ্মণ পূজা করে। পূজান্তে দেবী শুভদা বা সুবচনীর (শুভচণ্ডী) মাহাত্ম্যকাহিনীমূলক পাঁচালীটি পাঠ করে সকলকে শোনানো হয়। 'পুরোহিত দর্পণে' দেবীর ধ্যানমন্ত্রটি নিম্নরূপ -

> "ওঁ রক্তাঙ্গী চ চতুর্মুখী ত্রিনয়না রক্তাম্বরালঙ্কৃতা।
> পীনোত্তুঙ্গকুচা দুকুলবসনা হংসাধিরূঢ়াপরা।।
> ব্রহ্মানন্দময়ী কমণ্ডুল বরাভীতি প্রদানোৎসুকা।
> ধ্যেয়া সা শুভকারিণী সুবচনী সর্বাপদুজারিনী।।"

-'পুরোহিত দর্পণ' ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৮২২।

শুভদা বা সুবচনীর মাহাত্ম্যবিষয়ক কয়েকটি ক্ষুদ্রাকার পাঁচালীর পুঁথির সন্ধান মিলেছে। এর মধ্যে দ্বিজ মাধব (বা 'মাধবলতা'। কারো কারো মতে ইনি নাকি মহিলা। কিন্তু 'লতা' অর্থে তো 'লতিকা') বা মাধবদাস প্রমুখ কবির নাম উল্লেখ্য। দ্বিজ শ্রীরামজীবনের পুঁথিটি সম্ভবতঃ কবির স্বহস্তলিখিত আদর্শ পুঁথি, কোন অনুলিপি নয়।

কবি পরিচিতি

আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে কবি পুঁথিতে লিখেছেন-

'আরাণ্ডি গ্রামেতে ধাম শ্রীরামজীবন নাম
ভূরিচ্ছিষ্ট উপাধি যাহার ।
শুভদা চরণ ভাবি রচিল তনয় কবি
এ পুস্তক করহ উদ্ধার ।।'

সম্ভবতঃ তাৎকালিক জাহানাবাদ পরগণার (হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমা) আরাণ্ডি গ্রামে কবির বাস ছিল । তাঁর পূর্বপুরুষগণ ভূরিশ্রেষ্ঠ উপাধিতে ভূষিত ছিলেন । কবি আরো লিখেছেন-

'রাত্রিদিন ভাবি দ্বিজ অন্য নাহি মন । দ্বিজ পেলারামের পুত্র শ্রীরামজীবন ।।'.....
' শিশুকালে জননী মোর স্বর্গবাস হৈল । পিতামহী অনেক দুঃখে পালন করিল ।।
পিতামহীর চরণে অসংখ্য প্রণতি । সুবচনীর কথা ভেঙে করিলাম পুঁথি ।।'

কাব্যের প্রথমাংশে কবি 'বন্দনা পর্বে' নিজ বাসভূমির পার্শ্ববর্তী স্থানীয় দেবদেবীর বন্দনা করেছেন পঞ্চমুখে । আরাণ্ডি গ্রামের আঞ্চলিক ইতিহাস নির্মাণে এ পদ কটি মূল্যবান -

'খণ্ডচণ্ডী মাতা বন্দ গ্রামে উত্তর দিগে । দনুরায় ধর্ম্ম বন্দো গ্রামে মধ্যভাগে ।।
শান্তিনাথ শিব বন্দো হাতজোড় করি । মনসাকুমারী বন্দো জয় বিষহরি ।।
বাড়ির নিকটে বন্দো কালুরায়ের চরণ । কালী (য়) দমন করে সে তো ঘোড়া আরোহণ ।।'

এইভাবে কবি শীতলাকুমারী, মান্দারণের কালীমাতা, বাঁকুড়া রায়, স্বরূপনারায়ণ ধর্ম, কবির পারিবারিক কালীর বন্দনা করেছেন ।

কাব্যের কাহিনীর মধ্যে যে কিঞ্চিৎ ইতিহাসের ছোঁয়া আছে তা থেকেই কবির কাব্য রচনার কাল সম্পর্কে অনেকটাই নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায় । কবি একস্থানে বলেছেন -

'প্রতাপচন্দ্র মহারাজার পিতৃশ্রাদ্ধ দিনে । মহারাজা নিমন্ত্রণ করেন ব্রাহ্মণে ।।'

বর্ধমানরাজ প্রতাপচন্দ্র ১৮৫৬ খ্রীঃ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন । তাঁর পিতা রাজা তেজচন্দ্র । ১৮৩২ খ্রীঃ তিনি দেহরক্ষা করেন । আলোচ্য পুঁথিটি অনুলিখিত হয়েছে ১২৬৯ বঙ্গাব্দে বা ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে । সুতরাং কাব্যটি বর্ধমানরাজ প্রতাপচন্দ্রের রাজত্বকাল, ১৯শ শতকের প্রথমার্ধে রচিত হয় ।

কাহিনী সংক্ষেপ

প্রচলিত লোককথার অনুসরণে কবি আলোচ্য পুঁথিটি রচনা করেন । এর সংক্ষিপ্ত কাহিনীটি নিম্নরূপ ঃ-

বিরাটনগরের দরিদ্র ভিখারী ব্রাহ্মণ রামভদ্রের সন্তানাদি নেই । তাই তার দুঃখের অন্ত নেই । আত্মহত্যার ভয় দেখিয়ে পুত্রবর প্রার্থনায় সে শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্মা ও মহেশ্বরের কাছে গিয়ে বিফল হয়। শেষে মহেশ্বরের নির্দেশে দেবী সুবচনীকে বন্দনা করে সে পুত্রবর লাভ করে ঘরে ফেরে । ঘরে দেবীর পূজা করে যথাসময়ে সে পুত্রের পিতা হয় । নবজাতকের নাম রাখে অভিলাষ । পুত্রটির শিশুকালেই ব্রাহ্মণের একদিন অকালমৃত্যু হয় । এরপর বিধবা ব্রাহ্মণী অতিকষ্টে পুত্রটিকে লালন পালন করে । একদা প্রতাপচন্দ্র মহারাজার পিতৃশ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণভোজন উপলক্ষ্যে ব্রাহ্মণ তার পুত্রটিকেও পাঠায় । সেখান থেকে মহারাজার ভোজ্য নিয়ে ফেরার সময় ব্রাহ্মণপুত্র রাজার একটি হংস চুরি করে এনে বাড়িতে রান্না করে ভক্ষণ করলে কোটাল তাকে ধরে রাজার কাছে

নিয়ে যায় । রাজা তাকে কারাগারে বন্দী করে রাখেন ।দেবী সুবচনী স্বপ্নে রাজাকে ভয় দেখিয়ে বলেন 'ব্রাহ্মণসন্তানকে মুক্তি দাও । তার সঙ্গে নিজ কন্যার বিবাহ দাও । না হলে তোমাকে সবংশে ধ্বংস করব ।' রাজা ভীত হয়ে তাই করেন । রাজকন্যাকে বিবাহ করে ব্রাহ্মণপুত্র জননীর কাছে ফিরে আসে । ব্রাহ্মণী আনন্দিত মনে নিয়মমত দেবী সুবচনীর পূজা করে ।

শব্দটীকা

পুঁথিটিতে বানানে বহু ভুল ও বৈচিত্র্য আছে । শব্দগুলি অবিকৃতভাবে তুলে দেওয়া হল এবং প্রয়োজনবোধে কিছু কিছু পরিচিতিও দেওয়া হল ঃ-

অতঃপর, অতর্পর, অজ্ঞান, অসংঙ্খ, অবস, অবসেস, আস্চনা-আচমন; আটকলাই-শিশুজন্মের আটদিন পরে অনুষ্ঠিত লোক অনুষ্ঠান বিশেষ; উর্ত্তর, উপ, উর্ত্তরিলা, উদ্ধারি, উপজিল, উর্চ্চস্বরি, উর্দ্দেশ, এয় - এয়ো বা সধবা নারী, কাম্ব, ক্রৃপামই, কৃমেকে, কেন্দ্যা, ক্রন্দন, খিন, খেউরি, খাওায়, গআয়, গ্রিহে, গোমঞি, গত্তবতি, ঘুষয়ে - ঘোষণা করে; চালুদান - চালের.দান; জিউ, জাহার জে, জাবে, জিবন, জেজন, জমপাসে, জেইজন, জর্ম্ম, জলন্ত, তিষ্টায়, তর্চ্ছনা, দসভূজ্যা, দৃড, দবসন, দু'খ, দ্বহে - দোঁহে; দ্বর্বল - দুর্বল, ধম্মা , ধান্ব, নেঞ্জ - ন্যাহ্য; পুন্ন্য, পিত্যা, পুজ, পুথি, পশু, পর্ম্ম, পিত্যামহি, পির্ত্তয় - প্রত্যয়; পুষ্কর্নি - পুষ্করিণী; পদ পিক্ষালন - পা ধোয়া; পিথিবি, প্রিতিবাসি, পূর্ব্বার্জিত, পাঁচুটে - শিশুজন্মের পাঁচদিন পরের রাঢ়ীয় লোক উৎসব ; পাঁসকুড়্যা - ছাইফেলার স্থান ; বিসহরি, বির্দ্ধ, বিক্ষতলে, বিস্বনাথ, বিষ্ণুসম্মা, বুলি - কথা, ঘোরা ; ব্রিত - ব্রত ; ভিঙ্গার - লম্বা নলযুক্ত জলপাত্র বা গাড়ু ; ভিক্ষ্যা, ভংঙ্গ, ভোজনা - অন্নপ্রাশন ; ভূরিচ্ছিষ্ট - ভূরিশ্রেষ্ঠ ; মসিক - মুষিক, মর্দ্ধ - মধ্য ; মান্দারন - মান্দারাণ : মড়মতি - মূঢ়মতি ; মখ - মুখ ; মির্থা, মির্ত্তকাল - মৃত্যুকাল ; মর্ত্তি, মড়ি - মুড়ি ; মদ্ধাহ্ন - মধ্যাহ্ন ; মচ্ছা - মূর্চ্ছা ; মক্ত - মুক্ত; য়েনে - এনে ; স্মরস্মতি - সরস্বতী ; সমুদ্র, সিতলাকুমারী, স্বরূপিনি, সুর্দ্দ, সুর্দ্ধ, সিগ্রগতি, সার্দ্ধ, সিসু, স্মর্গো, স্ত্রান - স্নান ; স্বরির, যুর্য্য - সূর্য্য ; স্বার্দ্ধদান, হলিদা - হরিদ্রা ; হিদয় হিষ্টমখি - হৃষ্টমুখী । (পুঁথিটি বিষয়ে প্রথম আলোচনা ঃ 'একটি অপ্রচলিত কাব্য' ত্রিপুরা বসু, ইতিহাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৫ম বর্ষ, ১ম-৩য় সংখ্যা, বৈশাখ-চৈত্র, ১৩৭৮) ।

সম্পাদিত পাঠ

৭ শ্রী শ্রী রাধাগোবিন্দ জীউ ।। অথো সুবচনীর ব্রতকথা লিক্ষতে ।।
প্রণমহ গণপতি হরের নন্দন । একদণ্ড গজরক্ত মুষিক বাহন ।।
অতঃপর বন্দি মাতা সারদা চরণ । যাহার কৃপায় হয় গুরুপদে মন ।।
লক্ষ্মী সরস্বতী বন্দো সমুদ্রের তীরে । যাহার কৃপায় হয় ধনধান্য ঘরে ।।
লক্ষ্মীদেবী কৃপাময়ী হয় যে যাহারে । সর্বত্রে তেজই সেই ভয় করে কারে ।।
তারপর বন্দিব আমি মাতা দশভুজা । মহিষ মেষেতে যার অকালেতে পূজা ।।
খণ্ডচণ্ডী মাতা বন্দো গ্রামে উত্তরদিগে । দনুরায় ধর্ম্ম বন্দো গ্রামে মধ্যভাগে ।।
শান্তিনাথ শিব বন্দো হাতজোড় করি । মনসাকুমারী বন্দো জয় বিষহরি ।।
বাড়ির নিকটে বন্দো কালুরায়ের চরণ । কালী [য়] দমন করে সে তো ঘোড়া আরোহন ।।

শীতলাকুমারী বন্দো হয়্যা সাবধান । মান্দা [রা]ণের কালীমাতা হয় অধিষ্ঠান ।।
বাঁকুড়া রায় বন্দো গ্রামের পশ্চিমদিগে । স্বরূপনারায়ণ বন্দো সভাকার আগে ।।
নিজবাটীর কালি বন্দো হয়্যা সাবধান । আমি অতি মূঢ়মতি দিয় দিব্যজ্ঞান ।। * ।। * ।।
তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আর । আমি অতি পাপমতি সেবক তোমার ।।
মাতাপিতা বন্দিলাম দৃঢ় করি মন । পিতামহ বন্দি পিতামহীর চরণ ।।
মাতামহ পিতামহী করিল পালন । এক্ষণে ভরসা যে বিমাতার চরণ ।।
নিজগ্রামের দেবদেবী প্রণমিহ সভে । তারপর বন্দিব তেত্রিশ কোটি দেবে ।।
অতঃপব বন্দি আমি অশুভ নাশিনী । অজ্ঞানের অন্তরে আনন্দস্বরূপিনী ।।
জয় দিয় পূজা সভে জগতের মাতা । শুদ্ধভাবে শুন সবে সুবচনীর কথা ।।
দূরে যাবে দুঃখ সুখ করিলে স্তবন । দয়াময়ি দরিদ্রতা করিবে ভঞ্জন ।।
আমি অতি দুঃখী মাগো তুমি কর দয়া । সুবচনী রাখ মোরে দিয়া পদছায়া ।।
বন্দনা বন্দিতে ভাই পুঁথি বেড়ে যায় । অসংখ্য প্রণাম মোর সুবচনীর পায় ।।
পুঁথি করি বলি দ্বিজ রামজীবন ভাবে । বন্দনা হইল সায় হরি বল সভে ।। ১ ।। * ।।

রামভদ্র বলি দ্বিজ বিরাটনগরে । ভিক্ষা মাগিয়া সে দিন গুজরান করে ।।
কন্যা পুত্র নাঞি দ্বিজ ভাবে রাত্রি দিন । ভাবিতে গুণিতে তার তনু হৈল ক্ষীণ ।।
ধিক থাকু যেই লোকের নাহিক সন্তান । তাহারে সকল লোক করে পশুজ্ঞান ।।
পুত্রমুখ যে জন না করে দরশন । যমপাশে বান্ধা সেই থাকে অনুক্ষণ ।।
পুত্রেব লাগিয়া দেখ রঞ্জাবতী বাণী । শালে ভব দিয়া প্রাণ ত্যজিল পরাণি ।।
তার ধর্মঠাকুর হইল অনুকূলে । পুত্রবর পায়্যা বামা চাম্পায়ের কূলে ।।
তার কথা কলিতে ঘুষয়ে সর্বজন । যার পুত্র নাই তার বিফল জীবন ।।
প্রভাতে উঠিয়া তার না দেখে বদন । ভরথমন্ডলে তার বাঁচা অকারণ ।।
তেমতি আমার দশা বিধাতা করিল । জনম আমাব মিথ্যা বিফল হইল ।।
পুত্রবান যেই জন সফল জীবন । পুণ্যবান বলে যে তাহারে সর্বজন ।।
পড়িয়া শুনিয়া পুত্র হয় সুপুরুষ । গয়ায় পিণ্ড দান করে ধরে তিন কুশ ।।
পাণ্ডবের পুত্র নাই স্বর্গ হৈল নাই । এইসব পুরাণ কথা শুন সবভাই ।।
পিণ্ডদান মাত্র পিতা হয় স্বর্গগামী । ভারতমণ্ডলে লিখে এইসব শুনি ।।
কেন বিধি কপালেতে না লিখে সন্তান । তাহার উপরে হত্যা ত্যজিব জীবন ।।
শ্রীবিষ্ণু বলিয়া পূজা করেন ব্রাহ্মণ । ভক্তি দেখি তুষ্ট হয়ে আইল নারায়ণ ।।
ভারথ মণ্ডলে মোবে জন্মাইলে কেন । ধন নাই ধান্য নাই নাহিক সন্তান ।।
কিসের লাগিয়া বিধি জন্মাইল মোরে । ব্রহ্মহত্যা দিব আজি তোমার উপরে ।।
নহে এক পুত্রবর দেহ দামোদর । যেখানে মরিব হত্যা তোমার উপর ।।
শ্রীকৃষ্ণ বলেন তুমি শুন দ্বিজবর । ভাগ্যেতে নাহিক তোর কিবা দিব বর ।।
যখন তোমার জন্ম হইল ভূতলে । পুত্র তোমার বিধি না লিখিল কপালে ।।

শ্রীকৃষ্ণ বলেন যাহ ব্রহ্মার নগর । সেখানেতে গেলে তুমি পাবে পুত্রবর ।।
বিষ্ণুর বচন শুনি করিলা গমন । উত্তরিলা যথা আছে মরালবাহন ।।
সৃষ্টিকর্তা তুমি প্রভু সংসারের সার । পুত্রবর দিয়া আমায় করহ উদ্ধার ।।
শ্রীবিষ্ণু বলেন দ্বিজ বলিহে তোমায় । পুত্র বর দিতে ভার নাহিক আমায় ।।
শীঘ্রগতি যাহ তুমি মহে[শে]র স্থানে । স্বরূপে তোমারে দ্বিজ কহিনু নিদানে ।।
ব্রহ্মার বচন শুনি করিলা গমন । শীঘ্রগতি পাইল গিয়া মহেশভবন ।।
তুমি দেব বিশ্বনাথ গোলোকের পতি । পুত্রবর দিয়া আমার ঘুচাহ দুর্গতি ।।
উষায় বর দিলে বাণরাজার ঘরে । সেইরূপে বর তুমি দেহনা আমারে ।।
নাহি দিবে বর প্রভু শুনহ উত্তর । ব্রহ্মহত্যা দিব আজি তোমার উপর ।।
এত কটূর্ত্তর যদি বলিল ব্রাহ্মণ । প্রবোধ বচনে তারে বলে ত্রিলোচন ।।
ওহে দ্বিজ মোর বাক্য কর অবগতি । পুত্রবর দিতে নাই আমার শকতি ।।
যেকালে তোমার জন্ম হইল ভূতলে । পুত্র তোমার বিধি না লিখিল কপালে ।।
পূর্বার্জিত বিদ্যা পুত্র পূর্বার্জিত ধন । কার সাধ্য বর দিতে পারিবে এখন ।।
একযুক্তি বলি শুন দ্বিজ গুণমণি । যদি তোমায় অনুকূল হন সুবচনী ।।
তাহার চরণপদ্ম করহ ভাবনা । সন্তানের বর দিবেন পুরাবে বাসনা ।।
উপদেশ পায়্যা তবে দ্বিজ গুণমণি । কতদিনে পাব আমি দ্বিজ সুবচনী ।।
রাত্রিদিন ভাবি দ্বিজ অন্য নাহি মন । দ্বিজ পেলারামের পুত্র শ্রীরামজীবন ।। ২ ।। * ।।

শিশুকালে জননী মোর স্বর্গবাস হৈল । পিতামহী অনেক দুঃখে পালন করিল ।।
পিতামহীর চরণেতে অসংখ্য প্রণতি । সুবচনীর কথা ভেঙে করিলাম পুঁথি ।।
ভাবিতে ভাবিতে দ্বিজ করিল গমন । প্রবেশ করিল গিয়া গহন কানন ।।
পুত্রের লাগিয়া আমি ত্যজিব জীবন । পুত্র বিনে সংসারেতে আর নাহি ধন ।।
এতেক ভাবিয়া দ্বিজ বনে বনে ফিরে । বাঘে নাহি খায় তারে মহিষে নাহি মারে ।।
বনে বনে ফিরে বিপ্র তিষ্টায় আকুল । কাননে তুলিল দ্বিজ চম্পকের ফুল ।।
স্নান করি পূজে দ্বিজ দেবী সুবচনী । ঘাটকূলে বনফুলে পূজেন ভবানী ।।
পূজিয়া দেবীর পদ ভাবেন ব্রাহ্মণ । অর্চণা [?] করিয়া কেন করিল ভক্ষণ ।।
বাত্রি দিন ভাবি মোর তনু শেষ হৈল । প্রাণেতে ত্যজিব আমি খাইয়া গরল ।।
বৃক্ষতলে শয়ন কবিল দ্বিজবর । গড়াগড়ি যান দ্বিজ ধূলায় ধূসর ।।
বিষ্ণুশর্মা নামে দ্বিজ মথুরা নগরে । ফকির বেশেতে বর দিলেন তাহারে ।।
প্রসাদে রাখিলা কৃষ্ণ যেমন প্রকারে । সুবচনী চলিলেন রাখিতে তাহাবে ।।
মায়াপাতি হৈল মাতা বৃদ্ধ যে ব্রাহ্মণী । সিংহলেতে শ্রীমন্তেরে রাখিলা যেমনি ।।
কাতর দেখিয়া দ্বিজে দয়া উপজিল । বৃক্ষতলে ব্রাহ্মণের শিয়রে বসিল ।।
নিদ্রায় আকুল দ্বিজ হয়্যা অচেতন । শিয়রে বসিয়া মাতা কহেন বচন ।।
গা তুল গা তুল দ্বিজ ডাকে সুবচনী । আমার লাগিয়া তোমার ব্যাকুল পরাণি ।।

কিসের লাগিয়া ভাব দ্বিজ গুণমণি । বর দিতে তোমারে আইলাম সুবচনী ।।
নিরাহার থাক তুমি কিসের লাগিয়া । তোমার দুঃখ দেখে মোর বিদরে হিয়া ।।
তোমার লাগিয়া বাপু জরতী ব্রাহ্মণী । নিদ্রা ত্যজি উঠ বাপু দেখ দ্বিজমণি ।।
যে বর মাগিবে তুমি সেইবর পাবে । কলিতে আমার পূজা প্রচার করিবে ।।
তোমারে দেখিয়া আমার বড় হৈল দয়া । আমি সুবচনী হই নিদ্রা যে ত্যজিয়া ।।
পদ্মহাত আপনি বুলাইল তার গায় । নিদ্রাভঙ্গ হয়্যা দ্বিজ চারিপানে চায় ।।
দেখিল শিয়রে বসি জরতী ব্রাহ্মণী । তাহারে জিজ্ঞাসা করে ব্রাহ্মণ আপনি ।।
কে তুমি হেথায় কেন বল না আমারে । নহে হত্যা দিব আজি তোমার উপরে ।।
এতেক শুনিয়া মাতা বলেন তখন । আমি সুবচনী তুমি শোনরে ব্রাহ্মণ ।।
কিসের লাগিয়া তুমি পূজিলে আমারে । বরদান দিতে আমি এলাম তোমারে ।।
তোরে বর দিয়া আমি যাব শীঘ্রগতি । খণ্ডিব সকল দুখ ঘুচাব দুর্গতি ।।
বর মাগ শীঘ্রগতি না কর বিলম্ব । জোড়হাথে কহে দ্বিজ হৃদয়ে আনন্দ ।।
তুমি সুবচনী আমি জানিব কেমনে । নিজমূর্তি হৈলে মাতা প্রত্যয় হয় মনে ।।
তবে বর মাগি লব চরণে তোমারে । হাত জোড় করি দ্বিজ কহেন তাহারে ।।
সদয় হইয়া মাতা নিজরূপ ধরে । সমুখ হইতে মাতা বলেন তাহারে ।।
আছিল সমুখে দ্বিজ বিমুখ হইল । রামজীবন কহে রূপ দেখাইতে হইল ।। ৩ ।। * ।।

এতশুনি মহামায়া নিজমূর্তি ধরে । হংসরাজ বাহন সেতো পদ্ম দুই করে ।।
দেখহ ব্রাহ্মণ আমি দেবী সুবচনী । বর দিতে তোরে আমি এলাম ধরণী ।।
মূর্তি দেখি দ্বিজবর লোটায় ধরণী । অপরাধ ক্ষমা কর দেবী সুবচনী ।।
পূজিনু তোমারে আমি বনফুল তুলি । তোমার লাগিয়া আমি বনে বনে বুলি ।।
মহামায়া বলে দ্বিজ মাগি লহ বর । তোরে বর দিয়া যাব কৈলাস শিখর ।।
তুমি সর্ব চরাচব জানিলাম আমি । পুত্রবর ক্ষেমকান্তি দেহ মাগো তুমি ।।
পুত্রের লাগিয়া মাগো করি করি আরাধনা । পুত্র বর দিয়া মাগো পূরাহ বাসনা ।।
সন্তান হইবে তোমার বর দিলাম আমি । গৃহে গিয়া মোর পূজা কর গিয়া তুমি ।।
পূজার বিধান বলি শুন দিয়া মন । গোময় দিয়া মার্জনা করিবে উঠান ।।
চিত্র বিচিত্র করি আলপনা দিবে । দুগ্ধের পুষ্করিণী করি নড়া বসাইবে ।।
একবিংশতি হংস করিবে লিখন । তার মধ্যে খোঁড়া হংস আমার বাহন ।।
আতপ ধান্যের উপর ঘট বসাইবে । ঘটে আরাধনা করি সংকল্প করিবে ।।
পঞ্চদেবে পঞ্চপূজা পঞ্চউপচারে । পশ্চাতে আমার পূজা সাধ্য অনুসারে ।।
ধূপ দীপ দিয়া পূজা করিবে পূজন। শ্রীরাম পূজিল যেন বধিতে রাবণ ।।
সাত পাঁচ কিংবা নয় এয়ো ডাকাইবে । পূজা সাঙ্গ হৈলে ঘটে বিসর্জন দিবে ।।
অতঃপর এয়োগণের ধোয়াবে চরণ । নেতের আঁচল দিয়া করিবে মার্জন ।।
হরিদ্রা আবাটা তৈল কপালে সিঁদুর । পরে পান গুয়া রম্ভা দিবেক প্রচুর ।।

সরা পুরি খইমুড়ি দিবে সবাকারে । বিধি কহিলাম এই পূজ গিয়া ঘরে ।।
আর এক কথা দ্বিজ মন দিয়া শুন । পুত্র কোলে করি তোর হইবে মরণ ।।
এতেক বলিয়া মাতা হইলা অন্তর্ধ্যান । ভূমেতে পড়িয়া দ্বিজ গড়াগড়ি যান ।।
গড়াগড়ি দিয়ে দ্বিজ চারিপানে চায় । বিষাদ ভাবিয়া বিপ্র করে হায় হায় ।।
মোরে বর দিয়া মাতা গেলে কোথাকারে । ব্যাকুল হইয়া দ্বিজ ডাকে বারে বারে ।।
এতেক ভাবিয়া দ্বিজ গমন কবিল । শুভদা চরণ পূজ রামজী বলিল ।। ৪ ।। * ।।

নিজবাসে উপনীত হৈল দ্বিজমণি । ব্যস্ত হয়্যা আসন আনি দিলেন ব্রাহ্মণী ।।
পদ প্রক্ষালনে দিল ভৃঙ্গারেব জল । নেতের আঁচলে পুঁছে চরণকমল ।।
হৃষ্টমুখী হয়্যা রামা জিজ্ঞাসে বিপ্রেরে । কয়দিন হৈল গিয়াছিলে কোথাকারে ।।
বণিতার কথা শুনি কহে দ্বিজমণি । যে রূপেতে বর দিল দেবী সুবচনী ।।
বিশেষ করিয়া কথা দ্বিজ তাহা বলে । শুভদার পাদপদ্ম পূজ কুতূহলে ।।
এতশুনি ব্রাহ্মণীর হৃষ্ট হইল মন । ভিক্ষা মাগি কৈল দেবী পূজার আয়োজন ।।
এয়োগণে এনে তবে করিল পূজন । শুভদাচরণ ভাবি করে আরাধন ।।
পান সুপারি রম্ভা এয়োগণে দিল । খইমুড়ি লয়্যা সভে গমন করিল ।।
তারপর ব্রাহ্মণ যে করেন রন্ধন । সুবচনীর ভোগ দিয়া করেন ভোজন ।।
ভোজন করিয়া দোঁহে শয়ন করিল । শয়ন করিয়া বিপ্র রিক্ত (?) উপজিল ।।
হাস্য পরিহাস্য দোঁহে রজনী বঞ্চিল । প্রাতঃকালে উঠে বিপ্র পুষ্প আরোহিল ।।
প্রাতঃকালে শুদ্ধস্নান কৈল দ্বিজমণি । নিত্য নিত্য গন্ধপুষ্পে পূজে সুবচনী ।।
এইমতে ব্রাহ্মণী রহে আনন্দিতে । আঁচল বিছিয়া শুয়ে থাকে পৃথিবীতে ।।
সদাই উঠয়ে হাই মুখে সরে জলে । শরীর অবশ হৈল দুরন্ত দুর্বল ।।
স্তনে ক্ষীর হইল নীর পাণ্ডুর বরণ । কানাকানি করে সবে প্রতিবেশিগণ ।।
সবে বলে গর্ভবতী হইলা ব্রাহ্মণী । সত্য বটে ব্রাহ্মণে বর দিল সুবচনী ।।
দিনে দিনে বাড়ে পেট হইল মাস নয় । ব্রাহ্মণ বলেন তবে সাধ দিতে হয় ।।
নানা প্রকারেতে সাধ দিল দ্বিজমণি । আনন্দেতে তবে সাধ খাইল ব্রাহ্মণী ।।
এইরূপে আনন্দেতে যায় নয় মাস । প্রসব হইল রামা সূর্যের প্রকাশ ।।
শুনি দ্বিজ আনন্দিত শুভ সমাচার । গোকুলেতে যেইমত গোবিন্দ অবতার ।।
পাঁচদিনে পাচুটে পরম সুখে করে । ছয়দিনে ষষ্ঠী পূজা করিল সাদরে ।।
আটদিনে আটকলাই করিল ব্রাহ্মণ । শিশুগণে আনি তবে করি বিতরণ ।।
আনন্দেতে কৈল দ্বিজ একুশে তর্চ্চনা । বিধিমতে বাজে কত ব্যাল্লিশ বাজনা ।।
অনেক অরুণা উপস্থিত ষষ্ঠীতলা । বহুতর বিতরণ করে খই কলা ।।
এমতে একুশে পূজা অবশেষ করি । যে যাহার ঘরেতে চলিল যত নারী ।।
এইরূপে বাড়ে সেই ব্রাহ্মণ বালক । জ্বলে রূপ দেখি যেন জ্বলন্ত পাবক ।।
মূর্তি দেখি মগ্ন হইল সবাকার মন । অভিলাষ নাম বলি থুইল ব্রাহ্মণ ।।

ষষ্ঠ মাসের শিশু হইল ক্রমে ক্রমে । ভোজনা করিব বলি ব্রাহ্মণ করে ভিক্ষা ।।
ভিক্ষা সিক্ষা করে দ্বিজ ভোজনা করাইল । সুবচনী কথা দ্বিজের পাসরণ হইল ।।
তারপর ব্রাহ্মণেরে হইল মৃত্যুকাল । ব্রাহ্মণীর কাছে শিশু করেন জঞ্জাল ।।
শিশুকোলে করি বৈসে দোলার উপর । স্তন্যপান করে শিশু নিদ্রায় কাতর ।।
দোলার উপরে তারে করায়ে শয়ন । স্নান করিবারে দেবী করিলা গমণ ।।
নিদ্রাভঙ্গ হয়্যা শিশু করেন ক্রন্দন । পূর্বকথা ব্রাহ্মণের না হইল পূরণ ।।
কালে যাহা করে তাহা কে খণ্ডিতে পারে । কেঁদে কেঁদে পড়ে শিশু ধূলার উপরে ।।
আহামরি বাছা বলি কোলেতে করিল । এতদিনে মোর জন্ম সফল হইল ।।
শিশু কোলে করি দ্বিজ করয়ে বিলাপ । কেন কাঁদ বাছাধন তুমি মোর বাপ ।।
পুত্রকোলে করি দ্বিজ বসিল ভূধরি । কাল পেয়ে মৃত্যুরূপ দ্বিজেরে সংহারি ।।
দ্বিজ রামজীবন বলে শুভদা চরণে । স্নান করি ব্রাহ্মণী যে আইল ভবনে ।। ৫ ।। * ।।

ছাপা ত্রিপদী করুণা

গৃহেতে আইলঃ দ্বিজেরে দেখিলঃ পুত্র কোলে করে আছে ।
শুভদা চরণঃ নাহিক স্মরণঃ ব্রাহ্মণী আইল কাছে ।।
আস্তব্যস্ত হয়্যাঃ বসন ত্যজিয়াঃ বালক লইল কোলে ।
ডাকাডাকি করেঃ ঠেলাঠেলি মারেঃ ব্রাহ্মণী হইয়া বিকলে ।।
মলিন হয়্যাছে মুখঃ বিদরিয়া যায় বুকঃ আছাড় খাইয়া ভূমে পড়ে ।
পাড়াপড়শগণেঃ শুনিয়া ক্রন্দনেঃ ধায় সভে উভরড়ে ।।
হাহাকার করি মুখেঃ চাপড় হানয়ে বুকেঃ স্বকপালে করয়ে আঘাত ।
ধৈরয ধরিতে নারিঃ কেঁদে কহে উচ্চৈস্বরিঃ কোথা গেলে মোর প্রাণনাথ ।।
মিথ্যা কেন কান্দ তুমিঃ আর না পাইবে স্বামীঃ এইরূপ করয়ে সান্ত্বন ।
বেদের বিহিত মতেঃ ডাকি আন পাঁচসাতেঃ দাহকর্ম কর সমাপন ।।
শোকেতে আকুল প্রাণিঃ চলিলেন ব্রাহ্মণীঃ ব্রাহ্মণে ডাকিয়া সব আনে ।
একত্রে মিলিয়া তারেঃ বান্ধি লয়্যা যায় সভেঃ থুইল লয়ে শ্মশানের স্থানে ।।
চিতাকর্ম সমর্পিয়াঃ শ্রাদ্ধদান কর গিয়াঃ উপস্থিত ব্রাহ্মণী আলয় ।
ব্রাহ্মণী বিনয়ে সবেঃ কহে শুদ্ধ হব এবেঃ যথাশক্তি বেদমতে কয় ।।
আরাণ্ডি গ্রামেতে ধামঃ শ্রীরামজীবন নামঃ ভূরিছিষ্ট উপাধি যাহার ।
শুভদাচরণ ভাবিঃ রচিল তনয় কবিঃ এ পুস্তক করহ উদ্ধার ।। ৬ ।। * ।।

পয়ার

দ্বিজে সৎকার করি আইল ব্রাহ্মণ । ব্রাহ্মণীরে বুঝাইয়া করিল গমন ।।
দশদিনে খেউরি আদি হইল ব্রাহ্মণী । ভিক্ষাসিক্ষা করি শ্রাদ্ধ করিল অমনি ।।
চালু দানি মাগি দেবী কৈল আয়োজন । দ্বাদশ দ্বিজেরে তবে করায় ভোজন ।।
কি করিব কোথা যাব কি হবে উপায় । এইরূপে ব্রাহ্মণী করয়ে হায় হায় ।।

এমত প্রকারে তার কত দিন গেল । অষ্টম মাসের শিশু ক্রমেকে হইল ।।
তবে তার যজ্ঞসূত্র দিলেক ব্রাহ্মণী । দেখিতে সুন্দর হইল ব্রাহ্মণের স্থানি ।।
প্রতাপচন্দ্র মহারাজার পিতৃশ্রাদ্ধ দিনে । মহারাজা নিমন্ত্রণ করেন ব্রাহ্মণে ।।
মধ্যাহ্নের সময় ব্রাহ্মণ সব যায় । ব্রাহ্মণী দেখিয়া তাহা শিশুরে পাঠায় ।।
যাহ বাছা রাজবাটী জলপান কারণে । উদর পূরিবে তোমার পাইবে দক্ষিণে ।।
মায়ের মিনতি শুনি মনে হরষিত । রাজার বাটিতে শিশু চলিল ত্বরিত ।।
দরিদ্র শিশুরে দ্বারী না ছাড়িল দ্বার । দ্বারী পাশে অতি ত্রাসে বসিল কুমার ।।
চর্ব্য চুষ্য লেহ্য পিয় খাওয়ায় রাজন । রজত কাঞ্চন দিয়া তুষিলেন মন ।।
ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়া দান কৈল মহারাজা । শ্রাদ্ধ সাঙ্গ হইল সব ঘরে গেল প্রজা ।।
ভাণ্ডারী মুহুরী গেছে ভাণ্ডারে চাবি দিয়া । বাহির হইল রাজা ভোজন করিয়া ।।
রাজারে কহিছে দ্বারী জোহার করিয়া । ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের শিশু আছেন বসিয়া ।।
রাজা বলে এতক্ষণে আইল ব্রাহ্মণ । ভাণ্ডারী মুহুরী গেছে করিতে ভোজন ।।
আছাটা তণ্ডুল আছে গোলার ভিতরে । সিদ্য[২] উপযুক্ত করি দেহ না তাহারে ।।
রাজ আজ্ঞা লয়ে তবে চলিলেন দ্বারী । চালু দানি কাঁচাকলা দিল তরকারি ।।
ভগ্ন বস্তু কচুপাত পাতিয়া লইল । সন্ধ্যার সময়ে শিশু গমন করিল ।।
সুবচনী বিড়ম্বিলা হইয়া শিশুরে । শ্রীরামজীবন কহে শুন অতঃপরে ।। ৭ ।। * ।।

চালুদানি পেয়ে শিশু মনে হরষিত । রাজার একুশ হংস দেখিল ত্বরিত ।।
মরাল মধ্যেতে এক জন্ম খোঁড়া ছিল । বেগেতে ব্রাহ্মণীর পুত্র তাহাকে ধরিল ।।
ব্যস্ত হয়ে বসন ভিতরে করে লুকি । আপন আলয়ে চলে মনেতে কৌতুকী ।।
জননীরে জানাইল যত বিবরণ । হংস ধরে আনিলাম করহ রন্ধন ।।
পরিপাটী করি পাক রান্ধ্যা দেহ মোরে । হংস খেয়ে হরষিত আমার অন্তরে ।।
ব্রাহ্মণী কহিল এই মহারাজার হংস । নরপতি শুনিলে করিবে সর্বনাশ ।।
মহাকেঁদে বলে মাগো রেন্ধ্যা দেহ তুমি । শুভদাকে অর্পিয়া ভক্ষণ করি আমি ।।
আছাড়ে মারিল হংস করে পরিষ্কার । ব্রাহ্মণী রন্ধন করে কি কহিব তার ।।
শুভদাকে ভোগ দিয়া করিল ভোজন । পাঁশকুড়ে[৩] হংস পাখা পতিত তখন ।।
দৈবযোগে দিনচারি দিবস আন্তরে । হংসগণে একদিন দেখে নরবরে ।।
শ্রীরামজীবন চিন্তি চরণকমল । আজ্ঞা অনুসারে কহে শুভদামঙ্গল ।। ৮ ।। * ।।

ত্রিপদী

খোঁড়া হংস না দেখিয়াঃ রাজা মহাকোপ হয়্যাঃ কহেন যেন কালের সমান ।
হইল বদনচ্ছবিঃ প্রভাতকালের রবিঃ মূর্তি দেখি মূর্চ্ছা হইল জ্ঞান ।।
কোটাল কোটাল ভাষেঃ শুনি প্রাণ কাঁপে ত্রাসেঃ ফিরে আঁখি যেমন কুলাল ।
তর্জন গর্জন শুনেঃ কাতর হইয়া প্রাণেঃ উপনীত হইল কোটাল ।।
রাজা বলে মার মারঃ পাপমতি দুরাচারঃ পামর পাপিষ্ঠ দুষ্টমতি ।

খোঁড়া হংস না দেখিয়াঃ বিকলে আমার হিয়াঃ আজি তোর উঠাব বসতি ।।
না পাইলে খোঁড়া হংসঃ সবংশে করিব ধ্বংসঃ বেটা যাহ জাতি যাবে পৌতা ।
সদত্ত মাহিনা খায়ঃ খবর নাহিক লয়ঃ কহ বেটা হংস গেল কোথা ।।
নিশাপতি নিবেদয়ঃ দুনয়নে ধারা বয়ঃ করজোড়ে কহিছে বচন ।
যদি আজ্ঞা কর যাইঃ আনি হংস যথা পাইঃ দাসে ক্ষম স্থির কর মন ।।
রাজার আদেশ পায়্যাঃ সকাতর কোটালিয়াঃ খোঁড়া হংস খুঁজিবারে যায় ।
দিগাদিক নাহি জ্ঞানঃ ভয়েতে কম্পিত প্রাণঃ বিস্তর উদ্দেশ করি যায় ।।
দুখেতে পরাণ পুড়েঃ ব্রাহ্মণীর সারকুঁড়েঃ হংস পাখা পাইয়া তখনি ।
কোপ করি বিপরীতঃ কহে অতি অনুচিতঃ রক্ষা কৈলা দেবী সুবচনী ।।
ধরিয়া ব্রাহ্মণীর সুতেঃ দড়ি দিয়া বান্ধে হাতেঃ ঘোরতর করিছে গর্জন ।
তুমি খাইলে রাজহংসঃ রাজা করে বংশনাশঃ আজি তোর নিশ্চয মরণ ।।
ধরে দুই ধাক্কা মাবেঃ বিস্তর প্রহার করেঃ লয়ে যায় রাজার সাক্ষাতে ।।
দেখে রাজা কোপে বলেঃ রাখ এরে বন্দিশালেঃ পাথর চাপাও আমার সাক্ষাতে ।
শ্রীরামজীবন বলেঃ শুভদা চরণতলেঃ নায়কের করহ কল্যাণ ।।
পূজিয়া পাইবে প্রীতঃ শুন আপনার গীতঃ বন্ধুগণে বাড়াবে সম্মান ।। ৯ ।। * ।।

বিপাকে বিষম বন্দী হইল অভিলাষ । বিস্তর কান্দয়ে অতি সঘনে নিঃশ্বাস ।।
কি কবিব কোথা যাব কি হবে উপায় । পাথর চাপালে বুক বিদরিয়া যায় ।।
কাহার শবণ নিব যাব কোথাকারে । মরিল দুখিনী মাতা না দেখে আমারে ।।
হেথা গৃহে ব্যাকুল হয়ে কান্দয়ে ব্রাহ্মণী । করাঘাত হানে বুকে চক্ষে বহে পানি ।।
প্রাণধন বাছা মোর পরাণ পুতলি । তোরে না দেখিয়া মোর অন্তরে ব্যাকুলি ।।
কালহংস খেয়ে কোথা গেলে বাছাধন । দুরন্ত কোটাল যেন কালের সমান ।।
আহা মবি অনেক আগুনে জল দিলে । ঘর অন্ধকার[১] করে কোথাকারে গেলে ।।
বহুদুঃখে মানিক মিলিয়াছিল মোরে । কোনজন হরে নিল কোল শূন্য করে ।।
আমার পরাণ ধন এসে বস কোলে । বিধুমুখে মা বলিয়া ধর মোর গলে ।।
কথাবাখ বাপধন বাপের ঠাকুর । দেখা দিয়া প্রাণ রাখ দুঃখ কর দূর ।।
আহা মরি অভাগিনী আগে না মরিয়া । দেহ হইতে মোর প্রাণ না যায় ছাড়িয়া ।।
হাতজোড় করি বলি দেবী সুবচনী । বিশ্বমাতা আমায় বদন কর হানি ।।
নযনজল লয়্যা আমি ধুয়াব দুটি পা । সুখাভাস দেহ মোরে সুবচনী মা ।।
সদানন্দময়ী সুবচনী শুনি কথা । নারায়ণী চলিলেন নরনাথ যথা ।।
পালঙ্কে সুখে নিদ্রা যায় নরবর । সুবচনী বসিলেন শিয়র উপর ।।
কপটে করুণাময়ী ক্রোধ করি বলে । ছাড়ি দেহ ছত্রধর ব্রাহ্মণী ছাওয়ালে ।।
প্রভাতে আনিয়া তারে করাহ খালাস । নহে তোর করিব যে সবংশে বিনাশ ।।
না হইলে রক্ত তোর উঠাইব মুখে । তবে বধ রাজা আমি করে যাব তোকে ।।

অভিলাষে বিভা দেহ তোমার দুহিতা । আমি সুবচনী রাজা শুনহ নিশ্চিতা ।।
ব্রাহ্মণী মানস পূজা আকুল পরাণ । জটে ধর‍্যা উঠাইয়া হইল অন্তর্ধ্যান ।।
স্বপন দেখিল সব উঠি নরনাথ । কাঁপে কলেবর যেন কদলীর পাত ।।
মুখ প্রক্ষালিয়া রাজা বসিল আসনে । স্বপনের কথা রাজা কহে মন্ত্রিগণে ।।
মন্ত্রিগণ শুনি তবে বন্দীশালে গেল । মুক্ত করি অভিলাষে সভায় আনিল ।।
দিতি আর চন্দ্র যেন দেখিতে দুর্বল । রূপ দেখি ভূপতির নয়নে বহে জল ।।
রাজ রাজনী দোঁহে অঙ্গের তোলে মলা । খালাসের খেউরি করিল সেই বেলা ।।
বহুমূল্য বসন ভূষণ পরাইল । সেইক্ষণে কন্যা আনি সম্প্রদান কৈল ।।
বিধিমতে ব্যাল্লিশ বাজনা বহু বাজে । একঠাএ্রী যেন লক্ষ্মীনারায়ণ সাজে ।।
পুষ্পদোলার মধ্যেতে দোঁহারে বসাইল । ব্রাহ্মণের পুত্রবধূ পাঠাইয়া দিল ।।
প্রতিবেশী সকলে পরম প্রীত পায়্যা । ব্রাহ্মণীর বিবরণ বলেন আসিয়া ।।
শুন অভিলাষের মাতা শুন সমাচার । বধূসহ পুত্র আইল বাসেতে তোমার ।।
কান্দিয়া কাতরে তারে কহিছে ভারতী । অগ্নির উপর কৈলে ঘৃতের আহুতি ।।
সেইকালে আসি পুত্র হইল উপনীত । প্রণমিল পুত্র মায়ে বধূর সহিত ।।
দেখিয়া দুখিনী মাতা হইল বিভোলা । উচ্চৈঃস্বরে কান্দেন পুত্রের ধরি গলা ।
সুবচনী কৈল আজি সুপ্রভাত নিশি । বামন হইয়া যেন হাতে পাইল শশী ।।
বাহিরে দাণ্ডাহ বাছা পূজি সুবচনী । দয়াময়ী আনি দিল হারাধনখানি ।।
ব্রাহ্মণী বিচিত্র বেদী গোময় লেপন । সুখে দুগ্ধে সরোবর করিল রচন ।।
লিখিল একুশ হংস হরসিতমনা । চারিধারে সুচারু দিলেক আলিপনা ।।
চারিধারে চারি তীরে করিল স্থাপিত । মধ্যে ঘটস্থাপনা করিল পুরোহিত ।।
আনন্দেতে এয়োগণে আনে ডাক দিয়া । সুবচনী পূজি নানা উপহার দিয়া ।।
প্রণমিয়া এয়োগণে চরণ ধুয়াইল । অঞ্চলে মুছিয়া ধুলি পুত্রশিরে দিল ।।
সুবচনী কৈল মোরে সার্থক জীবন । পরে পান গুয়া রম্ভা করে বিতরণ ।।
মুখেতে হরিদ্রা দিল কপালে সিঁদূর । আঁচলে আঁচলে খই দিলেক প্রচুর ।।
ব্রত বিবরিয়া বিবরণ বাণী কয় । সুবচনী সুপ্রভাতে পাইনু তনয় ।।
কৃপাময়ী কটাক্ষেতে কৃপা করি যাই । তোমার প্রসাদে মাগো হারাধন পাই ।।
শুনি সব সমাচার লোকে ধন্য করে । কেহ বলে ব্রাহ্মণী মানহ মোর তরে ।।
মানেমান মোর বাঞ্ছনাপূর্ণ যদি হয় । এয়োগণে আনি পূজা করিব নিশ্চয় ।।
বিনয়েতে ব্রাহ্মণী মাগিল সবার তরে । প্রণমিয়া ঘটে বিসর্জন দিল পরে ।।
সুবচনী শুভ কথা যেইজন শুনে । ধনপুত্রলক্ষ্মী তার হয় দিনে দিনে ।।
সুবাতাস সদত তাহার ঘরে ঘরে । মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ তার সর্বত্রেতে জয় ।।[৮]
যতন করিয়া যে পুস্তক রাখে ঘরে । অগ্নি চোর [আদি] তার কি করিতে পারে ।।
অন্ধ নরে চক্ষু হয় নির্ধনের ধন । অপুত্রের পুত্র হয় পূজে যেই জন ।।
বিবাহের মানস রহিল মনে মনে । মোর বন্ধুগণে মাগো রাখিবে কল্যাণে ।।

আমি অতি মূঢ়মতি না জানি ভজন । নিদানকালে পাই যেন ও রাঙা চরণ ।।
ঈশ্বর দেবতা পানে যেন থাকে মতি । এই বর দিও দেবী কমলার পতি ।।
পুস্তক লিখিলাম আমি তব উপাখ্যান । দোষগুণ না লইবেন পুস্তক লিখন ।।
- ইতি সুবচনীর পালা সমাপ্তং ।। * ।।

'জথাদিষ্টং তথালিখিতং লিক্ষকো দোস নাস্তিক ভিমস্বাপি রণে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। ইতি সন ১২৬৯ সাল তারিখ ২৮ আসাড় রোজ সুক্রবার তিথি পৃথিমা পঠনাথং শ্রীময়েসচন্দ্র মাজি সাকিম হাটগেছ্যা চেতুয়া সামিল লাট বসন্তপুর থানা কোম্মীজোড জেলা মেদিনীপুর ।।'

সূত্র ঃ- ১ এই অংশটি লিপি প্রমাদ । ২. পুঁথিতে লিপি 'ওর্দ্ধ যে হইব আমি কীসে।' ৩ সিধা অর্থাৎ চাল, ডাল, শষ্য ইত্যাদির একত্র দান । ৪ উনুনের ছাই ফেলার স্থান। ৫ 'সূর্য্যকার' । ৬। পর পর দুটি ছত্র পুঁথিতে নেই ।

নির্বাচিত গ্রন্থ ও রচনাপঞ্জী

- অশোক ভট্টাচার্য, 'বাংলার চিত্রকলা', কলকাতা, ১৯৯৪ ।
- অক্ষয়কুমার কয়াল, 'প্রাণরাম কবিবল্লভের কালিকামঙ্গল', কলকাতা, ১৯৯১ ।
- অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'রামানন্দ যতি বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল', ক. বি. ১৯৬৯।
- অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি', কলকাতা, ১৯৭১ ।
- অচিন্ত্য বিশ্বাস, 'বাংলা পুথির নানাকথা', কলকাতা, ১৯৯৬ ।
- অতুল সুর, 'সিন্ধুসভ্যতার স্বরূপ ও অবদান', কলকাতা, ১৯৮০ ।
- আহমদ শরীফ, 'আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংকলিত পুথি পরিচিতি', ঢাকা বিশ্ব. বাংলাদেশ, ১৯৫৮ ।
- আবুদল করিম সাহিত্য বিশারদ, 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ', কলকাতা, ১৩২০ ।
- ঈশানচন্দ্র ঘোষ, 'জাতক', ১, ২, ৩, ৪, কলকাতা, ১৩৯৭ ।
- কল্যাণকুমার দাসগুপ্ত, 'ইতিহাস ও সংস্কৃতি', কলকাতা, ১৯৭৭ ।
- কল্পনা ভৌমিক, 'পাণ্ডুলিপি পঠন সহায়িকা', ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৯৯২ ।
- চিত্তরঞ্জন দাসগুপ্ত, 'আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন পরিচিতি', বিষ্ণুপুর, ১৩৯০।
- চিত্তবঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন', কলকাতা ১৯৮১ ।
- চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বাংলা পুঁথির বিবরণ', ১ম, কলকাতা, ১৯৪৪ ।
- ড. নরেন কলিতা, 'অসমর পুথিচিত্র', গুয়াহাটি, ১৯৯৬ ।
- ড. উপেন্দ্র গোস্বামী, 'অসমীয়া লিপি', গুয়াহাটি, ২০০০ ।
- ড. নির্মল দাস, 'মধ্যযুগের কাব্যপাঠ', কলকাতা, ১৩৮৬ ।
- ড. স্বাতী দাস সরকার, 'বাংলার পুঁথি বাংলার সংস্কৃতি', কলকাতা, ১৯৯৮ ।
- ড. দীনেশচন্দ্র সবকার, 'শিলালেখ ও তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ', কলকাতা, ১৯৮২ ।
- ড. মুহম্মদ এনামুল হক, 'মণীষা মঞ্জুষা', ১ম, ফরাশগঞ্জ, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৯৭৪ ।
- তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, 'পরিষৎ পুথিশালায় সংগৃহীত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ', ৩য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, কলকাতা, ১৩৩৯ । ২য় খণ্ড, কলকাতা, ১৩৬৯ ।
- তারাপদ সাঁতরা, 'মন্দিরলিপিতে বাংলার সমাজচিত্র', কলকাতা, ১৩৯০ । 'পশ্চিমবঙ্গের পুরাসম্পদ ঃ উত্তর মেদিনীপুর', কলকাতা, ১৯৮৭ । 'পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প ও শিল্পীসমাজ', কলকাতা, ২০০০ ।
- ত্রিপুরা বসু, 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কবি শঙ্কর', কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপ্রকাশিত

পি. এইচ্. ডি. গবেষণাপত্র, ১৯৮০ । 'বিস্মৃত কবি ও কাব্য', কলকাতা, ১৯৮৭ । 'নথি পত্রে সেকালের সমাজ', কলকাতা, ১৯৮৭ ।

- দেবকুমার চক্রবর্তী, 'বীরভূম জেলার পুরাকীর্তি', কলকাতা, ১৯৭২ ।
- নীলরতন সেন, 'চর্যাগীতিকোষ', কলকাতা, ২০০১ ।
- পঞ্চানন মণ্ডল, 'পুঁথি পরিচয়', ১ম-৪র্থ , শান্তিনিকেতন, ১৩৫৮-৮৬ । 'চিঠিপত্রে সমাজচিত্র'-২, ১৯৫৩ ।
- বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', কলকাতা, ১৩৮৫ । প্রাগুক্ত ও তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, 'পরিষৎ পুথিশালায় সংগৃহীত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ' ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৩৬৭ । বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সংকলিত ও অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ', ৩য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা, কলকাতা, ১৩৩০; ২য় সংখ্যা, কলকাতা ১৩৩৩ ।
- বিশ্বনাথ রায়, 'প্রাচীন পুঁথি উদ্ধার, রবীন্দ্রউদ্যোগ, কলকাতা, ১৩৯৯ ।
- বৈষ্ণবচরণ দাস পঞ্চতীর্থ, 'বরাহনগর শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দিরে সংরক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ ও তালিকা', কলকাতা, ১৩৭৪ ।
- মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 'হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা', কলকাতা, ১৩৮৮ । 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ', ২য় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৮১ ।
- মণীন্দ্রমোহন চৌধুরী, কাব্যতীর্থ, 'বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামের বাংলা পুথিব তালিকা', রাজশাহী, ১৯৫৬ ।
- মোহম্মদ আবদুল কাইউম, 'পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠসমালোচনা', চট্টগ্রাম, ১৩৭৭ ।
- মণীন্দ্রমোহন বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র পাল, 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পুঁথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুঁথির পরিচয়', ২য় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৬৪ ।
- মুনশী আবদুল করিম, 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ ', ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, কলকাতা ১৩২১ । ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, কলকাতা, ১৩২০ ।
- মোহিত রায়, 'নদীয়া জেলার পুরাকীর্তি', কলকাতা, ১৯৭৫ ।
- মৌলবী আলী আহমদ, 'বাংলা কলমী পুথির বিবরণ' ১ম ভাগ, কুমিল্লা, ১৩৫৪ । ।
- যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, 'বাংলা পুথির তালিকা সমন্বয়', ১ম, কলকাতা, ১৯৭৮ ।
- যূথিকা বসু ভৌমিক, 'বাংলা পুথির পুষ্পিকা', কলকাতা, ১৯৯৯ ।
- রমেশচন্দ্র মজুমদার, 'বাংলাদেশের ইতিহাস', প্রাচীনযুগ, কলকাতা ১৩৬৭ ।
- রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাঙ্গালার ইতিহাস', ১ম, ২য়, কলকাতা, ১৯৬৪ ।
- রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ও স্বাতী দাস, 'বাংলা পুথি', ১ম খণ্ড, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৯।
- শ্রীপান্থ, 'যখন ছাপাখানা এলো', কলকাতা, ১৯৭৭ ।
- সরসীকুমার সরস্বতী, 'পাল যুগের চিত্রকলা', কলকাতা, ১৯৭৮ ।
- সুকুমার সেন, 'কবিকঙ্কণ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল', সাহিত্য একাডেমী, ১৯৭৫ । 'ভাষার ইতিবৃত্ত', কলকাতা, ১৯৬৮ ।

- সুকুমার বিশ্বাস, 'বাংলা একাডেমী পুঁথি পরিচয়'-১, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৪০২ ।
- সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ত্রিপুরার পুঁথিপত্রের বর্ণনাত্মক তালিকা', আগরতলা, ১৯৭৭।
- সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'বাঙ্গালা ভাষা প্রসঙ্গে', কলকাতা, ১৯৭৫ ।
- সুখময় মুখোপাধ্যায়, 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম', কলকাতা, ১৯৭৪।
- Ahmed Hasan Dani, 'Indian Paleography', New Delhi, 1977.
- A Gaur, 'A History of writing', 1984.
- Basanta Ranjan Roy Vidvadvallabh and Basanta Kr. Chatterjee, 'Descriptive catalogue of Bengali Mns.' Vol. I. C. U. 1926.
  Ibid, Manindra Mohon Bose and Basanta Kr. Chatterjee, 'The Descriptive catalouge of Bengali Mns.' Vol. II. C U
- Cecil Bendall, 'Catalouge of the Buddhist Sanskrit Mns. in the university library, Cambridge, with introductory notices and illustrations of the Paleography and chronology of Nepal and Bengal, Cambridge, 1883 '
- D. P. Ghosh, 'Mediavel Indian Painting', New Delhi, 1982.
- Edward Clodd, 'The story of Alphabet', 1900
- H. Jensen, 'Sign, Symbol and Script, An account of man's effort to write 1968'
- K. Satyamurty, 'Text Book of Indian Epigraphy', Delhi, 1992.
- K. C Jain, 'Lord Mahavira and and his times', Delhi, 1991.
- Manindra Mohon Bose, 'A general Catalouge of Bengali Mns. in the Library of the University of Calcutta', Vol. I, 1940.
- M. Haraprasad Shastri, 'A Descriptive Catalouge of the Vernacular Mans in the collection of the Royal Asiatic Society of Bengal', Vol. IX, Calcutta 1941. 'A Catalouge of palmleaf and selected paper Mns. belonging to the Durbar Library, Nepal', Vol. I, 1905. Vol II. 1915.
- Niranjan Goswami, 'Cataloge of Painting of the Asutosh Museum Mns. of the Ramcharitamanas', Calcutta, 1981.
- Nanigopal Mazumder, 'Inscriptions of Bengal', Vol. III.
- Prafulla Ch. Pal, 'A Descriptive Catalouge of the Bengali and Assamese Mns. in the collection of the Asiatic Society', Calcutta, 1951.
- Rakhaldas Banerjee, 'Origin of the Bengali Script', Calcutta, 1973.
- S. P. Gupta & K. S. Ramachandran, 'The Origin of Brahmi Script', New Delhi, 1991
- George Buhler, 'Indian Paleography', New Delhi, 1980.
- G. H. Ojha, 'Prachin Bharatiya Lipimala', New Delhi, 1993.
- Ramaranjan Mukherjee and S. K. Maity, 'Corpus of Bengal Inscriptions', Calcutta, 1967.
- S. M. Katre, 'Introduction to Indian Textual criticism', Deccan College PGT. Research Inst. 1954.
- Suniti Kr. Chatterjee, 'The origin and Development of the Bengali Lan-

guage', Vol.- III, Rupa, Calcutta, 1985.
- Sunil Kr. Ojha, 'A Descriptive Catalouge of Bengali Mns ' Vol.-I-V, N. B. University, 1990-91.
- Shasi Bhusan Dasgupta, 'A Descriptive Catalouge of Bengali Mns. preserved in the State Library of Cooch Behar', 1948
- Sachindranath Siddhanta, 'A Descriptive Catalouge of Sanskrit Manuscripts in the Varendra Research Museum Library', Vol.- I, Rajsahi, 1979
- W S. Mason, 'A History of the Art of Writing', 1920.
- S. K. Saraswati, 'An illustrated Bengali Manuscript of the Bhagabat Purana', J A S. Vol.- XV, 1-4, 1974. S. N. Chakraborty, 'Development of the Bengali Script', Ibid, Vol - IX, 1938.
- B N. Mukherjee, 'Old Bengali Inscriptions', Pratnasamiksha, Vol - I, 1992.

পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত রচনা

অক্ষয় কুমার কয়াল, 'দক্ষিণ ২৪ পরগণার পুথিপাতড়া', পশ্চিমবঙ্গ, দ. ২৪ পব. সংখ্যা, ১৪০৬। আবদুল কাইউম, 'বাংলা হরফে মুদ্রিত প্রথম বই', বক্তব্য, বাংলাদেশ, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৫ । কমল কুমার মজুমদার, 'বঙ্গীয় গ্রন্থচিত্রণ', এক্ষণ, কার্তিক-মাঘ, ১৩৭৯ । কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত, 'প্রাচীন পুথির বিবরণ', ভারতবর্ষ, ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা । জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়, 'পুঁথি সংগ্রহের শতবার্ষিকী', সমকালীন, পৌষ ১৩৭৫ । দ্বারেশ শর্মাচার্য, 'বাংলার অক্ষর শিল্প', দেশ, ৩০. ১২. ১৯৩৯ । রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়, 'হ্যাণ্ডপ্রেসে ছাপা তালপাতার পুথি', আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫ ফাল্গুন, ১৩৮৫ । শ্যাম কাশ্যপ, 'কলকাতার যাদুঘরে', আনন্দবাজার, ৬. ২ ৮৩ । শ্রীপান্থ, 'বাংলা হরফ', প্রাগুক্ত, ২৮ মাঘ, ১৩৮৫ ; 'হ্যালহেডের ব্যাকরণের হরফ', প্রাগুক্ত, ৩ ফাল্গুন ১৩৮৫ । সুরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, 'উত্তরবঙ্গের একটি প্রাচীন পুঁথি', সমকালীন, অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫ ।

- বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার রচনা (বর্ষ ও সংখ্যা উল্লিখিত) : অতুলচন্দ্র চৌধুরী, 'পুঁথির বিবরণ', (৯/২); অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ, 'ভারতে লিপির উৎপত্তি', (১১/১; 'বাঙ্গালা পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ', (৫/১); অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'প্রাচীন বাংলা দলিল-দস্তাবেজ ও চিঠিপত্র', (৬২/৩); চিত্তসুখ সান্যাল, 'বাঙ্গালা পুথির তালিকা', (১০/২/১১৭); চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, 'সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদে বাংলা পুথি', (৩৪/৪; 'পুথির শেষ কথা', (৫৭/৩-৪); 'গ্রন্থরসিক রাজনারায়ণ', (৫৮/১-২); তারকেশ্বর ভট্টাচার্য, 'প্রাচীন পুথির বিবরণ (৮/১) ; দুর্গানারায়ণ সেনশাস্ত্রী, 'প্রাচীন পুথির বিবরণ (বৈদ্যক পুথি)', (২০/১); নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, 'বাঙ্গালা পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ', (৪/৪, ৬/১); নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য, 'বাঙ্গালা পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ', (৫/৩); পঞ্চানন মণ্ডল, 'বাংলা পুঁথি : রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতীর পুঁথি বিভাগ', (৭৫/১); বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ,'পরিষৎ পুথিশালায় রক্ষিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ', (২৯/৩—৩২/৩); বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদ, 'পিপরাবার প্রাচীন লিপি' (১৩/৩); ব্রজসুন্দর সান্যাল, 'প্রাচীন পুথির বিবরণ',

(১০/২; মৃণালকান্তি ঘোষ, 'বাঙ্গালা পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ', (৫/৩, ৬/৪); যোগেশচন্দ্র রায়, 'আঙ্কিক শব্দ', (৩৬/৪); রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, 'তর্পণদিঘির তাম্রশাসন', (১৭/২; রাজীবলোচন দাস, 'প্রাচীন পুঁথির বিবরণ', (৮/১); রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, 'বাঙ্গালা পুথির বিবরণ', (৫/৪); 'বাঙ্গালা পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ', (৭/২), 'প্রাচীন পুথির বিবরণ', (৮/১); শিবচন্দ্র শীল,'বাঙ্গালা পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ', (৮/৩); সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'ব্রিটিশ মিউজিয়ামের কতকগুলি বাঙ্গালা কাগজপত্র', (২৯/৩); হরগোপাল দাসকুণ্ডু, 'বাঙ্গালা পুঁথির বিবরণ', (১৩/৩)। 'বাঙ্গালার পুরানো অক্ষর', (২৭/১); মদনমোহন কুমার, 'লিপির উৎপত্তি ও বর্ণমালার বিকাশ, (৮১/১)।

পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত গ্রন্থকারের পুঁথি ও পাণ্ডুলিপি বিষয়ক রচনা

'পুঁথি লেখার আদব কায়দা', আনন্দবাজার পত্রিকা, ২১ বৈশাখ, ১৩৮১। 'ঘাটাল অঞ্চলের মঙ্গলকাব্য', আরো আগে, ১৫.১১.৭১। 'কালোল্লেখে কৌশল প্রাচীন সাহিত্যে', দৈনিক বসুমতী, ১৩.১২.৮১। 'সেকালের বইলেখার বৈচিত্র্যময় বিবরণ', ঐ ১০.৫.৮২। 'জীর্ণলিখনে বৈচিত্র্যময় প্রাচীন সমাজ', ঐ, ১১.৭.৮১। 'বাঙালী সমাজে বিবাহ ঃ প্রাচীন নথিপত্রে', ঐ, ১২. ১২. ৮১। 'মানুষ কেনাবেচা-সেকালে', ঐ, ১৩. ৪. ৮৩। 'সেকালে কীভাবে পুঁথি লেখা হোত', পরিবর্তন, ১৬. ৫. ৭৯। 'সেকালের পুঁথি মালিক', পত্র অন্বেষা, কাঁথি, শারদীয়া, ১৯৯০। একটি অপ্রচলিত মঙ্গলকাব্য, সমকালীন, অগ্রঃ ১৩৮১। 'পুরানো আমলের নথিপত্র ও দলিল দস্তাবেজের ভাষা', ঐ, অগ্রঃ, ১৩৮১। 'কিশোরচকের কবি দয়ারাম', রজতস্বাক্ষর, কোলাঘাট, ১৩৮০। 'মঙ্গলকাব্যের এক বিস্মৃত কবি', সমকালীন, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৯। 'বর্ধমান নৃপতিবর্গ ও সেকাল বাংলার কবিকুল', প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮০। 'পুষ্পিকা পদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব', সমকালীন, চৈত্র, ১৩৮১। 'লিপিফলকে বাঙালীর কাব্যচিন্তা', ঐ ভাদ্র, ১৩৮২। 'রেশম শিল্প সম্পর্কিত একটি পুরানো পুঁথি', কৌশিকী, বাগনান, কার্ত্তিক-অগ্রঃ ১৩৮৩। 'প্রাচীন পুঁথির পুষ্পিকাপদে বাঙালী জীবনের রূপরেখা',বঙ্গরত্ন, কৃষ্ণনগর, শরৎ, ১৩৮৫। 'পুঁথি প্রসঙ্গে দু-চার কথা', কাঁচা লেখা, বাগুইহাটি, কলকাতা, শারদীয়, ১৩৭৯। 'রেশম শিল্পের প্রাচীন পুঁথি', আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২. ৪. ৮৭। 'বাংলা লিপির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ', দৈনিক বসুমতী, ২৪. ৭. ৮৮। 'ভাগবত অনুবাদের বৃত্তে সনাতনের ভাগবত', কলেজ স্ট্রীট, জুলাই, '৮৮। 'জীর্ণ নথিপত্রের ঐতিহাসিক গুরুত্ব', সংবাদ বিচিত্রা, নিউ ইয়র্ক, ১ মার্চ, ৯৭। 'সেকালের গ্রন্থ পাঠক', আলোর পাখি, দুর্গাপুর ১, জানুয়ারী, ১৯৯৮। 'দক্ষিণ রাঢ় ওড়িশা সীমান্তের প্রাচীন কবি ও কাব্য', সাহিত্যিকী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, শরৎ ও বসন্ত, ১৩৮৯-৯০। 'দক্ষিণ বঙ্গে রেশম শিল্প ও একটি প্রাচীন পুঁথি', আকাদেমী পত্রিকা - ৩, কলকাতা, ১৯৯০। 'সাল তারিখের কথা', শারদীয়া নবাঙ্কুর, দুর্গাপুর, শারদীয়া, ১৪০২। 'মঙ্গলকাব্যের অনালোচিত অধ্যায় ঃ নবাবিষ্কৃত কবি ও কাব্য', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, কার্ত্তিক-চৈত্র, ১৩৮৪। 'পুঁথি লেখকের কথা', পাণ্ডুলিপি, দুর্গাপুর ১২, ফাল্গুন, ১৪০৪। 'পাণ্ডুলিপির কথা', ইস্পাতের চিঠি দুর্গাপুর নববর্ষা সংখ্যা, ১৪০৬। 'পুঁথিপত্রে সেকালের দাসপুর', দাসপুর বার্তা, শারদীয়া, ১৩৯৮। 'বাংলা

পুঁথিতে সমাজজীবন', শতাব্দীর দিকচিহ্ন, ঘাটাল, জুন-আগষ্ট, ১৯৮০। 'সেকালের পুঁথি লেখকের জীবনযাপন', দাসপুর বার্তা, শারদীয়া, ১৯৯২। 'সেই দুজন পুঁথি লেখক' ঐ, ১৯৮৮। 'অকেজো কাগজপত্রে কাজের কথা', শারদীয়া কৃষ্ণমৃত্তিকা, দুর্গাপুর ১৩, ১৩৯৪। 'মেদিনীপুর জেলার পুঁথি সাহিত্য ঃ একটি নমুনা সমীক্ষা', সাহিত্য সম্প্রতি, কাঁথি, নভেঃ, '৮৮। 'একটি অপ্রচলিত মঙ্গলকাব্য', ইতিহাস, ঢাকা, ১৩৭৮। 'রবীন্দ্রনাথ, ও পুঁথিসাহিত্য', ধনধান্যে, শারদীয়া, ১৩৯৪। 'পুঁথিপ্রসঙ্গ ও রবীন্দ্রনাথ', পশ্চিমবঙ্গ, রবীন্দ্রসংখ্যা, ১৯৮৯। 'প্রাচীন লিপিমালা ও বাংলা লিপির জন্মকথা', প্রকৃত অঙ্গীকার, ঘাটাল, শারদীয়া, ৯২। 'পুরোনো পুঁথির দিগবন্দনায় আঞ্চলিক ইতিহাস', বিশ্ববাণী, আশ্বিন-কার্ত্তিক, ১৩৯৭। 'মেলাইচণ্ডীর পুঁথি', কৌশিকী, মার্চ, ১৯৮০। 'প্রাচীন পুঁথির লিখনপদ্ধতি, অলঙ্করণ, প্রচ্ছদ', ইস্পাতের চিঠি, অণ্ডাল, নববর্ষ, ১৩৯৯। 'পুঁথি পাণ্ডুলিপির উপকরণ', ঐ আশ্বিন ১৩৯৭। 'সেকালের গ্রন্থপ্রেমী' গণশক্তি, ২৯. ১. ৯০। 'পুঁথির পুষ্পিকায় সামাজিক ইতিহাস, তটরেখা, আগরপাড়া, দীপান্বিতা, ৯০। 'প্রতিবেশী রাজ্যে পুঁথি শিল্প', শারদীয়া অভিজ্ঞান, এগরা, ১৪০২। 'সর্ত্তপীব পুঁথি', বিশ্ববাণী, কলকাতা, কার্ত্তিক-পৌষ, ১৩৯২। 'পুঁথিসাহিত্যে মেদিনীপুর' 'পশ্চিমবঙ্গ' মেদিনীপুর জেলা সংখ্যার জন্য প্রেরিত। ২০০২। 'মেদিনীপুর জেলার কাব্যচর্চা ঃ প্রাচীন ও মধ্যযুগ', 'সারস্বত সাধনায় মেদিনীপুর', ২০০১।

সংযোজনী

'পুথি-পাঠ' সহজ নয়

অক্ষয়কুমার কয়াল

পুরাতন হস্তলিখিত বাঙ্গালা পুথি লইয়া অনেকেই কাজ করিয়াছেন বা করিতেছেন, কিন্তু কয়জন গর্ব করিয়া বলিতে পারেন যে, তিনি সমগ্র পুথিখানার নির্ভুল পাঠোদ্ধার করিতে পারিয়াছেন ? হাতের লেখা ভালো হইলে পাঠোদ্ধার অনেকটা সহজ হয়, আর খারাপ হইলে কোন কোন ক্ষেত্রে পাঠক বিব্রত হইয়া পড়েন । অনভ্যস্ত পাঠকের পক্ষে শিব গড়িতে গিয়া বানর গড়াও বিচিত্র নয় ।

পুথি পড়িতে গিয়া আমাদিগকে যে যে বিষয়েব সম্মুখীন হইতে হয়, সংক্ষেপে তাহা নিবেদন করি । কোন কোন আধুনিক বর্ণ বা অক্ষরেব সহিত পুরাতন হস্তলিখিত পুথিব অক্ষরের মিল নাই । যেমন কৃ = ঙ্গ, তু = ত্ত, জু = হৃ ইত্যাদি । ন ও ল-এর পার্থক্য সর্বত্র রক্ষিত হয় নাই। কোন পুথির ব বর্ণের নীচে বিন্দু নাই, বরং তাহার বিপরীত ব বর্ণের নীচে বিন্দু । কোথাও অ =য (অর্থাৎ য়) পুরাতন ণ, দ্ধ, ম্ প্রভৃতি যুক্ত বা অযুক্ত বর্ণগুলি আধুনিক যুক্ত বা অযুক্ত বর্ণের সহিত মিলে না । শ, ষ, স এবং জ বা য প্রভৃতি বানানের কোন বাঁধাধরা নিয়ম রক্ষিত হয় নাই।

বিপদ বাধে অপ্রচলিত, তদ্ভব ও আঞ্চলিক শব্দ লইয়া । যেমন কৃণপ = শব ('ডাহিনে কৃণপধর বামেতে জগমা' - কৃষ্ণরাম দাস) পনই = জলের ঝাবি ('দারুন পনই জল, দেখি বড় ভয়ঙ্কর রাখ মোবে বিষম সঙ্কটে' - মুকুন্দরাম), অঁঠা = কোমর (অঁঠা ধব্যা শাখারীর পোকে - রামেশ্বর) ইত্যাদি ।

পুরাতন ভাষার সহিতও অল্পবিস্তর পরিচয় থাকা দরকার । যথা - গোহারি = প্রার্থনা, নাপান = লাস্য, বিতথা = বিপন্ন, নই = গ্রহণ করি, বাহুড়িয়া = ফিরিয়া ইত্যাদি ।

লিপিকরের কল্যাণে অপরিচিত নামধামে বড়ই গোলমাল বাধে । যথা - গর্ভেশ্বর না সর্বেশ্বর ? সোমনগর না শমনঘর ? মুড় পরগণা না ঘড় পবগণা ? ইত্যাদি ।

লিপিকর বহু স্থলে 'কমলালে বুরমত' (অর্থাৎ 'কমলালেবুর মত') লিখিয়া থাকেন । সুতরাং সতর্কতার সহিত পুথির পাঠ গ্রহণ করিতে হইবে । নবীন গবেষককে 'কনকে রচিত পুরী'-কে 'কনকের চিত্রপুরী' করিয়া তুলিতে দেখিয়াছি ।

---

* লেখক বিশিষ্ট পুঁথি - তাত্ত্বিক, পুঁথি পরিচায়ক ও সম্পাদক ।

হস্তলিখিত পুথি বাঙ্গলার পণ্ডিতসমাজকে কি ভাবে প্রবঞ্চিত করিয়াছে, তাহার কিছু কিছু উদাহরণ দেওয়া গেল —

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গলা পুথিশালার রক্ষক (keeper) মণীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কাশীদাসী মহাভারতের দ্রোণপর্বের একখানি পুথির পাঠোদ্ধার করিলেন -
'কাশীরাম দাসের প্রভু নিল সেন রুড়' এবং মন্তব্য করিলেন 'We do not know what historical basis was for a statement of this nature' (Descriptive Catalouge of Bengali Manuscript. Vol. III, Introduction, P. IX) আসলে পাঠ হইবে ঃ 'কাশীরাম দাসের প্রভু নিল সৈলারুড় ....অর্থাৎ জগন্নাথদেব । ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় এদিকে প্রথমে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ।

সেন মহাশয়ের মতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-প্রকাশিত বাঙ্গলা প্রাচীন পুথির বিবরণ তিন খণ্ড ছাড়া আর কোন পুথিবিবরণী নির্ভরযোগ্য নয় (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ ভূমিকা দ্রষ্টব্য) । আমার যতদূর জানা আছে, সন ১৩২৯ হইতে ১৩৩৯ পর্যন্ত উক্ত তিনটি খণ্ড ছয়টি সংখ্যায় প্রকাশিত হয় এবং মৌলভী আবদুল করিম, শিবরতন মিত্র, বসন্তরঞ্জন রায়, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য মহাশয়গণ কর্তৃক সঙ্কলিত হয় । সব সংখ্যা ব্যবহার করিবার সুযোগ আমার হয় নাই । তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য সঙ্কলিত তৃতীয় খণ্ডের তৃতীয় সংখ্যায় ২৬৯ নং কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীর দশম স্কন্ধের পুথির পুষ্পিকায় পাঠ দেওয়া হইয়াছে - 'স্বাক্ষরং শ্রীওলারাম দাস' । 'ওলারাম' না 'তুলারাম' কোন নামটি পাঠকের কান গ্রহণ করিতে চায়, তাহা বিবেচ্য ।

অধিকাংশ পুথিতে এবং ছাপা বইয়ে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর আশ্রয়দাতা আরড়া ব্রাহ্মণভূমের রাজা বাঁকুড়ারায়ের পিতার নাম মাধব দেখিতে পাওয়া যায় ।
বীর মাধবের সুত রূপে গুণে অদভূত বীর বাঁকুড়া ভাগ্যবান (বঙ্গবাসী সং ১৩৩১ পৃঃ ৭) কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৫১৭ নং কবিকঙ্কণ চণ্ডীর পুথি হইতে তারাপ্রসন্নবাবু বিনা মন্তব্যে পাঠ দিলেন —

বিরমা দেবীর সুত রূপে গুণে অদভুত বীর বাঁকুড়া ভাগ্যবান (সা, প, পত্রিকা ৬২ বর্ষ, পৃঃ২২২) এশিয়াটিক সোসাইটির ৫৩৮৮ সংখ্যক পুথিতে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের পাঠ-

বিরসদানব সুত রূপে গুণে অদহত বিষ × × × ভাগ্যবান (Descriptive Catalouge of the Vernacular Manuscript. Vol. IX, 1941 P. 316) এগুলি লিপিকর দৌরাত্ম্য, না পুথিপাঠকের অপটুতা, তাহার যাচাই হওয়া প্রয়োজন ।

এশিয়াটিক সোসাইটির ৩৯৬৮ নং রাধারসকারিকা পুথির পুষ্পিকায় 'শ্রীমতি লালমণি বৈষ্ণবী'র স্থলে 'শ্রী মতিলাল মণি বৈষ্ণব' এবং ৪০৮৪বি নং 'মনোহর ফাসিয়ারাপালা'র স্থলে বাঙ্গালা ও ইংরাজীতে 'মনোহর কাসিয়ারাপালা' পাঠ দেওয়া হইয়াছে । ডঃ সুকুমার সেন ও ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল পূর্বেই এই সংবাদ দুইটি পরিবেশন করিয়াছেন । 'অষ্টমঙ্গলার'র স্থলে 'ষষ্ঠমঙ্গলা' 'স্থাপনার পালা' স্থলে 'আপনার পালা' প্রভৃতি পাঠভ্রান্তি কি মুদ্রাকর প্রমাদ ? (ঐ পৃঃ ১৩৫, ৩১২, ৩১৪ ও ৪০৬ দ্রষ্টব্য) ।

ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র পাল কর্তৃক ঐ পুথিবিবরণীর পরিশিষ্ট সঙ্কলিত হইয়াছে। উহা হইতে একটি মাত্র পাঠ উদ্ধৃত করিব।

করিএ ভকতি সোন বন্দ দেব পঞ্চানন যাই গো বাবা ঘটের উপরে।
(ঐ, পরিশিষ্ট, ১৯৫২, পৃঃ ৮০)

আসল পাঠ - করিএ ভকতি শোন বন্দ দেব পঞ্চানন য়াই সো বাবা ঘটের উপরে।
('য়াই সো' অর্থাৎ আইস)

এশিয়াটিক সোসাইটির বাঙ্গলা পুথিবিবরণী নিপুণ হস্তে সংশোধিত হওয়া প্রয়োজন।

বিশ্বভারতী বাঙ্গলা পুথিবিভাগের অধ্যক্ষ পঞ্চানন মণ্ডল মহাশয়কে বাঙ্গলা পুথির কীট বলিয়াই জানি। তিনি তিনখণ্ডে পুথি পরিচয় (১৩৫৮ - ১৩৬৯) এবং যাদুনাথের ধর্মপুরাণ (১৩৬৫) হরিদেবের রচনাবলী (১৩৬৭) ও দ্বাদশ মঙ্গল (১৩৭৩) নামক পুথিগুলির সম্পাদনা করিয়াছেন। তৎসম্পাদিত যাদুনাথের ধর্মপুবাণে পুষ্পিকার শেষাংশে তিনি পাঠ দিয়াছেন - 'সন ১১৪৭ সাল তাং ২২ বৈশাখ সখাবুড়া....'। উহা 'সন ১১৪৭ তাং ২২ বৈশাখ সখাবদা ১....' (অর্থাৎ শকাব্দা) কিনা, তাহা ঐ পুস্তকেই প্রদত্ত শেষ পত্রের প্রতিলিপি দেখিয়া সুধী পাঠকগণ বিচার করুন।

অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী সম্পাদিত বলরাম কবিশেখরের কালিকামঙ্গল একসময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গলা অনার্সের পাঠ্য ছিল বলিয়া শুনি এবং উহার দুইটি সংস্করণ বাহির হইয়াছে (১৩৩৭ ও ১৩৫০)। ঐ কাব্যের গণেশবন্দনায় একটি পাঠ আছে —

নাভী গভীর সর বাহুলম্ব সিকবর (?) গলে শোভে পারিজাতমালা। (২য় সং, পৃঃ ১)

চক্রবর্তী মহাশয় পাঠ ধরিতে না পারিয়া প্রশ্নসূচক চিহ্ন দিয়াছেন। বিশ্বভারতীর ৯৩ নং বলরামের কালিকামঙ্গলের পুঁথিতে পাঠ পাওয়া গেল —

নাভি গভীর সর বাহন মুসিকবর গলে শোভে পারিজাতমালা।
(পুঁথি পরিচয়, ২য় খণ্ড, ১৩৬৪, পৃঃ ৩১)

বলা বাহুল্য 'বাহন মুসিকবর' পাঠই সঙ্গত।

ঘনরামের ধর্মমঙ্গলের বহু সংস্করণ বাহির হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডাঃ পীযূষ কান্তি মহাপাত্র মহাশয়ও একটি সংস্করণ বাহির করিয়াছেন (১৯৬২)। উহার পরিশিষ্ট 'সুরিক্ষার পালা'র প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। পীযূষবাবু এক স্থলে পাঠ দিয়াছেন —

সরা যেতে চোর ডাকাতের বড় ভয় (পৃঃ ৭১৮)

আমার ধারণা উহার পাঠ-সরায়েতে চোর ডাকাতের বড় ভয়। অর্থাৎ সরাই-তে। শহর অর্থে 'সরা' ধরিব কেন ? ঐ পালায় সর্বত্রই 'শহর' শব্দের প্রয়োগ।

আর এক স্থানে দেবীর পূজার্ঘ্য বর্ণনায় পীযূষবাবুর পাঠ —

মল্লিকা শ্রীফল দল করি বীরকেতু কি। (পৃঃ ৭২৩)

আমার ধাবণা, উহার পাঠ —মল্লিকা শ্রীফলদল করিবী কেতুকি। (অর্থাৎ করবী, কেতকী ;

কববীর শুদ্ধ শব্দ হইলেও ছন্দের উপর চাপ সৃষ্টি করে ।)

এই প্রসঙ্গে একটি পুরাতন কথা মনে পড়িয়া গেল । ঘনরামের ধর্মমঙ্গলের ঢেকুর পালায় ইছাই ঘোষের নগর বর্ণনার এক স্থলে আছে—

করিয়া আসন গাড়িল নিশান সম্মানে বসান পদ্য ।
সধর্ম মণ্ডিত বিধর্ম খণ্ডিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বৈদ্য ।
(বঙ্গবাসী সং, ১২৯০, পৃঃ ৪৬)

বঙ্গবাসী সংস্করণের সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় পদ্য শব্দের টীকা করিয়াছেন — 'নীচ লোক' । ১৩১৬ সালের 'প্রবাসী'তে মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল মহাশয় এক প্রবন্ধে সে কথার উল্লেখ করিলে, তৎকালীন সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মন্তব্য প্রকাশ করিলেন — 'ইহারা যদি নীচ জাতীয় লোক তাহা হইলে ইহাদিগকে সম্মানে বসাইবার কারণ কি বুঝা গেল না ।' 'ভারতবর্ষে' (১৮শ বর্ষ) ললিতমোহন রায় মহাশয় ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যের সমজাতিত্ব দেখাইতে গিয়া উহার পাঠ দিলেন — 'সসম্মানে বসান সদ্য' । ঘনরামের পুঁথিতে বা ছাপা বই-এর বহু স্থলে পদ্য বা সুপদ্য শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় । যথা— কতপদ্য বাদ্য বাজে আদ্যের গাজনে (ঐ পৃঃ ৮৭) বা সুপদ্য বাজে বাদ্য, মঙ্গলজয় হুলাহুলি । (ঐ, পৃঃ ৬৯) ভাষাচার্য সুনীতিকুমারকে প্রাগুক্ত ছত্রটি — 'সম্মানে বসান পদ্য' দেখাইলে তিনি বলিলেন — পদ্য শব্দের অর্থ পদস্থ হইতে পারে। দুঃখের বিষয়, অদ্যাপি আমার সংশয় কাটে নাই ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডঃ সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্যের কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইয়াছে (১৯৫৮) । গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত শীতলামঙ্গলের পুঁথিব হাতের লেখা ভালো নয় । উহা ডঃ ভট্টাচার্যকে কি ভাবে বঞ্চনা করিয়াছে, তাহা আমি অন্যত্র কিছু কিছু দেখাইয়াছি, এখানে একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দেখাইব । শীতলামঙ্গলের এক স্থলে ডঃ ভট্টাচার্যের পাঠ —

মিষ্টি পাত্র চিনি ফেলি খায় পেট ভরি । (কৃষ্ণদাসের গ্রন্থাবলী, পৃঃ ২৫৫)

আসল পাঠ — মিষ্টি পাএ চিনি ফেনি খায় পেট ভরি । (পাএ অর্থাৎ পাইয়া, ফেনি = বাতাসা) অর্থাৎ মিষ্টি পাইয়া চিনি বাতাসা পেট ভরিয়া খায় ।

'কয়েকটি অপ্রকাশিত বাংলা পুথির বিবরণ' দিতে গিয়া ডঃ বিনোদশঙ্কব দাশ মহাশয একখানি ধর্মমঙ্গল পুথির পাঠ উদ্ধৃত করিলেন —

রথভরে বেঙ্গলেট গেলেন ধর্মরায় । (ইতিহাস ৭ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, ১৩৭৯, পৃঃ ১৯) । অভিজ্ঞ পুথিপাঠক অবশ্যই বুঝিবেন, ধর্মরায় 'বেঙ্গলেট' নয় 'বৈকুণ্ঠে' গেলেন । (ঙ্গ = কু , লেট নয় - ণ্টে) । সাম্প্রতিককালের দুইটি পাঠ উদ্ধৃত করি —

সূর্য ইন্দ্র বায়ু অনলের গম্য নন । চক্রাদি বেষ্টিত ভ্রমে দুরাশ দহন ।।

(শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত সনাতন ঘোষালের ভাগবত ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২৩) । শুদ্ধ পাঠ — সূর্য ইন্দু বায়ু অনলের গম্য নন । চক্রাদি বেষ্টিত ভ্রমে দুরাসদ হন ।।

(দুরাসদ = দুরধিগম্য) ভাগবতোক্তি —

সূযেন্দুবায়বগ্ন্যগমং ত্রিধামভিঃ পরিক্রমৎ প্রাধনির্কৈদুরাসদম । (৩য় স্কন্ধ, ৮ম অধ্যায়) । ডঃ ত্রিপুরা বসু রেশম শিল্পের প্রাচীন পুঁথির পাঠ উদ্ধৃত করিলেন — (আনন্দবাজার ২৮ চৈত্র,

১৩৯৩)।

সুবর্ণ বরণ আভা কোটি বস্ত্র জিনিপ্রভা স্বর্গে যেন সাজে সৌদামিনী। কিংবা
নানা অলঙ্কার সাজে চরণে নূপুর বাজে করতলি চম্পক সমান

আসল পাঠ —

সুবর্ণবরণ আভা কোটিচন্দ্র জিনিপ্রভা মেঘে যেন সাজে সৌদামিনী। কিংবা
নানা অলঙ্কার সাজে চরণে নূপুর বাজে করাঙ্গুলি চম্পক সমান।

ঐ উদ্ধৃতিতে আরও ভুল আছে। ইহা ত্রিপুরাবাবুর পুথিপাঠে অক্ষমতা, না আনন্দবাজার পত্রিকার প্রুফরীডারের কেরামতি কিছুই বুঝিতে পারি নাই।

বলা আবশ্যক, উপরে যাঁহাদের সম্পাদিত প্রাচীন কাব্য হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিলাম, তাঁহাবা সকলেই আমার নমস্য বা প্রণম্য ব্যক্তি। ব্যক্তিগতভাবে তাঁহাদের সকলেরই প্রতি আমার অগাধ শ্রদ্ধা, তবুও এই পাঠগুলি উদ্ধৃত করিলাম এইজন্য যে, পুরাতন পুথিগুলি কতখানি সতর্কতার সহিত পাঠ করা উচিত, নইলে পদে পদে বিভ্রান্তির সম্ভাবনা।

একখানি মাত্র পুথি লইয়া নির্ভুল পাঠোদ্ধারের দম্ভ না করাই সমীচীন। একাধিক পুথি পাইলেই পাঠনির্ণয় সহজ হয়। অপ্রচলিত শব্দ, বিশেষ করিয়া তদ্ভব ও আঞ্চলিক শব্দের পাঠোদ্ধারে একাধিক পুথির বিশেষ প্রয়োজন। যে শব্দটি পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হইতেছে না বা যাহার কোন অর্থবোধ করা যাইতেছে না, তাহা যেমন আছে, তেমনই রাখা উচিত বরং পাশে একটি প্রশ্ন সূচক চিহ্ন দেওয়া যাইতে পারে অর্থাৎ শব্দটি সম্পর্কে পাঠকের সংশয় আছে। নূতন অর্থবহ শব্দ আমদানী করিয়া মূল শব্দের উচ্ছেদ কদাপি উচিত নয়। ইহাতে ব্যবসায়-বুদ্ধির পবিচয় পাওয়া যাইতে পারে কিন্তু প্রাচীন কবি ও কাব্যের প্রতি শ্রদ্ধা সূচিত করে না। উহা কবির রচনার উপর হস্তক্ষেপেরই সামিল। পুথিপাঠে দক্ষতা অর্জনের পূর্বে পুথি সম্পাদনা করা উচিত নয়।

মন্দিরলিপি, ধাতুফলক, দারুতক্ষণ শিল্পে বাংলা বর্ণমালা

তারাপদ সাঁতরা

পশ্চিম বাংলার নানাস্থানে প্রতিষ্ঠিত মন্দির দেওয়ালে নিবদ্ধ যে সব প্রতিষ্ঠালিপি বা উৎসর্গলিপি পাওয়া গেছে তার সময়কাল ধরলে দেখা যায়, সেগুলি খ্রীষ্টীয় ষোল শতক থেকে শুরু হয়ে বিশ শতক পর্যন্ত। তবে ষোল শতকের বাংলা মন্দিরে প্রতিষ্ঠালিপির সংখ্যা খুবই কম। কিন্তু সে তুলনায় মন্দিরলিপির সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে খ্রীষ্টীয় সতের শতক থেকে আঠার-উনিশ শতকপর্যন্ত। উনিশ বা বিশ শতকের প্রতিষ্ঠিত বহু স্থানের মন্দিরে যে সব প্রতিষ্ঠালিপি দেখা গেছে, সেগুলির অধিকাংশই মার্বেল ফলকে উৎকীর্ণ, যার উপর স্বল্প গভীবে খোদাই করে তার উপর সীসা ঢেলে পূরণ করা এবং সেগুলি র হরফ ছাপানো বইয়ের বর্ণমালা অনুসরণ করেই। অন্যদিকে সতের থেকে আঠারো শতকের মন্দিরে আমরা দেখতে পাই প্রতিষ্ঠা লিপি হিসবে ব্যবহৃত হয়েছে

* লেখক বিশিষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক, লোকসংস্কৃতিবিদ ও গবেষক।

পাথর বা পোড়ামাটির ফলক, যার উপর খোদিত বিষয়টি রচিত হয়েছে সেই সময় প্রথাগত হাতে লেখা পুঁথির বর্ণমালা-সদৃশ অক্ষর বিন্যাস করে ।

শেষ মধ্যযুগে বাংলার প্রথাগত মন্দির তৈরীর কাজে স্থপতি ও ভাস্কর হিসেবে নিযুক্ত হতেন আমাদের দেশের সূত্রধর সম্প্রদায়, যাদের সাধারণভাবে বলা হ'ত মিস্ত্রী । তারা মন্দির স্থাপয়িতার চাহিদামত মন্দির নির্মাণ ও মন্দির দেওয়ালে পোড়ামাটির ভাস্কর্য অলংকরণ করে দিতেন । উল্লেখ্য যে, এই মন্দির স্থপতিদের অধিকাংশই ছিলেন নিরক্ষর । এক্ষেত্রে মন্দিরে সাল-তারিখ ইত্যাদি সংযোজনের তাগিদে প্রতিষ্ঠালিপি নিবদ্ধ করার প্রয়োজন দেখা দিলে, স্বভাবতই দ্বারস্থ হতে হ'ত স্থানীয় পন্ডিত বা সেকালের পুঁথি নকলানবীসদের কাছে । তারা প্রতিষ্ঠার চাহিদা ও অনুমতিসাপেক্ষে প্রতিষ্ঠালিপির বয়ানে বিশেষভাবে সাল তারিখের ক্ষেত্রে শকাঙ্কের প্রয়োগ করতেন । এছাড়া বাংলা প্রতিষ্ঠালিপির ক্ষেত্রে সাল-তারিখ বা প্রতিষ্ঠাতার নাম ইত্যাদি রচনা করে দিতেন । পণ্ডিতমশাই বা পুঁথি নকলনবীসদের এইসব প্রতিষ্ঠালিপির রচনাগুলি তুলট কাগজের পাতায় মোটা মোটা অক্ষরে লিখে দেওয়া হ'ত । অন্যদিকে যাতে সংক্ষিপ্তভাবে সে প্রতিষ্ঠালিপির বয়ানটি রচিত হয়, সে বিষয়ে মন্দির-স্থপতিদের পক্ষ থেকে নির্দেশও দেওয়া থাকতো এই কারণে যে, খোদাই কাজের স্থানটি যত কম পরিসরে হয়, ততই স্থপতির পক্ষে খোদাইয়ের সুবিধে । সেইমত স্থানীয় পণ্ডিত বা পুঁথির নকলনবীসরা তুলট কাগজে প্রতিষ্ঠালিপির যে বয়ানটি লিখিতভাবে বড় বড় অক্ষরে লিখে দিতেন, মন্দিরের স্থপতি সেই বয়ানটিকে প্রতিষ্ঠালিপির জন্য বাছাই প্রস্তর ফলক বা কাঁচা মাটির ফলকে রেখে একটা প্রতিচ্ছবি তুলে নিয়ে, সেইমত ছাপের দাগ ধরে ধরে অর্থাৎ লিপি অক্ষরের চারপাশ জুড়ে খোদাই কাজ শুরু করতেন বা-রিলিফ পদ্ধতিতে । স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে, এ পদ্ধতিটি আজও দেখা যায়, কোন বাড়ির দেওয়ালে বাড়ির নাম বা মালিকের ঠিকানা ইত্যাদি নিবদ্ধ করার জন্য, ভাল হাতের লেখা কোন ব্যক্তির অথবা কোন সাইন বোর্ড লেখা আলার কাছ থেকে খসড়াটা করে এনে সে লেখামাফিক উদ্দিষ্ট ফলকের জন্য প্রস্তুত সিমেন্ট বালির পলেস্তারার উপর ছাপ ফেলে স্থানীয় রাজমিস্ত্রী সেভাবে লিপির ছাপ ধরে ধরে খোদাই করে লিপিটি সম্পন্ন করে থাকেন । সুতরাং মন্দির লিপির বেলায় ঠিক ঐ পদ্ধতি । তবে অভীষ্ট লিপির উপকরণ পাথর বা শুকনো মাটির ফলকে যথাযথ রচিত লিপির দৃষ্টান্তে ছাপ তোলার পর ছেনি বাটালির খোদাই দিয়ে প্রতিষ্ঠালিপি সম্পন্ন করা হ'ত ।

তাহলে প্রতিষ্ঠালিপির ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, একজন প্রতিষ্ঠালিপির বয়ান ও সেইসঙ্গে প্রতিষ্ঠালিপির বর্ণমালার ছাঁদটিও তৈরী করে দিচ্ছেন খোদাই কাজের জন্য এবং অন্যজন খোদাই মিস্ত্রি হিসেবে সেটি পাথর বা কাঁচা মাটির ফলকে খোদাই করে দিচ্ছেন । কাঁচামাটির ফলকটি অবশ্য খোদাই করার পর তা পুড়িয়ে নেওয়ার রীতি । এখন, এই যে একজন প্রতিষ্ঠালিপির বয়ান রচনা করে দিচ্ছেন এবং অন্যজন খোদাই করছেন, এ বিষয়ে পাথুরে প্রমাণ বিদ্যমান । উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণা থানা এলাকায় লালজী মন্দির প্রাঙ্গনে যে প্রস্তর লিপিটি দেখা যায়, সে শিলালিপিটির রচয়িতা হিসাবে জনৈক 'পৌরাণিক' মোহন চক্রবর্তীর নাম উল্লিখিত হয়েছে, এক্ষেত্রে 'শুক্রনীতিসার গ্রন্থে' পৌরাণিক কথাটি শিল্পশাস্ত্রজ্ঞান

সম্পন্ন পুরাণবিতকেই নির্দেশ করেছে । সুতরাং ঐ লিপির বয়ান যে প্রস্তুত করে দিয়েছেন উক্ত চক্রবর্তী মহোদয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই এবং লিপিতে যে 'গোকুল দাস'-এর নাম উৎকীর্ণ হয়েছে, সম্ভবত তিনি ছিলেন এ লিপির খোদাইকারক । প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় বাংলার পাল রাজাদের আমলে প্রাচীন তাম্রশাসনে খোদাই কারকের নাম উল্লেখ করার যে প্রথা ছিল এটিও সেই ধারাবাহিকতার এক সাক্ষ্য ।

এতক্ষণ প্রতিষ্ঠালিপির রচয়িতা ও খোদাইকারক প্রসঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল । এবার ঐসব লিপির বর্ণমালা প্রসঙ্গে আসা যাক । বাংলায় বিভিন্ন শতকে নির্মিত মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপিতে যে বর্ণমালা দেখে থাকি, তা সে সময়ে প্রচলিত পুঁথির বর্ণমালার সঙ্গে একাত্ম এবং হাতে লেখা পুঁথির হরফের প্রতিচ্ছবি মাত্র । পুঁথি নকলকারীরা যেমন বহুক্ষেত্রে টানা হাতের লেখা ব্যবহার করতেন, বহু মন্দির প্রতিষ্ঠা লিপিতেও তার প্রভাব সুস্পষ্ট । এমন কি, মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানা এলাকার রাধাকান্তপুর গ্রামের গোপীনাথের একরত্ন মন্দিরে উৎকীর্ণ দীর্ঘ ন'লাইন ত্রিপদী ছন্দে ও পুঁথির হরফে রচিত লিপিটি যেন হুবহু পুঁথির একটি পৃষ্ঠা মাত্র ।

প্রতিষ্ঠালিপি খোদাই বিষয়ে অনুসৃত সে সময়ের খোদাই প্রযুক্তি কৌশল বিষয়ে দু'একটি কথা বলা যেতে পারে । প্রাচীন পাথরের মূর্তি ভাস্কর্যে উৎকীর্ণ যে আদি বঙ্গাক্ষর আমরা লক্ষ করি তাতে খোদাই কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে ফলকের উপর গর্ত করে । বীরভূম জেলার খ্রীষ্টীয় ষোল শতকের কবিলাসপুরের মন্দির লিপিও এই পদ্ধতিতে গর্ত করে খোদাই করা এবং প্রাচীন আদি বঙ্গাক্ষর লিপির ছাঁদ প্রভাবিত । অন্যদিকে সতের শতকের প্রতিষ্ঠিত কোচবিহারের গোসানীমারী মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপিটি গর্ত করে খোদাই করা হলেও তার লিপি-ছাঁদটি প্রাচীন বঙ্গাক্ষরের সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্য যুক্ত । কিন্তু পরবর্তী খ্রীষ্টীয় সতের-আঠারো শতকে প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপিতে দেখা যায়, লিপির বর্ণমালা খোদাই করা হয়েছে বা-রিলিফ পদ্ধতিতে, অর্থাৎ পল তোলা করে অক্ষরের পাশের অংশগুলি খোদাই করে ।

আমাদের অনেকের ধারণা যে, মন্দির লিপিতে উৎকীর্ণ এইসব বাংলা বর্ণমালা আলাদাভাবে এক বর্ণমালার ধরণে সৃষ্টি - কিন্তু এ ধারণা নিতান্তই ভুল । পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, মন্দির প্রতিষ্ঠার লিপি তৈরীতে স্থানীয় পণ্ডিত বা পুঁথি নকলনবীসদের লেখা বর্ণমালাই অনুসৃত হয়েছে। এখন, পুঁথি লেখকদের লেখার ছাঁদ বা লেখার টান ভিন্নরকম হলেও বর্ণমালাগুলি প্রায়শই একই রকমের হয়ে থাকে । সমকালীন পুঁথি লেখকরা সে সময়ে বিশেষ কয়েকটি অক্ষরের বেলা যে প্রচলিত ছাঁদটি ব্যবহার করতেন, মন্দির ফলকেও তার হুবহু প্রতিচ্ছবি । উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, শ্রী, কৃ, ষ্ণ, ৰ, ব, ন, ভূ, ং (উপরে বিন্দু চিহ্ন দিয়ে), কু, ঙ্গ প্রভৃতি অক্ষরগুলি পুঁথিতে যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, মন্দির লিপিতেও তার প্রতিফলন ঘটেছে । তবে এ বিষয়ে কেবলমাত্র অন্য একটি মন্দির লিপির বর্ণমালার ছাঁদ দেখা যাচ্ছে ভিন্নরকম । উদাহরণ হ'ল, ভূকৈলাসের সিংহবাহিনী মন্দিরের পল তোলা বা-রিলিফ পদ্ধতিতে খোদাই করা লিপিটি ফার্সী হরফের ছাঁদে খোদিত । লিপি রচয়িতা অনবদ্য নৈপুণ্যের সঙ্গে বাংলা হরফ সাজিয়ে দিয়েছেন ফার্সী লিপি ছাঁদের মত করে ।

মন্দির লিপি খোদাই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলা খুবই প্রয়োজন । পুঁথি নকলকারীরা

তো মন্দির প্রতিষ্ঠালিপির এক বয়ান তৈরী করে ছিলেন, কিন্তু প্রতিষ্ঠালিপির নিরক্ষর খোদাইকারকরা সেই বয়ানের ছাঁপ ফলকে তোলার সময় যথাযথ প্রতিলিপি অনুসরণ না করায় অনেকক্ষেত্রে বর্ণমালাটিকে গোঁজামিল দিয়ে তৈরি করেছেন। ফলে সেটির পাঠোদ্ধার অনেক সময় দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। কোন সময় দেখা যায়, লিপি খোদাইয়ের পর প্রমাদ ধরা পড়ায় সেটিকে আবার সংশোধন করা হয়েছে খোদিত বর্ণমালার মধ্যে ক্ষুদ্রাকার ভাবে প্রার্থিত কোন অক্ষর প্রবিষ্ট করে। এমন একটি প্রতিষ্ঠালিপির দৃষ্টান্ত দেখা যায়, বাংলাদেশের রাজশাহী বরেন্দ্র মিউজিয়ামে, যেটি সংগৃহীত হয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার শ্রীনগর চাকদার মন্দির থেকে।

এখন 'টেরাকোটা' বা পাথরের উপর খোদাই মন্দির লিপির ক্ষেত্রে আমরা যেমন লক্ষ করি, সেকালে প্রচলিত পুঁথির বর্ণমালার হরফের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত, তেমনি আবার পিতলের কামানের গায়েও অনুরূপ পুঁথির হরফ সদৃশ বর্ণমালা দেখতে পাই, যার উদাহরণ হ'ল কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বা মেদিনীপুরের কর্ণগড়ের অধিপতি যশোমন্ত সিংহ মহারাজদের প্রস্তুত কামানের গায়ে বা-রিলিফে খোদিত লিপি। অনুরূপ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বহড়ু গ্রামে প্রাপ্ত এক কাঠের মূর্তির পাদদেশে খোদিত লিপিতে অথবা বিভিন্ন স্থানের আটচালা মণ্ডপের খুঁটিতে বা কাঠের রথের গায়ে খোদাই লিপিতেও পুঁথির হরফের প্রতিচ্ছবি পড়েছে।

সেকারণে মন্দির লিপি, ধাতু বা কাষ্ঠফলকে খোদিত লিপির বর্ণমালার মধ্যে আকারগত ক্রমবিকাশ খুঁজে পাওয়া কষ্টকর। হাতে লেখা পুঁথির হরফে সৃষ্ট আদর্শস্বরূপ এক প্রস্থ বর্ণমালাকেই আমরা এই সব মন্দির লিপি ফলক বা অন্যান্য ধাতু বা কাষ্ঠ ফলকের মধ্যে দেখতে পাই।

সুতরাং মন্দির লিপির বর্ণমালার ছাঁদ বা ধরণ সম্পর্কে বিচার বিশ্লেষণ করা যেতে পারে তার হস্তলিপি সংক্রান্ত ক্রমবিকাশের যেকোন নমুনা নিয়ে, কিন্তু পুঁথির হরফ ছাড়া পৃথক কোন বর্ণমালা যে মন্দিরলিপিতে অনুসৃত হয়েছিল- এমন ধারণা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়।

মুদ্রায় বাংলা বর্ণমালা

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

কোনও ভাষার লিপির বিবর্তন সর্বক্ষেত্রেই তার নজির রেখে যায়। দৈনন্দিন জীবনের অন্যতম উপাদান মুদ্রা। যদিও খুব সীমিত পরিসরেই তার ব্যবহার, তাহলেও মুদ্রায় ব্যবহৃত সামান্য কয়েকটি বর্ণমালা সেই পরিবর্তন-এর সাক্ষ্য বহন করে। এই নিবন্ধের মূল বিষয় বাংলা বর্ণমালা। পূর্ব ভারতীয় উপমহাদেশে বাংলা লিপির ব্যবহার ঐতিহাসিক তথা ভৌগোলিক দিক দিয়ে দেখলে বৃহৎ বঙ্গ বলে অভিহিত করা হবে। এই বিশাল অঞ্চলে মোটামুটি ভাবে আজকের পশ্চিম বঙ্গ এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশই শুধু নয়, আরাকান, আসামের কিছু অংশ, কাছাড়, কামতাপুর, ত্রিপুরা, রংপুর, জয়ন্তিয়া অঞ্চলেও যুক্ত হয়ে যায়। এই উপমহাদেশের মুদ্রা প্রচলন হয়েছিল মৌর্য যুগে, প্রথম দিকের অংক চিহ্ন এবং ছাঁচে ঢালা মুদ্রায় কোন লিপি ছিলনা। কুষাণ বঙ্গের তথাকথিত 'লিপিযুক্ত সোনার মুদ্রার কথা জানা থাকলেও তার বিশুদ্ধতা নিয়ে সন্দেহ

* ভিজিটিং ফেলো, সেন্টার ফর আর্কিওলজিক্যাল স্টাডিস এন্ড ট্রেনিং : ইস্টার্ণ ইন্ডিয়া।

রয়েছে। বৃহৎ বঙ্গের বেশ কিছু অঞ্চল গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হলেও গুপ্ত পরবর্তী গৌড়ের রাজা শশাঙ্ককে বাংলার লিপিযুক্ত মুদ্রার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়। অবশ্যই তাঁর মুদ্রায় সম্মুখ দিকে বৃষ আরোহী শিব এবং পশ্চাতে পদ্মাসনে উপবিষ্টা লক্ষ্মীদেবীর মূর্তি থাকত। সঙ্গে গুপ্ত ব্রাহ্মী হরফে সম্মুখে **'শ্রী শ'** এবং পশ্চাতে **'শ্রী শশাঙ্কঃ'** লেখা হত।

গুপ্ত পরবর্তী রাজাদের মধ্যে অন্যান্য উল্লেখ্য জনেরা হচ্ছেন সমতটের রাত বংশের জীবধরন রাত, শ্রীধরন রাত ইত্যাদি। এদের খাদ যুক্ত সোনার মুদ্রায় **'শ্রী' 'জীব'** ইত্যাদি কয়েকটি গুপ্ত ব্রাহ্মী হরফের ব্যবহার ছিল। ময়নামতির মুদ্রাভান্ডারে গুপ্তদের ধনুর্ধর মূর্তির অনুকরণে দেব আমলের (৭ম, ৮ম শতকের) **'শ্রী ভঙগাল মৃগাঙ্ক'** লিপিযুক্ত অষ্টভুজ দেবী মূর্তি সহ খড়গ রাজ **'সুধন্যাদিত্য'** ও **'বলভট'** লিপিযুক্ত মুদ্রা আবিস্কৃত হয়েছে। পশ্চিম বাংলায় যখন পাল - সেন রাজারা রাজত্ব করেছেন তখন এই অঞ্চল দেব - খড়গ রাজবংশের অধীনস্থ ছিল।

পাল - সেন অধিকৃত বঙ্গভূমিতে মুদ্রা প্রচলন সীমিত হতে হতে কড়িই শেষ পর্যন্ত মুদ্রার স্থান দখল করে। রূপার মুদ্রায় ধার্য বস্তুর মূল্য শেষ পর্যন্ত কড়ি দিয়েই মিটিয়ে নেওয়া হত। পাল যুগের শিলালেখ ও তাম্রলেখের উপর নির্ভর করে প্রত্যয় হয় সে যুগের প্রথম দিকেও মুদ্রিত মুদ্রা ছিল।

পূর্ব বাংলার হরিকেল অঞ্চলের মুদ্রাগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই মুদ্রাগুলির বেশীর ভাগ রূপার তৈরী। আদিতে আরাকান অঞ্চলের সঙ্গে সম্পর্ক থাকলেও হরিকেল শ্রেণীর মুদ্রার বিশেষ বৈশিষ্ট্য এর ব্যবহৃত লিপি। আসলে পূর্বাঞ্চলের সোনার মুদ্রায় গুপ্ত পরবর্তী প্রভাব আর এখানকার রূপার মুদ্রায় আরাকানে প্রচলিত বৃষ ও ত্রিশূল এর প্রভাব দেখা যায়। হরিকেল মুদ্রায় কিন্তু রাজার নামের পরিবর্তে রাজ্যের নাম লিপিবদ্ধ হয়েছে। প্রাক বঙ্গাক্ষরে বা গুপ্ত ব্রাহ্মী হরফে **'হরিকেল'** নাম হয়েছে।

লক্ষণসেনের রাজত্বের শেষ পর্বে মুহম্মদ-ই-বখতিয়ার খিলজির বাংলাদেশ জয় আর ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে তৎকালীন দিল্লীর শাসনকর্তা মুহম্মদ বিন সাম 'এর নামানুসারে সোনার মুদ্রার প্রকাশ একটি নতুন যুগের সূচনা করে। মুদ্রাটি প্রকাশিত হয়েছে হিজরী ৬০১ (১২০৫ খ্রীষ্টাব্দে। বাংলা মুদ্রায় আরবী-ফারসি লিপির সূচনা হলেও কিন্তু এই মুদ্রার বিশেষ গুরুত্ব হচ্ছে এর অশ্বারোহী চিত্রের নিচে লিপি রয়েছে **"গৌড় বিজয়ে"**। সাধারণ যে কোনও পাঠক এর লিপি পড়বেন বাংলাতেই তবে পণ্ডিতেরা বলেছেন ঐটি নাকি নাগরী লিপি। আর যাই হোক না কেন, কোনও রকম দ্বিধা না করেই বলা যায় যে ঐ লিপি গুপ্তপরবর্তী লিপি এবং আধুনিক বাংলা লিপির মধ্যবর্তী রূপান্তর। বৃহৎ বঙ্গের সর্বত্র বাংলালিপি হলেও সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার হয়েছে।

গৌড় বিজয়ের পরে বাংলার ইতিহাসে প্রথমে দিল্লীর সুলতানের পক্ষে স্থানীয় প্রতিনিধিরা শাসন চালান। এর পর বাংলায় স্বাধীন সুলতানেরা গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। নানা রাজনৈতিক জটিলতার মধ্যেই ধুমকেতুর মত দনুজমর্দনের আবির্ভাব বাংলার মূল ভূখণ্ডে স্বল্প কালের জন্য হলেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহের সময়ে তাঁর আত্ম

প্রকাশ এক জন জমিদার হিসেবে। ইলিয়াস শাহী রাজবংশের পতনের নেপথ্য নায়কের পরিচয় রাজা গণেশ হিসেবে।

গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সাইফ-উদ-দীন হামজা শাহ, পরে শিহাব-উদ-দীন বায়েজীদ শাহ এবং আলা-উদ-দীন ফীরুজ শাহের সংক্ষিপ্ত শাসনের পর গণেশ সিংহাসনে আরোহন করেন এবং মুসলমানদের শত্রু হয়ে ওঠেন। এই প্রথম বার সিংহাসনে আরোহন করে তিনি কোনও মুদ্রা প্রকাশিত করেছিলেন কিনা এই সম্পর্কে কোনও তথ্য জানা যায় না। প্রতিশোধপরায়ণ এই রাজার অত্যাচারে বাংলার মুসলমান প্রজারা তাঁদের ধর্মগুরু হজরৎ-নুর-কুতুব আলমের আশ্রয় নেন। ধর্মগুরু সহজে কিছু করতে না পেরে জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শার্কি কে বাংলা আক্রমণ করতে আমন্ত্রণ করেন। ইব্রাহিম শার্কি সসৈন্যে মালদহে এসে পৌছুলে রাজা গণেশ ঐ ধর্মগুরুর আশ্রয়প্রার্থী হতে বাধ্য হন। রাজা গণেশকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হলে তিনি কৌশলে তাঁর পুত্র যদুকে ধর্মান্তরিত করেন। যদু জালাল-উদ-দীন মোহাম্মদ শাহ নাম গ্রহণ করেন এবং রাজা হলেন। ১৪১৬ খ্রীষ্টাব্দে (৮১৯ হি.) জালাল-উদ-দীন মুদ্রা জারী করেন। এর ৮২০ হি. তারীখযুক্ত কোনও মুদ্রা পাওয়া যায় নি।

ইব্রাহিম শার্কি নিজদেশে প্রত্যাবর্তন করার পর রাজা গণেশ নিজমূর্তি ধারণ করেন। গণেশ দনুজমর্দন নাম গ্রহণ করেন এবং বাংলা লিপিতে প্রথম মুদ্রা প্রকাশ করেন পাণ্ডুয়া, সোনারগাঁ এবং চাটিগ্রাম বা চট্টগ্রাম থেকে ১৩৩৯-৪০ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪১৭-১৮ খ্রীষ্টাব্দে। এর পরেই বাংলার মুদ্রার ইতিহাসে ১৩৪০ শকাব্দ লিখিত মুদ্রা পাই মহেন্দ্রদেব নামে অপর এক জন রাজা সম্পর্কে। মুদ্রাগুলি ঐ একই পাণ্ডুয়া এবং সোনারগাঁ টাকশাল থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

দনুজমর্দনের মুদ্রা

আগেই বলা হয়েছে, মাত্র দুটি বছরের, ১৩৩৯ এবং ১৩৪০ শকাব্দে পাণ্ডুয়া (পাণ্ডুনগর), সোনারগাঁ (সুবর্ণগ্রাম) এবং চট্টগ্রাম (চাটিগ্রাম) টাকশাল থেকে দনুজমর্দনের মুদ্রা প্রকাশিত হয়েছিল। এ যাবৎ জানা মুদ্রাগুলি সবই রূপার তৈরী। জনৈক মুদ্রা ব্যবসায়ী বলেছেন তিনি নাকি কলকাতার কোনও সংগ্রাহক কে দনুজমর্দনের সোনার মুদ্রা বিক্রয় করেছিলেন। তবে এই মুদ্রার কোনও বিবরণী নেই। রূপার মুদ্রাগুলি সবই গোলাকার যার ব্যাস মোটামুটি ভাবে ৩০ মিলিমিটার। বাংলার সুলতানদের মুদ্রার প্রামাণিক ওজন ছিল ১১ গ্রামের চেয়ে একটু বেশী, যা কিনা ১ ভরি ওজনের মত। কোনও আধুলি বা শিকি মুদ্রা পাওয়া যায়নি। দনুজমর্দনের মুদ্রায় সমসাময়িক সুলতানদের প্রভাব রয়েছে। কোনও চিত্রের নজির নেই। মুদ্রা লিপিভিত্তিক, প্রাচীন বাংলা হরফে লেখা।

গুপ্ত পরবর্তী রাজা এবং হরিকেল মুদ্রায় টাকশাল ও সময়ের উল্লেখ থাকত না। দনুজমর্দনের মুদ্রা খুবই দুষ্প্রাপ্য। এপার ওপার বাংলার কিছু ব্যক্তিগত সংগ্রহ বাদ দিলে সামান্য কয়েকটির কথা জানা যায়। এগুলির মধ্যে উল্লেখ্য কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম, পশ্চিমবঙ্গ সরকারী সংগ্রহশালা ও সাহিত্য পরিষদ সংগ্রহশালা। এছাড়া ব্রিটিশ

মিউজিয়াম, ঢাকা মিউজিয়াম ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহশালায় কয়েকটি রয়েছে। রূপার মুদ্রাগুলিকে প্রধানত পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়। যা কিনা প্রাথমিক ভাবে বলা যায় যে, মূলতঃ টাকশালের উপর নির্ভরশীল। এদের ওজন মোটামুটি ভাবে ৯. ৮১ থেকে ১০.৭৯ গ্রামের মধ্যে রয়েছে।

(ক) পাণ্ডুয়াতে নির্মিত ঃ এই মুদ্রার সম্মুখদিকে মধ্যস্থিত বৃত্তে তিন লাইনের লিপি **'শ্রীশ্রীদ/নুজমর্দ্দ/নদেবস্য**। স্থানাভাবে শেষ 'য' (য ফলা) দ্বিতীয় এবং তৃতীয় লাইনের মাঝে উঠে গেছে। বৃত্তের বাইরে কিছু জ্যামিতিক রেখার বিন্যাস রয়েছে। মুদ্রার পশ্চাৎদিকে একটি চতুর্ভূজের মধ্যে তিন লাইনের লিপি- **'শ্রীচণ্ডী/চরণ প/রায়ন'**। চতুর্ভুজের বাইরে, উপরে **'শকাব্দা'**, নীচে **'পাণ্ডু'**, বামদিকে **'নগরাত'** এবং ডানদিকে **'১৩৩৯'** লেখা রয়েছে। অক্ষর গুলি একটু গোলাকার হয়ে গেছে।

(খ) পাণ্ডুয়াতে নির্মিত ঃ এই মুদ্রার সম্মুখ দিকে মধ্যস্থিত বৃত্তে তিন লাইনের লিপি **'শ্রীশ্রীদ/নুজমর্দ্দ/নদেব'**। বৃত্তের বাইরে ত্রিকোণ রশ্মির বিন্যাস রয়েছে। মুদ্রার পশ্চাৎ দিকে একটি চতুর্ভূজের মধ্যে তিন লাইনের লিপি- 'শ্রীচণ্ডী/চরণ প/রায়ন'। চতুর্ভুজের বাইরে, উপরে **'শকাব্দা'**, নীচে **'পাণ্ডু'**, বামদিকে **'নগরাত'** এবং ডানদিকে **'১৩৩৯'** লেখা রয়েছে। এর আগের মুদ্রার চেয়ে বেশী গোলাকার অনেকটা ওড়িয়া অক্ষরের মত।

(গ) সোনারগাঁতে নির্মিত ঃ এই শ্রেণীর মুদ্রা পাণ্ডুয়াতে নির্মিত মুদ্রা থেকে আলাদা। মুদ্রার সম্মুখ দিকে পদ্মাকৃতি বৃত্তে তিন লাইনের লিপি- **'শ্রীশ্রীদ /নুজমর্দ্দ / নদেব'**। মুদ্রার পশ্চাৎ দিকে একটি চতুর্ভুজের মধ্যে তিন লাইনের লিপি- **'শ্রীচ ণ্ডী/চরণ প/ রায়ন।'** চতুর্ভুজের বাইরে, উপরে **'সুবর্ণ'** নীচে **'শকাব্দা'**, নীচে **'পা ণ্ডু'**, ডানদিকে **'গ্রামাত'** এবং বামদিকে **'১৩৩৯'** লেখা রয়েছে।

(ঘ) চট্টগ্রামে নির্মিত ঃ এই মুদ্রার নক্সা আগেরগুলির মত নয়। সম্মুখ দিকে দুই লাইনের ঘেরা ষড়ভুজের মধ্যে তিন লাইনের লিপি- **'শ্রীশ্রীদ/নুজমর্দ্দ / নদেব'**। বৃত্তের বাইরে কিছু জ্যামিতিক রেখার বিন্যাস রয়েছে। মুদ্রার পশ্চাৎ দিকে পদ্মাকৃতি বৃত্তে তিন লাইনের লিপি **'শ্রীচণ্ডী/চরণ প/রায়ন'**। বৃত্তের বাইরে গোল করে লেখা **'চাটিগ্রামাত শকাব্দা ১৩৩৯'**।

(ঙ) চট্টগ্রামে নির্মিত ঃ আরেক ধরণের মুদ্রাব সম্মুখদিকে বৃত্ত মধ্যস্থিত তিন লাইনের লিপি- **'শ্রীশ্রীদ/নুজমর্দ্দ/নদেব'**। বৃত্তের বাইরে ত্রিকোণ রশ্মির বিন্যাস এবং চারিদিকে চারটি " রয়েছে। মুদ্রার পশ্চাৎ দিকে দুই লাইনে ঘেরা একটি চতুর্ভুজের মধ্যে তিন লাইনের লিপি- **'শ্রীচণ্ডী/চরণ প/রায়ন'**। চতুর্ভুজের বাইরে, বৃত্তের মধ্যে. উপরে **'শকাব্দা'**, ডানদিকে **'১৩৩৯'** নীচে **'চাটিগ্রা'** এবং বামদিকে **'মাত'** লেখা রয়েছে।

মহেন্দ্রদেবের মুদ্রা

দনুজমর্দনের চেয়েও মহেন্দ্রদেবের মুদ্রা অনেক বেশী দুষ্প্রাপ্য। এই মুদ্রার সঙ্গে পিতার মুদ্রার বিশেষ সাদৃশ্য রয়েছে। যতদূর জানা গেছে মাত্র এক রকমের রূপার মুদ্রাই পাওয়া

গিয়েছে। ওজন মোটামুটি ভাবে ১০.৭৯ গ্রামের মধ্যে রয়েছে। মুদ্রাগুলি সবই গোলাকার, যার ব্যাস মোটামুটিভাবে ২৯.৭ মিলিমিটার। সোনারগাঁ এবং পাণ্ডুয়া টাকশালে তাঁর মুদ্রা নির্মিত হয়েছে।

পাণ্ডুয়াতে নির্মিত ঃ এই মুদ্রার সম্মুখ দিকে পদ্ম মধ্যস্থিত বৃত্তে তিন লাইনের লিপি- **'শ্রীশ্রীম/স্মহেন্দ্র/দেবস্য'**। মুদ্রার পশ্চাৎ দিকে একটি চতুর্ভুজের মধ্যে তিন লাইনের লিপি- **'শ্রীচণ্ডী/চরণ প/রায়ন'**। চতুর্ভুজের বাইরে, উপরে **'পাণ্ডুন'**, নীচে **'শকাব্দা'**, ডানদিকে **'গরাত'** এবং বামদিকে **'১৩৪০'** লেখা রয়েছে।

নলিনীকান্ত ভট্টশালী মশাই যদু, জালাল-উদ-দীন এবং মহেন্দ্রদেবকে এক করে দেখেছেন। এইচ ই স্টাপলটন ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল এর জার্নালে মহেন্দ্রদেবকে সম্ভবত যদুর অন্য ভ্রাতা বলে দাবী করেছেন। সুখময় মুখোপাধ্যায় ও আবদুল করিম ঐ একই মত পোষণ করেন। তবে দনুজদর্মনের মৃত্যুর পরে মহেন্দ্রদেব খুব স্বল্প সময়ের জন্য রাজা হন। শুধু মাত্র ১৩৪০ শকাব্দের (১৪১৮), অর্থাৎ ৮২১ হিজরীর সময়েরই মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে।

মহেন্দ্রদেবকে অপসারিত করে জালাল-উদ-দীন গৌড়ের সিংহাসন দ্বিতীয় বার আরোহন করেন ঐ ৮২১ হিজরীতে। তবে তিনি বাংলা লিপিতে কোনও মুদ্রা প্রকাশ করেন নি। তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান একজন ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান হয়েও মুদ্রাতে অপরূপ এক সিংহের চিত্র অঙ্কন করেছিলেন। সুখময় মুখোপাধ্যায় রুকন-উদ-দীন বারবক শাহেব সংস্কৃত ভাষায় মুদ্রা প্রকাশের কথা লিখেছেন। কিন্তু এ সম্পর্কে আর কিছু তথ্য নেই। অনুমান করা যায় দনুজমর্দনের মতো বারবক শাহ হয়তো বাংলা লিপিতে সংস্কৃত ভাষায় মুদ্রা জারী করেছিলেন।

শ্রীহট্ট বা সিলেটের মুদ্রা ঃ এই মুদ্রাটি সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ নামে সিলেটের এক রাজার কথা উল্লেখ করেছেন। মুদ্রাটির চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। বন্দ্যোপাধ্যায় দাবী করেছিলেন, ঐটিতে নাকি মুদ্রার সম্মুখে বাংলায় রাজার নাম **'গৌরগোবিন্দ'** এবং ত্রিপুরার মুদ্রার ন্যায় সিংহের চিত্র রয়েছে। তাঁর অনুমিত তারিখ ১৪০২ (?) শকাব্দ। তবে পরবর্তী সময়ে আবদুল করিম সিলেট বিজয় ১৩০৩ খ্রিষ্টাব্দ বলে জানাচ্ছেন। যদিও এই মুদ্রা সম্পর্কে আমাদের কাছে অন্য তথ্য নেই, তবে বলা যাবে গৌড় বিজয়ের আগেও বাংলা লিপির মুদ্রা থাকা অসম্ভব নয়।

কোচবিহার, ত্রিপুরা, আরাকান ইত্যাদি রাজবংশ মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভুত। কালক্রমে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে বৃহৎ বঙ্গের সঙ্গে মিশে যায়। আরাকান অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত ছিল।

ত্রিপুরার মুদ্রা

বৃহৎ বঙ্গের সবচেয়ে আকর্ষণীয় মুদ্রা ত্রিপুরা রাজ্যের। লিপির সঙ্গে চিত্রের সংযোজন বিশেষ মাত্রা অর্জন করেছে। ত্রিপুরা রাজ্যের রাজাদের সবাইয়ের নামের সঙ্গে মাণিক্য উপাধি যুক্ত। এই মাণিক্য রাজাদের মুদ্রার সংগ্রহ কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম, সাহিত্য পরিষদ সংগ্রহশালা. আগরতলা, সরকারী মিউজিয়াম ব্রিটিশ মিউজিয়াম, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহশালা এবং ঢাকা মিউজিয়ামে বেশ কয়েকটি ত্রিপুরার মুদ্রা রয়েছে।

দনুজমর্দন ও মহেন্দ্রদেব বাংলা লিপিতে মুদ্রা প্রচলন করে যে পথ প্রদর্শন করেছিলেন তার সফল প্রয়োগ দেখা যাবে ত্রিপুরার মুদ্রায় । রত্নমাণিক্যের ১৩৮৬ শকাব্দের (১৪৬৪ খ্রিষ্টাব্দ) প্রকাশিত মুদ্রাটি প্রাচীনতম মুদ্রা । তাঁর মুদ্রায় রাজধানী ও টাকশাল রত্নপুর লেখা হয়েছে । মোট ৩২ জন রাজা ইংরেজ আমলের শেষ পর্যন্ত একটানা মুদ্রা প্রচলন করে গেছেন । শেষ রাজা ছিলেন বীরবিক্রমকিশোরমাণিক্য ।

ত্রিপুরার মুদ্রা প্রচলন হত সাধারণ ভাবে এবং স্মারক হিসাবে, যেমন তীর্থস্নান, রাজ্যজয় ইত্যাদি । বৃহৎ বঙ্গে একমাত্র এঁদের মুদ্রাতেই রাজা ও রাণীর নাম লেখা হত । তারিখের ব্যাপারেও সচেষ্ট ছিলেন রাজারা । প্রথমদিকে শক করে পরে বীরচন্দ্রমাণিক্যের সময় থেকে ত্রিপুরাব্দ ব্যবহার হত । ত্রিপুরার সব মুদ্রাই গোলাকার এবং রূপার । সোনার মুদ্রা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য, বিজয়মানিক্য ও কৃষ্ণমাণিক্য এর প্রচলন করেছিলেন ।

রত্নমাণিক্য বাংলালিপি ছাড়াও জালালুদ্দীনের অনুকরণে অপরূপ সিংহের চিত্র ত্রিপুরার মুদ্রায় শুরু করেছিলেন যা কিনা পরবর্তী মাণিক্য রাজারাও অনুসরণ করেছিলেন। আগেই বাংলার মুদ্রায় সংস্কৃত ভাষার ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে । মাণিক্য রাজারাও তাই অনুসরণ করেছেন । তবে যে সব চিত্র ত্রিপুরার মুদ্রায় ব্যবহৃত হয়েছে তা বাংলার মুদ্রার ইতিহাসে অতুলনীয় । অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়, 'অর্ধনারীশ্বর', 'গরুড় বাহন বিষ্ণু', 'গোপিনী সহ কৃষ্ণ' ইত্যাদি ।

লিপি প্রসঙ্গে বলতে হয় ত্রিপুরার রাজারা নিজের দেব ভক্তি হিসাবে বিরুদ ব্যবহার করতেন । যেমন, **'শ্রীনারায়ণ চরণপর'**, **'পার্বতী পরমেশ্বর চরণপর'**, **'শ্রীনরসিংহ চরণপরায়ন'**, **'শ্রীহরগৌরী পদপদ্ম মধুপ'**, **'শিবদুর্গাপদাব্জ মধুপ'**, **'অরবিন্দ'**, **'চতুর্দশ দেব চরণপর'**, **'শ্রীদুর্গারাধানাপ্ত বিজয়'** ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়েছে । মুদ্রার লিপি থেকেই জানা যায় যে এক সময় চাটিগ্রাম দনুজমর্দনের অধীনস্থ ছিল । ধন্যমাণিক্যর **'চাটিগ্রাম বিজয়ি'** স্মারক মুদ্রা থেকে সেই হস্তান্তর পরবর্তী এক সময়ে হয়েছিল বলে জানা যায় । চট্টগ্রাম বাংলার সুলতান, ত্রিপুরার রাজা ও আরাকানের মগ রাজাদের সীমান্ত শহর হওয়ার জন্য যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকত । এরকম আরো নজির ত্রিপুরার মুদ্রা থেকে পাওয়া যায় ।

কোচবিহার বা কামতাপুর-এর মুদ্রা

কোচবিহারেব মুদ্রার স্রষ্টা রাজা নরনারায়ণ । তাঁব প্রাচীনতম মুদ্রা ১৪৭৭ শকাব্দে (১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে) প্রকাশিত হয়েছে । কোচবিহারের রাজারা বাংলা লিপিতে সংস্কৃত ভাষায় মুদ্রা জারী করেছিলেন । সব মুদ্রাই গোলাকার । কোচবিহারের রাজাদের রূপার পূর্ণ মুদ্রার ওজন ছিল ১১.১৫ গ্রামের চেয়ে একটু বেশী । এর সঙ্গেই অর্ধ ও শিকি মুদ্রা প্রচলন করেছিলেন । ওজন যথাক্রমে ৫.৩ ও ২.৬ গ্রাম । কোচবিহারের রূপার মুদ্রায় শুধু লিপির ব্যবহার দেখা যায় । বাংলার সুলতান হোসেন শাহের মুদ্রার সাদৃশ্য রয়েছে । সোনার মুদ্রা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য । প্রয়াত বসন্ত চৌধুরীর সংগ্রহে এই মুদ্রাটি ছিল ।

নরনারায়ণের রূপার মুদ্রার লিপির ধরনে সামান্য পার্থক্য রয়েছে । মুদ্রার সম্মুখে ও পিছনে গোল বৃত্তের মধ্যে উভয় দিকেই বৃত্তের বাইরে বিন্দুর মালা রয়েছে । সামনের দিকে পাঁচ

পংক্তি লিপি '**শ্রীশ্রী/মন্নরনর নারা/য়ণ ভূপাল/স্য শাকে /১৪৭৭**' এবং পিছনে পাঁচ পংক্তি লিপি '**শ্রীশ্রী/শিবচরণ/কমল মধু/করস্য**' লিখিত হয়েছে। অর্ধ ও শিকি মুদ্রাতেও এই একই ধরনের লিপি রয়েছে। নরনারায়ণের সবচেয়ে বড় মুদ্রাভাণ্ডার আবিষ্কৃত হয়েছিল ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দে জলপাইগুড়ি জেলার চণ্ডীর ঝাড় থেকে। এখানে পাওয়া ২২২ টি মুদ্রা এখন পশ্চিমবঙ্গে সরকারী সংগ্রশালায় রয়েছে। লিপির দিক দিয়ে দেখা যায় প্রাচীন বাংলা ও নাগরী মিশ্রিত হয়েছে, বিশেষ করে পিছনের উপরোক্ত 'স' 'ভ' 'ণ' 'ম' 'র' 'স' অক্ষর গুলিতে।

সোনার মুদ্রা ৩০ মিলিমিটার ব্যাসের, যার ওজন ছিল ১২.১৫ গ্রাম। মুদ্রার সামনে ত্রিপুরার মুদ্রার ন্যায় বৃত্তের মধ্যে সিংহের চিত্র রয়েছে। বাইরে গোল করে লেখা '**দিগ্বিজয়ী সমর সিংহ শ্রীমান নরনারায়ণ ভূপালস্য শাকে ১৪৮৬**'। মুদ্রার পিছনে পাঁচ পংক্তি লিপি '**শ্রীশ্রী/হরগৌরী/চরণ কম/ল মধুক/ রস্য**' রয়েছে।

১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে নরনারায়ণের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ কোচ রাজ্যের পশ্চিম অংশে এবং ভ্রাতুস্পুত্র রঘুদেব পূর্বদিকে'কামরূপ'অঞ্চলের রাজা হয়েছিলেন। প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা মুদ্রা প্রচলন করেছিলেন।

রঘুদেবনারায়ণের মুদ্রায় '**হরগৌরীচরণ কমল মধুকরস্য**' লেখা হয়েছে। লক্ষ্মীনারায়ণের মুদ্রায় সম্মুখে '**শ্রীশ্রী শিবচরণ কমল মধুকরস্য**' লেখা হয়েছে। তবে তাঁর মুদ্রার লিপির ধরণ নরনারায়ণের মত নয়। প্রাণনারায়ণের পরবর্তী রাজারা মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করে পূর্ণমুদ্রার অধিকার হারায়। পরবর্তী রাজারা পূর্ণমুদ্রার 'ডাই' বা 'ছাঁচের' এর সাহায্যেই অর্ধমুদ্রা প্রকাশিত করতেন। এর ফলে অনেক সময়ই রাজার নাম বা তারিখ পড়া যেতনা। এই সব মুদ্রা 'নারায়ণী মুদ্রা' নামে পরিচিত। মোট ২১ জন কোচ রাজা নিজনামে মুদ্রা প্রকাশ করেছেন।

শেষ দিকের রাজাদের মুদ্রায় শকাব্দের পরিবর্তে কোচবিহারের নিজস্ব 'রাজশকা' ব্যবহৃত হত। ইংরেজ আমলে জিতেন্দ্রনারায়ণের (১৯১৩-২৩ খৃষ্টাব্দে) সময়ের একটি অর্ধমুদ্রায় ৪০৪ রাজশকা রয়েছে। এই মুদ্রা মেশিনে নির্মিত এর সামনের দিকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অনুকরণে রাজকীয় চিহ্ন অঙ্কিত হয়েছে। যার নিচে লেখা রয়েছে '**যতো ধর্ম স্ততো জয়**'। জগদ্বীপেন্দ্রনারায়ণ শেষ কোচ বাজা, ১৯৪৭ এ ভারত মুক্তি পর্যন্ত রাজত্ব করেছেন এবং বাংলা ভাষায় শেষ মুদ্রা প্রকাশ করেছিলেন।

আসামের মুদ্রা

অহোম রাজাদের আদি নিবাস ব্রহ্মদেশের শান প্রদেশে। বঙ্গভূমিতে যখন মুসলমান রাজত্বের শুরু তার পরেই ব্রহ্মপুত্র অঞ্চলে এই উপজাতি আক্রমণ করেন। প্রথমদিকের মুদ্রায় যে অহোম লিপির ব্যবহার হয়েছিল তার নৈকট্য রয়েছে বর্মী লিপির সঙ্গে। অহোম রাজা স্বর্গনারায়ণ (আনুমানিক ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে) সম্ভবত বাংলা হরফে প্রথম মুদ্রা প্রচলন করেছেন। আসামের মুদ্রার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এর অষ্টভুজ আকার। তবে বাংলার সুলতানদের রূপার প্রামাণিক ওজন গ্রহণ করেছেন সেই অনুপাতে টাকা, আধুলি, সিকি, দুআনি ও এক আনা মুদ্রা প্রচলন করেছেন। কয়েকজন রাজা সোনার মুদ্রাও প্রচলন করেছিলেন। আসামের রাজাদের মুদ্রার সামনের দিকে '**শ্রীশ্রী হরগৌরীচরণ কমল মকরন্দ মধুকরস্য**' '**শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ চরণ**

কমল ..' ইত্যাদি এবং পিছনের দিকে **'শ্রীশ্রী স্বর্গদেব শ্রী** ... (রাজার নাম)স্য শাকে (তারিখ)' থাকত।

আরাকান এর মুদ্রা

এর আগেই হরিকেল মুদ্রা প্রসঙ্গে আরাকানের মুদ্রার কথা বলা হয়েছে। আজকের বাংলা দেশের পূর্বাঞ্চলে গুপ্ত যুগের পরে সমতট বলে এক বর্ধিষ্ণু রাজ্য ছিল। এই রাজ্য আরাকানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে রূপার ব্যবসায়ে যুক্ত হয়। আরাকানে রূপার মুদ্রার প্রচলন ছিল। এদের মুদ্রার বিশেষ বৈশিষ্ট্য এর সঙ্গে রাজার নাম যুক্ত, সঙ্গে বৃষ ও ত্রিশূল এর মূর্তি। খ্রীষ্টিয় চতুর্থ শতক থেকে এই অঞ্চলে চন্দ্রবংশীয় রাজারা রাজত্ব করতেন। দেবচন্দ্র (৪৫৪-৭৬ খ্রীষ্টাব্দ) প্রথম শঙ্খ ও শ্রীবৎস চিহ্নযুক্ত মুদ্রা প্রচলন করেছিলেন। সম্ভবত শশাঙ্কের অনুকরণে গুপ্ত ব্রাহ্মী লিপিতে মুদ্রা প্রচলন করেছিলেন। ধর্মবিজয় আনুমানিক ৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দে সমতট অধিগ্রহণ করেন। এঁর মুদ্রায় লিপি রয়েছে পরবর্তী গুপ্ত ব্রাহ্মী হরফে **'ধর্ম্মবিজয়'** লেখা, সঙ্গে বৃষ ও ত্রিশূল এর মূর্তি। লিপিগুলি এত স্পষ্ট যে সহজেই বাংলা বলে মনে হয়।

আরাকান এর সঙ্গে বঙ্গভুমির সম্পর্কের নির্ভরযোগ্য নজির মুদ্রা। ব্রহ্মদেশের রাজারা আরাকান অধিগ্রহণ করে ১৪০৪ খৃষ্টাব্দে। বিতাড়িত মগ রাজা শ মুন খান, বা নরমেখলা বাংলার রাজা হামজা শাহের আশ্রয় নেন। পরে ১৪৩০ খৃষ্টাব্দে বাংলার সুলতানের সাহায্যে পুনরায় হৃত আরাকান রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি। আরাকানে ইসলামের সূচনা সম্ভবত এর থেকে। আরাকান রাজারা বৌদ্ধ নামের সঙ্গে ইসলামি নামও গ্রহণ করতেন। বাংলার সুলতানের নামের সঙ্গে নামের পার্থক্য রাখার জন্যও হয়তো বৌদ্ধ নাম যুক্ত হয়েছিল।

এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ্য সলিম শাহের (১৫৯৩-১৩১২ খ্রীষ্টাব্দ) মুদ্রা। বর্মি, ফারসী ও বাংলা তিন ভাষাই ব্যবহৃত হয়েছে এর মুদ্রায়। এঁর বৌদ্ধ নাম ছিল মেং রাজা গী। ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে এর প্রকাশিত মুদ্রায় পিছনের দিকে বাংলা হরফে **'ধবল গজেশ্বর শ্রীশ্রী ছলিম শাহ'** লেখা হয়েছে। এই রাজবংশের আরো কয়েকজন এই ধরণের ত্রিভাষী মুদ্রা প্রচলন করেছিলেন।

কাছাড় এর মুদ্রা

বৃহৎ বঙ্গের মুদ্রার ইতিহাসে আরেকটি উল্লেখ্য নাম কাছাড়। সাধারণতঃ কাছাড়ের রাজারা সিংহাসন আরোহণের প্রথম বছরটিকেই প্রকাশনের সময় বলে গ্রহণ করত। প্রথম কাছাড়ের রাজা মুদ্রা প্রচলন করেছিলেন সম্ভবত মেঘনারায়ণ ১৪৯৮ শকাব্দে (অর্থাৎ ১৫৭৬-৭৭ খ্রীষ্টাব্দে)। ইনি সোনা ও রূপার মুদ্রা প্রচলন করেছিলেন। রূপার মুদ্রাও সুলতানী বাংলার মুদ্রার প্রামাণিক ওজনে, প্রায় ১১ গ্রাম। মুদ্রার সামনের দিকে চার লাইনের লিপি **'হর গৌরী/চরণ পরা/য়ণ হাচেঙ্গ/শা বংশজ'** আর পিছনের দিকে চার লাইনের লিপি **'শ্রীশ্রী মে/ঘনারায়ণ ভূপাল/স্য শাকে/১৪৯৮** রয়েছে।

যশোনাবায়ণ (১৫০৫ শকাব্দ ৫৮৩-৮৪ খ্রীষ্টাব্দ) মেঘনারায়ণের পরবর্তী রাজা। এর রূপার মুদ্রার উভয় দিকে বৃত্তের মধ্যে নক্সার ভিতরে চতুষ্কোণের মধ্যে চার লাইনের লিপি রয়েছে। সামনের দিকে **'হর গৌরী/চরণ পরা/য়ণ হাচেঙ্গ/শা বংশজ'** আর পিছনের দিকেও চার লাইনের লিপি **'শ্রীশ্রী যশো/নারায়ণ দে/ব ভূপাল স্য/শাকে ১৫০৫** রয়েছে। রাজা ইন্দ্রপ্রতাপ

নারায়ণ '**শ্রীহট্টবিজয়**' উপলক্ষে স্মারকমুদ্রা প্রচলন করেছিলেন ১৫২৪ শক বা ১৪৪৬ খ্রীষ্টাব্দে। ভীমদর্পনারায়ণ ১৫৫২ শকাব্দে,(১৬৩০-৩১ খ্রীষ্টাব্দে) মুদ্রা প্রচলন করেছেন। লক্ষ্মীচন্দ্র নারায়ণ ১৬৯৪ শকাব্দে (১৭৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দে) মুদ্রা প্রচলন করেছেন।

গোবিন্দচন্দ্র (১৭৩৬ শকাব্দ বা ১৮১৪-১৫ খ্রীষ্টাব্দ) নামের আর এক কাছাড়ের রাজার মুদ্রার কথা জানা গেছে। লিপির দিক দিয়ে দেখলে বাংলার মুদ্রার ইতিহাসে একমাত্র অনুস্টুভ ছন্দের ব্যবহার হয়েছে এরই রূপার মুদ্রায়। সামনে এবং পিছন দিক মিলিয়ে দুই পর্বে লেখা হয়েছে বিচিত্র এক শ্লোকের মাধ্যমে। '**হৈড়িম্বপুর অধীশ শ্রীরণচণ্ডিপদা যুশ/শ্রীশ্রী গোবিন্দ চন্দ্রস্য রাজ্ঞো অংগ ত্রি অদ্রি কৌ শা**'। এখানে শকাব্দে যে তারিখ ১৭৩৬ লেখা হয়েছে দীনেশ চন্দ্র সরকার মশাই তার পাঠ নির্ণয় করেছিলেন উল্টোদিক থেকে এই ভাবে, অঙ্গ (৬), ত্রি (৩), অদ্রি অর্থাৎ সমুদ্র (৭) এবং কু (১)।

জয়ন্তিয়ার মুদ্রা

আসামের সুর্মা উপত্যকায় জয়ন্তিয়া পাহাড়ী অঞ্চলে অবস্থিত এক রাজ্য। সম্ভবত ১৫৯১ শকাব্দে বা ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম জয়ন্তিয়ার মুদ্রা প্রকাশিত হয়েছে। মুদ্রাগুলি গোলাকার। প্রথমদিকে জয়ন্তিয়ার মুদ্রায় রাজার নামের পরিবর্তে দেশের নাম লেখার রীতি ছিল। যেমন লক্ষ্মীনারায়ণের একটি রূপার টংক মুদ্রার দুদিকেই বৃত্তের মধ্যে চার লাইনের লিপি '**শ্রীশ্রী শিবচরণ কমল মধুকরস্য**' লেখা রয়েছে। আর পিছনের দিকে '**শ্রীশ্রীজ/য়ন্তিপুর পু/রন্দরেস্য** একটি দাগের নীচে '**শাকে ১৫৯২**' লেখা রয়েছে। অন্যান্য যে সব জয়ন্তিয়ার রাজাদের মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে তাঁদের মধ্যে জয়নারায়ণ, বড়গোসাই, ছত্রসিংহ, যাত্রানারায়ণ ও রামসিংহ অন্যতম। তবে এদের সনাক্ত করার জন্য নামের পরিবর্তে শকাব্দের তারিখের সাহায্য নিতে হবে।

বৃহৎ বঙ্গের মুদ্রা প্রসঙ্গে অবশ্যই বলতে হয় এই আলোচনা নিতান্ত প্রাথমিক এবং অত্যন্ত সীমিত স্তরে করা হয়েছে। এই সম্পর্কে বিভিন্ন সংগ্রহ নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনার অবকাশ রয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আবার বাংলা লিপিতে মুদ্রা প্রচলন শুরু হয়েছে।

সূত্র নির্দেশ ঃ

নলিনীকান্ত ভট্টশালী (১৯২২) কয়েন্স অ্যাণ্ড ক্রনোলজি অফ দি আর্লি ইনডিপেনডেন্ট সুলতানস অফ বেঙ্গল। আবদুল করিম (১৯৭৯) ক্যাটালগ অফ কয়েনস ইন দি ক্যাবিনেট অফ দি চিটাগং ইউনিভার্সিটি মিউজিয়াম। (১৯৮৭) বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল, পৃঃ ১৭২। প্রদীপকুমার মিত্র ও সুতপা সিংহ (১৯৯৩ - ৯৪) চণ্ডীব ঝার হোর্ড অফ সিলভার কয়েন্স, প্রত্নসমীক্ষা ২. ৩ঃ ২৭৮ - ৪১৯। রমনী মোহন শর্মা (১৯৮০) কয়েনেজ অফ ত্রিপুরা। সুখময় মুখোপাধ্যায় (১৯৮৮) বাংলায় মুসলিম অধিকারের আদিপর্ব, পৃ ১১৭ - ১৮। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২০) নিউমিসম্যাটিক সাপ্লিমেন্ট, জার্নাল অফ দি এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল, (এন এস ১৬) পৃ. ৮৬। জয়প্রকাশ সিংহ (১৯৮০) সম্পাদিত, কয়েনেজ অফ বেঙ্গল অ্যাণ্ড ইটস নেবারহুড।

মানবসভ্যতায় লিপির উদ্ভব ।। ভারতীয় লিপির উদ্ভবযুগ
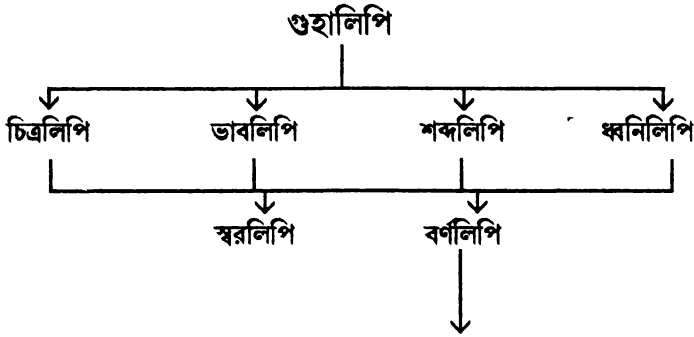
●মেসোপটেমিয় বাণমুখ কীলক লিপি (খ্রীঃ পূঃ ৮ম সহস্রাব্দ) । ●মিশরীয় চিত্রলিপি (খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ - ৩য় সহস্রাব্দ।) ●আক্কাডীয় কিউনিফর্ম (খ্রীঃ পূঃ ৩য় সহস্রাব্দ) । ●ফিনিসীয় সেমিটিককিউনিফর্ম (খ্রীঃ পূঃ ৩য় - ২য় সহস্রাব্দ) । ●হামুরাবির কোড্ (খ্রীঃ পূঃ ৩য় - ২য় সহস্রাব্দ) । ● গ্রীকলিপি (খ্রীঃ পূঃ ২য় সহস্রাব্দ) । ●হিত্তিৎ কিউনিফর্ম (খ্রীঃ পূঃ ২য় সহস্রাব্দ) । ●চীনা চিত্রলিপি (খ্রীঃ পূঃ ২য় সহস্রাব্দ) । ●লিনিয়ার 'বি' (খ্রীঃ পূঃ ১৪০০) । ●আসিরীয়া, ক্রীট, হিব্রু ও অন্যান্য লিপি (খ্রীঃ পূঃ ২য় সহস্রাব্দ) ।● হরপ্পা-সিন্ধুলিপি (খ্রীঃ পূঃ ৩য় সহস্রাব্দ → খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ অব্দ।

খ্রীষ্ট পূর্ব ২য় থেকে খ্রীঃ পূঃ ১ম সহস্রাব্দ কালের বিবিধ ভারতীয় বর্ণমালা

●লোথাল 'এ' (খ্রীঃ পূঃ ১৯০০ অব্দ) । ● লোথাল 'বি' (খ্রীঃ পূঃ ১৯০০ - ১৬০০ অব্দ) । ● রাখি শাহ্‌পুর, রোজ্ ডি, চণ্ডীগড় (খ্রীঃ পূঃ ১৯০০ অব্দ) । ● রংপুর (খ্রীঃ পূঃ ১৬০০ - ১৩০০ অব্দ) । ● অন্যান্য লিপি ।

বিতর্কিত প্রাক্ - অশোক বর্ণমালা (খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ - খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতাব্দী)*

●পরখম্ মূর্তিলিপি (খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শঃ) । ●পাটনা মূর্তিলিপি (খ্রীঃ পূঃ ৫ম শঃ) । ●পিপরহ্বা পাত্রলিপি (খ্রীঃ পূঃ ৫ম শঃ) । ● শোহগৌড়া ব্রোঞ্জলিপি (খ্রীঃ পূঃ ৩য় শঃ) । ●এরণমুদ্রালিপি (খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শঃ) । ● বরলি প্রস্তর লিপি (খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শঃ) । ●ভট্টিপ্রলু পাত্রলিপি (খ্রীঃ পূঃ ৫ম শঃ) । ●মহাস্থান প্রস্তরলিপি (খ্রীঃ পূঃ ৩য় শঃ) ।

* বুলার, স্মিথ, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখগণ প্রাক্ অশোকযুগের বলেছেন । দীনেশ চন্দ্র সরকার প্রমুখ পণ্ডিতদের মতে এগুলি অশোক - যুগীয় বা অশোক - পরবর্তী যুগেব লিপি ।

ভারতীয় বর্ণমালা

- ব্রাহ্মী লিপি (খ্রীঃ পূঃ ৫ম/৪র্থ — খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী)
  - প্রাচীন
    - উত্তরাঞ্চলীয় → উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় (এলাহাবাদ, রাধিয়া, মাথিয়া ইত্যাদি) ।
      - উত্তর মধ্যাঞ্চলীয় (বৈরট, সাসারাম ইত্যাদি)
      - উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় (কালসী) ।
    - দক্ষিণাঞ্চলীয় → (গির্ণার, ধৌলি, জৌগড়, সিদ্ধপুর লিপি)
      - ↓ দক্ষিণ ভারতীয় বর্ণমালা
  - পরবর্তী বা অর্বাচীন
    - দশরথের নাগার্জুনী গুহালিপি (খ্রীঃ পূঃ ২০০) ।
    - ভারহুত তোরণ, স্তম্ভ, প্রবেশপথের লিপি (খ্রীঃ পূঃ ১৫০) ।
    - পভোস গুহালিপি (খ্রীঃ পূঃ ১৫০) ।
    - মথুরা যক্ষমূর্তিলিপি (আ. খ্রীঃ পূঃ ১৫০) ।
    - হাথীগুম্ফা লিপি (খ্রীঃ পূঃ ১৬০) । (খারবেল)
    - নানাঘাট লিপি (খ্রীঃ পূঃ ১৫০) ।
    - বুদ্ধগয়া স্তম্ভলিপি (খ্রীঃ পূঃ ২০০)।
    - সুতনুকা লিপি (খ্রীঃ পূঃ ২য়) ।
- ↓ কুষাণ ব্রাহ্মী (খ্রীষ্টীয় ১ম - ৩য় শতাব্দী) → সারনাথ, বুদ্ধগয়া, সাহেত-মাহেত ও রাজগীর থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন লিপি ।
- ↓ গুপ্ত ব্রাহ্মী (খ্রীষ্টীয় ৪র্থ - ৫ম/৬ষ্ঠ শতাব্দী) →
  - পূর্বাঞ্চলীয় (এলাহাবাদ, উদয়গিরি, শুশুনিয়া, বুদ্ধগয়া, গড়োয়া, ধনাইদহ) ।
  - পশ্চিমাঞ্চলীয় (মথুরা সাঁচী, ভিতারী. এরাণ ইত্যাদি)।
  - দক্ষিণাঞ্চলীয় (বিলসদ, মন্দসোর, বিজয়গড় ইত্যাদি)।
  - মধ্যএশীয় (বোয়ার পাণ্ডুলিপি ও অন্যান্য) ।
- ↓
  - সাবদা (উঃ পশ্চিম ভারত) (৬ষ্ঠ ৭ম শতাব্দী) → গুরুমুখী (পাঞ্জাব)
  - নাগর (দঃ পশ্চিম ও মধ্যভারত) (৬ষ্ঠ - ৭ম শতাব্দী) → দেবনাগরী
  - * কুটিল (পূর্বভারত) (৬ষ্ঠ - ৭ম শতাব্দী) → আদি বঙ্গাক্ষর শশাঙ্ক, পাল, সেনযুগ

চর্যাগীতিকোষ (১০ম - ১২শ শতাব্দী। □ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (১৫শ শতাব্দী) ।

↓ ↓ ↓ ↓

বাংলা, অসমীয়া, নেওয়ারী, ওড়িয়া, মৈথিলী বর্ণমালার উদ্ভব (১০ম - ১১শ শতাব্দী) ।

*একে সিদ্ধমাতৃকা বর্ণমালাও বলা হয়ে থাকে। আদি নিদর্শন - মহানমনের বুদ্ধগয়ালিপি (৫৮৮-৮৯ খ্রীষ্টাব্দ) । পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত কুটিল লিপির প্রাচীন নিদর্শন গোপচন্দ্রের মল্লসারুল তাম্রশাসন (খ্রীঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী) ।

চোদ্দ

পাণ্ডুলিপির বর্ণমালা

অ /আ

।। আলরাধা ।। কিসক মরিতেঁ চাহ তোহ্মে । শ্রী. ।

অভিরাম গোশ্ব্যামি বন্দ কহনে না জাঅ । বৈ. ব. ১৯শ শঃ ।

প্রভূবাক্য শুনি অতি উর্দ্ধাসিত মন । ঢা. বি. ৬০৫৩ ।

নামমন্ত্রে করিয়া অভেদ । প্রে. চ. ১৮৫৩ খ্রীঃ ।

কেঁহ বলে মানুস নঅ । শী. । ১৮৫৯ খ্রীঃ ।

অমনি ধাইয়া আইল রাজসভাতলে । দ্রৌ. ল. ১৮০৪ খ্রীঃ ।

অবতারগণের ভক্তভাবে অধিকার । চৈ. চ. ১৮৪৭ খ্রীঃ ।

বুঝিলেন্ত কহি সুন রছুল আল্লার । ঢা. বি. ২১৫ ।

এবং আমার চাকরান জমি । ১৮২৫ খ্রীঃ লেখা দানপত্র ।

ই / ঈ

জাইবো মথুরা নগর । শ্রী. ।

ইতি সঙ্কল্প্য প্রায়শ্চিত্ত । রা. পা. ১২১৬ ।

ইহা ষুনি প্রভু পুন করিল গমন । গৌ. ব. ১৯শ শঃ ।

এই তিন লিঙ্গের মোদ্ধে । বৈ. প. ১৮২৫ খ্রীঃ ।

বৈদ্য হইতে তোমার পুত্র পাইল জিবন । অ. আ. ১৮শ শঃ ।

এই মতে রছুলে মাগীলা প্রভুস্থানে । ঢা. বি. ২১৫ ।

এমন অধমে যদি ঈশ্বর উদ্ধারে । শি. ১৮১৫ খ্রীঃ ।

শ্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ একলা ঈশ্বর । চৈ. চ. ১৮৪৭ ।

ঈশ্বর সেবক মালা প্রসাদ আনি দিল । ঐ. ১৮শ শঃ ।

উ / ঊ

এবেঁ তাক তেজিতেঁ উচিত তোর নহে ।।ধ্রু ।।শ্রী. ।

উমা কর‍্যা মরি মাগো মরি বিস ।শী. ১৯শ শঃ ।

করে যে বা উপহাস তার হয় সর্ব্বনাস ।ঐ, ১৯শ শঃ ।

গোবিন্দদাসকে কাহে উপেখি ।ত্রি. স. ১৮৩৫ খ্রীঃ ।

মিত্যু সহচর ঃ আউসতসম সোষে ।মু. চ. ১৯শঃ ।

উপনিত হল আসী গোর (া)ঙ্গ গোচর ।গৌ. ব. ১৯শ শঃ ।

সে জে উপবাসি ছিল উপবাসি দিনে ।শি. ১৮১৫ খ্রীঃ ।

ক্রমে উঠাইতে যেন উত্তম বস্তু পায় ।চৈ. চ. ১৮শ শঃ ।

উত্তর না কর কেনে মৌন কৈলে তুমি ।বি. মা. ১৯শ শঃ ।

ঋ

দেবান ঋষীন্ পিতৃশ্চৈব । রা. পা. ১১০৯ ।

ঋক্ষৈরমন্দ্রির গতৌ । রা. পা. ৩২০৯ ।

ছয় ঋতু ছয় রাগ ছত্তিস রাগীনি । লী. ম. ১৯স শঃ ।

ঋষীনাগবলায়াং । ঢা. বি. ২৩৯৭ ।

জত ব্রহ্মা ঋিসী দেব । শি. ১৯শ শঃ ।

ঋষয়শ্চাপি দেবাশ্চ গন্ধর্ব্বাভুজগাস্তথা । ঢা. বি. ৪৯৫ ।

দেহ যুবাতী ঋতুমতি । রা. পা. ৪৯৪৪ ।

এ / ঐ

তোম্মার বএসের দোষে । শ্রী. ।

তিন সহস্র এক শত এক । ত্রি. স. ১৮৩৫ খ্রীঃ ।

এত শুনী গোপীনাথ সভা কে লইআ । চৈ. চ. ১৮শ শঃ ।

এইরূপে ছলে কথা কহিলেন রাই । বি. মা. ১৯শ শঃ ।

একোত্রে সকল গোপি আইনু । গো. ম. ১৮৪০ ।

।। ৪৪ ।। ১১৯ ।। এই সভা এ বসিয়াছে জতজন । অ. কৃ. ক. ১৭৭৪ খ্রীঃ ।

ষুন ঐ হের সগর রাজ । বৈ. প. ১৮২৫ খ্রীঃ ।

এই জে অমুল্য সংখ মোর । শি. ১৯শ শঃ ।

ও / ঔ

কেমতে পাঁওঁ এবে শ্রীমধুসূদনে । শ্রী. ।

অনেক বিপদে গেল ষুন হে দেওর । রা. ব. ১৮১৫ খ্রীঃ ।

লক্ষি স্বরেস্বতী প্রিতি নুতি ওতিসয় । দি. ব. ১৯শ শঃ ।

ও ঔ মধ্যে প বর্গন্তু । ঢা. বি. ৮৫ ।

খী জাতী নহো বড়ায়ি উড়ী জাঁও তথা । শ্রী. ।

মালিনি বলেন গিত গাওায় । অজ্ঞাত, ১৯শ শঃ ।

ক

সিকালে তার থান জাহ একবারে । শ্রী. ।

এই শ্লোক উঘাড়িল প্রেমের কপাট । চৈ. চ., ১৮শ শঃ ।

মন তিন এক করি । বৈ. প. ১৮২৫ খ্রীঃ ।

সেইকালে হইল পুস্তক সমাধান । অ. কু. ক. ১৭৭৪ খ্রীঃ ।

জলের ভিতরে বৈশে কাঞ্চনপুরি নাম । শ. ব. ১৯শ শঃ ।

জেকেহো দাওয়া করে । ভূমিবিক্রয়পত্র, ১৮২৮ খ্রীঃ ।

পুনরপি মেনকা বিনয় বহু কৈল । শ. ব. শি. ১৯শ শঃ ।

গোপীজনবল্লভ রাধা নায়ক নাগর স্যাম । ত্রি. স. ১৮৩৫ খ্রীঃ ।

কথা কহ জখন আমার মুখ চেয়ে । শি. ১৯শ শঃ ।

খ

ভাত না খাইলি তবে তাহার কারণে । শ্রী. ।

কখন না দিঅ এরশে ভঙ্গ । বৈ. প. ১৮২৫ খ্রীঃ ।

দিয়ালেতে পরিচয় রাখিল লিখিয়া । প. ম. ১৯শ শঃ ।

দেখিব দুর্গার মুখ দু'টী আখি ভর‍্যা । শি. ১৯শ শঃ ।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখন্ডে । চৈ. চ. ১৮শ শতক ।

মনেতে ভাবিঅ্যা দেখ । বৈ. প. ১৮২৫ খ্রীঃ ।

কৃষ্ণমুখে তব গুণ য়নেক যুন্যাছি । ঢা. বি. ৫৯৯৩, ১৯শ শঃ ।

মোর পাসে বৈস রাধে খিন তরিখান । গো ম. ১৮৪০ খ্রীঃ ।

কৈলাস সিখররে বিস্বকম্মার নিম্মান । শ. ব. ১৯শ শঃ ।

গ

গাইব বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ । শ্রী. ।

এত বিচারিয়া কৃষ্ণ গেল নিজ ঘর । গো. ম. ১৮৪০ খ্রীঃ ।

নিজগণ সঙ্গে করি করিল গমণ । রা. ক. ১৯শ শঃ ।

সাধুসঙ্গ কর গিয়া নির্ত্যা সিদ্ধ পাবে । বি. ভা. ১৯১০ ।

জয়জগতারণ কারণ ধাম । ত্রি. স. পদ. ১৮৩৫ খ্রীঃ ।

আগেপার কৈলে তুমি সকল গোপিনি । গো. ম. ১৮৪০ খ্রীঃ ।

সে কলহ কর‍্যা গোরি আর হরে । শি. ১৯শ শঃ ।

সে বিদ্ধ নির্দ্ধন ঃ তুমাগত প্রাণ । ঐ, ১৯শ শঃ ।

ঘ

চরণে ধরিআঁ বোলো চল তোহ্মে ঘর । শ্রী. ।

দারুণ দমন তার সমনের ঘরে । শি. ১৯শ শঃ ।

সভারে বিদায় দেহ নিজ ঘরে ঘরে । রা. ক. ১৯শ শঃ ।

কি কর স্বচিমাতা ঘরেতে বসীআ । গৌ. ব. ১৯শ শঃ ।

তোমাবিনে ঘরদ্বার । শী. ১৮৫০ খ্রীঃ ।

দুঃখ তেজি নন্দ ঘোষে বলিতে লাগীলা । ভা. ১০ম, ১৮১৯ খ্রীঃ ।

সবগোপি ঘরে জাঅ বাক্য নাঞি । অ. আ. ১৮শ শঃ ।

ঙ

সুখে গোঙাইল কৃষ্ণকথা রঙ্গে । চৈ. চ. ১৮শ শঃ ।

বৈদ্যমুক্তি হইলাঙ নারিলে চিনিতে । অ. আ. ১৮শ শঃ ।

তোমার চরণেঃ লইলু স্বঙরণেঃ । মু. চ. ১৮শ শঃ ।

রণেজই জে তোমা স্বঙরএ । দি. ব. ১৯শ শঃ ।

ডাহিনে রহিল কোঙরপুর । মু. চ. ১৮শ শঃ ।

চ

এবেঁ তাক তেজিতেঁ উচিত তোর নহে . ।। ধ্রু ।। শ্রী. ।

হেনকালে হরচিত্ত হইল চঞ্চল । শি. ১৮১৫ খ্রীঃ ।

বজর পড়িল জেন স্বচির মাথাঅ । গৌ. ব. ১৯শ শঃ ।

জয় শচীনন্দন ত্রিভুবন বন্দন । ত্রি. স. ১৮৩৫ খ্রীঃ ।

মেঘচাপ দেখি জেন পর্ব্বত উপরে ঃ। ম. ১৯শ শঃ ।

চিকুর চাঁচর তোর চাঁমর নিন্দিত । গো. ম. ১৮৪০ খ্রীঃ ।

মানিক্য চক্ষু রাজা । ঢা.বি. আ. ২৯৫ ।

প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা এই ঃ । ব. বি. ৪৯, ১৭০৮ খ্রীঃ ।

ছ

তবেঁ তোক না ছাড়িব কাহে । শ্রী. ।

পিতামাতা আছেন কেমনে । গো. ম. ১৯শ শঃ ।

এতকাল দিয়াছিলে ছিল জল । ঢা. বি. ৫৮৮৮ ।

ছাড়িয়া পাল্যালে মোকেঃ । শী. ১৮৫০ খ্রীঃ ।

ইন্দুলেখা আছে এই বাউকোন সেবি । শ. ব. ১৯শ শঃ ।

আমার শে পুত্র ভাই শুখেতে আছয় । ভা. ১০ম. ১৮১৯ খ্রীঃ ।

গকুলের লোকে বলে কৃষ্ণ বড় ছোর । ঢা. বি. ৩৬৭০, ১৮২৭ খ্রীঃ ।

মনে এই ছিল সাদ । অ. আ. ১৮শ শঃ ।

চন্দ্রকোণা হৈতে কাসি ছমাসের পথ । প. ম., ১৯শ শঃ ।

জ

আল মরিবোঁ জালী আগুণী । শ্রী. ।

নদিয়া নিবাসী বিশারদের জামাতা ।৺ চৈ. চ. ১৮শ শঃ ।

মনে কর্য্যাছিল জিহ্‌পথে । ক. রা. ১৯শ শঃ ।

মন্দির জাএগ্না করে শ্রীমুখ দর্শন । চৈ. চ. ১৯শ শঃ ।

তবে জানি সফল হয় আমার জিবন । রা. ক. ১৯শ শঃ ।

জয়রে জয়রে গোরা শ্রীশচীনন্দন । ত্রি স. ১৮৩৫ খ্রীঃ ।

গুরূ উপদেসে আম্মি জানি সব । ঢা. বি. আ. ৩৫৩ ।

বন্দিলাম জনক জননী পদরজ । অ. কৃ. ক., ১৭৭৩ খ্রীঃ ।

বিদ্যমান সব তুয়া পুজা লইবারে । অজ্ঞাত ১৯শ শঃ ।

ঝ

।।৩ ।। হেন বেলে মাঝ বৃন্দাবনে. । শ্রী. ।

বৃন্দাবন মাঝে কৃষ্ণ । বৈ. প. ১৮২৫ খ্রীঃ ।

বুঝি তার অভিপ্রায় । অ. আ. ১৮শ শঃ ।

ঝিয়ের লাগিয়া মোর এত । জ. ম. ১৯শ শঃ ।

উঝ্যল প্রদিপ তুহ্মি জগতের ভোগ । ঢা. বি. ২২৯ ।

বুঝিতে নারিলা কেহো দুহাকার মতি । বা. ক. ১৯শ শঃ ।

বিশে স্নান করে উঝা বিশ করে পান । ঢা. বি. ৪৬০৮ ।

এও

বুঝিতেঁ না পারো কাহ্নাঞি তোহ্মার চরিত । শ্রী. ।

বিদাঅ হইআ জসোদার ঠাঞি । ক. ভ. ১৮১৫ খ্রীঃ ।

মাংস য়ানিঞা দেহ ষুন মহাসয় ঃ । দা. পা. ১৯শ শঃ ।

সুনিঞা তোমার জস ঃ । মু. চ. ১৯শ শঃ ।

ষুনিঞা অদ্বৈত্বচাঁন্দ গদ২ হয়া । রা ক. ১৯শ শঃ ।

কোন দোষে দোসি মুঞী । অ. কৃ.ক. কালিকা, ১৯৭৮ ।

ষুনিঞা না ষুনে গোসাঞিঃ নাদেন উত্তর । প. ম. ১৯শ শঃ ।

ট

খাটপালাঙ্কিখ গঢ়ায়িবো । শ্রী. ।

ধরণি লোটায় কেস । মু. চ. ১৯শ শঃ ।

কিবল ২ বলি ভূমে লোটাইলা । রা. ক. ১৯শ শঃ ।

অসারেতে সার করি ঘটাইলে বিপদ । বি. ভা. ১৯১০ ।

জটা সসীকলা মুকুট মণ্ডল । দি ব. ১৯শ শঃ ।

সাতটাকা লইয়া জরখরিদকি । ভূমিবিক্রয়পত্র, ১৮০৭ খ্রীঃ ।

মকুট কুণ্ডল হার না ২ রত্নমালা । শী. ১৮৫০ খ্রীঃ ।

গোপীনাথ সেবক দেখে প্রভুর প্রেমনাট । চৈ. চ. ১৮শ শঃ ।

ঠ

এখো গোপী ভালনহে সব দুঠ মনে । শ্রী. ।

মানিক পাত্রের ঠিকা জমি । ভূমিবিক্রয়পত্র, ১৮০৯ খ্রীঃ ।

এতদেখি কৃষ্ণে কহে রাধাঠাকুরাণি । গো. ম. ১৮৪০ খ্রীঃ ।

বলগীয়া বালাই মোর জায় তার ঠাই । শি. ১৯শ শঃ ।

জালগেঠা ধান্যসিসা ধুশুরা বিসাল । শী. ১৯শ শতক ।

নিজ বিন্দেবন রশের ঠাই । বৈ. প. ১৮২৫ খ্রীঃ ।

তেমন ঠাকুর এমন কেন হৈলে । রা. ব. ১৮১৫ খ্রীঃ ।

আরে মোর আরে মোর বৈষ্ণব ঠাকুর । ত্রি. স পদ. ১৮৩৫ খ্রীঃ

ড

তাহার ঠাইক জাইতে লাচা বড় ডরে. ।। শ্রী. ।

বাহু তুলে ডাকে গোপীগণ । শী. ম. ১৯শ শঃ ।

ডুবিলা সংসারমদে । ঢা. বি. ৬৫৮৩ ।

কেবোল তোমাকে ডাকে । প. ম. ১৯শ শঃ ।

ডগমগ লোচন কমল ঢুলায়ত । ত্রি. স. পদ. ১৮৩৫ খ্রীঃ ।

ডাকিনি বলিয়া গালি দিল দন্ডধর । শী. ১৯শ শঃ ।

ড়

আলবড়ায়ি . ।। না বোল বড়ায়ি হেন । শ্রী. ।

জত পাড়ি খায় তত বাড়য়ে অপার । ত্রি. স. ১৮৩৫ খ্রীঃ ।

শ্রীপাট নাম হবে খড়দহ গ্রামে । রা. ক. ১৯শ শঃ ।

লাজে কেহ পড়সি না আইসে মোর ঘর । শি. ১৯শ শঃ ।

বড়ভাগ্য হৈল ভাই আমা সভাকাব । ভা. ১৮১৯ খ্রীঃ ।

ঢ / ঢ়

কৌতুকেঁ বাঢ়ায়িল নেহা এবেঁ সেই নাসে . ।। ৩ ।। শ্রী. ।

নিজরসে নাচত নযন ঢুলায়ত । ত্রি. স. ১৮৩৫ খ্রীঃ ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভজ বাঢ়াইয়া লেহ । বি ভা. ৯২৩, ১৭৪০ খ্রীঃ ।

হইয়া কীঙ্কর ঢুলাব চাঁমর । মু. চ. ১৮শ শঃ ।

অধিরূঢ় ভাব যার তার এই বিকার । শ. ব. ১৯শ শঃ ।

অধিরূঢ় ভাব যার তার এই বিকার । চৈ. চ. ১৮শ শঃ ।

ণ

কেমনে বাঢ়ায়িব পা জানহ আপণে । শ্রী. ।

মরণ নিকট হৈল শেই পুতনার । ভা.১০, ১৮১৯ খ্রীঃ ।

বসময় ধাম সেই রসের কারণ । বৈ. প. ১৮২৫ খ্রীঃ ।

দারুণ মদন করে তরজন ভ্রমর ঝঙ্কিত করি । বি. মা. ১৯শ শঃ ।

প্রণতি কোরিত্র বন্দ জোড় কোরি হাত । দি. ব. ১৯শ শঃ ।

শ্রীরূপ রঘুনাথ চরণে যার আশ । চৈ. চ. ১৮শ শঃ ।

ত

বুঝিতে না পার কাহ্নাঞিঁ তোহ্মার চরিত । শ্রী. ।

পুণ্যবান বিনোদনাথ তাহার তনয় । বি. ভা. ৯২৩, ১৭৪০ খ্রীঃ ।

জারে মাতা বলি তুমি বলিবে আপনে । রা. ক. ১৯শ শঃ ।

এত করি তবু মনে ভাল বলে নাঞি । শি. ১৯শ শঃ ।

গায়ত কত ২ ভকতহি মেলি । ত্রি. স. পদ. ১৮৩৫ খ্রীঃ ।

বিস্তারি কহিতে নারে সহস্রবদন । চৈ. চ. ১৮শ শঃ ।

৫.

সিবৎস্ব কৌস্তুভ চির্ন্য ধরে নন্দলাল । গো. ম. ১৮৪০ খ্রীঃ ।

চর্ব্বিষ বৎসর কৈলা প্রভু গৃহে অবস্থান । বি. ভা. ১৯১০ ।

কৃষ্ণ দেখিলে কোলে বড় চমৎকার । রা. ক. ১৯ শ শঃ ।

স্বভক্ত নয়নোৎসব প্রবরভক্তি দাতা প্রভুঃ । ত্রি. স. পদ. ১৮৩৫ খ্রীঃ ।

মৎসধরাবৃর্ত্তি কৈল্য । শি. ১৯ শ. শঃ ।

হুথুল্যা কুথুল্যা জর পৎশাত গড়ায় । শী. ১৯ শ শঃ ।

থ

বিথর বুলি আঁ বড়ায়ি কাজ কিছু নাঁহী । শ্রী. ।

হইল প্রভুর মঙ্গল ভারথি । বি. ভা., ৯২৩ ।

অথ ঐসর্য্য মাধুর্য্যাশ্রয় । বি. মা. ১৯ শ শঃ ।

সহজে অথির গতি জিজি মাতোয়ার । ত্রি. স. পদ. ১৮৩৫ খ্রীঃ ।

এথ' সুনি নবিবরে নিসন্দে রহিলা । ঢা. বি. ২১৫ ।

পথে চায়্যা দেখ রথ । অ. আ. ১৮ শ শঃ ।

দ

কাহ্নাঞি বাঁশীত দিল সানে । শ্রী. ।

দাসানুদাষদাসস্য । ব. বি. ৪৯, ১৭০৮ খ্রীঃ ।

বৃন্দাবনযুগলভজনতাহেকেরল উপদেশ । ত্রি . স. পদ. ১৮৩৫ খ্রীঃ ।

বিধি হৈল্য পরমাদ । অ. আ. ১৮ শ শঃ ।

সুন ২ ভক্তবৃন্দ করি নিবেদন । বি. ভা. ১৯১০ ।

জিব জান্যা যুন্যা কৃষ্ণপদ না করে ভজনা ঃ । ঢা. বি. ৫৮৫৬, ১৭৮০ খ্রীঃ ।

ধ

বোলহ কাহ্নেরে বাধাক দেউ সমতীল । শ্রী. ।

সে রাধা না দেখি প্রাণ ধরণে না জায় । রা. ক. ১৯ শ শঃ ।

ইবে জাবে মধপুরি । অ. আ. ১৮ শ শঃ ।

সীবের খেতে না ধরিব আর ধরিব কথা । শি. ১৯ শ শঃ ।

রাধার হাথের অন্ন খাইবে কানাঞি । ক. ভ. ১৮১৫ খ্রীঃ ।

তবে সে সুনিয়া লোকে হবে সাবধান । ঢা. বি. ।

পরবধু গমণে গরিহ অপরাধ । শি. ১৯ শ শঃ ।

ন

মোর বোলে ভর কর আইস বনমালী . ।। ১ ।। শ্রী. ।

মহাপ্রভু মহাক্রপা করিবেন তোমারে । ঢা. বি. কে. ৬৭, ১৭৩৫ খ্রীঃ ।

অক্রুরে বলেন হরিঃ পরাণ ধরিতে নারি । অ. আ. ১৮ শ শঃ ।

নিতবিগ্রহোহৃদয় কৃষ্ণ ভাবান্বিতঃ । ত্রি. স. পদ. ১৮৩৫ খ্রীঃ ।

সপনে না বল আন । প্রে. চ. ১৮৫৩ খ্রীঃ

এতষুনি রসিক নাগর বনমালি । গো. ম. ১৯ শ শঃ ।

প

মোর বোলেঁ তোহ্মে তার পাসক না আসিবেঁ । শ্রী. ।

আপনা আপুনি করে দুহেঁ তিরস্কাঁর । রা. ক. ১৯ শ শঃ ।

ষুনিএগ্রা সকল লোক পরিহাস করে । প. ম. ১৯শ শঃ ।

এত গোপি পসরা একে একে হবে পার । গো. ম. ১৯শ শঃ ।

একতিল দুহে ছাড়া নহে পরস্পর । বৈ. প. ১৮২৫ খ্রীঃ ।

পূজিল গঙ্গার পদ দেবক । গ চ. ১৮০৪ খ্রীঃ ।

ফ

মাহ্লী মালতী ফুল গাথিবোঁ । শ্রী. ।

জনম সফল হয় জুড়াইবে হিয়া । শি. ১৯শ শঃ ।

ফনিরাজ সদাই কণ্ঠেতে অবস্থিতি । জ. ম. ১৯শ শঃ ।

স্বরির বিস্কল জেন । শী. ১৮৫০ খ্রীঃ ।

তোমার নফরে দেখ্যা রাজা হব দুখ । ঐ, ১৯শ শঃ ।

ফুল্যা খড়দেহেতে জাহার নিবাস । রা. ব. ১৮১৫ খ্রীঃ ।

ব

হেনকালে বড়ায়ি কাহ্ন সমে কর মেলা । শ্রী. ।

সিবদুত বাক্য সুন্যা জমদুত হাসে । শি. ১৮১৫ খ্রীঃ ।

ধনবিদ্যা অহংকারে পশি বিনাসব । বি. ভা. ১৯১০ ।

ঠাকুরের ভোগ সবে আরতি বাজিল । চৈ. চ. ১৮শ শঃ ।

তিনমত হয় ।। বিবরণ বলি তায় । রা. ক. ১৯শ শঃ ।

তবে বিস্বম্ভর পহু মুচকি হাসিএর লহু । চৈ. ম. ১৯শ শঃ ।

ভ

ভাত না খাইলি তবে তাহার কারণে । শ্রী. ।

অন্বেত্র লইয়া চল জাহ ভাই সভে । রা. ক. ১৯শ শঃ ।

পিরিতিফুলশরে মরম ভেদল্ ভাবে সহচরি ভোরবে । ত্রি. স. পদ. ১৮৩৫ খ্রীঃ ।

সেই ঃ তারে মন সদা কর ভয় । প্রে. চ. ১৮৫৩ খ্রীঃ ।

ষুভক্ষণে কৈন্যা জন্মিল সৈত্যবতি । ঢা. বি. ২৮০৩ ।

স্বচির গর্ভেতে প্রভূ আবির্ভুত হল্য। গৌ. ১৯শ শঃ ।

ম

কত না সহিব রে কুসুম শরজালা । শ্রী. ।

দেহি মম ধমায় ঃ । ব. বি. ৪৯ ১৭০৮ খ্রীঃ ।

বৃন্দাবননাথ প্রভূ পরম কৌতুকে । রা. ক. ১৯শ শঃ ।

গুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জনং । চৈ. চ. ১৯শ শঃ ।

য/য়

লাগ পাইলেঁ তার থানে . করিবো বড় যতনে । শ্রী. ।

বিষয় ছাড়িয়া তুমি যাহ নীলাচলে । চৈ. চ. ১৮শ শঃ ।

ধরিয়া তুলিল কোলে নিত্যানন্দ রায় । রা. ক. ১৯শ শঃ ।

আগুলিয়া রহি সভে পথে । অ. আ. ১৮শ শঃ ।

রাধিকা লাগিএগা মোর পুড়িছে যে হিয়া । বি. মা. ১৯শ শঃ ।

দামোদরপতি পিতা দোমেতে(?)য়ালয় বি. ভা. ৯২৩ ।

র

নাতিনী তোর বচনে হের মোঁ করিলো গমণে । শ্রী. ।

তাহা দেখি হাসে কৃষ্ণ দয়ার ঠাকুর । গো. ম. ১৮৪০ খ্রীঃ ।

চারুরূপা বরাঙ্গনা ঃ । ঢা. বি. ৪৯৫ ।

সপ্তম দিবস গেলে ঝুলি ভরে নাই । শি., ১৯শ শঃ ।

সবার চরণ বন্দ হরসিত মনে । অ. কু. ক. ১৭৭৩ খ্রীঃ ।

তনু মোর জরজরে । বৈ. প. ১৮২৫ খ্রীঃ ।

ল

যে আছে মোর কপালে . ফলিবেক সে । শ্রী. ।

পুত্র জে মৈনাক ছিল সমুদ্রে ডুবিল । শি. ১৯শ শঃ ।

সিঙ্গা বেণুপুরে কেহ মুরলি বাজায় । গো. ম. ১৮৪০ খ্রীঃ ।

এই লাগি পুনঃপুন করিয়ে মিনতি । ত্রি. স. পদ. ১৮৩৫ খ্রীঃ ।

হেনকালে কৃষ্ণকে বেড়িতে ধায় জর । শী. ১৯শ শঃ ।

গোধন সকল যথা খায় ত্রিনজল । ভা. ১০, ১৮১৯ খ্রীঃ ।

এতবলি বৈদ্যরাজ করিলা গমণ । ক. ভ. ১৮১৫ খ্রীঃ ।

কহিতে লাগিল কিছু ললিতাকে । বি. ম. ১৯শ শঃ ।

শ

আশো আশ দিআ তোম্মো হৈলা এক ভীতে । শ্রী. ।

নিত্যাতর্ত্ত জানাইতে শিষ্যে আকুল কৈল । বি. ভা. ১৯১০ ।

একশত দ্বিতীয় পল্লবে চারিসাখা । ত্রি স. পদ. ১৮৩৫ খ্রীঃ ।

আশনেতে বষুদেব শুখেতে বসিলা । ভা. ১০, ১৮১৯ খ্রীঃ ।

সত্য সত্য সত্য মোরে শিবের সবদি । শি. ১৯শ ।

শৈল কানন শোভিতঃ । ঢা. বি. ১৪ ।

ষ

আশিন মাসের শেষে নিবড়ে বারিষী । শ্রী. ।

শ্রীরূপরঘুনাথ পদে যার আষ । চৈ. চ. ১৮৪৭ খ্রীঃ ।

শ্রীনিবাষ করি আদি জত ভক্তবিন্দ । রা. ক. ১৯শ শঃ ।

লহু ২ হাসনি গদ ২ ভাষণি কত মন্দাকিনি নয়নঙ্কুরে । ত্রি. স. পদ. ১৮৩৫ খ্রীঃ ।

নন্দের বিলাষ হয় ঃ । অ. আ. ১৮শ শঃ ।

বিষ তেন পরিমান বিষ নাই । ঢা. বি. ২৯৫২৭ ।

স

কাহ্ন আলিঙ্গিআ সকল দেহ জুড়ায়িবোঁঃ ।। শ্রী. ।

সভাপানে চাহি প্রভু বলিতে লাগীলা । রা. ক. ১৯শ ।

পাদপদ্মঁ করে আস । ব. বি. ৪৯ ১৭০৮ খ্রীঃ ।

এক সন্যাসি আসি দেখি জগন্নাথ । শ. ব. ।

১৬৯৬ সন ১১৮০ সাল বাঙ্গলা । অ. কু. ক. ১৭৭৩ খ্রীঃ ।

আইস্য ২ হনুমান আসরে কর ভর । রা. ব. ১৮১৫ খ্রীঃ ।

হ্

একেঁ একে কহিবোঁ কাহ্নেরে . ।। শ্রী. ।

নয়নানন্দমনে আন নাহি জানে । ত্রি. স. পদ. ১৮৩৫ খ্রীঃ ।

বৈকুণ্ঠ বেড়িয়া আছে অনেক প্রহরি । বি. ভা. ১৫৪৫, ১৭৯৪ খ্রীঃ ।

পুনঃপুন কি আর কহিব অতিরেক । শি. ১৯শ শঃ ।

সভাই ভাবহে কেহ প্রবেসিতে নারে । প্রে. চ. ১৮৫৩ খ্রীঃ ।

'আ' - কার যোগ (া)

ঝালি আর ডাল যেন তখনি পালাইল । শ্রী. ।

অকারণে বৈস জেন করয় বিধবা ।। অ. কু. ক. ১৭৭৩ খ্রীঃ ।

মহাবির ধায় মনে মাগী বড় টান । শী. ১৯শ শঃ ।

আমাদের দসা ফিরে । রা. ব. ১৮১৫ খ্রীঃ ।

'ই' - কার যোগ (ি)

রাধাত লাগিআঁ কাহ্ন কি বা নাহি করে ।। ধ্রু ।। শ্রী. ।

দুরগতিঅগতি অসতিমতি যোজন নাহি সুহৃতিনবনে । ত্রি. স. পদ., ১৮৩৫ খ্রীঃ ।

বল গিআ বালাই মোর জায় তার ঠাঞি । শী. ১৮৬১ খ্রীঃ ।

মা বলিয়া কে ডাকিবে । শী. ১৮৫০ খ্রীঃ ।

কান্দিতে লাগিল তবে আহিড়ের ভিতর । ঢা. বি. ৩৫৯ ।

নিবেদন করি তোমার পায়ে । ঢা. বি. ।

এইরূপে সাতদিন গুজারিয়া গেল ঃ । ম. ম. ১৯শ শঃ ।

'ঈ'-কার যোগ (ী)

মোর বোলে ভর করী আইস বনমালী । শ্রী. ।

আচার্য্য দিক্ষিতগুরু লীলাতর্ত্ত দিল । বি. ভা. ১৯১০ ।

জাহ গৌরী স্মামি লঞা যথাইচ্ছা তোর । শি. ১৯শ শঃ ।

এগার কাটা জমী খরদগী করিয়া লইয়াছি । ভূমিবিক্রয়পত্র, ১৮০৭ খ্রীঃ ।

সেখানে থাকীঞা নিজ নয়ান চকোরি । শ. ব. ১৯শ শঃ ।

শ্রীরূপরঘুনাথ পদে যার আশ। চৈ. চ. ১৯শ।

'উ'- কার যোগ (ু)

কাহ্নুত লাগিআঁ মোর বেআকুল চীতে। শ্রী.।

মুকুন্দ কহে মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিএগ্রা। চৈ. চ. ১৮শ শঃ।

কার মুখে চুম্ব খাব। শী. ম. ১৮৫০ খ্রীঃ।

পঞ্চতত্ত্ব এক বস্তু নাহি কিছু ভেদ। চৈ. চ. ১৮৪৭ খ্রীঃ।

কিম্বা তুমার পুত্রপোত্রাদীক্রমে। ভূমিবিক্রয়পত্র, ১৮১৯ খ্রীঃ।

বাদ বান্ধি বিধুমুখী ঃ ছিচা ফেলে পয়। শি. ১৯শ শঃ।

তাহা ষুনি যুবতি আর যুবতি। গৌ. ব. ১৯শ শঃ।

কালু রায় প্রতি প্রভূ কহেন আপনি । দ. প. ১৮৮৪ খ্রীঃ ।

'ঊ'- কার যোগ (ূ)

মথুরানগরী গত্বা জরতী মধুসূদনং । শ্রী. ।

হাহা পূত্র গুণধাম । শী. ম. ১৮৫০ খ্রীঃ ।

শুন বাছা রাধিকার প্রেম মূদ্রাগণ । বি. মা. ১৯শ ।

সরূপ কহিলোঁ তোম্মারে । শ্রী. ।

এত শূনি নরপতি দারূণ শপন । শী. ১৮৫৯ খ্রীঃ ।

মাধূর্য্য প্রকাস জাহা বিনে কভূ লয় । গৌ. ব. ১৯শ শঃ ।

'ঋ'- কার যোগ (ৃ)

ইতিশোত্রশয়ং কৃত্বা জগাদ জরতীং হরি ঃ । শ্রী. ১৯শ শঃ ।

তাহার কৃপায়ে লোক পাইল নিস্তার । গৌ. ব. ১৯শ শঃ ।

দন্তে তৃণ ধরি প্রভু করি এ প্রার্থনা । ত্রি. স. পদ. ১৮৩৫ খ্রীঃ ।

পুত্রজন্য শুখ জদি অদৃষ্টে না থাকে । ভা. ১০, ১৮১৯ খ্রীঃ ।

নন্দিভৃঙ্গি সঙ্গে রঙ্গে বন্দ মহাকাল । অ. কু. ক. ১৭৭৩ খ্রীঃ ।

‘এ’- কার যোগ (ে) ।। ‘ও’কার যোগ (ে া)

কাহ্নসমে ভালেঁ রস ভুঞ্জিতেঁ না পাইল । শ্রী. ।

মোরক সে গোপজাতি । অ. আ., ১৮শ শঃ ।

তারতলে সখিছলে দেখে নিজগুরু । রা. ক. ১৯শ শঃ ।

কমরে না এর দড়া পিছে মারে ধাকা । মু. চ. ১৯শ ।

শতবর্ষ আউশ শঙ্খ্যাদশে পাচে ক্ষয় । বি ভা. ১৯১০ ।

'ঐ'- কার যোগ (ৈ)

তবেঁ কাহ্নবিনা হৈব নিফল জীবন । শ্রী. ।

অষ্টাদশ বর্ষ ক্ষেত্রে কৈল সংকীর্ত্তন । বি. ভা. ১৯১০ ।

কাটুআর ঘাটে বন্দ চৈতন্ন নিতাই । দি. ব. ১৯শ শঃ ।

অদ্বৈত্য আচার্য্য গোসাঞির । চৈ. চ. ১৮৪৭ ।

জসোমতি রাধা লৈইআ জাঅ । ক. ভ. ১৮১৫ খ্রীঃ ।

'ও'- কার যোগ (ো)

আর কিবা জাইবারে বড়ায়ি বোলহ আহ্মারে । শ্রী. ।

কোইবোলে গোরা জানকীবল্লভ রাধার । ত্রি. স. পদ. ১৮৩৫ খ্রীঃ ।

বারে বারে কৈল পার সকল গোপিনি । গো. ম. ১৮৪০ খ্রীঃ ।

অকারণে জেতে চাহ রাজার গোচরে । প. ম. ১৯শ শঃ ।

ধবলি স্যামলি বন্দ নন্দ ঘোষের গাই । দি. ব. ১৯শ ।

এতদার্থে নগদ চোবিস টাকা রোক দস্তবদস্ত । ভূমিবিক্রয়পত্র, ১৮১৯ খ্রীঃ ।

'ঔ'-কার যোগ (ৌ)

একাপার্থ মহাআর্ত্ত করিল কৌরবে । মহা. ১৯শ শঃ ।

পান কর বলি শ্রীগৌরাঙ্গে বলে । গৌ. ব. ১৯শ শঃ ।

দৌলতপুর বাহিল তখন । মু. চ. ১৯শ শঃ ।

পৌত্রিক ভোগদখলের আছে । ভূমিবিক্রয়পত্র, ১৮০৫ খ্রীঃ ।

'অনুস্বার' (ং)

ততঃ কিং গমণাসক্তা যতোহং রাধিকে ধুনা । শ্রী. ।

ইতি খিলেষু হরিবংশে যযাতি চরিতং । ঢা. বি. ১৪ ।

পদকল্পতরুং রসসিন্ধুনিভং হরিভক্তজন শ্রুত । ত্রি. স. পদ. ১৮৩৫ খ্রীঃ ।

যথাকথনং সংপুর্ন্নমোস্তঃ । ব. বি. ১৭০৮ খ্রীঃ ।

সব গেল জানা ঃ সংখ পরিবেত পর । শি. ১৯শ শঃ ।

বেদিভক্তি ভারত প্রসঙ্গ সূর্যবিংশ । বি. ভা. ১৯১০ ।

শ্বরূপং যস্যশতং পুনঃ কিম্ভুতং ভক্তরূপশ্বরূপকং । চৈ. চ. ১৮৪৭ খ্রীঃ ।

'বিসর্গ' (ঃ)

জানে বাথ ন জানে বা সমুদ্দেশমহং হরেঃ । শ্রী. ।

প্রাতঃ কালে উঠে প্রভু দেখে হনুমান । চৈ. চ. ১৮শ শঃ ।

তোর দুঃখ দেখিয়া কহিনু দুঃখ কথা । জ. ম. ১৯শ শঃ ।

আলস আওয়াস ভূমেঃ অহংকার মতিভূমে । অ. কু. ক. ১৭৭৩ খ্রীঃ ।

'চন্দ্রবিন্দু' (ঁ)

আলরাধে . ।। নিলজী নিকুপেঁ থাকে । শ্রী. ।

বদন বিমল চাঁন্দ ষুরঙ্গ অধর । গো. ম. ১৮৪০ খ্রীঃ ।

খাঁচা থেক্যা ঃ পাছে বা বিপদ দেখ্যা । প. গা. ১৯শ শঃ ।

কাঁচনা নগর পানে উর্দ্ধমুখে ধায় । গৌ. ব ১৯শ শঃ ।

তিহোঁ কহে শুনহ সুন্দর শ্যামরায় । বিদগ্ধমাধব, ১৯শ শঃ ।

ন্ত

গোসাঞি তখন অন্তরে জানিল । গৌ. ব. ১৯শ শঃ ।

তোমার সির্দ্ধান্ত সঙ্গ করে যেই জন । চৈ. চ. ১৯শ শঃ ।

চাচর কুন্তলে করবির মালে । বি. ব. ১৯শ শঃ ।

দক্ষীন শ্রীসত্রুখন সামন্তের রাজস্ব সালিজমি । ভূমিবিক্রয় পত্র, ১৮০৭ খ্রীঃ ।

এক পকে আর ফুটে নাই আদ অন্ত । শী. ১৯ শ শঃ ।

ন্দ

আল রাধা বৃন্দাবনে কাহ্নাঞিঁবোঁ । শ্রী. ।

অধম জনের দেহ চরণারবিন্দ । ত্রি. স. পদ. ১৮৩৫ খ্রীঃ ।

তাহা বিন্দু ভালমন্দ কিছুই না জানি । ব. বি. ৪৯, ১৭০৮ খ্রীঃ ।

তথাহি ।। অসার খুলুসংসার সারনন্দনন্দন । বি. ভা. ১৯১০ ।

দামোদর পন্ডিত দত্ত মুকুন্দ । চৈ. চ. ১৮ শ শঃ ।

এখন নিশ্চিন্দ হইআ থাকি গিআ ঘরে । ক. ভ. ১৮১৫ খ্রীঃ ।

নিত্যানন্দ প্রভূবন্দ সদানন্দময় । ঢা. বি. ৫৮৮৬ ।

গায়েন গুণিন বন্দো আর মুখদস্যিঃ । রা. ব. ১৮১৫ খ্রীঃ

ন্ধ

ভাদর মাঁকে আহনিশি আন্ধকারে । শ্রী. ।

রামচন্দ্র মণিবন্ধ সাকে সাকে করিয়া প্রবন্ধ । বি.ভা. ১৯১০ ।

কো দেই গোরা অঙ্গে সুগন্ধি চন্দন । ত্রি. স. পদ ১৮৩৪ খ্রীঃ ।

পঞ্চাস বেঞ্জন অন্ন করঃ না রন্ধন । ক. ভ. ১৮১৫ খ্রীঃ ।

পত্র ও করজ্জা টাকার বন্ধকি খত দিলাই । ভূমিবিক্রয়পত্র ১৮০৭ খ্রীঃ

আজুনিসি সন্ধ্যাকালে এসব দেখাইলে । ঢা. বি. ২১৫ ।

বাথানে থাকিয়া নন্দ আইল সন্ধ্যাকালে । গো. ম. ১৮৪০ খ্রীঃ

ন্ম

সত জর্ম্মানী পুন্যাণি রতিস্যাৎ । বি. মা. ১৯ শ শঃ

ন-ফলা (ন)

জগাদবিরহেমগ্না রাধাতে সরণং গতা । শ্রী. ।

অনেনাগ্নিদর্ক্ষিনতঃ । রা. পা. ১২১৬ ।

বিরপত্নি হও তুমি বিরের তনয়া । বা. এ. ২৭৬ ।

অতিদগ্নাছাত্রেন অকারোশ্চারণং । রা. পা. ৬১৬৭ ।

নিবগ্ন ন্তি মহাবাহো দেহে । ঢা. বি. ।

সপ্নে আসী কৃষ্ণ মোরে কহেন আপুনি । রা. ক. ১৯ শ শঃ ।

ভক্তগণ মধ্যাহ্নে প্রভু লঞা আইলা । চৈ. চ. ১৯ শ শঃ ।

'ব'-ফলা (ব)

ইতি শোত্রময়ং কৃত্বা জগাদ জরতীং হরিঃ । শ্রী. ।

চারিদ্বারে চন্দ্র সূর্য্য গরূড় পবন দুয়ারি । বি. ভা. ৯২৩ ।

বিদ্যুত্বান্ পর্বতঃ । ঢা. বি. ১৪ ।

স্বিবর্জর শ্বভার শ্বোরিরে দ্বিবদেখা । শী. ১৯ শ শঃ ।

শাল্ব্য বিশ্বাল্ব্য জত পর্ব্বত । শী. ১৯ শ শঃ ।

এই হেতু বড় ভয় হৈতেছে স্বরির । মহা ১৯ শ শঃ ।

পোত্রাদিক্রমে স্বার্থ অধিকারি হইলেন । ভূমিবিক্রয় পত্র, ১৮০৭ খ্রীঃ ।

এই কৃষ্ণ মহাপ্রেমের সাত্বিক বিকার । চৈ. চ. ১৮ শ শঃ ।

শ্রীমদ্বৈততত্ত্বনিরূপণং নামষষ্ঠঃ পরিচ্ছেদঃ । চৈ. চ. ১৮৪৭ খ্রীঃ ।

'ম'-ফলা (ম)

আস্মাখিনী চন্দ্রাবলী বিকলী বিরহে । শ্রী. ।

আত্মরক্ষা লাগী রহে সাবধানে যাএঞা । শ. ব.

অদ্বিতীয় নন্দাত্মজ রসিক । শি. ১৮১৫ খ্রীঃ ।

পদ্মহস্ত দিয়া সিবা করিবেঃ চিরাই । অ. কু. ক. ১৭৭৩ খ্রীঃ ।

পদ্মাঁ জয়া প্রভিতি বিজয়া দাশিগণ । শিবায়ণ, ১৯শ শঃ ।

যুভক্ষণে কৈন্যা জন্মিল সৈত্যবতি । ঢা. বি. ২৮০৩ ।

ধন্য ২ মুহাম্মদ পর উপকার । ঢা. বি. ২১৫ ।

অনাগত কবির্ত রচিল বাল্মিকমুনিবর । রা. ব. ১৮১৫ খ্রীঃ ।

শ্রীকাত্তিক সামন্তের রাজস্ব সালি জমির দক্ষিণ । ভূমিবিক্রয়পত্র, ১৮০৭ ।

'য়'-ফলা (্য)

সত্য করোঁ তার আগে । শ্রী. ।

শ্রীচৈতন্য লিখ্যতেস্য ভক্তিপ্রেম বদান্যতা। চৈ. চ. ১৮১৫ খ্রীঃ।

বহু ভাগ্যে পাইল যদি দুল্লভ মনিষ্য দেহ। বি. ভা. ১৯১০।

বাগতিনি বলে দুর আঠ্যাখেক্যার বেটা। শি. ১৯শ শঃ।

বিষাদ যাড্য কভু গর্ব্ব দৈন্য। চৈ. চ. ১৮শ শঃ।

জয় ২ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দ। চৈ. চ. ১৯শ শঃ।

যদ্যপি না হয় শেই বান্ধব সাধন। ভা. ১৮১৯ খ্রীঃ।

আমার হিষ্যা তোমাকে বিক্রয় করিলাম। ভূমিবিক্রয়পত্র, ১৮০৯ খ্রীঃ।

জাহার কল্যাণে কালি তোমার গুণ গাই। অ. কু. ক. ১৭৭৩ খ্রীঃ।

জ্যেষ্ঠপুত্র গজমুখ কণেষ্ঠ শড়মুখ। জ. ম. ১৯শ শঃ।

'র'-ফলা (্র)

পাহাড়ীআ রাগঃ . ।। ক্রীড়া . ।। আহা . ।। শ্রী. ।

হেনরূপে দয়ানিধি দেবচক্রপাণি । গো. ম. ১৯শ শঃ ।

সমুদ্রলহরী জেন নিবারিল বেলা । দি. ব. ১৯শ শঃ ।

দ্রুব হয় চিত । অ. আ. ১৮শ শঃ ।

লুটিয়া ইন্দ্রিয় গ্রাম পাত্তাইল ভ্রম । শি. ১৮১৫ খ্রীঃ ।

অতএব আমার প্রভাস । বি. ভা. ১৯১০ ।

আমি ভ্রান্ত নহি তুমি অজ্ঞ ন জানহ । শ. ব. ।

মিশ্রজগর্ন্নাথ পিতা শচী গর্ব্ভে জন্ম । বি. ভা. ১৯১০ ।

সর্ব্ব সাস্ত্রে জ্ঞাত হয় জাহার শ্রবণ । দি. ব. ১৯শ শঃ ।

তালুক শ্রীযুত মেস্ত্র উম্মেদৎত্তুর্জ্জা । অ. কু. ক. ১৭৭৩ খ্রীঃ ।

'ল'-ফলা (ল)

অতি ক্লেসে বিরচিল মহামুনি ব্যাস । মহা. ১৯শ শঃ ।

যুক্লপর্ক্ষজুগিনিপর্শ্চাত । অ. কু. ক. ১৭৭৩ খ্রীঃ ।

প্লবগোবার ভেকেসারথৌ । ঢা. বি. ২৩৯৭ ।

অষ্টচল্লিষ বর্ষ প্রভু প্রকট হইয়া । বি. ভা. ১৯১০ ।

সিকারে সাজিল সব উল্লসিত মন । বা. এ. ২৭৬ ।

'রেফ (´)

বিপদে য়র্ঘ্য দিলা ঐরূপে তখন । গ. চ. ১৮০৪ খ্রীঃ ।

তিনকাল পুর্ন্ন্য হৈল পাক্যা গেল কেস । শী. ম. ১৯শ শঃ ।

তাহার মধ্যে ছয় বৎসর তির্থ পর্য্যোটন । বি. ভা. ১৯১০ ।,

চাকলে বর্দ্ধমান সামিলে । ভূমিবিক্রয়পত্র, ১৮০৭ খ্রীঃ ।

অর্যুন জিনিতে জেন শিঘ্রগোতি । শী. ম. ১৯শ শঃ ।

ধন্যরাজামল্বংশ শার্থক জিবন । দি. ব. ১৯শ শঃ ।

ষ্ট

যথাদৃষ্টং তথা লিখি । ব. বি. ৪৯ ।

যস্য সাধ্য বিনাআণ্ড জন্মে ২ শৃষ্টি যাতন । বি. ভা. ১৯১০ ।

বিধাতার ছিষ্ট নহে বেদান্তে । বৈ. প. ১৮২৫ খ্রীঃ ।

যুদিষ্টীর বোলে তবে করি নিবেদন । শ. ব. ১৯শ শঃ ।

জেষ্ট তাত শ্রীবৈদ্যনাথ সামন্তের পুত্র । ভূমিদানপত্র, ১৯শ শঃ ।

ষ্প

গন্ধপুষ্প মাল্য জোগায় । বি. ভা. ৯২৩, ১৭৪০ খ্রীঃ ।

পুষ্পভারে ফল প্রেমবৃক্ষে আছে ভরে । ত্রি. স. পদ. ১৮৩৫ খ্রীঃ ।

দেবগ(ণ)পুষ্পবৃষ্টি তখনি করিল । গ. চ. ১৮০৪ খ্রীঃ ।

মিলাতে পুষ্প মদনঃ । আ. জি. ১৯শ শঃ ।

গোষ্পদসদ্রস হত্র জারে ভবাম্ভব (ভবার্নব) । অ. কু. ক. ১৭৭৩ খ্রীঃ ।

ষ্ঞ

বৈষ্ঞবর্ত্তর জমি জরখরিদকি কোওলাপত্র । ভূমিবিক্রয়পত্র, ১৯শ শঃ ।

শ্রীগুরুবৈষ্ণব সেবা করেন সদত । প. গা. ১৯শ শঃ ।

ক্ষুধায় তিষ্ণায় । চৈ. চ. ১৯শ শঃ ।

করযোড়ে বন্দিলাম আনন্দে বৈষ্ণব । অ. কু. ক. ১৭৭৩ খ্রীঃ ।

স্ক

আচার্য্যচরণে করি কোটি নমস্কার । চৈ. চ. ১৮৪৭ খ্রীঃ ।

কথোক দয়ীতা করে স্কন্দে আলম্বন । ঐ, ১৯শ শঃ ।

স্ত

মিদং সহস্তাক্ষর শ্রীচৈতন্য । ব. বি. ৪৯ ।

ষুস্তিসকলমঙ্গলালয় শ্রীযু রত্নেশ্বর বেরা । ভূমিবিক্রয়পত্র, ১৮২৩ খ্রীঃ ।

দরখাস্ত করিলে জে চেতুয়া পরগণার । ভাষপত্র, ১৮২৭ খ্রীঃ ।

স্তু

মো জে কস্তুরী কপুর খাইবোঁ । শ্রী. ।

স্থ

জমুনা পুলিনে স্থল আছে যুকমল । গো. ম. ১৮৪০ খ্রীঃ ।

শিবনিন্দাস্থানে নাহি রহি মুহুর্ত্তেক । শি. ১৯শ শঃ ।

ঘটমট প্রিতিমা জতেক স্থানে ২ । অ. কু. ক. ১৭৭৩ খ্রীঃ ।

আস্থিক করিয়া মন । প্রে. চ. ১৮৫৩ খ্রীঃ ।

স্ম

অকস্মাৎ আসন করিল টল ২ । শি. ১৮১৫ খ্রীঃ ।

গ্নি

সুদেব্যাগ্নি কোনে তুঙ্গ বিদ্যা যে দক্ষিণে । শ. ব. ১৯শ শঃ ।

ন্ট

বটুঘন্টা সহিত বন্দিলাম ক্ষেত্রপাল । অ. কু. ক. ১৭৭৩ খ্রীঃ ।

ণ্ঠ

কুম্বুকণ্ঠে সোভা করে। গো. ম. ১৯শ শঃ।

কলধৌত কণ্ঠামালা। ম. চ. ১৯শ শঃ।

হ্নু

মধ্যাহ্নু করিয়া পুন আইলা মন্দিরে। চৈ. চ. ১৯শ শঃ।

গ্রহ্নিপাপ হবে পরিছেদ। আ. জি. ১৯শ শঃ।

ণ্ড

গাইল বড়ুচণ্ডীদাস বাসলীগণে. ।। ৪ ।। শ্রী.।

তিন দণ্ডবত নিলেন বগিড়র কিষ্ট রায়। দি. ব. ১৯শ শঃ।

নিবশে কলাইকুণ্ড চেতুয়া পরগণা। শী. ১৯শ শঃ।

প্রভু পদাঘাতে তুলী হয় খণ্ড খণ্ড। চৈ. চ. ১৯শ শঃ।

ক্রপাপাণি গোপিগণে কহেন কাণ্ডারি। গো. ম. ১৮৪০ খ্রীঃ।

ম্প

চম্পকলতিকা এই উর্ত্তরেত হয় । শ. ব. ১৯শ শঃ ।

ম্ভ

সম্ভাশ করিলে আসী সভাকার সনে । ভা. ১০, ১৮১৯ খ্রীঃ ।

কিম্ভুতং ভক্তিসক্তিকং । চৈ. চ. ১৮৪৯ খ্রীঃ ।

ভারথি কহেন কেমন ব্রাম্ভন । গৌ. ব. ১৯শ শঃ ।

ঙ্ক

সিবা বলে সয়া আমি সংঙ্করের নারি । শি. ১৯শ শঃ ।

চরণপঙ্কজরাজে কনকনুপর বাজে । দি. ব. ১৮শ শঃ ।

উচ্চকরি করে সভে নাম সঙ্কীর্ত্তন । চৈ. চ. ১৮শ শঃ ।

কর্ন্নিকাপঙ্কজদলে যুগল সেবিবে । বি. ভা. ১৯১০ ।

কৈলাঙ তোমার কলঙ্ক ঘুচাত্যে । চৈ. ম. ১৯শ শঃ ।

ঙ্খ

সঙ্খ মৃদঙ্গ ধ্বনি বাজে । দি. ব. ১৯শ শঃ ।

চৈতন্যের জন্মকথা সংঙ্খেপ বর্ণন । বি. ভা. ১৯১০ ।

·ঢাক সংঙ্খ বাদ্যকর জয় দেহ নারি । বি. ভা. ১৭৪০ খ্রীঃ ।

সঙ্খ করতাল ঘন্টারব ভেল মীলন পদতলে তলেরে । ত্রি. স. ১৮৩৫ খ্রীঃ ।

ঙ্গ

কাহ্ন আলিঙ্গিয়াঁ সকল দেহ জুড়াইবোঁ । শ্রী. ।

সকাব্দা ।। বাঙ্গলা পাতসার অধিকার সন । বি. ভা. ১৯১০ ।

সাঙ্গোপাঙ্গো পারিসদ লইয় বিহার । চৈ. ম. ১৯শ শঃ ।

জঙ্গলে বুলিয়া বুলি পসুভয় ভাবি । অ. কু. ক. ১৭৭৩ খ্রীঃ ।

প্রসঙ্গানুকরণং । ব. বি. ৪৯, ১৭০৮ খ্রীঃ ।

মনুস্যের অঙ্গে দেখি বড় চমৎকার । শ. ব. ।

কুঃ কথা প্রসঙ্গ করি তারে দেই কথা । চৈ. ম. ১৯শ শঃ ।

কৃষ্ণ সঙ্গে জাও ঃ কাখে সঙ্গে পাও । ঢা. বি. ৬৬১৪ ।

শ্রীকৃষ্ণ সংঙ্গে বৈদ্যরাজ। অ. আ. ১৮শ শঃ ।

বেশর ভেঙ্গা শনা দিল কানে । শি. ১৯শ শঃ ।

ঙঘ

চৌরঙ্গ ঘুঙ্ঘুর পলে কান্দে ঘনে ২ । বা. এ. ২৭৬ ।

ঞ্চ

কেমনে বঞ্চিবোঁরে বারিষা চারিমাষ । শ্রী. ।

ভুমস্যাপি রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম । বি. তা. ৯২৩, ১৭৪০ খ্রীঃ ।

চৌদ্দশত পঞ্চানে হইল অন্তধ্যান । বি. ভা. ৯২৩, ১৭৪০ খ্রীঃ ।

অতিসয় দয়া তাঁর আমা পঞ্চজনে । দি. ব. ১৯শ শঃ। ।

ঞ্ছ

তব দুই বাঞ্ছা আমার রহিল অবধি । রা. ক., ১৯শ শঃ।

জিবন মোঞ্ছব শদা বৈষ্টবের খেলা । বৈ. ব. ১৯শ শঃ। ।

শ্চ

আর মোর শক্তি নাই নিশ্চয় কহিল । জ. ম. ১৯শ শঃ।

আশ্চর্য্য জজ্ঞের কথা কহন না জায় । শ. ব. ১৯শ শঃ।

ঞ্জ

আইহ্নক পীঠ দিলোঁ লাজে তিলাঞ্জলী । শ্রী. ।

শুনিলে গঞ্জিবে মোরে দেবের সমাঝ । জ. ম. ১৯শ শঃ।

সুবর্ন্ন থালিতে ভাত উত্তম ব্যঞ্জন । চৈ. চ. ১৮শ শঃ।

সাদরে বন্দিয়া কালি নতসিরে কৃতাঞ্জলি । অ. কু. ক. ১৭৭৩ খ্রীঃ।

কহয়ে অঞ্জলী । বি. মা. ১৯শ শঃ।

জ্ঞ

অজ্ঞান জড়তা অন্ধজনের নয়ন । দি. ব. ১৯শ শঃ।

সংষারে অজ্ঞান লোক না করে সাধন । চৈ. চ. ১৯শ শঃ।

তব আজ্ঞায় চিরদিন করিনু বসতি । অজ্ঞাত, ১৯শ শঃ।

জানে নাঞি জজ্ঞদান জপপুজা ব্রত । শি. ১৯শ শঃ।

বেদজ্ঞান মুখে সদা । প. গা. ১৯শ শঃ।

যে আজ্ঞা তোমার । বি. মা.১৯শ শঃ।

সত্যভামা আজ্ঞা দিলা । ঢা. বি. ১৯৯১ ।

ক্ষ

রাধিকা মন্ননিঃশেষ নাগরো পরমাক্ষরং । শ্রী.।

অত কলির ক্ষয় ৪৯৫২ বৎসর । বি. ভা. ১৯১০ ।

প্রেতের লক্ষণ এহার প্রেতের য়াবস্থা । প. গা. ১৯শ শঃ।

সুক বলে ষুণ পরিক্ষিত নরেপতি । গো. ম. ১৮৪০ খ্রীঃ ।

লক্ষির নিবাস রক্ষ সক্ষহেতু হরি । শি. ১৯শ শঃ।

ক্ষ্ল

অক্ষ্লা অত্যক্ষ্লা । রা. পা. ৬১৬৭ ।

ক্ষন

শুক্ষনতুলা আনিলা সার । শ. ব.১৯শ শঃ।

লক্ষিন সরেস্বতি বন্দো লোটাইআ খিতি । দি. ব. ১৯শ শঃ।

সাং পরগণে দক্ষিণ সাগর মৌজে । অ. কু. ক. ১৭৭৩ খ্রীঃ ।

ঃখ

জাগে দুঃখ হিয়ার মাঝারে । শী. ১৮৫০ খ্রীঃ ।

ক্ত

চৈতন্যশক্তি শ্রীনিবাস আচার্য্য মহাশয় । বি. ভা. ১৯১০ ।

শ্রীরাধিকা মুক্ত হৈলা পটপদ্ম হৈতে । শি. ব. ১৯শ শঃ।

ঘাড় ভাঙ্গি রক্তখাব পূতি জাব পাকে । শি. ১৯শ শঃ।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা কহে নরোর্ত্তম দাস । ব. বি. ৪৯, ১৮০৭ খ্রীঃ ।

এহি যুক্তি ভাবিয়া মৃগ হৈল খরতর । বা. এ. ২৭৬ ।

ভক্ত নায়েকে প্রভু করহ কল্যাণ । রা. ব. ১৮১৫ খ্রীঃ ।

গ্ধ

সহজে চৈতন্যচরিত ঘনদুগ্ধ পুর । চৈ. চ. ১৮শ শঃ।

জনমিএগ্রা স্বচিমাত্র দগ্ধনাহী খাই । গৌ. ব. ১৯শ শঃ।

গ্ন

মনহর মক্তি দেখে মগ্ন হইল জর । শী. ১৯শ ।

দ্ধ

চৌদ্ধ ভুবন উজিয়ার প্রসন্ন হইলা । বি. ভা. ১৯১০ ।

আমি মোর বৃদ্ধক দেবর ছাড়ি গেল । শি. ১৯শ শঃ।

শ্রদ্ধাযুক্ত হএ৷ ইহা শুনে যেইজন । চৈ. চ. ১৮শ শঃ।

তাহারে উদ্ধার কৈল দেব চক্রপানি । শী. ১৯শ শঃ।

যুর্দ্ধে হৈলে ক্রোধ । দি. ব. ১৯শ শঃ।

ন্ত্র

এসব মন্ত্রণা করি । অ. আ. ১৯শ শঃ।

ক্ষিতি ধন্য কৈল নাম মন্ত্র দিয়া । বি. ভা. ১৯১০ ।

জন্ত্রণার উপর জন্ত্রণা । অজ্ঞাত, ১৯শ শঃ।

ন্দ্র

আর কভোঁ ধিক না বুলিব চন্দ্রাবলী । শ্রী. ।

রামের চরণে দ্বিজ কবিচন্দ্র গান । রা. ব. ১৯শ শঃ।

ইতি শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকায়াং । ব. বি. ৪৯, ১৭০৮ খ্রীঃ ।

ন্ম

যতা দুখ দেখিলোঁ তোম্মারে । শ্রী. ।

ব্রহ্মাবিষ্ণু সিব জায় । বৈ. প. ১৯শ শঃ।

সচির গর্ব্ভেতে প্রভূ জন্মিল আসীয়া । রা. ক. ১৯শ শঃ।

ভয়ে এ কম্মাবট ঃ । তারে কর ক্রোধ ঃ । শি. ১৯শ শঃ।

জর বলে ব্রহ্মমই আমার ভঅ কি । শী. ১৯শ শঃ।

স্বপ্নে কৃপা কৈলেন প্রভূ ব্রহ্মাণের বেসে । দা. পা. ১৯শ শঃ ।

<u>দ্বিত্বব্যঞ্জন</u>

চ্ছ ।। সিখিপুচ্ছ সোভা করে চূড়ার উপরে । গো. ম. ১৮৪০ খ্রীঃ ।

জ্জ ।। গুজ্জরীরাগ ঃ ।। কুড়ুক্ক ঃ । শ্রী. ।

ঘট বিসর্জ্জন দেও সুন দানপতি ।

ট্ট ।। নিত্যানন্দ প্রভু ভট্টাচার্য্যে উঠাইলা । চৈ. চ. ১৯শ শঃ ।

ণ্ণ ।। স্বচির কণ্ণেতে হরিনাম দিল । গৌ. ব. ১৯শ শঃ ।

ত্ত ।। পিতর্ত্তর বাতর্ত্তর একত্রেতে ধায় । শী. ১৯শ শঃ ।

দ্দ ।। মথুরা কাহ্নের উদ্দেশে । শ্রী. ।

ন্ন ।। আনিআঁ দিআব জগন্নাথে । শ্রী. ।

বর্ণবিভ্রাট

ন, ল

বিথর বুলিআঁ বড়ায়ি কাজ কিছু নাঁহী । শ্রী. ।

দিবস কতেক করিলাম পালন । বৈ. প. ১৮২৫ খ্রীঃ ।

কনকাচল জিতল গৌরতনুলাবণিরে । ত্রি. স. পদ. ১৮৩৫ খ্রীঃ ।

মোরে দয়া না করীল কি লাগিয়া । মু. চ. ১৯শ শঃ ।

ইথে অপরাধ কিছু না লবে আমার । চৈ. চ. ১৮৪৭ খ্রীঃ ।

ব । র

গাইল বড়ু চন্ডীদাস বাসলী বর । শ্রী. ।

সভামৌলি পুছে প্রভুর বার্ত্তা আর বার । চৈ. চ. ১৮শ শঃ ।

দেববুদ্ধে জেবাঃ করে তার সেবা । শি. ১৯শ শঃ ।

শনার শ্বোরির শ্বব পচে । শী. ম. ১৯শ শঃ ।

কিম্ভুতং ভক্তাবতারং ভক্তরূপেণ । চৈ. চ. ১৮৪৭ খ্রীঃ ।

চলইবে রাইপাশে করি অনুসার । বি. মা. ১৯শ শঃ।

ও । ত্ত । তু

নিশ্চয় জানিলাও আমি হৈলাও দেসান্তরি । বা. এ. ২৭৬ ।

নিবারহো চিত্ত তুমি পিড়া পরিহরি । ঐ ।

শু । শ্ত

পাটনির এতস্তব শুনি চক্রপানি । শী. ১৮শ শঃ।

উ-কার রূপে 'ব'

আশা হাতে কক্ষতলে করি দুসাসন । শী. ১৮শ শঃ।

পুত্রবিনে অনাথিনি অভাগিনি হইনু । ঐ, ১৮৮০ খ্রীঃ ।

এপুস্তক শ্রীপঞ্চানন্দ পুরকাইতের পুত্র । অ. কু. ক. ১৭৭৩ খ্রীঃ ।

দ্বিত্ব বোঝাতে 'ব'

লৰ্জ্জা ভয়ে মেনকা বিনয় কিছু বলে । শি. ১৯শ শঃ।

পূৰ্ব্ব তরফ জগন্বাথ সরকারের । ভূমিবিক্রয়পত্র, ১৮০৯ খ্রীঃ ।

'ব' এর দ্বিমাত্রিক ব্যবহার

পান গুবাক দ্বিয়া । গৌ. ব. ১৯শ শঃ।

দ্বিবস দ্বপরে ডাকা । চ. ম. ১৯শ শঃ।

সংশোধন । তোলাপাঠ

অতিকাল হৈল হৈল লোক ছাড়িয়া না জায় । ('হৈল' দুবার হয়েছে ।)। শী. ১৯শ শঃ।

জানিবি জখখন ভেঙ্গ্যা দিবে হুড়া । ('খ' দুবার হয়েছে) । শি. ১৯শ শঃ।

গোকুলে উৎপাত পাছে আশীয়া ঘটয় । ('পাত' পরে লেখা । ভা. ১০, ১৮১৯ খ্রীঃ ।

সংসারের গুরু তুমি কে এ গুরু তম্‌্যার (অতিরিক্ত 'এ') । আ. জি. ১৯র্শ শঃ।

য়ানিব প্রচুর মাংস জত খাইতে ('স' পরে লেখা) । দা. পা. ১৯শ শঃ।

শকল দেবতা পুজা করিল আমার ('ল' পরে লেখা) । শী. ১৯শ শঃ।

গণেশের বাহন ইন্দুর সব বহে ('শে' পরে লেখা) । জ. ম. ১৯শ শঃ।

কান্দিয়া ধরিল গিয়া দ্রোপদির ধরিল চরণ (দ্বিতীয় 'ধরিল' ভুলক্রমে লেখা)। মহা. ১৯শ শঃ।

সঘনে বাজএ সিঙ্গা (দুর্বোধ্য 'ঘ' স্পষ্ট করে লেখা হয়েছে) । চ. ম. ১৯শ শঃ।

নিত্যানন্দন চৈতন্য সে জানিব কেমেনে (অতিরিক্ত 'ন', 'মে' এর এ-কার কাটা হয়েছে) । চৈ. ম., ১৯শ শঃ।

আহেররাগ ঃ ।। কুড়ুক্ক ঃ ।। লগনী ।। ('র' পরে লেখা) । শ্রী. ।

কবির আআক্ষান ভাই যুন মনোরথি (অতিরিক্ত 'আ') । অজ্ঞাত, ১৯শ শঃ।

ভক্ত অবতাঁর ঃ তার অদ্বৈতগণন (বিসর্গ স্থানে 'তাব') । চৈ. চ. ১৯শ শঃ।

শ্বেত বস্ত্র দেখাইলা নারি অপরূপ ('দেখা' শব্দ কাটা হয়েছে)। দি. ব. ১৯শ শঃ।

বর্ণ ছেড়ে যাওয়া

রাজার মহলে অগি (ণ) লাগে অতর্পর । মহা. ১৯শ শঃ।

শ্রী(অ)দ্বৈত গোসাঞি জেবা নাহি মানে । চৈ. ম. ১৯শ শঃ।

ব্যাঘ ( ) চর্ম পরিধান মুস(সি)ক বাহন । দি. ব. ১৯শ শঃ ।

রামে(র) মহিমা জা(ন) তুমি । রা. ব. ১৮১৫ খ্রীঃ ।

বিধুম (্)খি বলিল বুড়ার বড় জ্ঞান । শি. ১৯শ শঃ।

আমি অতি মুড়ামতি কি বলিতে জ(া)নি । শী. ১৯শ শঃ।

হেনকা(লে) **প্রজাপতি** গঙ্গায় দেখিল । গ. চ. ১৮৬৯ খ্রীঃ ।

জাহা হইতে পাই ব্রজে ব্রজ (ে) ন্দ্র নন্দন । রা. ক. ১৯শ শঃ।

প্রজাপতিগলায় পর্য়্যাছমিত্তু ম (নু) স্যের মাথা । প. গা. ১৯শ শঃ।

<u>কৃষ্ণ</u>

রাধাকৃষ্ণোচিরাদিত্য তব স্পর্শং করিষ্যতি । শ্রী. ।

শ্রীমান্মহাধার্ম্মিকোধীমান কৃষ্ণকিসোর ভূপতিলকো । ত্রি. স. পদ. ১৮৩৫ খ্রীঃ ।

রাধাকৃিষ্ণ কর ধ্যান । আ. জি. ১৯শ শঃ।

রাধারে কহেন কৃষ্ণ । অ. আ. ১৮শ

প্রেম ভক্তি হএ রাধাকৃষ্ণের চরণে । চৈ. চ. ১৮শ শঃ।

একাক্ষর । কৃষ্ণ

গোপীগণ নিবেদন কৃষ্ণ প্রতিবলে । অজ্ঞাত, ১৯শ শঃ।

জখন গোকুলে হৈল কৃষ্ণ অবতার । দি. ব. ১৯শ শঃ।

সত্যভামা কৃষ্ণ পাইল । অজ্ঞাত, ১৯শ শঃ।

কৃষ্ণপ্রণমিয়া দেবী করেণ স্তবণ । ঢা. বি. ৬০৫৩ ।

রসিক সেজন তার কৃষ্ণ কথায় মন । বৈ. প. ১৯শ শঃ ।

শ্রীকৃষ্ণদাসেতে কঅ এইসত্ত্যসত্ত্য । বৈ. প. ১৮২৫ খ্রীঃ ।

কৃষ্ণপাদপদ্ম বিরহ দেয় ভাবিয়া । ঢা. বি. ৩২৭৬ ।

একাক্ষর । প্রভু

পারিষদ হইয়া রইল প্রভু বিদ্যমানে । বি. ভা. ৯২৩ ।

সভোসঙ্গে লএগ্রা প্রভু আলালনাথ আইলা । অজ্ঞাত, ১৯শ শঃ।

জয় জয় প্রভু মোর বৈষ্ণব গোসাঞিও । ত্রি. স. পদ. ১৮৩৫ খ্রীঃ ।

প্রভুর অঙ্গনে নাচে ডম্বরু বাজায় । ঢা. বি ৫৯৯৩ ।

তাহ্বারে করেন কৃপা প্রভু কৃষ্ণচন্দ্র । বৈ. প. ১৯শ শঃ।

সুখে মহাপ্রভু দেখে ঈশ্বরগমন । চৈ. চ. ১৯শ শঃ।

আর দিনে প্রভু কহে সব ভক্তগণে । চৈ. চ. ১৮শ শঃ।

শব্দদ্বৈতে ২ ব্যবহার '

গদ ২ আধ ২ মধুর বচনামৃত লহু ২ হাস বিকাশিত গন্ড । ত্রি. স. পদ. ১৮৩৫ খ্রীঃ ।

কেহ ২ সুধাইছে সুন ব্রহ্মচারি । প. গা. ১৯শ শঃ।

পথে জাত্যে ২ নন্দ করএ চিন্তন । ভা. ১০, ১৮১৯ খ্রীঃ ।

আরে মাগী কি করিলি ২ হায় । শি., ১৯শ শঃ।

বর্ণদ্বিত্ব নির্দেশে বিশেষ চিহ্ন (^)

গুন্ডিচামাজ্জন এই সংক্ষেপে কহিল । চৈ. চ. ১৯শ শঃ।

মহাঁভয় দুজ্জোধন হইল তাহা দেখ্যা । মহা. ১৯শ শঃ।

'দ' বোঝাতে বিশেষ চিহ্ন (^)

আনন্দ হইএ স্বচিপুত্র । গৌ. ব. ১৯শ শঃ।

'জ' বোঝাতে বিশেষ চিহ্ন (^)

দলিতাঞ্জন চিক্কণ ঃ । ঢা. বি. ৯২৫৬ ।

করি লজ্জা তেয়াগিঞা । বি. মা., ১৯শ শঃ।

বিচিত্র অক্ষর-বিন্যাস

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য শ্রুতিনির্ভর বলেই পুঁথি-পাণ্ডুলিপির অনুলিপি করার সময় শ্বাসাঘাত বা স্বরাঘাত সৃষ্টিতে, কোন কোন বর্ণে গাম্ভীর্য রক্ষার উদ্দেশ্যে বিচিত্র স্বর ও ব্যঞ্জনের মাত্রা বা চিহ্ন যোগ করা হয়েছে। বাংলা পুঁথির অনন্ত সাম্রাজ্যের এমন কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ ঃ-

অ স্থানে য়

য়ার এক আছে মোর । দা. পা. ১৯শ শঃ।

রাজার মহলে য়গ্নি লাগিল তখন । শী. ১৯শ শঃ।

উ এর অতিরিক্ত ব্যবহার

সে বলে গৌউরাঙ্গ তমার দেখিআছি জেতে । গৌ. ব. ১৯শ শঃ।

ওয়া/য়া স্থানে ওা

রাজার দুওারে কত বস্যাছে দুওারি। শী. ১৯শ শঃ।

কে আর খাওাবে তোরে। শী. ১৮৫০ খ্রীঃ।

এ স্থানে য়ে

দুইজনে য়েবে মনে করিয়া সাদরে। ভা. ১০, ১৮১৯ খ্রীঃ।

য়া স্থানে আ

অদ্যাবোধি সেই নেত্র হিআর মাঝে। গৌ. ব. ১৯শ শঃ।

কৃ স্থানে ক্র

ক্রপা করি এসব কথা সহিবে। রা. ক. ১৯ শঃ।

ত্ত স্থানে ক্ত

কিক্তিবাষ পন্ডিত বন্দো। রা. ক. ১৮১৫ খ্রীঃ।

নরক্তম সদাই বিহরে। প্রে. চ. ১৮৫৩ খ্রীঃ।

ঙি + ক্ত > ঙিক্ত

তার সঙ্গে এক পুঙিক্ত বড় অনাচার । চৈ. চ. ১৯শ শঃ।

ক্র স্থানে কৃ

কর্ন্নপাতা নাগ্রি জায় কৃন্দনের রোল । শী. ১৯শ শঃ।

কৃ স্থানে ক্র

এক নিবেদন করি জদি ক্রপা হয় । রা. ক. ১৯ শ শঃ।

ক স্থানে খ

সুস্ক হয় সাগর সতির অভিসাপে । শি. ১৯শ শঃ।

গৃ স্থানে গ্রি

আজি নিজ গ্রিহে আমি করিব গমণ । ক. ভ. ১৮১৫ খ্রীঃ ।

গ্র স্থানে ঘ্র

এক দন্ডবতে জার বিঘ্রহ ফেটে জাঅ । দি. ব. ১৯শ শঃ।

চ স্থানে ব

ওহে কৃষ্ণ চিতচরা । অ. আ. ১৮ শ শঃ।

চ স্থানে ফ এর বিকৃত প্রয়োগ

কফজর মাতাবেথা পফসাতগড়ায় । শী. ১৯শ শঃ।

জ স্থানে জ্র (এখানে ও = আে।)

অোরে বাপু জ্ররাসুরূ বালাই জাই তোর । শী. ১৯শ শঃ।

দ্রি স্থানে দ্রী

হিমাদ্রী পর্ব্বতে য়াইলা । গ. ব. ১৯শ শঃ।

ঋ স্থানে ঋ + ইকার

কৃিতান্ত নগর ডম দিল দরসন । অজ্ঞাত, ১৯শ শঃ।

দৃিডভক্তী হৈল্যে আর । গৌ. ।

আর কি পুজিবে চন্দ্রকেতু নৃিপমুনি । শী. ১৮৮০ খ্রীঃ ।

আমা সভা বচনে কোপিত বৃিক্ষে উঠ । গো. ম. ১৮৪০ খ্রীঃ ।

দ্রা স্থানে দৃাঁ

খাদৃাঁঘাটে দিল দরসনঃ । মু. চ. ১৯শ শঃ ।

দ্ধ স্থানে ৰ্দ্ধ

সুৰ্দ্ধ ভজনে কর মন । প্রে. চ. ১৮৫৩ খ্রীঃ ।

নে স্থানে নু

প্রেম বিনু আর নাহি চাউঃ । বৈ. প. ১৮২৫ খ্রীঃ ।

প্রি স্থানে ব্রি

ইহ মহাশয় বড় মহেসের প্র্য় । শি. ১৮১৫ খ্রীঃ ।

রি স্থানে ব্রি

মহারণে বলে ব্রিপুস্থানে । শী. ১৯শ শঃ।

বৃ স্থানে ব্র

ব্রকোদর বলে বেটির বড় । শি. ১৯শ শঃ ।

অতিরিক্ত ব-ফলা, য-ফলা ও রেফ

বসন্তে অনেক লোক মবির্ব্য । শী. ১৯শ শঃ।

অতিরিক্ত ব-ফলা

বাগিচার আম্ব্র তোরূ ডরে তারা কান্দে । শী. ১৯শ শঃ।

অবশন্ত আর্নেকি মনশ্ব্য ত্বব পুরে । ঐ, ১৯শ শঃ।

ন্ম স্থানে ম্ব্য

হেন দিনে জম্ব্য নিলেন গরাগুণমনি । গৌ. ১৯শ শঃ।

ম্র স্থানে ম্ব্র

কুঞ্জের বাহিব আছে আম্ব্র দুই তরু । রা. ক. ১৯শ শঃ।

ক্ষ স্থানে ক্ষ

মুগ্রিব অঙ্গদ বন্দো আর জক্ষুবান । রা. ক. ১৮১৫ খ্রীঃ ।

র্দ্ধ স্থানে গর্দ্ধ

তেকারণে গোরাচান্দ দুগর্দ্ধ নাহি খাঅ । গৌ. ব. ১৯শ শঃ।

চর্যাপদের পুঁথি (১০ম-১২শ শঃ)।

ত্রিলোচন দাসের 'জগাই মাধাই উদ্ধার' (১৮১২ খ্রীঃ)।

'বোধিচর্যাবতার' (১৪৩৬ খ্রীঃ)।

বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' (১৫ শ শঃ)।

সিলেট নাগরীতে লেখা বাংলা পুঁথি।

বালুরঘাট মিউজিয়ামে রক্ষিত মন্দিরলিপি (মালদহ)। ১৬৫৮ খ্রীঃ।
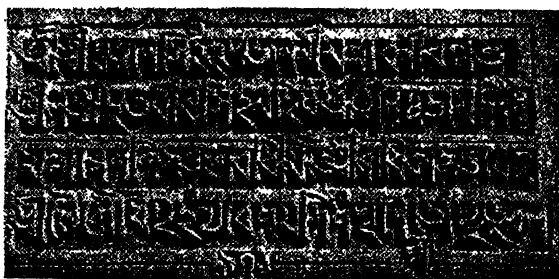
মুরলীমোহন মন্দিরলিপি (বিষ্ণুপুর। বাঁকুড়া) ১৬৬৫ খ্রীঃ।
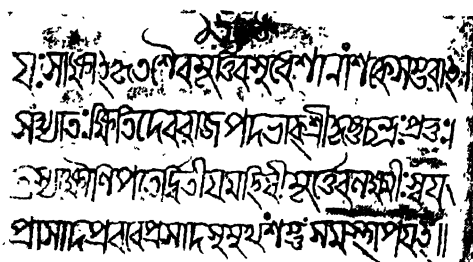
শিবনিবাসের মন্দিরলিপি (নদীয়া)। ১৮শ শঃ।

নরোত্তম দাসের 'গুরুভক্তিচিন্তামণি' (১৭৭৮ খ্রীঃ)।

কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' (আঃ ১০০ বৎসর)।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথির ভিতরে প্রাপ্ত চিরকুট

সংস্কৃত মহাভারত (১৪৭১ খ্রীঃ)।

'চৈতন্যচরিতামৃত' (আঃ ২০০ বৎসর)।

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' (আঃ ১৫০ বৎসর)।

পুঁথিতে রেখাচিত্র (১৮ শ শঃ)।

আরবীতে লেখা বাংলা পুঁথি।

পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদে বাংলা লিপি (মালদহ)।
১৪ শ - ১৫ শ শঃ।

মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' (আঃ ১৫০ বৎসর)।

'অক্রূর আগমন' (১৮২৪ খ্রীঃ)।

পুঁথির পুষ্পিকা (১৮৫০ খ্রীঃ)।

গদ্যপুঁথি 'আত্মজিজ্ঞাসা' (আঃ ১০০ বৎসর)।

কবিচন্দ্রের 'বকাসুর বধ' (১৮৪৩ খ্রীঃ)।

শঙ্করের 'কামিক্ষ্যার বন্দনা' (১৮১৪ খ্রীঃ)।

কবিলাসপুরের মন্দির লিপি (বীরভূম)। ১৬৪৩ খ্রীঃ।

পূর্বোক্ত মন্দিরলিপির অপরাংশ।

চন্দ্রকোণার লালজীউ মন্দিরলিপি (পঃ মেদিনীপুর)। ১৬৫৫ খ্রীঃ।

তমসুকপত্র (১৮৫৯ খ্রীঃ)।

১৮৮৭ খ্রীঃ লেখা পোস্টকার্ড।

১.

২.

৩.

৪.

৫.

যুক্তাক্ষরের বিবর্তন।

১ - অশোক ব্রাহ্মী।

২ - কুষাণলিপি।

৩ - গুপ্তলিপি।

৪ - ৭ম - ১০ম খ্রীঃ।

৫ ● ● - ৫ম - ৮ম শতকের পাণ্ডুলিপি।

বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামের

বাংলা পুথির তালিকা

শ্রীমনীন্দ্র মোহন চৌধুরী কাব্যতীর্থ

সংকলিত

প্রকাশক—

ডিরেক্টর, বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম, রাজশাহী।

মূল্য ... টাকা

A

DESCRIPTIVE

CATALOGUE OF SANSKRIT MSS.

IN THE

LIBRARY OF THE ASIATIC SOCIETY OF

BENGAL.

PART FIRST—GRAMMAR.

BY

RAJENDRALALA MITRA LL. D

CALCUTTA

1877

Descriptive Catalogue of old Manuscripts in the
Sree Sree Gouranga Grantha Mandir, Pathbari, Baranagar,
Calcutta 35

বরাহনগর শ্রীশ্রীপাঠবাড়ী শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দিরে সংরক্ষিত

প্রাচীন পুঁথির বিবরণ ও তালিকা

শ্রীবৈষ্ণবচরণ দাস গব্ধতীর্থ

সম্পাদিত

কয়েকটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের পুঁথির মুদ্রিত তালিকার নামপত্র।

স্মৃতিমন্দিরের লিপি (দাসপুর। পঃ মেদিনীপুর)। ১৮৮৩ খ্রীঃ।
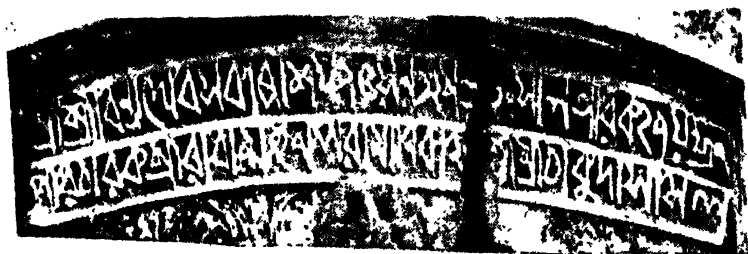
অবলুপ্ত তুলসীমঞ্চের লিপি (দাসপুর। পঃ মেদিনীপুর)। ১৮৫৩ খ্রীঃ।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কামানের লিপি (১৮ শ শঃ)।
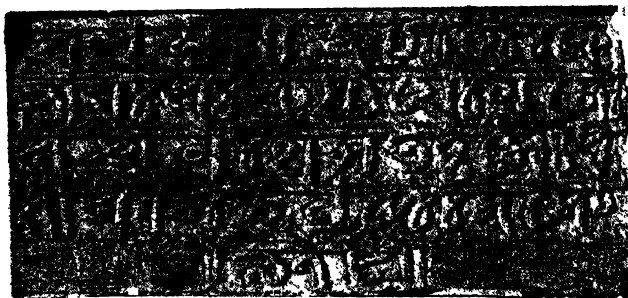
তেজপাল রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের লিপি (বিষ্ণুপুরঃ বাঁকুড়া। ১৬৭২ খ্রীঃ)।
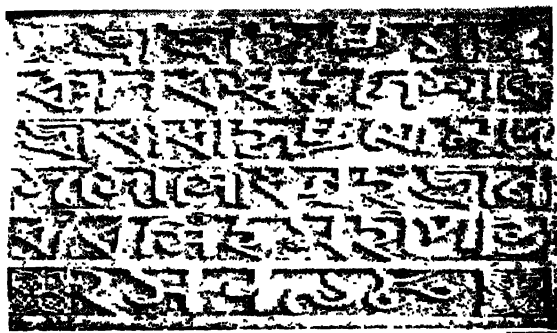
সাবড়াকোণের মন্দিরলিপি (বিষ্ণুপুর। বাঁকুড়া)। ১৬৭২ খ্রীঃ।
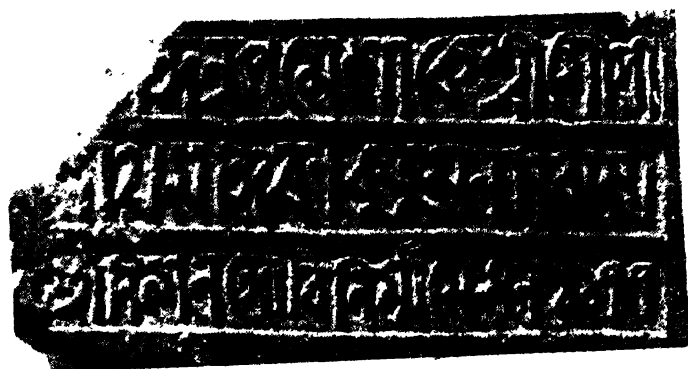
কুড়মুনের অবলুপ্ত মন্দিরের লিপি (বর্দ্ধমান)। ১৭৭১ খ্রীঃ।

পুঁথিচিত্রে বৌদ্ধদেবী (১১০৫ খ্রীঃ)।

পুঁথিচিত্রে বৈরোচন (১১০৫ খ্রীঃ)।

বটতলার বইতে কাঠের ব্লক (১৯ শ শঃ)।

বটতলার বইতে কাঠের ব্লক (১৯ শ শঃ)।
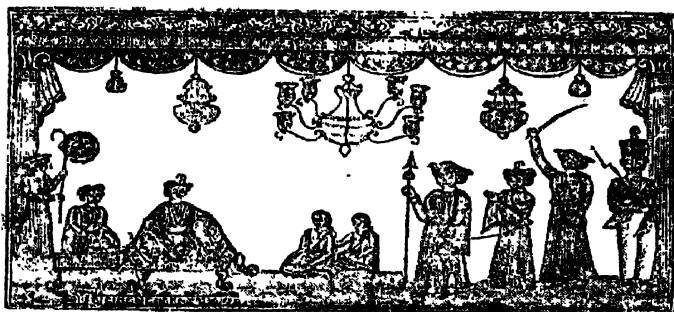
বটতলার বইতে হীরালাল কর্মকারের তৈরী কাঠের ব্লক (১৯ শ শঃ)।

'পঞ্চরক্ষা' পুঁথির পাটাচিত্র (১১০৫ খ্রীঃ)।

পুঁথির পাটাচিত্র (১৭ শ শঃ)।
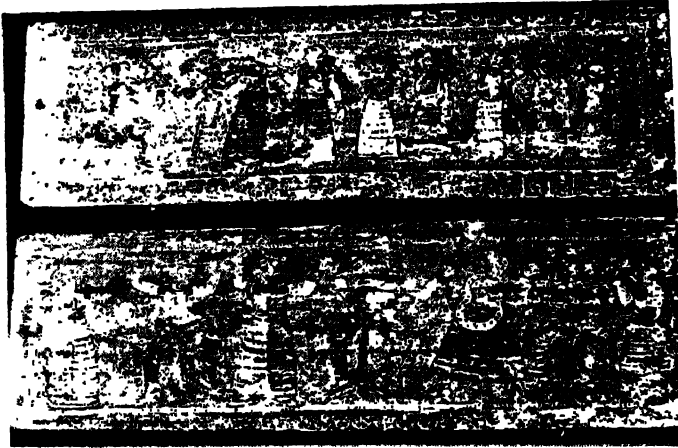
রাউতাড়া কেরাণীবাড়ির (জয়পুর / হাওড়া) পুঁথির পাটাচিত্র (১৮ শ শঃ)।

আড়রা গ্রামের পুঁথির পাটাচিত্র ঃ দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল (১৮ শ শঃ)।
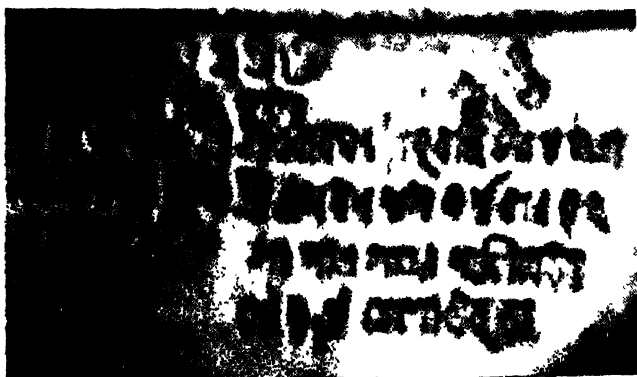
পিতলের রথের লিপি (আনন্দপুর। পঃ মেদিনীপুর)।

ধাতবমুদ্রায় বাংলা লিপি। ১৬ শ - ১৮ শ শতাব্দী।

ঈশা খাঁর কামানের লিপি (বাংলাদেশ যাদুঘর। ঢাকা)। ১৫৯৩ - ৯৪ খ্রীঃ।

গিয়াসুদ্দিন মামুদের সমকালীন শিলা লিপি (বাংলাদেশ যাদুঘর। ঢাকা)। ১৫৩৩ খ্রীঃ।

গৌরার মন্দিরলিপি (দাসপুর। পঃ মেদিনীপুর) । ১৭৮১ খ্রীঃ।
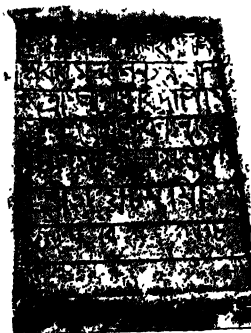
ডিহিচেতুয়ার মন্দিরলিপি (দাসপুর। পঃ মেদিনীপুর)। ১৮৮৪ খ্রীঃ।

শতাধিক বর্ষের প্রাচীন জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'।

শতাধিক বর্ষের প্রাচীন 'শুভচনীর পালা'।

শুশুনিয়ার গুহালিপি (৪র্থ শতাব্দী)।

'পদকল্পতরু' পুঁথির চিত্র।

অ সেমিটিক ও ভারতীয় বর্ণমালার কষ্টকল্পিত সাদৃশ্য।

আ ব্রাহ্মী থেকে বাংলা বর্ণমালার বিবর্তন।

১. অশোক ব্রাহ্মী (খ্রীঃ পূঃ ৩য় শঃ)।
২. কুষাণ লিপি (১ম - ৩য় শঃ)।
৩. গুপ্তযুগ (৪র্থ - ৬ষ্ঠ শঃ)।
৪. কুটিল লিপি (৭ম - ৯ম শঃ)।
৫. শশাঙ্ক (৭ম শঃ)।
৬. ময়নামতি ও খালিমপুর তাম্রশাসন (৮ম শঃ)
৭. ৯ম-১১শ শঃ।
৮. ১২শ শঃ।
৯. চর্যাপদ (১০ম - ১২শ শঃ)।
১০. ১৩শ শঃ।
১১. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (১৪শ - ১৫শ শঃ)।
১২. ১৬শ শঃ।
১৩. ১৭শ শঃ।
১৪. ১৮শ শঃ।
১৫. ১৯শ শঃ।

ই বাংলা সংখ্যাচিহ্নের বিবর্তন।

১. বর্তমান লিপি।
২. ১ম ও ২য় শতাব্দী।
৩. ৩য় ও ৪র্থ শতাব্দী।
৪. গুপ্তযুগ (খ্রীঃ ৪০০ - ৫০০ শঃ)।
৫. পালযুগ (৯ম - ১০ম শঃ)।
৬. সেনযুগ (১১শ - ১২শ শঃ)।
৭. চর্যাপদ।
৮. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।
৯. ১৫শ শতাব্দী।
১০. ১৬শ শতাব্দী।
১১. ১৭শ শতাব্দী।
১২. ১৮শ শতাব্দী।

ঈ আধুনিক ভারতীয় বর্ণমালা।

১. বাংলা ও অসমীয়া।
২. নাগরী।
৩. মৈথিলী।
৪. নেওয়ারী।
৫. উৎকলীয়।
৬. শারদা।
৭. গুরুমুখী।
৮. কৈথী।
৯. গুজরাটী।
১০. মারাঠী।
১১. তেলুগু।
১২. কানাড়ী।
১৩. মালয়ালম।
১৪. তামিল।

আ

ব্রাহ্মী থেকে বাংলা বর্ণমালার বিবর্তন।

	১	২	৩
অ			
আ			
ই			
ঈ			
উ			
ঊ			
ঋ			
এ			
ঐ			
ও			
ঔ			
ক			
খ			
গ			
ঘ			
ঙ			

৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
অ	অ	অ	অ	অ	অ	অ	অ
আ	আ	আ	আ	আ	আ	আ	আ
ই	ই	ই		ই	ই	ই	ই
ঈ	ঈ		ঈ			ঈ	ঈ
উ	উ	উ	উ	উ	উ	উ	উ
	ঊ		ঊ		ঊ	ঊ	ঊ
এ	এ	এ	এ	এ	এ	এ	এ
ঐ					ঐ	ঐ	ঐ
ও	ও		ও	ও	ও	ও	ও
					ঔ	ঔ	ঔ
ক	ক	ক	ক ক	ক +	ক	ক ক	ক
খ	খ	খ	খ	খ	খ	খ	খ
গ	গ	গ	গ	গ	গ	গ	গ
ঘ	ঘ	ঘ	ঘ	ঘ	ঘ	ঘ	ঘ
			ঙ	ঙ	ঙ	ঙ	ঙ

৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫

৪	৫	৬	৭

৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
ফ	ফ	ফ	ফ	ফ	ফ	ফ	ফ
ব	ব	ব	ব	ব	ব	ব	ব
ভ	ভ	ভ	ভ	ভ	ভ	ভ	ভ
ম	ম	ম	ম ম	ম	ম	ম	ম
য	য	য	য	য	য	য	য য
র	র	র	র	র	র	র	র র
ল	ল	ল	ল	ল	ল	ল	ল ল
ব						ব	ব
শ	শ	শ	শ	শ	শ	শ	শ
ষ	ষ	ষ	ষ	ষ	ষ	ষ	ষ ষ
স	স	স	স	স	স	স	স
হ	হ	হ	হ হ	হ	হ	হ	হ হ
	০		০			০	০
	৪		৪			৪	ঃ
			ঁ			ঁ	ঁ
			ক্ষ		ক্ষ	ক্ষ	ক্ষ

৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	১	১	১	১	১
২	২	২২	২২	২	২
৩	৩	৩৩	৩৩	৩	৩৩
৪	৪	৪	৪	৪	৪৪
৫	৫	৫	৫৫	৫	৫৫
৬	৬	৬	৬	৬	৬৬
৭	৭	৭	৭৭	৭	৭
৮	৮	৮৮	৮৮	৮	৮
৯	৯	৯	৯	৯	৯
0	0	0	0	0	0

'শিশুশিক্ষার' কাঠের ব্লক (১৮৪৯ খ্রীঃ)।

বোলট্‌সের তৈরী বর্ণমালা (১৭৬৮ খ্রীঃ)।

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ
ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ
দ ধ ন প ফ ব ভ ম
য ৰ ল ব শ ষ স হ ক্ষ

হলহেডের বর্ণমালা। (১৭৭৮ খ্রীঃ)।

মহেন্দ্রপালদেবের তাম্রশাসন (৯ম শঃ)।

43 A GRAMMAR OF THE
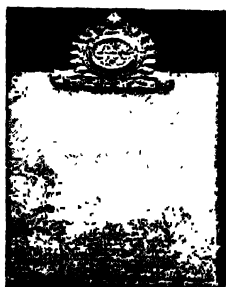
সেনী দেখি সোমদত্ত উঠিল তখন।
হুড়াহুড়ি মহা যুদ্ধ করে দুই জন॥

তবে সেনী মহা কোপে ধরে তার চুলে।
দেখিয়া হইল হাস্য জত সভা জনে॥

কেশে ধরি চড় মারে বজ্রের সমানে।
এক চড়ে দন্ত ভাঙ্গি করে খানে খানে॥

তবে সভে উঠি দোহা নিবারণ কৈল।
অভিমানে সোমদত্ত দেশেরে চলিল॥

সভা মধ্যে সোমদত্ত পাইয়া অভিমান।
তপস্যা করিতে বনে করিল পয়ান॥

দ্বাদশ বৎসর সেই কৈল অনাহারে।
এক চিত্তে সোমদত্ত সেবে মহেশ্বরে॥

তপস্যায় বস হইল দেব দিগাম্বর।
বৃষভে চড়িয়া আইল বনের ভিতর॥

শিব বলে বর মাগ সুনহ রাজন।
এত বানি সোমদত্তে ডাকে পঞ্চানন॥

হলহেডের ব্যাকরণের পৃষ্ঠা (১৭৭৮ খ্রীঃ)।

ঈ আধুনিক ভারতীয় বর্ণমালা

ঈ আধুনিক ভারতীয় বর্ণমালা

. পাট্টাপত্র (১৭২৩ খ্রীঃ)।

. ভূমিদানপত্র (১৭৬৬ খ্রীঃ):

. ফসলছাড়পত্র (১৭৬৯ খ্রীঃ)।

. রাজা তিলকচন্দ্রের স্বাক্ষরিত ফসলছাড়পত্র (১৭৮০ খ্রীঃ)।

চিত্রঋণ

বালুরঘাটজেলা মিউজিয়ামের শিলালিপি; কবিলাসপুর, চন্দ্রকোনা লালজীউমন্দির, তেজপাল, সাবড়াকোণ, কুড়মুন, গৌরা ও ডিহিচেতুয়ার মন্দিরলিপি; কৃষ্ণচন্দ্রের কামানের লিপি, রাউতাড়ার পুঁথির পাটা, পিতলের রথের লিপি, ঈশা খাঁর কামানের লিপি ও মহেন্দ্রপালদেবের তাম্রশাসনের আলোকচিত্র শ্রীতারাপদ সাঁতরার সৌজন্যে প্রাপ্ত। মুরলীমোহন মন্দিরলিপি ও শুশুনিয়ার গুহালিপির আলোকচিত্র প্রয়াত অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত। আরবী পুঁথির চিত্র 'দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন' থেকে, বৌদ্ধ পুঁথি ও পাটাচিত্র 'হান্ড্রেড ইয়ারস অব্ দি ইউনিভার্সিটি অব ক্যালকাটা' থেকে বাংলাদেশ যাদুঘরের শিলালিপির চিত্র 'বাংলাদেশ যাদুঘর প্রদর্শনী স্মারক' থেকে, সংস্কৃত মহাভারত পুঁথির চিত্র কল্পনা ভৌমিকের 'পাণ্ডুলিপি পঠন সহায়িকা' ত্রিপুরার পুঁথিপত্রের বর্ণনাত্মক তালিকা' থেকে এবং শিবনিবাসের মন্দিরলিপির আলোকচিত্র মোহিত রায়ের 'নদীয়া জেলার পুরাকীর্তি' থেকে গৃহীত।